হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ-বিভাগ
১৯৩২–১৯৪৭

অনুবাদ
আবু জাফর
অনুবাদ সম্পাদনা
বদিউদ্দিন নাজির

এল্ অ্যাল্মা পাব্লিকেশনস

First Edition 1999

প্রচ্ছদ
আশরাফুল হাসান আরিফ

প্রকাশক: এল্ অ্যাল্মা পাব্লিকেশনস, ৪১ বি, লোয়ার রেঞ্জ, কলকাতা ৭০০ ০১৯। কম্পিউটার কম্পোজ: অসীম কুমার বিশ্বাস। মুদ্রণ: একতা অফসেট প্রেস, ১১৯ ফকিরাপুল, ঢাকা।

সূচি

মানচিত্র vii
সারণি viii
বাংলা সংস্করণের মুখবন্ধ ix
কৃতজ্ঞতা xiii
শব্দসংক্ষেপ xv

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায়
বাঙলার রাজনীতি ও সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ ২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাঙলার রাজনীতিতে মফস্বলের অভ্যুদয় ৬৭

তৃতীয় অধ্যায়
বেঙ্গল কংগ্রেসের পরিচিতি সংকট ১২৩

চতুর্থ অধ্যায়
ভদ্রলোক সম্প্রদায়গত পরিচিতির ব্যাখ্যা:
বাঙলায় সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িকতা ১৭৭

পঞ্চম অধ্যায়
হিন্দু ঐক্য এবং মুসলমান স্বেচ্ছাচার:
হিন্দু ভদ্রলোক রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় ১৯৩৬-৪৭ ২২৫

ষষ্ঠ অধ্যায়
দ্বিতীয় বারের বাঙলা বিভাগ ১৯৪৫-৪৭ ২৫৯

উপসংহার ৩১১

পরিশিষ্ট ১ ৩১৫
তথ্যসূত্র ৩২১
নির্ঘণ্ট ৩৪৫

সারণি

সারণি ১ : বাঙলায় সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ ২৫

সারণি ২ : গ্রামীণ বাঙলায় শ্রেণী ও অর্থনৈতিক পার্থক্য ৩৯

সারণি ৩ : মধ্যবর্তী রায়তি স্বত্ব বিক্রয় ও হস্তান্তর: ১৯২৯-৩৭ ৭৬

সারণি ৪ : বাণিজ্য ও জমির মালিক। 'বিশেষ স্বার্থ' ও কংগ্রেস ১৯৩৬-৩৭ এবং ১৯৪৫-৪৬ ১৬০

সারণি ৫ : ২৪ পরগণা জেলার স্থানীয় বোর্ডসমূহে মুসলমান সদস্য: ১৯৩০-৩১ থেকে ১৯৩৬-৩৭ পর্যন্ত ২৪৯

সারণি ৬ : ১৯৪৫-৪৬-এর নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সর্ব-ভারতীয় ফলাফল ২৬৩

সারণি ৭ : বাঙলায় কংগ্রেসের নির্বাচনী ফলাফল: ১৯৩৬-৩৭ এবং ১৯৪৫-৪৬ ২৬৭

সারণি ৮ : কোলকাতার কয়েকটি হিন্দু স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন: ১৯৪৫-১৯৪৭ ২৭৪

সারণি ৯ : বাঙলা বিভাগের দাবি সম্বলিত আবেদনের জেলাভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ ও হিন্দু জনগণের আনুপাতিক হার, ১৯৪৭ ২৮২

সারণি ১০ : বিভাগের জন্য আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারীদের পেশাগত শ্রেণীবিভাগ (বাঙলার চারটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম থেকে প্রেরিত)। ২৯৪

প্রায় এক দশক আগে *বেঙ্গল ডিভাইডেড* গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়; ১৯৪৭ সালে বাঙলায় এলিট বলে পরিচিত শ্রেণীর কিছু লোক প্রদেশ ভাগে কেন সমর্থন দিয়েছিল তা ঐ গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়। ঐ বিভাগের পরিণতিতে বাঙলার উভয় অংশের জনজীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। বলতে গেলে, এমন কোনো বিষয় বাকি ছিল না যাকে এই ঘটনা স্পর্শ করেনি। ঐ গবেষণামূলক গ্রন্থখানি এখন বাংলায় অনূদিত হল; কেন এবং কিভাবে প্রদেশ ভাগ হয়েছিল তার প্রেক্ষাপট ও বর্তমান কালে তার প্রভাব সম্পর্কে এখন অধিক সংখ্যক পাঠক এই গ্রন্থ পড়ে অবহিত হতে পারবেন। ঐ ঘটনায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের নিয়ে আলোচিত গ্রন্থখানি তাদের কাছেই সহজলভ্য করার উদ্যোগ নেওয়ায় আমি ঢাকার ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের কাছে কৃতজ্ঞ।

অবিভক্ত বাঙলায় সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদের সাম্প্রদায়িকতার ওপর দশ বছর আগে এই গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয় – ঐ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রথাগত ও প্রচলিত ধারণার বিপরীত। কিন্তু এখন ভারতে হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্পষ্ট উন্মেষ এবং ঐ ধারা সম্পর্কে অত্যন্ত দেরিতে হলেও যেসব জ্ঞানগর্ভ ভাষ্য প্রকাশিত হচ্ছে তাতে *বেঙ্গল ডিভাইডেড*-এ উপস্থাপিত যুক্তিগুলো কম বিতর্কিত ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। অবশ্য ১৯৪৭ সালের ঐ ঘটনার জন্য বা এর সুদূরপ্রসারী প্রভাবের জন্য *বেঙ্গল ডিভাইডেড* গ্রন্থে দুই সম্প্রদায়ের কোনো পক্ষকেই অংশত প্রশংসা বা দায়ী করা হয়নি। সাম্প্রতিক গবেষণা (যার সাথে আমি নিজেও জড়িত) আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় — বাঙলা বিভাগের সফলতা দাবিকারী ও তার প্রতিরোধে ব্যর্থদের সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মূল্যায়নের চেষ্টা, নিজেদের স্বার্থে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও দোষদর্শী হওয়া সত্ত্বেও, কতটাই অন্তঃসারশূন্য। বিভাগোত্তর কালের অসফলতা থেকে বুঝা যায় যে, ১৯৪৭ সালে বাঙলার দ্বিতীয় বিভক্তির ব্যাপক এবং অনেক ক্ষেত্রে দুঃখজনক পরিণতির কথা কেউ তখন ভাবতে পারেনি।

আমি আশা করি, যে উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরেজি গ্রন্থখানি লেখা হয় সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই পাঠকেরা এর বাংলা অনুবাদকে গ্রহণ করবেন। ১৯৮০ সালে আমি যখন এ গ্রন্থের জন্য গবেষণা শুরু করি তখন একটা সাধারণ ও অনুকূল ধারণা প্রচলিত ছিল যে, ভারত বা বাঙলার বিভক্তি মুসলমানদের কাজ — হিন্দুরা তাদের মাতৃভূমির অখণ্ডতাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতে কোনো কিছুই করেনি। ঐ সময়ে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণায় প্রকাশ পায় যে, স্বাভাবিক ও ঐতিহ্যগতভাবে হিন্দুত্বের বৈশিষ্ট্য হল সহনশীল এবং বহুত্ববাদী। তাই হিন্দুত্বে

সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ নেই। তবে আমার গবেষণায় প্রচলিত ঐ সাধারণ ও তৃপ্তিদায়ক ধারণা তো নয়ই, বরং ভিন্ন তথ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঐ গবেষণায় প্রকাশ পায় যে, বাঙলার হিন্দু ভদ্রলোকদের (elites) ক্রম-ক্ষয়িষ্ণু ক্ষমতা, ধনসম্পদ ও মর্যাদা হুমকির সম্মুখীন হওয়ায় তারা সামাজিক অবস্থান অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে কূট-কৌশল অবলম্বন করে এবং নিজেদের কাজের যৌক্তিকতা হিসাবে বিভিন্ন ভাবাদর্শকে (idiologies) ব্যবহার করে। সত্যিকার অর্থে ঐ কূট-কৌশলকে একমাত্র সাম্প্রদায়িকতা হিসেবেই আখ্যায়িত করা যায়। আত্মরক্ষায় যুযুধান ঐ সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু ভদ্রলোকদের প্রদেশ ভাগের দাবীর পেছনে যুক্তি ছিল যে, এতে তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ হবে। আসলে ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে বাঙলায় যা ঘটে এবং উনিশ শতকের শেষ দিকে যুক্ত প্রদেশের উর্দুভাষী ভদ্রলোকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মুসলিম রাজনীতির যে উন্মেষ ঘটে তা একই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করা যেতে পারে। এতে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, রাজনৈতিক ও সামাজিক কৌশল হিসেবে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন সময় তাদের চলমান প্রাধান্যের প্রতিকূল হুমকির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতাকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে।

বেঙ্গল ডিভাইডেড-এর অনুবাদের কারণে এসব যুক্তি ও প্রেক্ষাপট নতুন পাঠকের কাছে তুলে ধরার সময় এ কথা সবার সব সময় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বাঙলার অভিজ্ঞতা কোনোমতেই আধুনিক কালের ইতিহাসে বিচ্ছিন্ন একটিমাত্র ঘটনা নয়। এছাড়া একটা সিদ্ধান্তেও আসা যায় যে, 'কূপমণ্ডুক জোলা'র কৌতুককর চরিত্র তৈরি করে মুসলিম রাজনীতি সম্পর্কে কোনো নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি একটি নতুন, ভ্রান্ত ও গৎবাঁধা 'উচ্চমন্য বাবু' সৃষ্টি করে বাঙলাকে উপলব্ধি করাও সম্ভব নয় — উভয় প্রচেষ্টা সমান ক্ষতিকর।

নতুন বাংলা সংস্করণ আমাকে অতীতের মতো নতুন করে ঋণ স্বীকারের সুযোগ করে দিয়েছে। *বেঙ্গল ডিভাইডেড* গ্রন্থের জন্য অতীতে যাঁরা প্রশংসা বা সমালোচনা করেছেন তাঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বইতে আলোচ্য বিভিন্ন বিষয় তাঁদের আবেগময় স্মৃতিকে জাগ্রত করেছে, এই বাঙলা সংস্করণের পাঠকদের ক্ষেত্রেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে বলে মনে করি। অনূদিত এ গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমি ঢাকার ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের প্রকাশক মহিউদ্দিন আহমদের কাছে কৃতজ্ঞ। অনুবাদের মাধ্যমে উভয় বাঙলার পাঠকের কাছে গ্রন্থখানি উপস্থাপন করতে অত্যন্ত ধৈর্য্যের সঙ্গে কঠিন পরিশ্রম করেছেন যে দুই যোগ্য ব্যক্তি — আবু জাফর ও বদিউদ্দিন নাজির — আমি তাঁদের কাছেও অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

ক্ষেত্রবিশেষে ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত মূল বাংলা উদ্ধৃতির ইংরেজি অনুবাদ থেকে পুনরায় বাংলায় অনুবাদ করার জন্য বর্তমান গ্রন্থে বাংলা উদ্ধৃতিতে কিছু কিছু অসামঞ্জস্য দেখা যাবে। হতে পারে, বাংলা উদ্ধৃতির ঐ ইংরেজি অনুবাদ হয়ত সম্পূর্ণ নির্ভুল হয়নি, বা ঐ মূল রচনা খুব একটা সহজলভ্য ছিল না, বা অন্য কেউ মূল বাংলা উদ্ধৃতির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন — যেসব এখন খুঁজে বের করা বা চিহ্নিত করা দুরূহ। দুঃখজনক হলেও

সত্য যে, এ ধরনের কাজে এটা স্বাভাবিক। যেখানে যেখানে এই অসামঞ্জস্য পাওয়া যাবে সে সবের দায়িত্ব একান্তভাবে আমার।

বাংলায় অনূদিত এ গ্রন্থখানি দেখে আমার পিসি শ্রীমতী স্নেহলতা মুখোপাধ্যায়ের চেয়ে বেশি আর কেউ খুশি হতেন না। গভীর দুঃখের বিষয়, তিনি এবং আমার শ্রদ্ধেয় বাবা যোগনাথ চট্টোপাধ্যায় এ বই দেখার আগেই পরলোকগমন করেছেন। তাঁদের উভয়ের স্মৃতির উদ্দেশে আমি এই বাংলা সংস্করণটি উৎসর্গ করলাম।

কৃতজ্ঞতা

এ গ্রন্থের সূচনা হয় ১৯৮৯ সালে ট্রিনিটি কলেজে ফেলোশিপ ডিসারটেশন উপস্থাপনের সময়। ১৯৯০ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরাল থিসিস উপস্থাপনের সময় তা আরো পরিমার্জিত করা হয়। প্রতিটি স্তরেই আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। এ গ্রন্থ প্রণয়নে সহযোগিতার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

স্নাতক ছাত্র ও পরে একজন ফেলো হিসেবে পাঁচ বছর গবেষণা, লেখালেখি ও ভ্রমণ কাজে ট্রিনিটি কলেজের শিক্ষক ও ফেলোগণ আমাকে উদার আর্থিক সহায়তা দেন। স্মাটস ফান্ডের সহায়তায় ভারত ও বাংলাদেশের আর্কাইভ ও লাইব্রেরিতে পড়াশুনা করা সম্ভব হয়।

কেম্ব্রিজে আমার সুপারভাইজার ড. অনিল শীল আমার কাজে যে আগ্রহ দেখান তা কর্তব্য পালনের চেয়ে বেশি। তাঁর সার্বক্ষণিক উৎসাহ দ্রুত লেখার কাজ সম্পাদনে আমাকে প্রেরণা যোগায়, তা না হলে লেখার কাজ শেষ করতে হয়ত বিলম্ব হত। তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও সতর্ক দৃষ্টি আমার বর্ণনার ভঙ্গি ও যুক্তির ত্রুটি নিরসনে সহায়ক হয়। ড. রাজনারায়ণ চন্দভারকার, প্রফেসর রবিন্দর কুমার এবং ড. তনিকা সরকার প্রাথমিক পর্যায়ের খসড়া পড়েন, তাঁদের পরামর্শ আমার কাজে খুবই সহায়ক হয়। এ গ্রন্থের মূল ভিত্তি ফেলোশিপ ও ডক্টরাল ডিসারটেশন বিশ্লেষণ করেন প্রফেসর তপন রায়চৌধুরী ও ড. গর্ডন জনসন — তাঁদের বিশ্লেষণধর্মী পরামর্শ খুবই মূল্যবান ও উৎসাহব্যাঞ্জক।

এ গ্রন্থ লেখার সময় বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আলোচনা ও যুক্তি উপস্থাপনে আমি শুধু উদ্দীপ্ত হইনি; নতুন চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ হয়েছি; পুরনো ধারণা আরো স্বচ্ছ করতে তা সহায়ক হয়েছে। আমার যুক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনার জন্য আমি সমিতা সেন, শুভ বসু ও সুজাতা প্যাটেলের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। অনুবাদ কাজে শুভ ও সমিতা আমাকে সাহায্য করেছে এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁদের জ্ঞান আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। ওয়ার্ড প্রসেসর সম্পর্কে সমিতার গভীর জ্ঞান আমার কাজে সহায়ক হয়েছে — পাণ্ডুলিপি তৈরিতে তিনি আমাকে ব্যাপক সাহায্য করেছেন।

নেহেরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম ও লাইব্রেরি, দিল্লীর ন্যাশনাল আর্কাইভ ও জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আর্কাইভ, কোলকাতার সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোসাইটি ও বাংলাদেশের (ঢাকা) বাংলা একাডেমী ও এশিয়াটিক সোসাইটি, লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি ও রেকর্ডস, অক্সফোর্ডের বোডলিয়ান লাইব্রেরি — এসব

প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারী আমাকে তথ্য-উপাত্ত দেখার জন্য সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন, এ গবেষণার ভিত্তি ঐসব তথ্য-উপাত্ত। বিশেষভাবে আমি ধন্যবাদ জানাই কেম্ব্রিজের সেন্টার ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের ড. লিওনেল কার্টার, বাংলা একাডেমীর (ঢাকা) জনাব এম মোজাদ্দেদ এবং কোলকাতার গোয়েন্দা শাখার রেকর্ড রুমের মি. কানাই লাল সর্দারকে — তাঁরা আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন।

ঢাকায় জনাব ও বেগম আতাউল হক তাঁদের গৃহে আমাকে স্বাগত জানান। প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামান, প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক ও সিরাজ মান্নান বাঙলার ইতিহাস নিয়ে আমার সাথে মত বিনিময় করেন। জনাব উমরের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে তথ্য-উপাত্ত পাওয়ার ব্যাপারে আমি জনাব বদরুদ্দিন উমর ও ফিরোজ আহসানের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এ গ্রন্থ প্রকাশে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য ট্রিনিটি কলেজের টিনা বোন ও লরা কর্ডি এবং কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেসের মেরিগোল্ড এ্যাকল্যান্ড ও মেরি রিচার্ডসকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

কয়েক বছর ধরে ইতিহাসের প্রতি গভীর আগ্রহে আমার পরিবারের সদস্যগণ আমাকে সহযোগিতা করেছেন, আমার ইচ্ছা পূরণ করেছেন — আমার গবেষণার অগ্রগতি তাঁরা আগ্রহ সহকারে লক্ষ করেছেন (এবং কখনো হতবুদ্ধি হননি)। সারা ও পিটার ম্যাকমানুস এবং ঝুপু ও সোনা অধিকারী আমার সুদীর্ঘ কোলকাতা অবস্থানকে ঘরোয়া পরিবেশে আনন্দদায়ক করে তোলে। আমার ঠাকুরদা ফ্রেডারিক সউয়ের এবং আমার মা সাইকী আবরাহাম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পাণ্ডুলিপি পাঠ করেন এবং প্রকাশ-কৌশল ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনার অনেক ত্রুটি উল্লেখ করেন। কেম্ব্রিজে থাকার সময় মিতি ও রামোনা অধিকারী এবং জয় ও জিগমন্ড ওয়ারউইক বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য করেন। বন্দনা ও অরুণ প্রসাদ ছিল আমার উৎসাহের নিত্যসঙ্গি। গর্ভবতী অবস্থায় এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আমার চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত থাকায় দলিল-পত্র গবেষণায় অর্চনা প্রসাদ আমাকে সাহায্য করেন।

আমার সবচেয়ে বড় ঋণ আমার স্বামী প্রকাশ-এর কাছে। আমার কাজে তাঁর সার্বক্ষণিক আগ্রহ ও সংশ্লিষ্টতা ছাড়া এ গ্রন্থের প্রকাশ হত নিম্ন মানের। শিশু সন্তানের লালন ও সাংসারিক কাজের সব দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় ও আনন্দের সাথে গ্রহণ করেন। এর মধ্যে তিনি তাঁর নিজের গবেষণা কাজের সময় বের করে নেন। আমাদের পুত্র কার্তিক আমাকে সব সময় সহযোগিতা করেছে। সব সময় সদাহাস্যে সে তার মাকে পড়াশোনা করার সুযোগ দিয়েছে।

আমার বাবা আমাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে সমর্থন ও সহযোগিতা করেন। আধুনিক বাঙালির ইতিহাস নিয়ে তাঁর নিজস্ব সচেতন আগ্রহ ও দৃঢ় ধারণা (বিতর্কিত হলেও) আমাকে এ বিষয়ে প্রথম আগ্রহী করে তোলে। গ্রন্থখানি তাঁর নামেই উৎসর্গ করা হল।

শব্দসংক্ষেপ

AICC	All India Congress Committee
AIML	All India Muslim League
BPCC	Bengal Provincial Congress Committee
BPHM	Bengal Provincial Hindu Mahasabha
CC	Congress Committee
DCC	District Congress Committee
DIG	Deputy Inspector General
DM	District Magistrate
FR	Fortnightly Report
FSR	Fortnightly Secret Report
GB	Government of Bengal
HCPB	Home Confidential Political Branch
INA	Indian National Army
IOLR	India Office Library and Records
LOFCR	Local Officers Fortnightly Confidential Reports
MLA	Member of the Legislative Assembly
NAI	National Archives of India
NBPS	Nikhil Banga Praja Samity
NMML	Nehru Memorial Museum and Library
OT	Oral Transcript
PS	Police Station
RSS	Rashtriya Swayam Sevak Sangha
SB	Special Branch
SP	Superintendent of Police
SSR	Survey and Settlement Report
WBSA	West Bengal State Archives
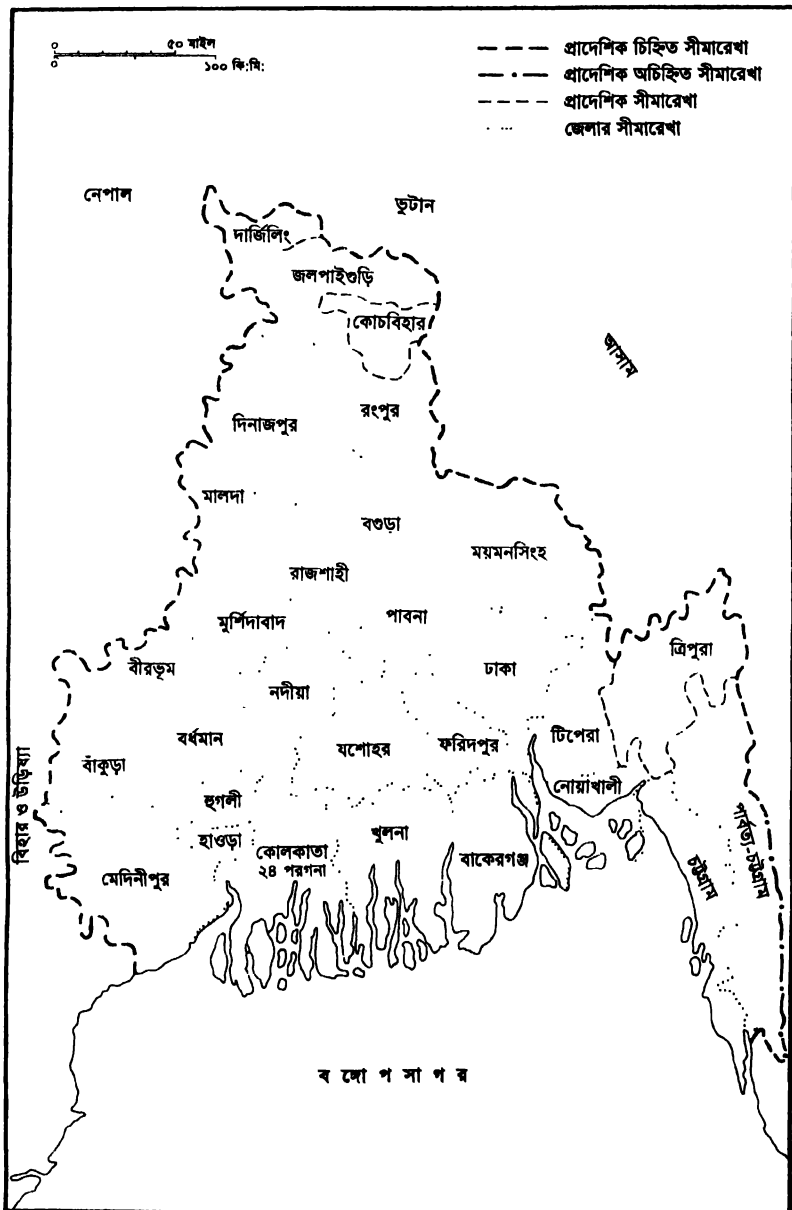
মানচিত্র ১: অবিভক্ত বাঙলার জেলাসমূহ।

ভূমিকা

উনিশশ পাঁচ সালে কার্জন বাঙলা ভাগ করলেন। কিন্তু তাঁর এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ফলে ছ'বছরের মধ্যে সরকার ঐ সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য হয়। বাস্তবিকপক্ষে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনে সুনাম অর্জনের ক্ষেত্রে বাঙলা সেই আন্দোলনের নিকট ঋণী, যাতে প্রদেশ বিভাগের মতো 'মীমাংসিত বিষয়'ও ওলটপালট হয়ে যায়। ভারতীয় রাজনীতিতে শুরু হল আন্দোলনের নতুন কৌশল।[১]

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গার ফলে ১৯৪৭ সালে বাঙলা আবার ভাগ হয়। কিন্তু এ সময় প্রায় কারও কণ্ঠেই প্রতিবাদের ধ্বনি উচ্চারিত হল না, বরং, দ্বিতীয় বার বাঙলা ভাগ নিশ্চিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে একটা সংঘবদ্ধ আন্দোলন পরিচালিত হল – যার লক্ষ্য ছিল ধর্মের ভিত্তিতে প্রদেশকে ভাগ করা। এই আন্দোলনে বাঙালি সমাজের সেই শ্রেণীর লোকেরাই নেতৃত্ব দেয়, যারা বাঙলার প্রথম বিভাগের সময় থেকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে আসছিল, যাদের পরিচিতি ছিল তথাকথিত ভদ্রলোক বা 'সম্মানিত লোক'। মাত্র চল্লিশ বছরেরও কম সময়ের ব্যবধানে ভদ্রলোক রাজনীতি তার সূচনা বিন্দুতে এসে সমাপ্ত হল – তারা জাতীয়তাবাদী বিষয়সূচি থেকে সংকীর্ণ বা সীমাবদ্ধ বিষয়ের দিকে সরে গেল। ভদ্রলোক রাজনীতির এসব পরিবর্তনের ব্যাখ্যা ও 'জাতীয়তাবাদ' থেকে 'সাম্প্রদায়িকতা'র ধারায় বাহ্যত তাদের স্থান বদলের বিশ্লেষণ এ গবেষণা গ্রন্থের মূল লক্ষ্য।[২]

আদর্শ ও রাজনৈতিক আচরণের দিক থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যকার সম্পর্ক জটিল এবং দুই বিপরীতধর্মী শক্তির একটি সংশ্লেষিত রূপ। সাম্প্রতিক গবেষণায় এমন দাবি করা হয়েছে যে, ভারতের জাতীয়তাবাদকে 'সাম্প্রদায়িকতা'র 'ভিন্নরূপ' হিসেবে গণ্য করা যায় না।[৩] সাম্প্রদায়িকতার বিপরীত ধারণা হল ধর্মনিরপেক্ষতা, যা ধর্ম থেকে রাজনীতিকে পৃথক করে দেয়।[৪] অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, এই অর্থে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অনেক কিছুই ধর্মনিরপেক্ষ নয়।[৫] জনসমর্থন পাওয়ার জন্য ধর্মীয় কল্পমূর্তি ও ইস্যুকে জাতীয় আন্দোলন পরিচালনার সময় কৌশলে ব্যবহার করা হয়।[৬] ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আদর্শিকভাবে সত্যিকার অর্থে যেমন ধর্মনিরপেক্ষ নয়, তেমনি তার দার্শনিক ভিত্তিও সুদৃঢ় নয়। এই জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সহমত পোষণ করে যে, ভারতীয় সমাজের গোড়াতে রয়েছে ধর্মীয়ভাবে সংজ্ঞায়িত সম্প্রদায়।[৭] তাদের 'ধর্মনিরপেক্ষ' জাতীয়তাবাদী আদর্শ হল 'সর্বধর্ম

সম্ভবা' অর্থাৎ সব সম্প্রদায়ের সমান অধিকার ও তাদের মধ্যে সমন্বয় বিধানের চেতনা।[৮] তবু অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ জাতীয় পরিচিতির বর্ণনাকালে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করেছেন – যে দৃষ্টিভঙ্গিতে একজন ভারতীয় মানে একজন হিন্দু। এ বিষয়টি বাঙলা প্রদেশে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ ও স্বামী বিবেকানন্দের রচনায় এবং তাদের অনুপ্রাণিত বিশেষ ধরনের 'চরম' জাতীয়তাবাদে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।[৯]

কিন্তু এ জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা সত্যিকার অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না, 'সাম্প্রদায়িক'ও ছিল না। জাতীয় আন্দোলনের মূলধারা পরিচালিত হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। ঐ আন্দোলনে ধর্মকে ব্যবহার করা হয় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে জাগ্রত করার জন্য। অন্য দিকে, সাম্প্রদায়িক দল ও আদর্শসমূহ একটি সম্প্রদায়কে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক ইউনিট হিসেবে অভিহিত করে, অন্য সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে এর ছিল চিরবৈরী সম্পর্ক। বাস্তবে অবশ্য সাম্প্রদায়িক আদর্শবাদীরা ভারত সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী চেতনার চেয়ে ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণার কাছে অনেক বেশি ঋণী। ঔপনিবেশিক সরকারি কর্মকর্তাদের মতো তারা ভারতকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় প্রভাবিত একটা সমাজ হিসেবেই শুধু লক্ষ করেনি, তারা দুই প্রধান সম্প্রদায়কে পরস্পরের প্রতি চির শত্রুভাবাপন্ন হিসেবেও গণ্য করে। এছাড়াও সম্প্রদায়ভিত্তিক দলগুলো মূলত ব্রিটিশ শাসনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন তো ছিলই না, বরং তারা ঘনঘন ব্রিটিশ শাসনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।[১০]

এই ধারণার উপর ভিত্তি করে জাতীয়তাবাদ থেকে সাম্প্রদায়িক চেতনার রূপান্তর সম্পর্কে এ গবেষণায় আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনা বাঙলার হিন্দু ভদ্রলোকদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে – এই ভদ্রলোকেরাই বাঙলা প্রদেশের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। অথচ বাঙলায় এসব রাজনীতির সামাজিক ভিত্তি ছিল সামান্য, জনগণের সমর্থনও ছিল কম; এমনকি গান্ধীর প্রবল প্রতিপত্তির সময়ও এখানে তাঁর প্রভাব ছিল সীমাবদ্ধ ও বিক্ষিপ্ত।[১১] একমাত্র খেলাফত আন্দোলনের সময় স্বল্পকালীন বিরতি ছাড়া বাঙলার মুসলমানেরা, যারা এই প্রদেশে জনসংখ্যার দিক থেকে অর্ধেকের বেশি, ভদ্রলোকদের পরিচালিত সব আন্দোলন পরিহার করে। কিন্তু অতি মাত্রায় ভদ্রলোক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও ১৯২০-এর দশক পর্যন্ত বাঙলায় কংগ্রেস ছিল একটা প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তি; বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল স্রোতধারায় এ দলটির প্রভাব ছিল খুবই শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ।

কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শেষ দেড় দশকে সর্ব-ভারতীয় রাজনীতিতে বাঙলা তার প্রাধান্য হারিয়ে জাতীয়তাবাদী মূল স্রোতধারার রাজনীতি থেকে ছিটকে পড়ে। ঐ সময় 'ভদ্রলোক রাজনীতি' ক্রমশ অন্তর্মুখী হয়ে পড়ে এবং ক্রমাগতভাবে প্রাদেশিক বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিতে থাকে। বাঙলার সমাজে অন্যান্য প্রতিপক্ষ গ্রুপের চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় আগে থেকেই সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন ভদ্রলোকেরা রাজনীতিকে ক্রমাগতভাবে অতিমাত্রায় সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করতে থাকে। এখন তারা যে হিন্দু সাম্প্রদায়িক আদর্শিক কাঠামো বিনির্মাণ করল সেটা জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে

গেল তো বটেই, সেই সঙ্গে সেটিকে তারা সূক্ষ্ম ও কৌশলপূর্ণভাবে বিপরীত দিকে নিয়ে গেল।

বাঙালি সমাজে এসব পরিবর্তন ও সেখানে হিন্দু ভদ্রলোকদের অবস্থানের আলোকে সংঘটিত ঐসব প্রক্রিয়া সম্পর্কে এ গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে। বাঙলায় 'ভদ্রলোক' কথাটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এবং সবার কাছে তা সহজে বোধগম্য। কিন্তু বাঙলার বাইরের পণ্ডিত ব্যক্তিরা এ কথাটি নানাভাবে এবং অনেক সময় পরস্পর-বিরোধী অর্থে ব্যবহার করেন। ষাটের দশকে জন ব্রুমফিল্ড 'ভদ্রলোক' কথাটি ব্যবহার করেন 'পাশ্চাত্যভাবাপন্ন সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর লোক' হিসেবে এবং তাদের গণ্য করেন 'ওয়েবারিয়ান (Weberian) গ্রুপের' লোকদের মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের মতো।[১২] ঐ কথাটিকে অন্য একজন ঐতিহাসিক গ্রহণ করেছেন 'উচ্চ বর্ণের ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত সুবিধাভোগী বাঙালি সমাজের অভিজাত শ্রেণীর' লোক হিসেবে।[১৩] অতি সম্প্রতি জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে প্রেসিডেন্সি অঞ্চলের অভিজাতদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।[১৪] ঐ সমালোচনায় 'ভদ্রলোক' শব্দটির ব্যবহার সন্দেহপূর্ণ হয়ে পড়েছে।[১৫] এর বদলে 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী'[১৬] দিয়ে যা বোঝানো হয়েছে তা বিকল্প শব্দ হিসেবে বিভ্রান্তিকর। পশ্চিমা শিল্প সমৃদ্ধ সমাজের ধারণা থেকে পাওয়া 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী' বলতে মূলত শহরকেন্দ্রিক লোকদের বোঝানো হয় – এর মধ্যে রয়েছে প্রধানত ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা শ্রেণীর লোক। পরবর্তী পর্যায়ে উন্নত শিল্প সমাজে বেতনভুক পেশাজীবীরাও ঐ 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী'র অন্তর্ভুক্ত হয়।[১৭] ভদ্রলোক শ্রেণীর লোকেরা নিজেদেরকে ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংল্যান্ডের সমৃদ্ধ ও প্রভাবশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের সাথে তুলনা করতে পছন্দ করে।[১৮] কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে তারা, এবং পরবর্তী পর্যায়ে ঐতিহাসিকেরা, বাঙলা ও ব্রিটেনের সমাজের মধ্যে অসত্য সাদৃশ্য তুলে ধরেন।

ব্যবসা বা শিল্প[১৯] ভদ্রলোকদের সমৃদ্ধির ভিত্তি ছিল না – তাদের সমৃদ্ধির ভিত্তি ছিল ভূমি।[২০] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে সম্পত্তির সাথে যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তার অপরিহার্য উপজাত ফল হল এই বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণী। তারা ছিল খাজনা আদায়কারী শ্রেণীর প্রতিরূপ; জমির পত্তনি স্বত্ব দেওয়ার (intermediary tenurial rights) অধিকার ভোগকারী। ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যে অবশ্য অনেক পার্থক্য ছিল।[২১] ভূমির পরিমাণ, আকার ও উর্বরতার পার্থক্য এবং ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে পাওয়া শর্তাধীন জমি অভিন্ন শর্তে অধস্তনদের কাছে লিজ দেওয়া (subinfeudation) ও মধ্যবর্তী স্বত্ব ভোগকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এই পার্থক্য সৃষ্টি হয়।[২২] তবে বড় বড় জমিদার থেকে সাধারণ তালুকদার পর্যন্ত সবাই ছিল একটা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তারা জমিতে কাজ করত না; জমি থেকে প্রাপ্ত খাজনা দিয়েই তারা তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করত। ভদ্রলোক হল দেশের অনুভূতিহীন মাটির সন্তানদের ঠিক বিপরীত। কায়িক পরিশ্রম থেকে বিরত থাকাকে এই 'বাবু' শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের ও সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে একটা সামাজিক দূরত্বের জন্য অপরিহার্য উপাদান বলে বিবেচনা করত।[২৩] এই 'বাবু' পদবি ছিল ভদ্রলোকদের মর্যাদার

প্রতীক – যা অবশ্যই হিন্দুকে বুঝায়, প্রায়শ একচেটিয়াভাবে উচ্চ বর্ণের হিন্দু,[২৪] মনিব (কর্মচারীর বিপরীত) এবং পরবর্তী পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ইংরেজ-ভাবাপন্ন হিন্দুদের[২৫] ক্ষেত্রে পদবিটা সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক মর্যাদায় পৃথক বৈশিষ্ট্যের ধারণা প্রকাশের ক্ষেত্রে দেশীয় ভাষায় (মাতৃভাষায়) 'ভদ্রলোক' কথাটি ছিল যথার্থ এবং ঐ কথার মাধ্যমে সেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারণাই প্রকাশ পেত। শুধু তাই নয়, ঐ শ্রেণীর উৎপত্তির ঔপনিবেশিক মেজাজ ও তাদের প্রায় অধিকাংশই যে হিন্দু – এ ধারণা ঐ 'ভদ্রলোক' কথার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেত। তবে 'ভদ্রলোক' বা 'বাবু' কথা দুটোর মধ্য দিয়ে সরাসরি সাম্প্রদায়িক বা কোনো বর্ণ শ্রেণীর লোককে বোঝাত না।[২৬] ঐ শব্দগুলি বরং ঔপনিবেশিক বাঙলার সামাজিক বাস্তবতা এবং বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক কারণে উদ্ভূত যে সামাজিক কাঠামোর জন্য বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠী ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা ভূমির মালিকানা হতে প্রাপ্ত সুবিধাদি এবং বিশেষভাবে প্রাপ্ত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়, সেটাই প্রতিফলিত করে।[২৭]

ভদ্রলোক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অনেকে উৎসাহের সাথে নতুন পাশ্চাত্য শিক্ষাকে গ্রহণ করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই এ ধরনের শিক্ষা সৃষ্টি হয়েছিল। এই 'আধুনিক' বুদ্ধিজীবীরাই ছিল প্রধানত খাজনা গ্রহণকারী শ্রেণীর মধ্যে মাঝারি ও নিম্ন স্তরের লোক। তারা স্বীকার করে যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা হল নতুন শাসকদের অধীনে তাদেব অগ্রগতির একটা পথ।[২৮] এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ঐতিহ্যগতভাবে শিক্ষিত পরিবারের সদস্য। তাদের পূর্বপুরুষেরা মোগল ও নবাব দরবারে লিপিকর বা কেরানি হিসেবে কাজ করত, বা ঐ সময়ে তারা ঐতিহ্যগত শিক্ষিত শ্রেণীর একটি অংশ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে।[২৯] ব্রিটিশরা যখন আমলাতন্ত্র দিয়ে বাঙলা শাসন করে এদের অনেকে সেখানে, বিশেষভাবে ভারতীয়দের জন্য সংরক্ষিত নিম্ন পর্যায়ে, নিয়োগ লাভ করে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণী কোলকাতা ও জেলা শহরগুলোতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করলেও তারা গ্রামীণ জনগণের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখে। ক্ষুদ্র একটা শহরের এক আইনজীবীর সন্তান নীরোদ চৌধুরী শতাব্দী পরিক্রমায় তাঁর শৈশবকাল এবং পূজার ছুটিতে ও পারিবারিক বিয়ের অনুষ্ঠানে নিজের পরিবারের পূর্ব পুরুষদের গ্রামে যাওয়ার কথা বর্ণনা করেন।[৩০] শহর ও গ্রামের মধ্যে বিদ্যমান আবেগপূর্ণ অটুট বন্ধনের কথা তিনি লেখেন:

> মনে হয় সাবালকদের হৃদয়ে পূর্ব পুরুষদের গ্রামের কথা সব সময় জাগরূক থাকত। তাদের মধ্যে অনেকে কিশোরগঞ্জে (শহরে) অনেক সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিল। এক ধরনের নাগরিকত্বের ধারণাও ... তারা অর্জন করে। তবু কিশোরগঞ্জের জীবনকে কেউ তার সমগ্র জীবন হিসেবে চিন্তা করেছে এমন কোনো সাবালক লোকের কথা আমার প্রায় মনেই পড়ে না ... আমাদের ধারণায় কিশোরগঞ্জ জীবনের স্থিতিকাল সব সময় ক্ষণস্থায়ীভাবে বর্তমান – পূর্ব পুরুষদের গ্রাম হল অতীতের ও ভবিষ্যতের ...।[৩১]

শহর ও গ্রামের মধ্যকার এ সম্পর্ক গ্রামের বাড়ি ও শহরের আবাসস্থলের বর্ণনায় পৃথক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। শহরের গৃহকে বলা হয় বাসা, অস্থায়ী

আবাসস্থল। অথচ গ্রামের গৃহকে বলা হয় বাড়ি। গ্রামের সাথে একাত্মতার অনুভূতি এমন প্রবল ছিল যে, চৌধুরীর শিশুকালে 'কিশোরগঞ্জের কোনো শিশু বা বয়স্ক লোক তাঁর কিশোরগঞ্জের বাড়িকে একই অর্থের শব্দ *বসতবাড়ি* (home) বলে আখ্যায়িত করেনি।'[৩২]

পূর্ব-পুরুষদের গ্রামের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনেরা বসবাস করতে থাকে। তাদের মধ্যে কেউ পারিবারিক সম্পত্তি দেখাশোনা করে, অন্যরা নিকটবর্তী বিভিন্ন এস্টেটে নায়েব (হিসাবরক্ষক) ও আমাল (খাজনা আদায়কারী) হিসেবে চাকুরি করে বা বিভিন্ন জমিদারি স্কুলে শিক্ষকতা করে।[৩৩] ভদ্রলোক পরিবারের, এমনকি যেসব পরিবার পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল তাদের, সকল শাখাই শহরে বসতি স্থাপন করেছে এবং কোনো পেশায় বা চাকুরিতে যোগ দিয়েছে, তা কিন্তু নয়। নির্দিষ্টভাবে মহেশগঞ্জের পালচৌধুরীদের কথা উল্লেখ করা যায়। নদীয়ার একটা বিরাট এস্টেটের দু'জন উত্তরাধিকারীর একজন নফরচন্দ্র মফস্বলে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন, লাঠিয়ালদের (কর্মচারী) সাহায্যে পারিবারিক এস্টেটের কার্যনির্বাহ করেন, কাছারিতে (নিম্ন আদালত) বিচার কার্য সম্পাদন করেন, পারিবারিক দেব-দেবীর পূজা করেন এবং একটি শ্রেণীভিত্তিক সমিতি পরিচালনা করেন। অন্য দিকে তাঁর ভাই বিপ্রদাশ কোলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে স্নাতক পাস করে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ইংল্যান্ড যান। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসার পর তিনি 'পাশ্চাত্য জীবনধারা' অনুসরণ করেন। তিনি নদীয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন, কংগ্রেসে যোগ দেন এবং দু'শতাব্দী ধরে নদীয়া জেলা বোর্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন।[৩৪] 'পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী'র পরিচিত জীবনধারার সাথে বিপ্রদাশ সহজে নিজেকে মানিয়ে নেন। নফরচন্দ্রের জীবনধারাও ছিল একটি বিশেষ ধরনের – বলা যায়, মফস্বল ভদ্রলোকের জীবনধারা।[৩৫]

তেমনি সব ভদ্রলোক পরিবারও আগ্রহের সাথে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে গ্রহণ করেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেও অনেক রক্ষণশীল পরিবার নতুন ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে তাদের অসন্তোষের প্রকাশ অব্যাহত রাখে। কেননা ঐ নতুন ধ্যান-ধারণা ইয়ং বেঙ্গল প্রজন্ম কর্তৃক প্রদর্শিত ঐতিহ্যের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণাকে শক্তিশালী করে।[৩৬] শুধু পাশ্চাত্য শিক্ষাই এককভাবে ভদ্রলোক মর্যাদাকে নিশ্চিত করেনি। পারিবারিক এস্টেট দেখাশোনা করার জন্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে যখন যশোরে ফেরেন তখন তাঁর পিতাকে সামাজিকভাবে জাতিচ্যুত করা হয়। এমনকি, তাঁর 'আধুনিক' আচরণে স্থানীয় জমিদার সমাজ এত বিরক্ত হয় যে, অতি রক্ষণশীল পরিবারের সদস্যরা তাঁর পরলোকগত পিতামহের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান বয়কট করে।[৩৭] কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি প্রাথমিক বিরোধিতা বিংশ শতাব্দীতে এসে লোপ পায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়।[৩৮] এই প্রবণতায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাস্তবতার চিত্রই প্রকাশ পায়। উপমহাদেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষী গোষ্ঠীগুলো গভীরভাবে অনুভব করে যে, ক্ষমতার ভাষা ইংরেজি জানা খুবই দরকার। এই চিন্তায় বাঙালি ভদ্রলোকও ব্যতিক্রম ছিল না।[৩৯] বিভিন্ন ধরনের চাপ, বিশেষ করে নির্দিষ্ট চাপের ফলে ভদ্রলোক শ্রেণীর লোকেরা 'আধুনিক'

শিক্ষার প্রতি অতি মাত্রায় উৎসাহিত ও অনুরক্ত হয়ে পড়ে। তারা ছিল জমির খাজনা থেকে অর্জিত আয়ের সুবিধাভোগী লোক – কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ঐ আয় কমে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যায়। কৃষি পণ্যের উৎপাদন হার ক্রমেই কমে আসতে শুরু করে এবং চাষের আওতায় অনাবাদি জমি আনার প্রয়াস ক্রমশ হ্রাস পায়। এর ফলে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়।[৪০] ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জমিদারদের ক্ষমতা সীমিত করার ফলে পাওনা অর্থ আদায় করা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।[৪১] এ কারণে তাৎক্ষণিক ও চূড়ান্তভাবে জমির খাজনা থেকে আয়ের পরিমাণ হ্রাস পাবার দীর্ঘ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই অবস্থায় ভদ্রলোক পরিবারের সদস্যরা নিজেদের আয় সম্পূরণ করতে ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে টিকিয়ে রাখতে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে একটি উপায় হিসেবে দেখতে থাকে। একই সময়ে অনেক উচ্চ বর্ণের পরিবার যারা দেশীয় ঐতিহ্যগত শিক্ষাকে আঁকড়িয়ে ছিল তাদের কাছে ঐ শিক্ষা নিরর্থক বলে প্রতীয়মান হয়। সুমিত সরকার উল্লেখ করেন যে, ঐতিহ্যগত শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত থাকায় উচ্চ বর্ণের শিক্ষিত লোকদের অবস্থান শিথিল হয়ে পড়ে ও তারা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংরেজি শিক্ষা গ্রামীণ সমাজের গভীরে প্রবেশ করে।[৪২] বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী* উপন্যাসে গ্রামের একজন হিন্দু পুরোহিতের অভাব-অনটনে পতিত হওয়ার করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, যেখানে বিশেষ ধরনের বিভিন্ন অবস্থার চাপে দেশীয় হিন্দু পুরোহিত বেঁচে থাকার জন্য নতুন শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হয়।[৪৩]

ব্যয়ভার বহনে সমর্থ অধিকাংশ ভদ্রলোকের কাছে পাশ্চাত্য শিক্ষা পছন্দনীয় হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সরকারের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির নিশ্চয়তাই শুধু ঐ শিক্ষাকে মর্যাদাপূর্ণ করে তোলেনি, এর মধ্যে সুবিধাভোগীদের স্বার্থ রক্ষার নিশ্চয়তাও ছিল। পাশ্চাত্য মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজগুলোতে এমন সব হিন্দু ভদ্রলোক পরিবারের ছাত্ররা সংখ্যাগরিষ্ঠতায় প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, যেসব পরিবার তাদের সন্তানদের প্রলম্বিত ও ব্যয়বহুল শিক্ষার ব্যয় বহন করতে পারত এবং দূরবর্তী শহর ও নগরে তাদের থাকার বন্দোবস্ত করতে পারত।[৪৪] বস্তুত যে ধরনের শিক্ষা ভদ্রলোকদের জন্য প্রচলিত রীতিসম্মত হিসেবে পরিচিতি পায় তা শুধু ঔপনিবেশিক প্রশাসনের জন্যই প্রয়োজনীয় ছিল না, তা ভূমির মালিক ও অলস জীবন-যাপনকারী শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। রামমোহন রায় হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ ও 'প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান' শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া সত্ত্বেও[৪৫] বাঙলার ছাত্রদের পছন্দ ছিল সাহিত্য ও মানব জাতির ইতিহাস সম্পর্কিত বিষয়।[৪৬] এটা এতটাই বেশি ছিল যে, সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিব্রত প্রশাসন উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিকতর কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালুর চেষ্টা করলে তার জোর প্রতিবাদ হয়।[৪৭] ভদ্রলোকদের মধ্যে কিছু পেশাগত শিক্ষা, বিশেষ করে আইন ও চিকিৎসা, বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ ধরনের শিক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল কয়েক বছরের প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত সুনাম অর্জনের জন্য দীর্ঘ দিনের কষ্টকর প্রয়াস। এই শিক্ষা নির্ভরশীল ছিল সচ্ছল পিতা-মাতার উদার আর্থিক সহায়তার উপর। সম্পদের উৎস ছিল

মানচিত্র ২: জেলাওয়ারি মুসলিম জনসংখ্যার অবস্থান। *সমগ্র জনসংখ্যার প্রতি একশ জনে মুসলিমদের সংখ্যা, ১৯৩১ সালের আদমশুমারি।*

মূলত ভূমি এবং ভদ্রলোকদের শিক্ষা ও পেশার সাফল্যের পেছনে ছিল ভূমি থেকে অর্জিত আয়; শিক্ষা ও পেশাগত শিক্ষার সাফল্যের কারণে তারা এসব ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে। ভদ্রলোক হিন্দুরা মনে করত পাশ্চাত্য শিক্ষা তাদের জন্যই সংরক্ষিত, সে-কারণে তারা ঐ মাথাভারি শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিকে বিস্তীর্ণ করার প্রয়াসের বিরোধিতা করে তীব্রভাবে। কারণ নিম্ন পর্যায়ের লোকদের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হলে তাদের একচেটিয়া অধিকার হ্রাস পেত।[৪৮]

এভাবে বাঙালি সমাজে ভদ্রলোকদের আয়ের মূল উৎস জমির খাজনার পরিমাণ কমে গেলে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে প্রাচীন আধিপত্যকে টিকিয়ে রাখার নতুন উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়। একই সময়ে শিক্ষা ভদ্রলোকদের নতুন এক আত্মপরিচয় গড়ে তোলার একটা বাহন হিসেবে গণ্য হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভদ্রলোক লেখকেরা তাদের শ্রেণীকে অতি ঘন ঘন ও বেশি বেশি করে 'ভদ্রলোক'-এর পরিবর্তে 'শিক্ষিত সম্প্রদায়' বা 'শিক্ষিত মধ্যবিত্ত' হিসেবে বর্ণনা করে – তারা ভূমি সম্পদের উপর নির্ভরশীলতাকে ঐ শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে বর্ণনা করে।[৪৯] সম্পদের আভিজাত্য[৫০] পরিবর্তিত হয় (অন্তত তাদের নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে) সংস্কৃতির আভিজাত্যে।[৫১] বিংশ শতাব্দীতে ভদ্রলোকের পরিচিতি এমন এক ক্রমবর্ধমান ধারণার উপর স্থিতিশীল হয় যে, তারা সংস্কৃতিবান ও আলোকিত শ্রেণী, 'বেঙ্গল রেনেসাঁ'র উত্তরসূরি এবং অগ্রগতি ও আধুনিকতার পতাকাধারী।[৫২] এই মনগড়া কল্পনা ভদ্রলোক রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে এবং একে প্রথম দিককার জাতীয়তাবাদীদের প্রতিনিধিত্বের দাবির যথার্থতা প্রমাণে ব্যবহার করা হয়। পরবর্তী বছরগুলোতে হিন্দুরা অবশ্যই বাঙলায় কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখবে এবং শেষে বাঙলাকে ভাগ করতে হবে – এই দাবিগুলোর যথার্থতা প্রমাণেও এটিকে ব্যবহার করে।

যাহোক, ভদ্রলোক সম্পর্কে তাদের স্বঘোষিত নতুন সংজ্ঞায় আধুনিক, আলোকিত ও সংস্কৃতিবান মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে পরিচিতির ক্ষেত্রে নিজস্ব বেশ কিছু সমস্যা ছিল। বাঙালি সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভদ্রলোক হিসেবে তাদের প্রাধান্য ছিল অস্পষ্ট। এই অস্পষ্টতা ছিল ভূস্বামী হিসেবে উচ্চ শ্রেণীর লোকের সম্পদ ও ক্ষমতা, বর্ণ সমাজের শীর্ষে তাদের মর্যাদা, সুবিধাভোগী শ্রেণী হিসেবে নগরের বিভিন্ন চাকুরিতে যোগদান এবং ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন কিছুটা হলেও কর্তৃত্বের অধিকার সম্পর্কে – নিরঙ্কুশ ক্ষমতার একটি ছাঁচের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে এর সব কিছুই মিশে ছিল। বৈশিষ্ট্য হিসেবে ভদ্রলোকদের রাজনৈতিক বিবেচনায় যে পরস্পর বিরোধিতা দেখা যায়, এইগুলিই ছিল তার কারণ। উল্লেখ্য যে, কোলকাতার ভদ্রলোকেরা প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে তার মধ্যে একটির নাম হল 'ল্যান্ডহোল্ডার'স সোসাইটি' (Landholder's Society)।[৫৩] জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতেও একই ধরনের পরস্পর বিরোধী শক্তির অবস্থান লক্ষ করা যায়। ভদ্রলোকদের যেমন এক পা ছিল শহরে এবং অন্য পা ছিল গ্রামে, তেমনি তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনা ছিল একই রকম, তাদের ঐ চিন্তা-চেতনা কোলকাতা থেকে বিকীর্ণ ও নগরভিত্তিক ইস্যু দ্বারা বেশি করে প্রভাবিত হলেও জমিদারি ও খাজনা আদায় স্বার্থ ধরে

রাখতে তারা গভীরভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। বুদ্ধিজীবীদের উভয় সংকটের প্রতিফলন ঘটে এই অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে। তারা বসবাস করত শহরে, কিন্তু গ্রাম থেকে আসা আর্থিক সাহায্যের ওপর তারা অত্যন্ত বেশি নির্ভরশীল ছিল। খাজনা থেকে অর্জিত আয় ক্রমশ হ্রাস পাওয়ায় এবং আর্থিক কারণে তারা অন্য কোনো নতুন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে না পারায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়।[৫৪] গ্রাম বাঙলায় জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনাকে সুসংগঠিত করার ক্ষেত্রে এই দোলাচল ছিল ঐ একই সংকটাবস্থার বহিঃপ্রকাশ।[৫৫]

এতদ্‌সত্ত্বেও এটা বাস্তব সত্য যে, ঐ ভদ্রলোকদের জাতীয়তাবাদী ধারা প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত 'আধুনিক', প্রগতিশীল ও ইংরেজ-ভাবাপন্ন লোকেরা নেতৃত্ব দিলেও এটি হিন্দু 'পুনর্জাগরণ' (revivalist) আদর্শ থেকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করে।[৫৬] সাত বছর বয়সে অরবিন্দ ঘোষ ইংল্যান্ডে পাড়ি জমান এবং লন্ডন ও কেমব্রিজে লেখাপড়া করে[৫৭] দেশে ফিরে তিনি যে 'রাজনৈতিক বেদান্ত' দর্শনের বিকাশ সাধন করেন, তাতে সেখানে জাতীয় পরিচিতির সাথে দেবী মাতা কালীকে যুক্ত করেন।[৫৮] এ সময়ে প্রাচীন ব্রাহ্ম পরিবারের দুই সন্তান বিপিনচন্দ্র পাল ও সরলা দেবী জাতীয় কর্মসূচিতে কালীপূজা ও শিবাজী উৎসব অন্তর্ভুক্ত করেন।[৫৯] বাঙলার সন্ত্রাসী দলগুলো প্রধানত পাশ্চাত্য শিক্ষিত লোকদের মধ্য থেকে দলীয় সদস্য সংগ্রহ করলেও যুবক অনুসারীদের শাক্ত দর্শন[৬০] দ্বারা অনুপ্রাণিত ধর্মীয় শপথে আবদ্ধ করত। এমনকি বেশভূষায় পুরোপুরি ইংরেজের মতো দেখা গেলেও চিত্তরঞ্জন দাশ বৈষ্ণববাদ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। বৈষ্ণব মরমি বা অতীন্দ্রিয়বাদী কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।[৬১] তাঁর যুবক সহযোগী সুভাষ বসুও ছিল রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য।[৬২] সুতরাং দেখা যায়, বাঙলার সামাজিক ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে 'পাশ্চাত্যকরণে'র বাছবিচারহীন ব্যবহার খুবই বিপজ্জনক;[৬৩] আবার আধুনিকতা ও অগ্রগতির মুখপাত্র হিসেবে ভদ্রলোকদের নিজেদের দাবি করাও বিজ্ঞজনোচিত নয়। ভদ্রলোক জীবনধারায় সাধারণত 'আধুনিকতা' ও 'ঐতিহ্যে'র মিশ্রণ দেখা যেত বেশি করে। তাদের বাহ্যিক আচার-আচরণ, কথাবার্তা ও বেশভূষার সাথে প্রায় ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্যহীনভাবে উপস্থিত ছিল ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন এবং নীতিবোধের বিষয়ে প্রচণ্ড গোঁড়ামি।[৬৪] একই ধরনের মিশ্র অনুভূতি তাদের রাজনৈতিক দর্শনেও প্রকাশ পেত। ঐ দর্শনে ইউরোপের কারিগরি দক্ষতা ও রাজনৈতিক সাফল্যকে গ্রহণ করা হলেও হিন্দু আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের মহত্ত্বকে বিশেষভাবে স্বীকার করা হয়।[৬৫] ভাবতে অবাক লাগে, আধুনিক রাজনীতির বাহ্যিক প্রকাশ হিসেবে প্রথম যে ভদ্রলোক এসোসিয়েশন গড়ে ওঠে ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে – এর নাম ধর্মসভা (এ কমিটিতে ছিল একজন প্রেসিডেন্ট, একজন ট্রেজারার ও একজন সেক্রেটারি)। হিন্দু বিধবাদের সতীদাহ অধিকারকে রক্ষা করাই ছিল ঐ ধর্মসভার মূল লক্ষ্য।[৬৬] এরই প্রেক্ষাপটে পরবর্তী যুগের লোকদের একটি স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রয়াসটিকে ওপর থেকে পুরোপুরিভাবে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির মনে হলেও তাদের ঐ প্রয়াসের ভিত্তি ছিল 'ভারতে'র সাথে 'হিন্দুত্ব'কে এক করে ফেলার দর্শন। তাদের কাছে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে সংগঠিত করার লক্ষ্য ছিল দীর্ঘকালব্যাপী স্থবির হিন্দু জাতির

পুনর্জাগরণ ও নতুন করে তাকে সবল করা। ভদ্রলোক নেতারা মনে করে যে, তারাই হল হিন্দু বাঙলার ভবিষ্যৎ নির্ধারক বিশিষ্ট নেতা। ১৯৪৬-৪৭ সালে বাঙলাকে ভাগ করার আন্দোলনের সঙ্গে হিন্দুদের যে প্রচারাভিযান যুক্ত হয় তাতে জোরালোভাবে এ বিষয়বস্তুটির পুনরাবির্ভাব ঘটে। 'পশ্চিমা ভাবধারার উচ্চ শ্রেণীর লোক' বলে ভদ্রলোকদের পরিচয় বর্ণনা করা সম্ভবত তাদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে অনুধাবনের জন্য নিশ্চিতভাবে সহায়ক নয়; তারা যে রাজনৈতিক দর্শন অনুসরণ করত তার জটিলতা ও অসঙ্গতি উন্মোচনেও ঐ পরিচয় সঠিকভাবে সহায়ক হবে না।

হিন্দু সাম্প্রদায়িক আলোচনায় (discourse) ব্যবহৃত বাগধারা বা ভাষা (idioms) জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় তাই চিহ্নিত করা যায়, এমনকি 'বাঙলার রেনেসাঁ'র চিন্তা-চেতনা প্রকাশের ক্ষেত্রেও তাকে পাওয়া যাবে এবং এটি বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কয়েক দশকে এই বাগধারাগুলিকে সূক্ষ্মভাবে ঢেলে সাজানো হয়; বিষয়বস্তুর দিক থেকে ব্রিটিশ বিরোধিতা (এবং পাশ্চাত্য-বিরোধী) থেকে সরে গিয়ে মননে-মেজাজে মুসলিম-বিরোধিতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। পরিবর্তিত অবস্থার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ভদ্রলোক রাজনীতির ধ্যান-ধারণার এই দিক পরিবর্তন অনুধাবন করাই এই গবেষণার মূল লক্ষ্য, যে ঐ পরিবর্তিত অবস্থা ব্রিটিশ শাসনের শেষ পনেরো বছরে বাঙালি সমাজ ও রাজনীতিকে বদলিয়ে দেয়। এই আলোচনা শুরু হয় ম্যাকডোনাল্ডের সম্প্রদায়ভিত্তিক রোয়েদাদ (১৯৩২) নিয়ে, যে রোয়েদাদের ফলে প্রদেশে নাটকীয়ভাবে ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সামগ্রিকভাবে বাঙলায় মুসলমানেরা ছিল সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ – পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে তাদের সংখ্যা ছিল স্পষ্টভাবে অধিক (মানচিত্র ২)। কিন্তু বাঙালি সমাজে আধিপত্য ছিল ভদ্রলোক হিন্দুদের এবং ভারতীয়রা যেসব ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকারী ছিল তার প্রায় প্রতিটি স্তরেই তাদের আধিপত্য ছিল। অবশ্য এই সম্প্রদায়ভিত্তিক রোয়েদাদে নতুন প্রাদেশিক আইন সভায় (Legislative Assembly) হিন্দুদেরকে সংখ্যানুপাতে ন্যায্য প্রাপ্য থেকেও কয়েকটি আসন কম দেওয়া হয়। এর ফলে তারা হাউসে সোচ্চার সংখ্যালঘিষ্ঠ দলে পরিণত হয়। বাঙলা যখন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করে তখন ভদ্রলোকদের মনে সত্যিকার যে রাজনৈতিক ক্ষমতার আশা ছিল ঐ রোয়েদাদ তা নিভিয়ে দেয় এবং মুসলমানদের কাছে তাদের চিরস্থায়ীভাবে অধীনতা সম্ভাব্য ভবিষ্যতের ছবি হয়ে ওঠে। ঐ রোয়েদাদের পরপরই ঘোষিত হয় পুনা চুক্তি – এই চুক্তির ফলে হাউসে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত হয়; অথচ ঐ হাউসে তারা সব সময় কর্তত্ব বজায় রাখার আশা পোষণ করে আসছিল।

অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে ভদ্রলোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত না হলে রাজনৈতিক ধারা পরিবর্তনের এই খেলায় তাদের ক্ষতি হত সামান্য। কৃষিজাত পণ্যের মূল্য ও গ্রামীণ ঋণ আকস্মিক ও নাটকীয়ভাবে কমে যাওয়ায় খাজনা ও পাওনা আদায় পদ্ধতির ওপর মারাত্মক চাপ পড়ে – অথচ এগুলোই ছিল বাঙলায় তাদের আয়ের প্রধান উৎস। খাজনা আদায়ে

খাজনা-আদায়কারীদের ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পাওয়ার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পদশালী রায়তদের অনুকূলে চলে যায়; আর সম্পদশালী রায়তদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে উৎসাহিত হয়ে এই রায়তেরা ক্রমবর্ধমান হারে তাদের জমিদারদের কর্তৃত্বকে অবজ্ঞা করে এবং গ্রামীণ বাঙলায় তারা নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করে। একই সময়, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন উচ্চ শ্রেণীর কৃষকদের ভোটের অধিকার দেয় এবং এর ফলে এই প্রথম তারা আইন সভার পরিমণ্ডলে তাদের কথা বলার অধিকার পায়। উচ্চ শ্রেণীর কৃষকদের অবিরামভাবে সমর্থন দেয় মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা। শিক্ষা ও বিভিন্ন চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য বাঙলা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা থাকায় মুসলমান বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা একেবারে কম ছিল না। ভদ্রলোক হিন্দুদের বিরুদ্ধে তাদের অনেক অভিযোগও ছিল। নতুন আইন সভায় উভয় গ্রুপ তাদের উপস্থিতিকে সরব করে তোলে এবং বাঙালি রাজনীতির মূল স্রোতধারায় তারা খাজনা গ্রহণকারী ও সুদ ব্যবসায়ী ভদ্রলোকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভদ্রলোকদের জন্য মফস্বলে মুসলমানদের উত্থান এবং সাধারণভাবে বাঙলার রাজনীতিতে তার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রক্রিয়ায় ভদ্রলোক সমাজের মধ্যকার চিরাচরিত অনেক পার্থক্য ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। নগরভিত্তিক পেশাজীবীর সঙ্গে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, বড় জমিদারের ও ক্ষুদ্র তালুকদারের, ভূস্বামী অভিজাতদের সঙ্গে সামান্য কেরানি শ্রেণীর এবং আধুনিকতাবাদীদের ও ঐতিহ্যবাদী শ্রেণীর লোকের মধ্যে ঐ পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। একই সাথে ভদ্রলোক রাজনীতিতে প্রাচীন রাজনৈতিক বিভক্তির মধ্যে যা 'মধ্যপন্থী' ও 'চরমপন্থী', বিভিন্ন সন্ত্রাসী সমিতি, দল ও উপদল এবং এমনকি অনুগত ও জাতীয়তাবাদী রূপে বিদ্যমান ছিল সে-সবের প্রাসঙ্গিকতা অনেকটাই লোপ পায়। রাজনৈতিক কর্মসূচিতে জাতীয়তাবাদী ইস্যুর ওপর ভদ্রলোক শ্রেণীর স্বার্থ প্রাধান্য বিস্তার করায় বিভিন্ন আদর্শকে অবলম্বন করে নতুন রাজনৈতিক বিভক্তির উদ্ভব ঘটে। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে বেঙ্গল কংগ্রেস, সর্ব-ভারতীয় রাজনীতিতে এর ক্ষয়িষ্ণু ভূমিকা, কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে এর পরিবর্তনশীল সম্পর্ক, দলের মধ্যে সৃষ্ট 'বাম' ও 'ডান' উইং-এর গ্রুপিং এবং সংকীর্ণ বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে বেঙ্গল কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান সংশ্লিষ্টতা। শেষ পর্যন্ত 'হিন্দু' স্বার্থ রক্ষায় দৃঢ় ডানপন্থীরা দলকে দখল করায় এবং দলের অভ্যন্তরে বামপন্থীরা দুর্বল হয়ে পড়ায় ভদ্রলোকদের রাজনৈতিক অগ্রাধিকার ও ধ্যান-ধারণার আলোকে দলে ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

এসব পরিবর্তিত ধ্যান-ধারণা কিভাবে একটা নতুন 'হিন্দু' রাজনৈতিক পরিচিতি সৃষ্টিতে সাহায্য করে তা আলোচনা করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। সাহিত্যিক সূত্রগুলোর মূল্যায়নে দেখা যায়, এ সময়ে জাতীয়তাবাদী আদর্শের অনেক কিছুকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে এবং মূল ভাবধারাকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, ভদ্রলোকেরা এ সময় ব্রিটিশ শাসনকে অত্যন্ত অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করে। 'মুসলিম শাসন'কে গণ্য

করা হয় হিন্দু সমাজের জন্য মারাত্মক ও তাৎক্ষণিক হুমকি হিসেবে। এ কারণে ভদ্রলোকেরা তাদের অতীতকে নতুন করে উপস্থাপন করে এবং সেখানে ব্রিটিশদের অভিহিত করে ত্রাণকর্তা হিসেবে এই কারণ দেখিয়ে যে, তারা মুসলমানদের স্বেচ্ছাচার থেকে হিন্দু বাঙলাকে মুক্ত করেছে। 'আনুগত্য' আবার বাঙালি বাবুদের কাছে মর্যাদার প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়। বস্তুত বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তির বিষয়কে জোরদার করার জন্য ব্রিটিশ শাসনে ভদ্রলোকদের সহযোগিতার অগৌরবের ইতিহাসকে এখন গৌরবের সাথে স্মরণ করা হয়। এবার যে কারণ দেখানো হয় তা হল, যে ব্রিটিশ সরকার তাদেরকে স্বেচ্ছাচারদের হাত থেকে উদ্ধার করেছিল এখন আবার সে-ই স্বেচ্ছাচারীদের হাতে তাদের ঠেলে দিচ্ছে। একই সময় নিজেদের সংস্কৃতিবান উচ্চ শ্রেণীর লোক হিসেবে দেখার ভদ্রলোকদের ধ্যান-ধারণায় নতুন গুরুত্ব সংযোজিত হয়; এখান থেকে তারা বাঙলার মুসলমানদের চেয়ে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করার একটি শক্তিশালী অনুভূতির প্রসার ঘটাতে থাকে। এ ধরনের অনুমিত সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব ছিল ভদ্রলোক সাম্প্রদায়িকতার ভাষার বা বাগধারার (idioms) মূল বৈশিষ্ট্য। সার্বজনীন ভোটাধিকার ও সংখ্যাগরিষ্ঠদের শাসনের যুগে উচ্চ শ্রেণীর সংখ্যালঘিষ্ঠদের রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়া স্পষ্টতই যুক্তিপূর্ণ বলে তারা প্রকাশ্যে দাবি করে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ পুষ্ট হয় গণতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে, অথচ এই ধরনের যুক্তি শুধু স্পষ্টভাবে গণতান্ত্রিক নীতিকেই প্রত্যাখ্যান করেনি, ব্রিটিশদের উপনিবেশবাদের বৈধতার সাথেও তার স্পষ্ট মিল রয়েছে। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের যুক্তি ছিল ভারতকে শাসন করার জন্য ভারতীয়দের চেয়ে ব্রিটিশরাই বেশি 'উপযুক্ত', কারণ তাদের আছে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব।

স্বেচ্ছাচারী ভদ্রলোকদের মাঝে 'সংস্কৃতি' – এ বাগধারাটি বা কথাটি সম্প্রদায়গত পরিচিতির অনুভূতি কিছুটা জাগ্রত করলেও স্লোগান হিসেবে সেটি অন্যান্য হিন্দুদের একতাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। ত্রিশ দশকের শেষ দিকে এবং চল্লিশ দশকে হাবভাবে একটা ঐক্যবদ্ধ 'হিন্দু' বিধিবদ্ধ সমাজ গঠনে ভদ্রলোকেরা বিভিন্ন ধরনের কৌশলের আশ্রয় নেয়, যেমন 'শুদ্ধি' (ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পবিত্রকরণ) বা 'ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের লোককে ঐক্যবদ্ধ' করার কর্মসূচি। এর উদ্দেশ্য ছিল নিম্ন বর্ণের হিন্দু ও উপজাতীয়দের হিন্দুদের সমাজে একটা স্থান করে দেওয়া। তবে নিজেদের সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ভদ্রলোকেরা স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও রাজনৈতিক দুঃখ-কষ্টের প্রতি কিভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল এবং এই প্রয়াস বাঙলায় কিভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্রমবর্ধমান ইন্ধন যুগিয়েছিল, সে-সম্পর্কে পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

'অধস্তন' মুসলমানদের শাসনকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি বিভাগের দাবি ও পৃথক হিন্দু আবাসভূমি প্রতিষ্ঠাকে এগিয়ে নেয়। বাঙলাকে ভাগ করার জন্য ভদ্রলোকেরা কিভাবে সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন পরিচালনা করে এবং লক্ষ্য অর্জনে কিভাবে বেঙ্গল কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভাকে নিয়োজিত করে, তা আলোচনা করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। এ আন্দোলনের পেছনে কিভাবে শক্তিশালী প্রাদেশিক স্বার্থ সমর্থন যোগায়, কোথা থেকে এই আন্দোলন

প্রধান সমর্থন পায় এবং কিভাবে ঐ আন্দোলন সংগঠিত হয় তাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সর্ব-ভারতীয় বাধ্যবাধকতা ও ভদ্রলোকদের দাবির মধ্যে পারস্পরিক দেয়া-নেয়ার সম্পর্কের বিষয়টিও বিবেচনা করা হয়েছে। এখানে এই যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করা হয়নি যে, বাঙালি হিন্দুরা তাদের প্রদেশকে বিভক্ত দেখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল এবং সে-কারণে ভারতকে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বরং এ কথা বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে, প্রাদেশিক বিচ্ছিন্নতার দাবি বিভক্তি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। এখানে প্রদেশ বিভাগের বিষয়টিকে ব্যাপকভাবে উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে, যাকে প্রায়শ দিল্লী ও লন্ডনের নেতৃবৃন্দের শুধুমাত্র অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে আসা হয়েছে।

উপমহাদেশ বিভাগের ক্ষেত্রে যে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা একটা মূল ভূমিকা পালন করেছে – ব্যাপকভাবে প্রচারিত সেই মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে ওজর হিসেবে বিষয়গুলিকে এখানে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়নি। ভারতের রাজনৈতিক জীবনের অনেক ক্ষেত্রে বিভেদের বীজ বপনে উপনিবেশবাদের মূল্যায়িত ভূমিকার মৌলিক পুনর্মূল্যায়নও এ আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। বরং এ কথা অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে যে, কেন এবং কিভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নেতা হওয়া থেকে ভদ্রলোকেরা ছিটকে পড়ল এবং তার পরিবর্তে তারা কেন অতি ক্ষুদ্র বিষয় ও কম আকর্ষণীয় ক্ষুদ্রতর সাম্প্রদায়িক ভূমিকা গ্রহণ করল। আশা করা যায়, এই প্রয়াস সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সম্পর্কে অনুধাবনে আমাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে এবং আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদের মধ্যকার জটিল সম্পর্কের ওপর নতুনভাবে আলোকপাত করবে।

টীকা

১. দেখুন, সুমিত সরকার, *দি স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল*, ১৯০৩-১৯০৮, নিউ দিল্লী, ১৯৭৩।

২. 'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দটি ভারতে বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

৩. জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে, *দি কনস্ট্রাকশন অব কমিউনালিজম ইন কলোনিয়াল নর্থ ইন্ডিয়া*, নিউ দিল্লী, ১৯৯০, পৃ. ২, ২৪১। আরও দেখুন, মুশিরুল হাসান, *ন্যাশনালিজম এ্যান্ড কমিউনাল পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়া*, ১৮৮৫-১৯৩০, নিউ দিল্লী, ১৯৯১।

৪ 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সম্পর্কে প্রথম দিককার আলোচনার জন্য দেখুন জি. জে. হোলিওক, *দি অরিজিন এ্যান্ড নেচার অব সিকিউলারিজম*, লন্ডন, ১৮৯৬। আরও দেখুন, ব্রায়ান উইলসন, *রিলিজিওন ইন এ সেকিউলার সোসাইটি – এ সোসিওলজিক্যাল কমেন্ট*, লন্ডন, ১৯৬৬।

৫. উদাহরণ হিসেবে ভারতে ধর্মীয় ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে ডিউমন্টের আলোচনামূলক নিবন্ধ 'ন্যাশনালিজম এ্যান্ড কমিউনালিজম' দেখুন, এপেনডিক্স ডি, *হোমো হায়ারসিকাস, দি কাস্ট সিস্টেম এ্যান্ড ইটস্ ইমপ্লিকেশনস্*, শিকাগো, ১৯৮০। ডিউমন্টের যে যুক্তি, এই সম্পর্ক শুধুমাত্র ভারতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। পশ্চিম ইউরোপে জাতীয় ও আধা-জাতীয় আন্দোলনে ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে দেখুন, জন ব্রিউলি, *ন্যাশনালিজম এ্যান্ড দি স্টেট*, মানচেস্টার, ১৯৮৫, পৃ. ৪৫-৫০।

৬. ধর্মীয় বিষয়গুলো নিশ্চয়ই এমন অনেক উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে যার সাথে জাতীয়তাবাদী স্বার্থ ছাড়া কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ জড়িত। এসব বিষয়সহ জাতীয়তাবাদী স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার সম্পর্কে অনেক লিখিত দলিল আছে। উদাহরণ হিসেবে দেখুন, বারবারা সাউদার্ড, 'দি পলিটিক্যাল স্ট্রাটেজি অব অরবিন্দ ঘোষ: দি ইউটিলাইজেশন অব রিলিজিয়াস সিম্বলস্ এ্যান্ড দি প্রোব্লেম অব পলিটিক্যাল মবিলাইজেশন ইন বেঙ্গল', *মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ*, খণ্ড-১৪, ১৯৮০, পৃ. ৩৫৩-৩৭৬; আনন্দ ইয়াঙ্গ, 'সেকরেড সিম্বল এ্যান্ড সেকরেড স্পেস ইন রুরাল ইন্ডিয়া, কমিউনিটি মবিলাইজেশন ইন দি 'এ্যান্টি কাউ কিলিং' রায়ট অব ১৮৯৩', *কমপ্যারেটিভ স্টাডিজ ইন সোসাইটি এ্যান্ড হিস্ট্রি*, খণ্ড-২২, ১৯৮১; জন আর. ম্যাকলেন, 'দি আর্লি কংগ্রেস, হিন্দু পপুলিজম এ্যান্ড ওয়াইডার সোসাইটি', আর. সিসন ও স্ট্যানলি উলপার্ট (সম্পাদিত) *দি কংগ্রেস এ্যান্ড ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম – দি প্রি-ইনডিপেন্ডেন্স ফেজ*, নিউ দিল্লী, ১৯৮৮।

৭. দেখুন, রবিন্দর কুমার, 'ক্লাস, কমিউনিটি অর নেশন? গান্ধী'জ কোয়েস্ট ফর এ পপুলার কনসেন্সাস ইন ইন্ডিয়া,' *এসেজ ইন সোসাল হিস্ট্রি অব মডার্ন ইন্ডিয়া*, কোলকাতা, ১৯৮৬।

৮. প্রকাশচন্দ্র উপাধ্যায়, 'দি পলিটিক্স অব ইন্ডিয়ান সেকিউলারিজম', *মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ*, খণ্ড-২৬, ৪, ১৯৯২, পৃ. ৮১৫-৮৫৩।

৯. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, 'ট্রান্সফারিং এ পলিটিক্যাল থিয়োরি: আর্লি ন্যাশনালিস্ট থট ইন ইন্ডিয়া', *ইকোনমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি, খণ্ড-২১*, ৩, ১৮ই জানুয়ারি, ১৯৮৬: বারবারা সাউদার্ড, 'দি পলিটিক্যাল স্ট্রাটেজি অব অরবিন্দ ঘোষ'; *স্বামী বিবেকানন্দ* (একনাথ রানাড়ে সম্পাদিত), *উত্থিত! জাগ্রত! হিন্দু রাষ্ট্র কা অমর সন্দেশ*, (এরাইজ! এ্যাওয়েকেন! দি ইমমরটাল মেসেজ অব দি হিন্দু নেশন), লক্ষ্ণৌ, ১৯৭২।

১০. জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের যে নির্বাচনী ক্ষমতা ছিল তার চেয়ে তাদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং অন্তত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ শক্তি হিসেবে লালন করা হয়। দেখুন আয়েশা জালাল, *দি সোল স্পোকস্ম্যান – জিন্নাহ, দি মুসলিম লীগ এ্যান্ড দি ডিমান্ড ফর পাকিস্তান*, কেম্ব্রিজ, ১৯৮৫; এবং অনিতা ইন্দর সিং, *দি অরিজিনস্ অব দি পার্টিশন অব ইন্ডিয়া, ১৯৩৬-১৯৪৭*, নিউ দিল্লী, ১৯৮৭। এই গ্রন্থে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, বাঙলায় ব্রিটিশ গভর্নরেরা কংগ্রেস বা কৃষক প্রজা পার্টির চেয়ে হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগের মতো প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলোকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। মহাসভা ও লীগ ব্রিটিশ শাসনের ডান হাত হিসেবে থাকার জন্য সচেষ্ট থেকেছে; উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, উভয় দলই ১৯৪০ সালের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সক্রিয় ছিল। আজ একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, সাম্প্রদায়িক দলগুলো শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে পৃষ্ঠপোষক 'দেবতা' হিসেবে গণ্য করলেও নিজেদেরকে 'সত্যিকার' জাতীয়তাবাদী হিসেবে দাবি করে।

১১. সুমিত সরকার, *দি স্বদেশী মুভমেন্ট*; তনিকা সরকার, *বেঙ্গল ১৯২৮-১৯৩৪, দি পলিটিক্স অব প্রোটেস্ট*, নিউ দিল্লী, ১৯৮৭; বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, *সুভাষচন্দ্র বোস এ্যান্ড মিডল ক্লাস র‍্যাডিক্যালিজম – স্টাডি ইন ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম*, লন্ডন, ১৯৯০।

১২. জে. এইচ. ব্রুমফিল্ড, *এলিট কনফ্লিক্ট ইন এ প্লুরাল সোসাইটি। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি বেঙ্গল*, বার্কলে, ১৯৬৮, পৃ. ৫-১৪।

১৩. গর্ডন, জনসন, 'পার্টিশান, এজিটেশন এ্যান্ড কংগ্রেস: বেঙ্গল ১৯০৪-১৯০৮', *মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ*, খণ্ড-৭, ৩, ১৯৭৩, পৃ. ৫৩৪-৫৩৫।

১৪. ইতিহাস লিখনের মতবাদ সম্পর্কিত বিতর্কের বিবরণের জন্য দেখুন, মাইকেল গুগলিয়েলমো টোরি, "ওয়েস্টারনাইজড মিডল ক্লাস – ইনটেলেকচুয়াল এ্যান্ড সোসাইটি ইন লেট কলোনিয়াল ইন্ডিয়া', *ইকোনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, খণ্ড-২৫, ৪, ২৭শে* জানুয়ারি, ১৯৯০, পৃ. পিই ২-১১।

১৫. ঐ শব্দের অর্থ নিয়ে আলোচনার জন্য দেখুন, সুমিত সরকার, *দি স্বদেশী মুভমেন্ট*, পৃ. ৫০৯-৫১২।

১৬. সামাজিক ঐ গ্রুপের বর্ণনায় 'মিডল ক্লাস' বা 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী'র যে অর্থ করা হয়েছে, তার জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখুন, হিমানী ব্যানার্জী 'দি মিরর অব ক্লাস: ক্লাস সাবজেক্টিভিটি এ্যান্ড পলিটিক্স ইন নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি বেঙ্গল', *ইকোনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, খণ্ড-২৪,* ১৩, মে, ১৯৮৯; এবং বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, *সুভাষচন্দ্র বোস এ্যান্ড মিডল ক্লাস র‍্যাডিক্যালিজম।*

১৭. দেখুন, গুগলিয়েলমো কারডেসি, *অন দি ইকোনমিক আইডেন্টিফিকেশন অব সোসাল ক্লাসেস,* লন্ডন, ১৯৭৭; নিকোস পোলান্তাজ, *ক্লাসেস ইন কনটেমপোরারি ক্যাপিটালিজম,* লন্ডন, ১৯৭৫ এবং 'দি নিউ পেটি বুর্জোয়া', এলান হান্ট (সম্পাদিত), *ক্লাস এ্যান্ড ক্লাস স্ট্রাকচার,* লন্ডন, ১৯৭৭; এ্যান্থনি গিডেন্স, *দি ক্লাস স্ট্রাকচার অব এডভানসড্ সোসাইটিজ,* লন্ডন, ১৯৭৩; এবং রেমন্ড উইলিয়ামস্, *কি-ওয়ার্ডস – এ ভোকাবুলারি অব কালচার এ্যান্ড সোসাইটি,* নিউইয়র্ক, ১৯৭৬, পৃ. ৫১-৫৯।

১৮. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বাঙলার 'নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী'কে 'প্রজ্ঞা, স্বাধীনতা, উন্নয়ন ও অগ্রগগতি'র পতাকাবাহী হিসেবে বর্ণনা করেন; *'দি বেঙ্গলি,* ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২১। উদ্ধৃত, রজত রায় 'থ্রি ইন্টারপ্রেটেশানস্ অব ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম', বি. আর. নন্দ (সম্পাদিত), *এসেজ ইন মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি,* নিউ দিল্লী, ১৯৮০, পৃ. ১। ভদ্রলোক সংস্কৃতি ও সমাজের উপর ভিক্টোরিয়ান প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন সুমন্ত ব্যানার্জি, *দি পারলার এ্যান্ড দি স্ট্রিটস – ইলাইট এ্যান্ড পপুলার কালচার ইন নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি ক্যালকাটা,* কোলকাতা, ১৯৮৯ এবং নীলমনি মুখার্জি, 'এ চ্যারিটিবল এফোর্ট ইন বেঙ্গল ইন দি নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি – দি উত্তরপাড়া হিতকারী সভা', *বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট,* খণ্ড-৮৯, ১৯৭০, পৃ. ২৪৭-২৬৩।

১৯. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান ও মধ্যবর্তী দালাল হিসেবে কিছু পরিবার তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করে। কিন্তু তারা ঐ অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্য বা উৎপাদনমুখী ব্যবসায়ে নিয়োগ করে সম্পদ বৃদ্ধি করতে ব্যর্থ হয়। এর পরিবর্তে তাদের মধ্যে অনেকে ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভূ-সম্পত্তি ক্রয় অত্যন্ত নিরাপদ ও লাভজনক বিনিয়োগ ছিল। দেখুন, জন ম্যাকগুইরি, *দি মেকিং অব এ কলোনিয়াল মাইন্ড, এ কোয়ালিটিটেটিভ স্টাডি অব দি ভদ্রলোক ইন কোলকাতা, ১৮৫৭-১৮৮৫,* ক্যানবেরা, ১৯৮৩, পৃ. ১-২০; এস. এন. মুখার্জী, *কাস্ট, ক্লাস এ্যান্ড পলিটিক্স ইন ক্যালকাটা,* তাঁরই রচিত *ক্যালকাটা: মিথ এ্যান্ড হিস্ট্রি,* কোলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ১৫; বিনয় ঘোষ, 'সাম ওল্ড ফ্যামিলি ফাউন্ডার্স ইন এইটিনথ্ সেঞ্চুরি কোলকাতা; *বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট,* ভলিউম, ৭৯, ১৯৬০, পৃ. ৪২-৫৫। সুমিত সরকার উল্লেখ করেন, 'কোনো একক দ্বারকানাথ বুর্জোয়া শ্রেণীর উত্থানের অগ্রদূত ছিলেন না।' সুমিত সরকার, তাঁরই রচিত 'রামমোহন রায় এ্যান্ড দি ব্রেক উইথ দি পাস্ট' *এ ক্রিটিক অব কলোনিয়াল ইন্ডিয়া,* কোলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১২।

২০. বস্তুত ভদ্রলোকেরা ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের ঘৃণা করত (ব্যাপকভাবে করতে থাকে) এবং এর মাধ্যমে ভূস্বামী শ্রেণীর লোকদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেত।

২১. সুমিত সরকার মন্তব্য করেন যে, 'ঐ শব্দটার সমস্যা হল ... এর পরিধি ব্যাপক – ময়মনসিংহের মহারাজা থেকে ইস্ট ইন্ডিয়ার রেলওয়ে কেরানি পর্যন্ত বোঝায়।' *দি স্বদেশী মুভমেন্ট*, পৃ. ৫০৯।

২২. পূর্ব বাঙলার জেলাগুলোতে এ অবস্থা বিশেষভাবে দেখা যায়, যেমন বাখেরগঞ্জ জেলা। এখানে জমিদার ও রায়তের মধ্যে কম করে হলেও পনেরো জন মধ্যস্বত্বভোগী ছিল। তপন রায়চৌধুরী, পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট ইন অপারেশন, বাখেরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট, ইস্ট বেঙ্গল; আর. ই. ফ্রাইকেনবার্গ (সম্পাদিত) – *ল্যান্ড কন্ট্রোল এ্যান্ড সোসাল স্ট্রাকচার ইন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি*, ম্যাডিসন, উইস, ১৯৬৯, পৃ. ১৬৩-১৭৪। বিস্ময়কর যে, বাখেরগঞ্জ জেলায় ভদ্রলোক হিন্দুর সংখ্যা বেশি ছিল।

২৩. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পল্লী সমাজ'-এর কথা দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়। নায়ক রমেশের কাছে মাসিমা তার ভদ্রলোক মর্যাদার কথা এই ঘোষণার মাধ্যমে বলে – 'আমার বাবা তোমার বাবার গোমস্তা ছিলেন না, তিনি ভূমিহীন শ্রমিক ছিলেন না, তিনি তোমার বাবার ব্যক্তিগত স্টেটে কাজ করতেন না ...। আমাদের পরিবার ছিল ভদ্রলোক।' সুকুমার সেন (সম্পাদিত) *সুলভ শরৎ সমগ্র*, খণ্ড ২, কোলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১৩৭।

২৪. এস. এন. মুখার্জী বলেন যে, 'বাবু' শব্দটির উৎপত্তি হল ফারসি ভাষা থেকে – এ শব্দটি 'উচ্চ শ্রেণীর বাঙালি হিন্দুদের প্রতি সম্মানসূচক হিসেবে ব্যবহার করা হত। 'ভদ্রলোক ইন বাঙলা ল্যাঙ্গুয়েজ এ্যান্ড লিটারেচার – এ্যান এসে অন দি ল্যাঙ্গুয়েজ অব কাস্ট এন্ড স্ট্যাটাস', *বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট*, খণ্ড ১৮১, ১৯৭৬, পৃ. ২৩৩।

২৫. ডিকশনারিতে উল্লিখিত শব্দটির ব্যাখ্যা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক: 'একজন ভদ্রলোকের নামের সাথে পদবি হিসেবে সংযুক্ত; একজন মালিক; একজন মনিব; একজন নিয়োগকর্তা; একজন অফিসার; একজন জমিদার ... ব্যাখ্যায় ঐ শব্দটির সাথে আরোপ করা হয়েছে বিলাসিতা, সূক্ষ্ম সম্পন্নতা, অত্যন্ত রুচিবাগিশ, ফুলবাবুর মতো, ফুলবাবুগিরি, বাবুগিরি', *সংসদ বেঙ্গলি-ইংলিশ ডিকশনারি* (দ্বিতীয় সংস্করণ), কোলকাতা ১৯৮৮। মুখার্জী উল্লেখ করেন যে, শুরুতে ব্রিটিশরা হিন্দু জমিদারদেরকে সম্মানের সাথে সম্বোধন করার জন্য বাবু শব্দটা ব্যবহার করত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ঐ শব্দটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'ভদ্রলোক ইন বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ এ্যান্ড লিটারেচার', পৃ. ২৩৩–২৩৫। ক্রিস্টাইন বাক্সটার বলেন যে, বাবু শব্দটিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য অর্থে গ্রহণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয় ১৮২০ সালের দিকে। ঐ সময় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিদ্রূপাত্মক রচনা প্রকাশ করেন – ঐ রচনায় বাবু শব্দটিকে তিনি চিত্রিত করেন 'ফারসি ভাবাপন্ন ভুঁইফোঁড় লোক' বলে। ইংরেজ ভাবাপন্ন লোকদের উদ্যোগে সমিতি গঠন শুরু হয় আরও পরে। ক্রিস্টাইন বাক্সটার, 'দি জেনেসিস অব দি বাবু: ভবানীচরণ ব্যানার্জি এ্যান্ড দি *কলিকাতা কমলালয়* – পিটার রব ও ডেভিড টেইলর (সম্পাদিত), *রুল, প্রোটেস্ট, আইডেনটিটি: আসপেকটস অব মডার্ন সাউথ এশিয়া*, লন্ডন, ১৯৭৮।

২৬. শীল ও বসাকদের মতো কোলকাতার অনেক ধনী পরিবার বর্ণ সমাজের অনেক নিম্ন ধাপ থেকে উঠে আসে। এস. এন. মুখার্জী, *কাস্ট, ক্লাস এ্যান্ড পলিটিক্স*, পৃ. ৩১।

২৭. দেখুন শীলা সেন, *মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল ১৯৩৭–১৯৪৭*, নিউ দিল্লী, ১৯৭৬, পৃ. ১–৩০; জয়ন্তী মৈত্র, *মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল ১৮৮৫–১৯০৬: কলাবোরেশন এ্যান্ড*

কনফ্রন্টেশান, কোলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৯–৪৪; এস. এন. মুখার্জী, *কাস্ট, ক্লাস এ্যান্ড পলিটিক্স*।

২৮. রাজা পিয়ারী মোহন মুখার্জীর মতো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা মনে করতেন যে, 'আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় কোনো আনন্দ নেই।' 'তাঁরা এটাকে অবজ্ঞার বিষয় হিসেবে মনে করেন, কারণ তার সাহায্যে গরিব লোকেরা খাদ্য পায়।' পি. সি. মাহতাব, *বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট*, খণ্ড ৯২, ১৯৭৩, পৃ. ২৩–৩৬। ১৭৮১ সালের বাঙলার ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের বার্ষিক রিপোর্টের মূল্যায়নে দেখা যায়, স্কুলে 'উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মোট ছাত্রদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত পরিবারের (aristocracy) সন্তানদের সংখ্যা শতকরা ০.৯৭ ভাগ; অধিকাংশ ছাত্রই হল সামান্য জমির মালিক ও পেশাজীবীদের সন্তান। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, *দি পার্লার এ্যান্ড দি স্ট্রিটস*, পৃ. ২১৫–২১৬, এন ৭৯।

২৯. বাঙলায় এই শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে শুধু ব্রাহ্মণেরাই ছিল না, কায়স্থ ও বৈদ্যরাও ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রেমেন আঢ্য ও ইবনে আজাদ, 'পলিটিক্স এ্যান্ড কালচার ইন বেঙ্গল', *নিউ লেফট রিভিউ*, খণ্ড ৭৯, মে-জুন, ১৯৭৩; এস. এন. মুখার্জী – *কাস্ট, ক্লাস এ্যান্ড পলিটিক্স*।

৩০. নীরদ সি. চৌধুরী, *দি অটোবায়োগ্রাফি অব এ্যান আননোন ইন্ডিয়ান*, লন্ডন, ১৯৮৮।

৩১. গ্রামের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে চৌধুরী লেখেন যে, বয়োজ্যেষ্ঠদের কিশোরগঞ্জ উপস্থিতির অনুভূতির গুরুত্ব ছিল আপেক্ষিক এবং তাদের পিতৃপুরুষের গ্রামের অনুভূতির কথা একই ধরনের গাছ ও তার শিকড়, বাড়ি ও তার ভিত্তিকে এনেও বর্ণনা করা যাবে না ... এসব ক্ষেত্রে বিস্মৃত জিনিসগুলো ছিল ভাসা-ভাসা অথবা কোনও ঘটনাই তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। সবচেয়ে গুরুত্বহ হল, কিশোরগঞ্জে আমাদের জীবনের অনুপস্থিত সময়ের জন্য অনুভূতি, যে অনুভূতিটি আমাদের পিতৃপুরুষের গ্রামের জীবনের স্থানে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল।' ঐ, পৃ. ৪৯–৫০।

৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০। আরও দেখুন এস. এন. মুখার্জী, 'কাস্ট, ক্লাস এ্যান্ড পলিটিক্স'।

৩৩. নীরদ সি. চৌধুরী, *অটোবায়োগ্রাফি অব এ্যান আননোন ইন্ডিয়ান*, পৃ. ৫৪–৫৯। পারিবারিক এস্টেট দেখাশোনা করার জন্য শিক্ষিত যুবকদের কোলকাতা থেকে ফিরে আসা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টান্তটি সবার কাছে পরিচিত। অপর এক সুপরিচিত ব্যক্তি হলেন সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ। যুবক বয়সে তিনি বেশ কয়েক বছর পারিবারিক জমি পরিচালনা করেন। তিনি ছিলেন সন্ত্রাসী যুগান্তর গ্রুপের একজন প্রভাবশালী নেতা এবং পরবর্তীকালে বেঙ্গল কংগ্রেসের সভাপতি। সুরেন্দ্র মোহন ঘোষের সাথে সাক্ষাৎকার, মৌখিক প্রতিলিপি নম্বর, ৩০১, *নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম এ্যান্ড লাইব্রেরি* (অতঃপর এনএমএমএল বলা হবে)।

৩৪. রত্নালেখা রায়, 'দি চেঞ্জিং ফরচুনস অব দি বেঙ্গলি জেন্ট্রি আন্ডার কলোনিয়াল রুল – পাল চৌধুরীস্ অব মহেশগঞ্জ, ১৯০০-১৯৫০' *মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ*, খণ্ড ২১, ৩, ১৯৮৭, পৃ. ৫১৩-৫১৪। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরবর্তী পর্যায়ের উপন্যাস *বিপ্রদাস*-এ উল্লিখিত দুই ভাই বিপ্রদাস ও দ্বিজদাস একইভাবে গ্রামভিত্তিক ও শহরভিত্তিক ভদ্রলোক চরিত্র। হরিপদ ঘোষ (সম্পাদিত), *শরৎ রচনা সমগ্র*, কোলকাতা, ১৯৮৯, খণ্ড ৩।

৩৫. পি. সি. রায়ের বাবা রাড়ুলিতে জমিদার হিসেবে যে জীবনধারা পরিচালনা করেন তার বিবরণ দেখুন প্রফুল্লচন্দ্র রায়, *লাইফ এ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্সেস অব এ বেঙ্গলি কেমিস্ট*, কোলকাতা, ১৯৩২, পৃ. ৮–১২।

৩৬. কোলকাতার একজন ইংরেজ ভাবাপন্ন যুবক ব্যক্তির সংগৃহীত প্রাচীন কালের পুরাকীর্তি (antics) দেখে যশোরের স্থানীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক যেভাবে মূল্যায়ন করে এবং এর ফলে যে ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তার কৌতুকপ্রদ বিবরণ দেন পি. সি. রায়। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২, ২৫।

৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪–২৫। ইংরেজ ভাবাপন্ন শহরের ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে পারিবারিক মর্যাদার অনুভূতি পিতৃপুরুষের গ্রাম ও ভূমির সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত থাকে এবং এই বন্ধন অব্যাহত থাকে। নীরদ চৌধুরী বিষয়টা এভাবে স্মরণ করেন: 'বনগ্রামে উপস্থিত হওয়ার পর পরই আমরা আমাদের বংশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়ি, আমাদের বংশের মর্যাদার কারণে অন্যের চেয়ে নিজেদেরকে উচ্চ শ্রেণীর বলে অনুভব করি – শুধু তা-ই নয়, আমরা আমাদের বংশের সীমাহীন মর্যাদার কথা অনুভব করি যা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম ... কিশোরগঞ্জে আমাদের বংশলতিকা অন্যান্য ছেলেদের মতো পিতা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে। ঘটনা এমন যে, নীরদ চৌধুরী হল উপেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর পুত্র, এ কথা বলাই যথেষ্ট। বনগ্রামে তা ছিল না। সেখানেই আমরা জানতে পেরেছি, তা শুধু নয়, আমাদের কাকাতুয়ার মতো মুখস্থ করানো হয়েছে – উপেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর পুত্র হল নীরদ চৌধুরী, কৃষ্ণ নারায়ণ চৌধুরীর পুত্র হল উপেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, লক্ষ্মী নারায়ণ চৌধুরীর পুত্র হল কৃষ্ণ নারায়ণ চৌধুরী, কীর্তি নারায়ণ চৌধুরীর পুত্র হল লক্ষ্মী নারায়ণ চৌধুরী, চন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর পুত্র হল কীর্তি নারায়ণ চৌধুরী এবং চৌদ্দ পুরুষ পর্যন্ত।' *অটোবায়োগ্রাফি অব এ্যান আননোন ইন্ডিয়ান*, পৃ. ৫১।

৩৮. তপন রায়চৌধুরী, 'পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট ইন অপারেশন', পৃ. ১৭৪।

৩৯. *কলিকাতা কমলালয়* পুস্তকে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজি শিক্ষার যৌক্তিকতা সমর্থন করেন এভাবে: 'শাস্ত্রে বাস্তব ও অর্থ উপার্জনের শিক্ষাকে প্রয়োজনীয় বলে সমর্থন করা হয়েছে। শাসকের ভাষার জ্ঞান ছাড়া একটা দেশ কিভাবে শাসন করা যায়?' ক্রিস্টাইন বাক্সটার, *দি জেনেসিস অব দি বাবু*, পৃ. ৯৯। ইংরেজি শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন জন আর. ম্যাকলেন, *ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম এ্যান্ড দি আর্লি কংগ্রেস*, প্রিন্সটন, ১৯৭৭, পৃ. ৪; গৌরী বিশ্বনাথন, *মাস্কস অব কনকোয়েস্ট – লিটারারি স্টাডি এ্যান্ড ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া,* নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৯; তেজস্বিনী নিরঞ্জনা, 'ট্রানস্লেশন, কলোনিয়ালিজম এ্যান্ড দি রাইজ অব ইংলিশ', স্বাতী জোসী (সম্পাদিত), *রিথিংকিং ইংলিশ এসেজ ইন লিটারেচার, ল্যাঙ্গুয়েজ, হিস্ট্রি*, নিউ দিল্লী, ১৯৯৯; যশোধারা বাগচি, শেকসপীয়ার ইন লয়েনক্লোদস: ইংলিশ লিটারেচার এ্যান্ড দি আর্লি ন্যাশনালিস্ট কনসাসনেস ইন বেঙ্গল', স্বাতী জোশী (সম্পাদিত) – *রিথিংকিং ইংলিশ* ...।

৪০. রজত দত্ত, 'এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন, সোসাল পার্টিসিপেশন এ্যান্ড ডমিনেশন ইন লেট এইটিনথ সেনচুরি বেঙ্গল: টুয়ার্ডস এ্যান অলটারনেটিভ এক্সপ্লানেশন', *জার্নাল অব পিজান্ট স্টাডিজ*, খণ্ড ১৭, ১, ১৯৮৯, পৃ. ৭৭।

৪১. রজত এবং রত্না রায়, 'জমিনদারস্ এ্যান্ড জোতদারস্: এ স্টাডি অব রুরাল পলিটিক্স ইন বেঙ্গল', *মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ*, খণ্ড ৯, ১, ১৯৭৫, পৃ. ৯৯।

৪২. সুমিত সরকার, 'দি কল্কি অবতার অব বিক্রমপুর: এ ভিলেজ স্ক্যান্ডাল ইন আর্লি টুয়েনটিয়েথ সেনচুরি বেঙ্গল', রনজিত গুহ (সম্পাদিত), *সাবলটার্ন স্টাডিজ*, ৬, নিউ দিল্লী, ১৯৮৯, পৃ. ১৫। 'দেশীয় ব্রাহ্মণ'-এর বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন সরকার-এর

মিমিওগ্রাফ 'দি কথামৃত এ্যাজ টেকস্ট, এনএমএমএল, *অকেশনাল পেপারস ইন হিস্ট্রি এ্যান্ড সোসাইটি*, নম্বর ২২, ১৯৮৫।

৪৩. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পথের পাঁচালী*, কোলকাতা, ১৯২৯। বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁর বালক নায়ক অপুর চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রাম্য চিকিৎসকের বংশ পরম্পরায় জন্মগ্রহণ করেন বিভূতিভূষণের পিতা। অন্য দিকে হবিহর রায় ছিলেন একজন পারিবারিক পুরোহিত। উভয়ে কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করেন। অতি কষ্টের মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণকে তাঁর পিতা ইংলিশ মিডিয়াম হাই স্কুলে লেখাপড়া করান। বিভূতিভূষণ পরে কোলকাতা রিপন কলেজ থেকে অনার্সসহ গ্রাজুয়েট হন এবং শিক্ষক ও কেরানি হিসেবে বিভিন্ন স্কুলে চাকুরি করেন। দেখুন, টি ডাব্লু ক্লার্ক-এর ঐ উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদের মুখবন্ধ। *সং অব দি রোড* (টি ডাব্লু ক্লার্ক ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় অনূদিত), নিউ দিল্লী, ১৯৯০, পৃ ১১।

৪৪. ১৯০১ সালে হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যা ছিল আর্টস কলেজে শতকরা ৯৪ ভাগ, পেশাগত কলেজে শতকরা ৯৬.২ ভাগ এবং হাই স্কুলে শতকরা ৮৮ ভাগ। তাজিম এম. মুরশিদ, 'দি বেঙ্গলি মুসলিম ইন্টেলিজেনসিয়া, ১৯৩৭–৭৭: দি টেনশন বিটুইন দি রিলিজিয়াস এ্যান্ড দি সেকিউলার', ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড, ডি ফিল থিসিস, ১৯৮৫, পৃ ৪৩। পাশ্চাত্য শিক্ষা অর্জনে খরচ ও কষ্ট সম্পর্কে মুরশিদের আলোচনাও দেখুন।

৪৫. এস. ডি. কোলেট, *দি লাইফ এ্যান্ড লেটারস্ অব রাজা রামমোহন রায়*, কোলকাতা, ১৯৬২, পৃ. ৪৫৮।

৪৬. হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায, 'দি মিরর অব ক্লাস', পৃ, ১০৪৬। এখানে প্রাথমিক শিক্ষা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রুশোসকিউ/রেনল্ডসিয়ান (Rousseauesque/Rcynoldsian) রোমান্টিক ভিশন এবং তাঁর বিখ্যাত *সহজ পাঠ*-কে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আরও দেখুন, যশোধরা বাগচী, 'শেকসপিয়ার ইন লয়েনক্লোদস্'।

৪৭. অর্চনা মণ্ডল, দি আইডিওলজি এ্যান্ড ইন্টারেস্টস অব দি বেঙ্গলি ইনটেলিজেনসিয়া: স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলস্ এডুকেশন পলিসি (১৮৭১–১৮৭৪), *ইন্ডিয়ান ইকনমিক এ্যান্ড সোসাল হিস্ট্রি রিভিউ*, খণ্ড ১২, ১, ১৯৭৫, পৃ. ৮১-৮৯।

৪৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১-৮৯।

৪৯. এস. এন. মুখার্জী, 'ভদ্রলোক ইন বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ এ্যান্ড লিটারেচার', পৃ. ২৩৩।

৫০. অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কোলকাতার সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক পরিবারের যে তালিকা প্রকাশ করা হয় তাতে শুধু ধনী লোকদের নাম ছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখুন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কলিকাতা কমলালয়*-এ উপস্থাপিত তালিকা 'প্রথমধারা ভদ্রলোক', কোলকাতা, ১৮২৩। এইচ. টি. প্রিন্সেফ-এর জন্য ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে রাধাকান্ত দেব ঐ তালিকা প্রস্তুত করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ঐ তালিকার উপর ভিত্তি করে যে তালিকা প্রস্তুত করা হয় তাতে সংস্কৃতিবান বা সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, প্রথম দিকে খ্যাতনামা ভদ্রলোকদের যে তালিকা প্রস্তুত করা হয় তাতে রামমোহন রায়ের নাম ছিল না। এস. এন. মুখার্জী, *কাস্ট, ক্লাস এ্যান্ড পলিটিক্স*, পৃ. ১৬-২০।

৫১. পিয়েরে বোরদিউ এই ধারণাটির ব্যবহার করেন। দেখুন, তাঁর *ডিসটিংশন এ সোস্যাল ক্রিটিক অব দি জাজমেন্ট অব টেস্ট* (রিচার্ড নাইস অনূদিত), লন্ডন, ১৯৮৬, পৃ. ১১-৯৬। 'ইকনমিক

ক্যাপিটাল' এবং 'এডুকেশনাল' বা 'কালচারাল ক্যাপিটাল'-এর মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে বোরদিউ-এর আলোচনা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩-৫৪, ৮০-৮৩, ৩০৩। 'এডুকেশনাল এস্টাবলিস্টমেন্ট' সম্পর্কে সাম্প্রতিক গবেষণায় বোরদিউ বিষয়টিকে আরো বিস্তারিত করেছেন। *হোমো একাডেমিকাস* (পিটার কোলিয়ার অনূদিত) , কেমব্রিজ, ১৯৮৮, পৃ. ৪৭-৫০। বোরদিউ-এর পুস্তক নিয়ে এ্যাক্সেল হোনেথ-এর আলোচনা 'দি ফ্রাগমেন্টেড ওয়ার্ল্ড অব সিম্বলিক ফরমস্: রিফ্লেকশনস্ অন পিয়েরে বোরদিউ'স সোসিওলজি অব কালচার', *থিওরি, কালচার এ্যান্ড সোসাইটি*, খণ্ড ৩, ৩, ১৯৮৬ দেখুন। রেমন্ড উইলিয়াম আধুনিক বাগধারায় 'শিক্ষিত' শব্দটির 'প্রবল শ্রেণী চেতনা'র একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হতে পারে। দেখুন, *কিওয়ার্ডস*, পৃ. ৯৫-৯৬।

৫২. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির বিখ্যাত উক্তি এখানে একটা সুন্দর নিদর্শন – 'যেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণী আছে সেখানে আছে সংস্কৃতি, স্বাধীনতা, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি ...। বাঙলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্মেষ সেই সময়কার সবচেয়ে আশ্বস্ত হওয়ার সময়। এটা একটা নিশ্চিত আভাস যে, ভারতের এই অংশে আমাদের দৃষ্টি সঠিক পথে নিবদ্ধ। পশ্চাদ্গমন নয়, অগ্রগতিই হল সময়ের দাবি: বর্তমান অবস্থার সামগ্রিক ধারা হল ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি ...।' *দি বেঙ্গলি*, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১১। রজত রায়ের 'থ্রি ইন্টারপ্রেটেশনস অব ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম'-এ উদ্ধৃত, পৃ. ১। আরও দেখুন, বাঙালি হিন্দুদের সাথে প্রাচীন গ্রিসের বুদ্ধিবৃত্তিক 'ঔজ্জ্বল্য' সম্পর্কে অরবিন্দ ঘোষের তুলনা। *বন্দে মাতরম*, ৬ই মার্চ, ১৯০৮।

৫৩. অন্যায়ভাবে সরকারি হস্তক্ষেপ থেকে ভূ-সম্পত্তি রক্ষা করাই ছিল এই সমিতির প্রাথমিক কাজ। এ ছাড়াও আর যেসব ইস্যু ছিল সেগুলো হল: হাউজ ট্যাক্স, স্ট্যাম্প ডিউটি এবং বিনা খাজনার জমি দেয়া শুরু। এস. এন. মুখার্জী, *কাস্ট, ক্লাস এ্যান্ড পলিটিক্স*, পৃ. ৩৬।

৫৪. দেখুন, রজত কান্ত রায়, *সোস্যাল কনফ্লিক্ট এ্যান্ড পলিটিক্যাল আনরেস্ট ইন বেঙ্গল*, ১৮৭৫-১৯২৭, নিউ দিল্লী, ১৯৮৪, পৃ. ১৪-২১; অমিয় কুমার বাগচী, *প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ইন ইন্ডিয়া ১৯০০-১৯৩৯*, মাদ্রাজ, ১৯৭২, পৃ. ১৬৫-১৭০।

৫৫. বাঙলায় কংগ্রেস ও ভদ্রলোক জাতীয়তাবাদ নিয়ে অনেক গবেষণায় এটা উন্মোচিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখুন সুমিত সরকার, *দি স্বদেশী মুভমেন্ট*; তনিকা সরকার, *বেঙ্গল ১৯২৮-১৯৩৪*; বারবারা সাউদার্ড, 'দি পলিটিক্যাল স্ট্রাটিজি অব অরবিন্দ ঘোষ'; বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, 'পিজান্টস এ্যান্ড দি বেঙ্গল কংগ্রেস, ১৯২৮-১৯৩৮', *সাউথ এশিয়া রিসার্চ*, খণ্ড ৫.১, ১৯৮৫। আরও দেখুন এই পুস্তকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়।

৫৬. আসলে তথাকথিত 'পুনরুজ্জীবনবাদী (revivalist) চিন্তাবিদেরা বর্তমান নিয়ে স্বীয় সমাজে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় গর্বের ব্যাপারে বেশি তৎপর ছিল – অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য নয়। তপন রায়চৌধুরী, *ইউরোপ রিকনসিডার্ড – পারসেপশনস্ অব দি ওয়েস্ট ইন নাইনটিনথ সেনচুরি বেঙ্গল*, নিউ দিল্লী, ১৯৮৮, পৃ. ৮-৯।

৫৭. অরবিন্দ ঘোষের জীবনী বেশ কৌতূহলজনক এবং তিনি ব্যতিক্রমীভাবে পাশ্চাত্য ধারায় লালিত-পালিত ও বড় হন। দেখুন, এ. বি. পুরানী, *দি লাইফ অব শ্রী অরবিন্দ, এ সোর্স বুক*, পন্ডিচেরি, ১৯৬৪।

৫৮. বারবারা সাউদার্ড, 'দি পলিটিক্যাল স্ট্রাটিজি অব অরবিন্দ ঘোষ', পৃ. ৩৬১-৩৬৯। আরও দেখুন, *বন্দে মাতরম*-এ (২৩শে এপ্রিল ১৯০৭) নিজের দর্শন ও রাজনৈতিক বেদান্ত সম্পর্কে অরবিন্দের আলোচনা।

৫৯. বারবারা সাউদার্ড. 'দি পলিটিক্যাল স্ট্রাটিজি অব অরবিন্দ ঘোষ', পৃ. ৩৬৬; সুমিত সরকার, *দি স্বদেশী মুভমেন্ট*, পৃ. ৩০৪-৩০৫।

৬০. রজতকান্ত রায়, *সোস্যাল কনফ্লিক্ট এ্যান্ড পলিটিক্যাল আনরেস্ট ইন বেঙ্গল*, পৃ. ১৭৭।

৬১. পৃথীশচন্দ্র রায়চৌধুরী, *লাইফ এ্যান্ড টাইমস্ অব সি আর দাস – দি স্টোরি অব বেঙ্গল'স সেলফ এক্সপ্রেশন*, লন্ডন, ১৯২৭, পৃ. ২৭-৩৭।

৬২. সুভাষচন্দ্র বসু, *এ্যান ইন্ডিয়ান পিলগ্রিম*, শিশির বোস (সম্পাদিত) *নেতাজী কালেকটেড ওয়ার্কস্*, খণ্ড ১, কোলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৩৯-৪৭।

৬৩. এ ধারণা সম্পর্কে কিছু সমস্যার কথা এম. এন. শ্রীনিবাস তাঁর প্রবন্ধ 'ওয়েস্টার্নাইজেশন'-এ আলোচনা করেছেন। এম. এন. শ্রীনিবাস, *সোসাল চেঞ্জ ইন মডার্ন ইন্ডিয়া*, নিউ দিল্লী ১৯৭৭, পৃ. ৪৬-৪৮।

৬৪. হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেন যে, পারিবারিক জীবনে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিকে বাতিল করা হয় এবং ভদ্রলোক মহিলারা 'ঐতিহ্যগত' জগৎ ও 'ঐতিহ্যগত' প্রথা, নৈতিকতা ও সামাজিক বিধি সংরক্ষণে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। 'দি মিরর অব ক্লাস', পৃ. ১০৪৪।

৬৫. পার্থ চ্যাটার্জী, *ন্যাশনালিস্ট থট এ্যান্ড দি কলোনিয়াল ওয়ার্ল্ড, এ ডেরিভেটিভ ডিসকোর্স*, নিউ দিল্লী, ১৯৮৬, পৃ. ৫৮।

৬৬. এস. এন. মুখার্জী, 'কাস্ট, ক্লাস এ্যান্ড পলিটিক্স', পৃ. ৫৪-৫৫।

প্রথম অধ্যায়

বাঙলার রাজনীতি ও সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ

লন্ডন ও নতুন দিল্লীর ব্রিটিশ নীতি-নির্ধারকেরা ১৯২৯ সালের দিকে মনে করেন যে, দশ বছর আগে মন্টেগু ও চেমস্‌ফোর্ডের নির্ধারণ করা শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল্যায়ন হওয়া দরকার। গত দশকের বিভিন্ন চাপের ফলে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কেন্দ্রের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকদের চাপ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য প্রাদেশিক স্বাযত্তশাসন ব্যবস্থার পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকারের সাথে ভারতীয়দের সহযোগিতার ভিত্তিকে প্রসারিত করা হয়। এই সংস্কারের ফলে ভারতীয়দের হাতে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়, কৌশলগত কারণে কেন্দ্রে ব্রিটিশ শাসন কিছুটা শিথিল করা হয়। কিন্তু আসল ক্ষমতা যথারীতি তাদের হাতেই থেকে যায়। একই সাথে প্রদেশগুলোকে দেয়া বৃহত্তর 'স্বায়ত্তশাসনের' সুযোগকে সীমিত করতে বেশ কয়েকটি রক্ষাকবচের পরিকল্পনা করা হয়। ১৯৩২ সালের সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ ছিল ঐ কৌশলের একটা অখণ্ড রূপ।[১]

প্রদেশগুলোর বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায় ও সামাজিক গ্রুপের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়ার লন্ডনের সিদ্ধান্তের উপজাত ফল হল ঐ সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ। কারণ, তাদের মতে, ঐসব প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায় ও সামাজিক গ্রুপের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে ভারতীয় সমাজ। ব্রিটিশ প্রশাসকেরা বুঝতে পারে যে, মূলত ভারত হল সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণী, জাতি ও সম্প্রদায়ের সমষ্টি – এদের মধ্যে আছে স্বার্থের ভিন্নতা ও বংশগত আবেগ, যার কারণে তারা যুগের পর যুগ ধরে যৌথভাবে কোনো কাজ করতে পারে না বা স্থানীয় পর্যায়ে কোনো বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হতে পারে না।[২] বস্তুত প্রশাসকেরা তাদের ধারণা অনুযায়ী ভারতীয় সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে। তাদের ঐ ধারণায় গভীরতা থাকলেও তাতে উপমহাদেশের সামাজিক বাস্তবতা ছিল না। ব্রিটিশ 'মূলনীতিবাদী'দের (essentialists) ভারত সম্পর্কে ধারণা ছিল, ইনডেনের মতে, 'অদ্ভুত ও পরস্পরবিরোধী এক মিশ্র সমাজের প্রতি ভারত আস্থাবান – ঐ সমাজে ভারতীয়দের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় জাতি, গ্রাম, ভাষাগত অঞ্চল, ধর্ম ও যৌথ পরিবারের মতো সামাজিক গ্রুপগুলোর জন্য। কারণ, ভারতে 'ব্যক্তিগত' বলে কিছু নেই – ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ভারতীয়রা

অসৎ কাজ বলে মনে করে।'[৩] দশকওয়ারি আদমশুমারি ভারতীয় সমাজের এমন একটি চিত্র গড়ে তোলে যা কিনা 'বিশেষ স্বার্থ' এবং গ্রুপগুলোর একটি সম্মিলিত রূপ। এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে ব্রিটিশরা তাদের চিহ্নিত ভারতীয় সমাজের 'সহজাত নেতৃবৃন্দে'র স্বার্থের সাথে এক প্রকার সখ্য গড়ে তোলে যাতে একজনের বিরুদ্ধে অন্যকে ব্যবহারের মাধ্যমে ভারসাম্য বজায় রাখা যায় এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে নিশ্চিত করে সবাইকে অধীন রাখা যায়। একই সাথে ব্রিটিশদের ঐ 'সহজাত নেতৃবৃন্দ' সম্পর্কে আপত্তি (reservation) ছিল এবং তারা 'জনগণ'-এর নেতৃত্ব দেবার দাবি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করত। পরস্পরবিরোধী এই অবস্থানের মধ্য দিয়ে তারা তাত্ত্বিকভাবে ব্রিটিশ শাসনের যৌক্তিকতা তুলে ধরে তাদের শাসন চালিয়ে যেত। ভারতীয় সমাজে পরস্পরবিরোধী স্বার্থের মধ্যে ঔপনিবেশিক বেসামরিক লোকেরা নিজেদের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দাবি করত এবং একই সাথে জনগণের নেতৃবৃন্দের দুর্নীতি ও প্রচণ্ড লোভের বিরুদ্ধে তারা নিজেদেরকে জনগণের অভিভাবক হিসেবে দাবি করত।[৪]

সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ নৈতিকতা ও ব্যক্তি-স্বার্থের এই ধারাবাহিকতার প্রতিফলন। কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোর আইন প্রণেতাগণকে বিভিন্ন 'সম্প্রদায়' ও স্বার্থের মধ্যে বিভক্ত করা হয়; মুসলমান, অনুন্নত সম্প্রদায়, শিখ, ইউরোপীয় এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের 'সাধারণ' জনগণসহ জমিদারদের 'বিশেষ' নির্বাচনী এলাকা, শ্রমিক, মহিলা ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ছিল এই বিশেষ সম্প্রদায় ও স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট। সংখ্যা নয়, প্রত্যেক গ্রুপের 'গুরুত্ব' অনুযায়ী আসন বণ্টন করা হয় (অথচ বিষয়টাকে সরকারের প্রতি কে কতটা অনুগত বলে ব্যাখ্যা করা হয়)। বাঙলায় প্রস্তাবিত আইন সভার ২৫০টি আসনের মধ্যে ইউরোপীয় গ্রুপকে দেওয়া হয় মোট আসনের[৫] শতকরা দশ ভাগ আসন অর্থাৎ ২৫টি আসন (তালিকা ১ দেখুন); অথচ বাঙলায় তাদের জনসংখ্যার অনুপাত ছিল শতকরা এক ভাগেরও কম। তদুপরি আইন সভার নির্বাচন ছিল 'পৃথক প্রতিনিধিত্বমূলক'; মুসলমানেরা নির্বাচিত করবে মুসলমানদের, হিন্দুরা নির্বাচিত করবে হিন্দুদের এবং ইউরোপীয়রা নির্বাচিত করবে ইউরোপীয়দের।

সম্প্রদায়গত রোয়েদাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দু ও মুসলমান আসনের বণ্টন। অনুন্নত শ্রেণীসহ হিন্দুদের দেওয়া হয় ৮০টি আসন, মোট আসনের শতকরা ৩২ ভাগ। অথচ ১৯৩১ সালের আদমশুমারিতে বাঙলায় তাদের সংখ্যা ছিল ২২.২ মিলিয়ন বা শতকরা ৪৪ ভাগ। জনসংখ্যার অনুপাতে সামান্য কম হলেও মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকেও অবমূল্যায়ন করা হয়। ১৯৩১ সালের আদমশুমারিতে বাঙলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ২৭.৮ মিলিয়ন, অর্থাৎ শতকরা ৫৪ ভাগ;[৬] আর ভারতীয় উপমহাদেশে মোট মুসলমানদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশি। কিন্তু ঐ রোয়েদাদে তাদেরকে দেওয়া হয় ১১৯টি আসন বা আইন সভার মোট আসনের শতকরা ৪৭.৮ ভাগ।

সারণি ১ : বাঙলায় সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ

নির্বাচনী এলাকা	আসন সংখ্যা
মুসলমান	১১৭
মুসলিম মহিলা	২
সাধারণ	৭০
অনুন্নত শ্রেণী	১০[ক]
সাধারণ মহিলা	২
ইউরোপীয়	১১
ইউরোপীয় ব্যবসায়ী	১৪
ভারতীয় ব্যবসায়ী	৫
জমিদার	৫
বিশ্ববিদ্যালয়	২
শ্রমিক	৮
এ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান	৩
এ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান মহিলা	১

ক. মোট 'সাধারণ' আসনের মধ্যে কমপক্ষে ১০টি আসন অনুন্নত শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

সূত্র: এস. এন. মিত্র (সম্পাদিত), *ইন্ডিয়ান এ্যানুয়াল রেজিস্টার*, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৩২, খণ্ড-২, পৃ. ২৩৬।

আসন বণ্টনের বৈশিষ্ট্য থেকে দেখা যায়, হিন্দুরা ন্যায্যভাবে যতটা আসন আশা করেছিল তার চেয়ে তাদের অনেক কম আসন দেওয়া হয়েছে। এটা বাস্তব যে, হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের অংশ বেশ বৃদ্ধি পায়। দ্বৈত শাসনে বেঙ্গল কাউন্সিলে[৭] হিন্দুরা পায় ৪৬, আর মুসলমানেরা পায় ৩৯টি আসন। এই ব্যবস্থায় বাঙলায় হিন্দু ভদ্রলোকদের অতিরিক্ত শক্তিশালী আধিপত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মাত্র একটা আঘাতের মধ্য দিয়ে এই অবস্থার পরিবর্তন করা হয়। তদুপরি, ৮০টি আসনের মধ্যে কমপক্ষে ১০টি আসন সংরক্ষিত করা হয় অনুন্নত শ্রেণীর জন্য। এর ফলে ২৫০ আসন বিশিষ্ট হাউসে হিন্দু আসনের সংখ্যা আরও কমিয়ে ৭০ করা হয়, অর্থাৎ শতকরা হিসেবে তা হয় মাত্র ২৮ ভাগ। বাস্তবে সম্প্রদায়গত এই রোয়েদাদ আইন সভায় বাঙালি ভদ্রলোকদের দুর্বল সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত করে। অথচ তারা আশা করেছিল যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের নতুন যুগে আইন সভায় তাদের আধিপত্য থাকবে। অপর দিকে বাঙলার আইন সভার ইতিহাসে এই প্রথম বারের মতো হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানেরা আনুপাতিক হারে বেশ শক্তিশালী অবস্থায় থাকে।

রোয়েদাদ অনুযায়ী বাঙলায় হিন্দু-মুসলমান আসন বণ্টন হয় দিল্লীর সর্ব-ভারতীয় অগ্রাধিকারমূলক কাজের প্রতিফলন হিসেবে। ভাইসরয় মনে করেন যে, খেলাফত আন্দোলনের পর মুসলমানদের শান্ত করার প্রয়োজনীয়তা খুবই জরুরি এবং বাঙলার গভর্নর জন এ্যান্ডারসন তাঁর প্রদেশে আরো প্রতিনিধিত্বমূলক আসন বণ্টন বিবেচনা করতে অনুরোধ জানাবেন না। উইলিংডন ব্যাখ্যা করে বলেন যে, 'বাঙলার সার্বিক পরিস্থিতির আলোকে সম্পূর্ণ প্রাদেশিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্যার মোকাবেলা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমাদের নিজস্ব দায়িত্ব আমাদেরকে একটা প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে বাধ্য করে। বাঙলার বাইরের প্রতিক্রিয়াকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না ... গভর্নরের প্রস্তাবগুলো ... আমাদেরকে শুধু বাঙলার মুসলমানদের সমর্থন প্রাপ্তি থেকে নয়, সারা ভারতের মুসলমানদের সমর্থন থেকেও বঞ্চিত করবে।'[৮] ইন্ডিয়া অফিস দিল্লীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে, তবে কিছুটা ইতস্তত করার পর।[৯] বাঙলার সাম্প্রতিক গভর্নর জেটল্যান্ডের 'বাঙলার পরিস্থিতি' সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল। বাঙালি হিন্দুদের স্বার্থ উপেক্ষা করার সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে তিনি দিল্লীকে সতর্ক করে দেন। তিনি রোয়েদাদের ব্যাপারে নিম্নলিখিত আপত্তি উত্থাপন করেন:

১. এই রোয়েদাদ একটি অগ্রবর্তী জনগোষ্ঠীকে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর অধীন করেছে;

২. এই রোয়েদাদ ক্রমাগতভাবে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বাড়িয়ে দেবে;

৩. এই রোয়েদাদ তাদের মধ্যে এমন এক অবিচারের অনুভূতি সৃষ্টি করবে যা তারা সহজে ক্ষমা করবে না বা ভুলবে না;

৪. এই রোয়েদাদ ক্রমাগত আন্দোলনের পথকে সুগম করবে এবং নিশ্চিতভাবে নাশকতামূলক আন্দোলনে প্রভূত শক্তি যোগাবে।[১০]

জেটল্যান্ড বিশেষভাবে চিন্তিত ছিলেন রোয়েদাদের অধীন বিভিন্ন প্রস্তাবে বর্ণ হিন্দুদের অবস্থান নিয়ে। তিনি সঠিকভাবে অনুমান করেন যে, রোয়েদাদের শর্ত নিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া হবে চরম। তিনি সতর্ক করে দেন যে, 'এসব আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে কর্ম-পদ্ধতি ঠিক করা হয়েছে তাতে বর্ণ হিন্দুরা প্রেসিডেন্সি বিভাগে প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরকে স্থায়ী সংখ্যালঘিষ্ঠ হিসেবে দেখতে পাবে। অথচ ঐ বিভাগে তারা জনগণের বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমার খুবই আশংকা হয় যে, নতুন শাসনতন্ত্রে তাদেরকে যথাযথ সুযোগ দেওয়া হয়নি বলে তাদের ধারণা বদ্ধমূল হলে তারা হতাশ হয়ে এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।'[১১]

জেটল্যান্ডের ভীতি ছিল যথার্থ। ঐ রোয়েদাদকে ভদ্রলোকেরা গণ্য করে তাদের মর্যাদার ওপর সরাসরি আক্রমণ হিসেবে এবং তারা তাদের ঘৃণাসূচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তীব্রভাবে। ১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর ভদ্রলোক রাজনীতিতে এ ধরনের ঐক্য ছিল বিরল। দাশ তাঁর কোনো উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে যাননি। তাঁর মৃত্যুর পর

তাঁর দুই প্রিয় প্রতিনিধি যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে কোলকাতার তিনটি বিখ্যাত 'মুকুট'-এর জন্য (বেঙ্গল কংগ্রেস, কাউন্সিল ও কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন) অশোভন প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বসু এবং সেনগুপ্তকে পৃথকভাবে সমর্থন করার জন্য বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটি (বিপিসিসি) দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং দাশের গড়ে তোলা সংগঠনটি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। এমনকি গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনের আহবানও বেঙ্গল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে ঐক্যবদ্ধ করতে ব্যর্থ হয় এবং দলের প্রতিটি অংশই কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজ নিজ আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করে।[১২] কিন্তু গান্ধী যেখানে ব্যর্থ হলেন, রোয়েদাদ সেখানে সফল হয়। পরস্পর বিনাশকারী তিক্ত প্রতিযোগিতা বেঙ্গল কংগ্রেসকে একেবারে দুর্বল করে দিয়েছিল। কিন্তু এখন ঐ প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায় – সব অংশ ও গ্রুপ ঐক্যবদ্ধভাবে যতটা সম্ভব কড়া ভাষায় ঐ রোয়েদাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে নিন্দা জানায়। সেনগুপ্ত পক্ষের মুখপত্র *এ্যাডভানস্* (Advance) অত্যন্ত কঠোর নিন্দা জানিয়ে ঐ রোয়েদাদকে বর্ণনা করে 'সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কাছে লজ্জাহীন আত্মসমর্পণ' হিসেবে; বলা হল, ঐ রোয়েদাদে 'হিন্দুদের দাবি ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে।' ঐ পত্রিকা সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, 'হিন্দুরা এ ধরনের আমূল, প্রায় বিপ্লবী পরিবর্তনের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না।'[১৩] বসু গ্রুপের মুখপত্র *লিবার্টি* (Liberty) নিন্দা প্রকাশে কম প্রচণ্ড ছিল না: 'ভারতীয় জাতির প্রতি এই রোয়েদাদ একটি কলঙ্ক ... রোয়েদাদ শব্দটির বৈশিষ্ট্য 'অন্যায়' শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা যাবে না। ঐ রোয়েদাদ অপমানকর এবং নিশ্চিতভাবে ক্ষতিকর। রাজনৈতিকভাবে হিন্দুদের দুর্বল করা হয়েছে এবং প্রদেশের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে এই প্রক্রিয়ার ফল হবে অমঙ্গলজনক।'[১৪] বাঙলা *দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা* দূরদৃষ্টিহীন বলে ঐ রোয়েদাদের নিন্দা করে,[১৫] আর *দৈনিক বসুমতী* যুক্তি প্রদর্শন করে যে, ঐ রোয়েদাদ বাঙালিদের ওপর বাধ্যতামূলক নয়, কারণ 'সম্প্রদায়গুলোর সত্যিকার প্রতিনিধিরা প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর রোয়েদাদ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়নি।'[১৬] সবচেয়ে বহুল প্রচারিত জাতীয়তাবাদী *দৈনিক অমৃত বাজার পত্রিকা* প্রধানমন্ত্রীর ওপর তীব্র ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণ চালায়। একটা বাঙালি উপকথায় বর্ণিত গ্রাম্য মাতব্বরের বিচারের সাথে প্রধানমন্ত্রীর ন্যায়বিচারের তুলনা করে ঐ আক্রমণ চালানো হয়। উপকথাটি এরকম:

> এক কৃষকের একটা ভেড়া বাড়ির আঙিনায় রাখা লম্বা মুখওয়ালা ধান ভর্তি একটা মাটির কলসির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু এর পর ভেড়াটি তার মাথা আর বের করতে পারছিল না। এ ঘটনায় পরিবারের সবাই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। ফলে গ্রামের মাতব্বরকে ডেকে পাঠানো হয় ... মাতব্বর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বিস্মিত হয়: 'সামান্য এই বিষয়ে তোমরা আমার সাহায্য কামনা করেছ? আমি মারা গেলে তোমরা কী করবে? একটা তলোয়ার এনে দাও।' অতঃপর তলোয়ারের এক আঘাতে ভেড়াটির মাথা তার দেহ থেকে সে বিচ্ছিন্ন করে দিল। মাতব্বরের বুদ্ধির প্রখরতা লক্ষ করে গ্রামবাসীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু চালাক ধরনের এক যুবক কথার মধ্যে কথা বলল: 'কিন্তু কলসির মধ্যে ভেড়ার মাথাটা তো এখনো রয়ে গেল।' মাতব্বর লোকটি তার

দিকে অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল: 'বোকা কোথাকার। এ ঘটনায় তুমি হতবুদ্ধি হতে পারো, কিন্তু আমার বুদ্ধি লোপ পায়নি।' অতঃপর সে এক টুকরো পাথরের আঘাত দিয়ে কলসিটা ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। কলসির মধ্যে যে ধান ছিল তা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। আর ভেড়ার মাথাটা বেরিয়ে আসল। কৃষক পরিবারের সবাই সঙ্কট থেকে মুক্ত হল। তারা সবাই বুঝতে পারল যে, এই সঙ্কট থেকে উদ্ধারের জন্য মাতব্বর যদি না আসত তাহলে তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ত ...।[১৭]

ভদ্রলোকদের ভাগ্যের পতনের প্রেক্ষাপটে হিন্দুদের প্রতিক্রিয়ার প্রচণ্ডতা বিস্ময়কর কিছু ছিল না। বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ভদ্রলোকদের জন্য সুবিধাপ্রাপ্ত মর্যাদার যে ভিত দীর্ঘদিন ধরে অক্ষুণ্ন ছিল তা দৃশ্যত ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে। একদিকে জমিদারি সুবিধার ওপর প্রবল চাপ এবং অন্য দিকে বিভিন্ন চাকুরি ও পেশায় মুসলমানদের উৎসাহিত করার জন্য সরকারি নীতির পরিবর্তন ভদ্রলোক প্রভাবের মূলে কুঠারাঘাত হানে। রোয়েদাদ ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ও আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভদ্রলোকদের অবস্থান কিছুটা অনিশ্চিত অবস্থায় থাকলেও তাদের প্রভাব ছিল। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে তখনও তারা মোটামুটিভাবে ভালো অবস্থায় ছিল; কোলকাতা কর্পোরেশনে তাদের প্রাধান্য ছিল। গালাঘের (Gallagher) অবশ্য উল্লেখ করেন যে, স্থানীয় ও জেলা বোর্ডে তাদের অবস্থান দুর্বল হতে শুরু করে।[১৮] তবে এ সময় স্থানীয় পর্যায়ে তাদের প্রাধান্য ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য, জনসংখ্যার অনুপাতে তারা বেশি আসন নিয়ন্ত্রণ করে, বিশেষ করে পূর্ব বাঙলার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোতে। পশ্চিম বাঙলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোতে অবশ্য মুসলমানেরা কুড়ি দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে বেশ ভালো অবস্থায় আসে।[১৯] কিন্তু স্থানীয় প্রভাবশালী হিন্দুরা সাধারণভাবে সারা বাঙলায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে।[২০] সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ ঘোষণার পর স্থানীয় প্রাধান্যকে অবশ্য প্রাদেশিক পর্যায়ে কার্যকরভাবে রূপান্তরিত করা যায়নি। রোয়েদাদের মাধ্যমে পৃথক নির্বাচন ও আসন সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর আপস-মীমাংসা ও মৈত্রী-বন্ধনের বিষয়টি অসম্ভব হয়ে পড়ে; অথচ এর মাধ্যমে হিন্দু ভদ্রলোকেরা হয়ত স্থানীয় প্রাধান্যকে প্রাদেশিক পর্যায়ে রূপান্তরিত করতে পারত। কিন্তু তা না হওয়ায় বাঙালি সমাজের অত্যন্ত সুবিন্যস্ত ও সংগঠিত একটি সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধ্বংস হয়ে যায়।

এই আঘাতের কারণে তাদের প্রতিক্রিয়া যে চরম হবে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। কিন্তু যে কারণে তারা ঐ রোয়েদাদকে প্রত্যাখ্যান করে এবং যে ভাষায় তা প্রকাশ করে তা আরও বিস্ময়কর। ব্রিটিশ নীতির বিরুদ্ধে ভদ্রলোকেরা বাঞ্ছনীয় জাতীয়তাবাদী সমালোচনা করেনি। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়, আবেদন, স্মারক ও বক্তৃতার মাধ্যমে ঐ রোয়েদাদ প্রত্যাখ্যান করার দৃঢ়তা ও উন্মত্ততায় পৃথক নির্বাচন ও পুরানো ব্রিটিশ শাসন নীতি তথা 'বিভেদ নীতি' (divide and rule) সম্পর্কে খুব কমই শোনা যায়।[২১] আইন সভায় ইউরোপীয়দের বেশি গুরুত্ব দেওয়া বা গভর্নরের বিবেচনামূলক ক্ষমতা নিয়ে তাদেরকে

বিক্ষোভ করতেও দেখা যায়নি। সরকারি শ্বেতপত্রে প্রকাশিত 'স্বায়ত্তশাসন'কে প্রতারণা বলে জাতীয়তাবাদী ভারত প্রত্যাখ্যান করলেও বাঙালি ভদ্রলোকেরা (কংগ্রেস ও অকংগ্রেস সবাই) শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব প্রাদেশিক রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতি উপেক্ষার বিষয়েই উদ্বিগ্ন ছিল। ম্যাগডোনাল্ড ও ভাইসরয়ের কাছে প্রথমে তীব্র অভিযোগ জানানোর পর ভদ্রলোকদের সংবাদপত্র রোয়েদাদ প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের সমালোচনার ক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে নীরব হয়ে যায়।

এর পরিবর্তে, তারা তাদের ধারণায় রোয়েদাদের সবচেয়ে বেশি সুফলপ্রাপ্ত বাঙালি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশ করতে থাকে। রোয়েদাদ ঘোষণার দু'দিন পর *অমৃত বাজার পত্রিকা* এক রিপোর্টে উল্লেখ করে যে, হিন্দুদের দুঃখ-কষ্ট দেখে উল্লসিত মুসলমান রাজনীতিকেরা একটা 'বড় পার্টি'র আয়োজন করে তাদের বিজয় উৎসব পালন করে।[২২] এ ধরনের কাহিনী সন্দেহ ও শত্রুতার পরিবেশ সৃষ্টি করে; ফলে এমন এক ধারণা জন্মে যে, ঐ বোয়েদাদ ছিল মুসলমানদের (ব্রিটিশদের পরিবর্তে) প্রতারণামূলক চালাকি এবং ঐ চালাকির মাধ্যমে তারা বাঙলার হিন্দুদের রাজনৈতিক অধীনতার জালে স্থায়ীভাবে আটকাতে সফল হয়েছে। এ রকম ধারণার ফলে ভদ্রলোক হিন্দুরা নিজেদের জন্য সংখ্যালঘুদের অধিকার দাবি করতে উৎসাহী হয় এবং তারা সংখ্যালঘুদের জন্য নিরাপত্তা দাবি করে। লর্ড জেটল্যান্ডের কাছে প্রেরিত বাঙলার সব নামিদামি ও বড় বড় নেতাদের স্বাক্ষরিত এবং ব্যাপকভাবে প্রচারিত এক স্মারকলিপিতে এ কথা দৃঢ়তার সাথে বলা হয়, 'আপনার কাছে আবেদনকারীরা হল বাঙলার হিন্দু সম্প্রদায়; তারা হল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং সে-কারণে অন্যান্য প্রদেশের সংখ্যালঘুদের প্রদত্ত নিরাপত্তার মতো তারাও নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকারী।' এমনকি তারা ঘোষণা করে যে, 'বাঙলার সংখ্যালঘু হিন্দুরা স্বীকৃত সংখ্যালঘুর অধিকার হিসেবে তাদের প্রাপ্য যথার্থ প্রতিনিধিত্বের দাবি করছে।'[২৩]

ভদ্রলোক জাতীয়তাবাদীদের জন্য এ ধরনের অবস্থান গ্রহণ করা ছিল অভূতপূর্ব। তারা সেই জাতীয়তাবাদী আদর্শের চেতনাকে প্রত্যাখ্যান করে যেখানে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের ঐক্য এবং মুসলমান ও সমাজের অন্যান্য 'অনুন্নত' শ্রেণীর লোকদের প্রতি হিন্দুদের উদারতা প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।[২৪] রোয়েদাদ-বিরোধী বাগ্মিতায় উন্মোচিত অনেক বিষয় মূলত জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার মূল ধারার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে কোলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত সভায় ভদ্রলোক সমাজের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যোগদান করেন। সেখানে একজন বক্তার সুপারিশের সাথে দ্বি-জাতি তত্ত্বের তাত্ত্বিকদের অনেক মিল আছে:

> হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক সাংস্কৃতিক সংশ্লিষ্টতা, তাদের শিক্ষা, ব্যক্তিগত আইন (Personal Law) এবং অনুরূপ বিষয়ের প্রেক্ষিতে তাদেরকে পৃথক জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং অতঃপর তারা কোনরকম মতভেদ ছাড়াই অল-বেঙ্গল ফেডারেশন এ্যাসেমব্লিতে একসাথে সমতা, ন্যায়পরতা ও ভ্রাতৃত্বের শর্তে যোগ দিতে পারে। এ ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারণাই বাঙলার জন্য উপযোগী হতে পারে।[২৫]

অন্য অনেক ঘটনায় রোয়েদাদের বিরুদ্ধে ভদ্রলোক-বাগ্মিতায় বেশ আকর্ষণীয়ভাবে জাতীয়তাবাদী আদর্শ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। হিন্দুসভার বি. সি. চট্টোপাধ্যায় রোয়েদাদকে 'বিশ্বাসঘাতকতা' বলে আখ্যায়িত করে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তবে তিনি উল্লেখ করেন যে, 'বাঙালি হিন্দু প্রতিভার বিকাশ (লেখক) এবং বাঙলার নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিনির্মাণ হল ব্রিটিশ ভারতের এক সুবিদিত বিস্ময়কর ঘটনা'; আর ব্রিটিশ শাসনে বাঙালি হিন্দু সভ্যতার বিকাশ সম্ভব হয়েছে। মুসলমানদের 'গদি'তে (ক্ষমতায়) বসানোর অর্থ হল বাঙলাকে পলাশী-পূর্ব অন্ধকার যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। তিনি যুক্তি দেখান যে, 'এর ফলে (অর্থাৎ মুসলমানদের 'গদি'তে বসানো হলে) ১৭৫৭ সাল থেকে বাঙলায় ব্রিটিশরা যা করেছে তাকে অস্বীকার করা হবে এবং 'ব্রিটেন ও বাঙলার বিশ্বাসঘাতকতা' শিরোনামে বাঙলার ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায় লিখতে হবে।'[২৬] জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনায় পলাশী যুদ্ধের ওপর এই প্রতীকী বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়েছিল যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিস্তারে এটা ছিল প্রথম *কলংকিত কাজ* – এখন ঐ ধারণার আমূল পরিবর্তন হল। এখন ঐ পরিবর্তিত ধারণায় একে বলা হল স্বাধীনতার মুহূর্ত হিসেবে – যে মুহূর্তে মুসলমানদের 'অত্যাচার'-এর স্বেচ্ছাচারী 'অন্ধকার' থেকে ব্রিটিশরা বাঙালি হিন্দুদের মুক্ত করে; আর জাতীয়তাবাদীদের উপহাসের পাত্র ব্রিটিশ শাসনকে গণ্য করা হল 'বাঙালি হিন্দুদের প্রতিভা' বিকাশের অনুকূল পরিবেশ হিসেবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সুদূর অতীত বা অদূর ভবিষ্যতে ব্রিটিশ শাসনকে 'মুসলিম শাসনে'র চেয়ে কম ক্ষতিকর বলে গণ্য করা হল। জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চায় ব্রিটিশ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন দেওয়ার পর ভদ্রলোক বাঙালিদের মধ্যে সোচ্চার একটি শাখা জাতীয়তাবাদের মূল স্রোতধারার বাইরে অন্য একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে।[২৭]

রোয়েদাদ ঘোষণার পর পুরানো আদর্শিক ভিন্নতা ও রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে ভদ্রলোকদের মধ্যে সৃষ্ট বিভাজন কিছুটা হলেও গুরুত্ব হারায়। সম্প্রদায়গত রোয়েদাদের বিরুদ্ধে তাদের সম্মিলিত ক্রোধ কংগ্রেসকে শুধু তাদের অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দল ভুলিয়ে দেয়নি, বরং একই প্লাটফর্মে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আমৃত্যু অনুগত থাকতে ও হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগ দিতে তাদেরকে উৎসাহিত করে। 'আসন্ন সংস্কারের প্রেক্ষাপটে বাঙলার হিন্দুদের প্রয়োজন ও দাবি সম্পর্কে আলোচনা'র জন্য আলবার্ট হলে হিন্দু নাগরিকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় কংগ্রেসের শরৎচন্দ্র বসু ও জে এল বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রিটিশের প্রতি প্রচণ্ডভাবে অনুগত ভারতীয় বেসামরিক লোকদের মধ্যে বাঙলার সর্বোচ্চ মর্যাদার কর্মকর্তা বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, হিন্দু মহাসভার ড. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এবং নসিপুরের রাজা বাহাদুর যোগদান করেন।[২৮] 'বেঙ্গল এন্টি-কমিউনাল এ্যাওয়ার্ড মুভমেন্ট' (বেঙ্গল সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ-বিরোধী আন্দোলন) সংগঠনের কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন খ্যাতনামা বাঙালি কংগ্রেস নেতা নলিনাক্ষ সান্যাল, তুলসী চরণ গোস্বামী ও দেবেন্দ্রলাল খান; হিন্দু মহাসভার মধ্যে ছিলেন রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও বি. সি. চট্টোপাধ্যায় এবং এছাড়াও ছিলেন অনেক অনুগত মহারাজা।[২৯]

রোয়েদাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রচারের ক্ষেত্রে অন্য একটা বিষয় ক্রিয়াশীল ছিল – তা হল বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের একক বৈশিষ্ট্য। লর্ড জেটল্যান্ডের কাছে প্রেরিত স্মারকলিপিতে স্বাক্ষরকারীদের সবার পরিচিতি ছিল নিখুঁত ভদ্রলোক হিসেবে। তাঁরা ঐ স্মারকলিপিতে 'বাঙলার সমগ্র হিন্দু সমাজের গভীর হতাশা ও ক্রোধ' এবং 'রোয়েদাদের চরম অবিচারের বিরুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায়ের জাতীয় প্রতিবাদ',[৩০] – জানাতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেননি। সাধারণ 'জাতীয়' স্বার্থের সাথে হিন্দু সম্প্রদায়ের একক দৃষ্টিভঙ্গি রোয়েদাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রচারকে জোরদার করে। বলা হতে থাকে যে, ঐ রোয়েদাদ সামগ্রিকভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এক নিদারুণ আক্রমণ। আবেগপ্রবণ ভাষা ও কল্পনার আশ্রয় নিয়ে এবং আবেদন ও বক্তৃতার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রাণবন্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের এমন এক চিত্র তুলে ধরা হয় যা কিনা বাঙলার গর্ব, অথচ এখন তা ধ্বংসের মুখোমুখি। মহান এই সম্প্রদায়কে রোয়েদাদ সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে বাঙলার অনুন্নত ও ঘৃণাযোগ্য মুসলমানদের অধীনে স্থায়ীভাবে ভূমিদাসে পরিণত করবে, এ কথাও বলা হয়।

অবশ্য ঐ 'সংস্কৃতি' নিয়ে এই যে অত্যুক্তি সেটা বাঙলার ভদ্রলোকদের সংস্কৃতি। ভদ্র সমাজের ধারে-কাছে সাধারণ হিন্দু শ্রেণী ও গোত্রের লোকদের জীবনে ঐ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রায় স্পর্শই করেনি। অথচ সাধারণ ঐ হিন্দু শ্রেণী ও গোত্রের মধ্যে আছে সাঁওতাল, বাগদি ও বাউরি; নিম্ন ও মধ্যবর্তী গোত্র যাদের মধ্যে আছে নমঃশূদ্র, রাজবংশী, মাহিষ্য, সাহা, সাদগোপ ও কৈবর্ত্য – এদের ব্যবহারিক জীবনের সাথে ঐ সংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক নেই; বাস্তবিকপক্ষে এরাই হল বাঙলার হিন্দু জনসংখ্যার বিরাট জনগোষ্ঠী।[৩১] হিন্দু বাঙলাকে সমরূপে দেখানোর চেষ্টায় বাঙলার সত্যিকার বৈচিত্র্যপূর্ণ সহঅবস্থানকারী অথচ প্রতিদ্বন্দ্বী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করা হয়।[৩২] এই ধারণাটিকে ভদ্রলোকেরা নিজেদের ভাবমূর্তি নির্মাণের বেলাতেও ব্যবহার করে। ব্যাপকভাবে প্রচারিত একটা স্মারকলিপির বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়:

> অতিশয় অগ্রণী অংশ (বাঙলার হিন্দুরা) ... ব্রিটিশদের অধীন প্রদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, পেশাগত ও অর্থনৈতিক জীবনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে ... সংখ্যার দিক থেকে কম হওয়া সত্ত্বেও বাঙলার হিন্দুরা সাংস্কৃতিক দিক থেকে স্পষ্টভাবে শ্রেষ্ঠ – শিক্ষিত জনগণের মধ্যে তারা শতকরা ৬৪ ভাগ ... স্বাধীন পেশার ক্ষেত্রেও তাদের আর্থিক প্রাধান্য সমভাবে দৃশ্যমান।[৩৩]

ভদ্রলোকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক জগতের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব ঐ স্মারকে স্বাক্ষর করেন; এদের মধ্যে ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট, দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রসায়নবিদ ড. পি. সি. রায় এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। 'হিন্দু নেতৃবৃন্দের ঘোষণাপত্র' নামে অন্য এক স্মারকলিপিতে ঘোষণা করা হয়:

> শিক্ষাগত যোগ্যতা ও রাজনৈতিক উপযুক্ততায় হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব, নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নে তাদের অবদান এবং রাজ্যের প্রশাসনের প্রতিটি শাখায় অতীতে তাদের সেবার খতিয়ান এত সুবিদিত যে, তা পুনরুক্তি করার প্রয়োজন নেই। শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতে হিন্দু বাঙালিদের সাফল্য সবার চেয়ে বেশি; অথচ বাঙলায় মুসলমান সম্প্রদায় এমন কোনো ব্যক্তিকে সৃষ্টি করতে পারেনি যে ঐসব ক্ষেত্রে সর্ব-ভারতীয় প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে ...।[৩৪]

লর্ড জেটল্যান্ডের কাছে প্রেরিত স্মারকলিপিতে স্বাক্ষরকারীরা একথাও দাবি করে যে, 'বাঙলার হিন্দুরা সংখ্যায় কম হলেও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সামগ্রিকভাবে তারা শ্রেষ্ঠ।'[৩৫] এ কথার ভাবার্থ এই যে, হিন্দুদের 'সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বে'র গুরুত্ব অনুন্নত মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের গুরুত্বের চেয়ে বেশি এবং এ কারণে হিন্দুরা তাদের সংখ্যার চেয়ে অধিক ক্ষমতার দাবিদার। এভাবে হিন্দুদের 'সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বে'র ধারণা তাদের মূল যুক্তি হিসেবে গণ্য হয়, যার মাধ্যমে ভদ্রলোক হিন্দুরা প্রস্তাবিত প্রাদেশিক আইন সভায় তাদের অধিক প্রতিনিধিত্বের দাবিকে সমর্থন করে। পরবর্তী বছরগুলোতে তারা ঐ দাবির সপক্ষে ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। বাঙালি মুসলমানদের 'বুদ্ধিবৃত্তিক পশ্চাৎপদতা'র বিষয়টি একটা কৌশল হিসেবে বিস্তৃতি লাভ করে এবং ঐ ধারণা বাঙলায় হিন্দু সম্প্রদায়গত পরিচিতি বা স্বকীয়তার মধ্যে একটা মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য হয়। এই স্বকীয়তার আরও অগ্রগতি ও রাজনীতিকরণ এবং বাঙলার রাজনীতিতে তার গুরুত্ব সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হবে।

রোয়েদাদ সম্পর্কে মুসলমান রাজনীতিকদের প্রতিক্রিয়া হিন্দু নেতৃবৃন্দের মতো অতটা স্পষ্ট ছিল না। বিশ শতকের শেষ দিকে চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু ও হিন্দু-মুসলিম চুক্তি বাতিল হওয়ার পর অনেক মুসলমান নেতা ও কর্মী কংগ্রেস ত্যাগ করে।[৩৬] অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ছিল তা শিথিল হয়ে পড়ে; দাশের চুক্তি বাতিল করার সাথে জড়িত অপ্রীতিকর ঘটনায় মুসলমান জাতীয়তাবাদীরা মনে আঘাত পায় এবং তারা বুঝতে পারে যে, মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় বেঙ্গল কংগ্রেসকে আর বিশ্বাস করা যায় না। এক সময় 'কংগ্রেসের ব্যাপারে মুসলমানদের একটা উষ্ণ সাধারণ উৎসাহ'[৩৭] ছিল, এখন তাদের ক্রমবর্ধমান একটা অনুভূতি জাগে যে –

> কংগ্রেস একটা হিন্দু সংগঠন ছাড়া আর কিছু নয়। এর কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এটা হল মুসলমানদের ধ্বংস করার হিন্দু মনোবৃত্তির অন্য এক অভিব্যক্তি ... সারা ভারতে হিন্দু কংগ্রেসবাদী, স্বরাজবাদী ও পুনরুজ্জীবনবাদীরা (রিভাইভ্যালিস্ট) ভারত থেকে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তার করেছে তা চরম বিপজ্জনক ... সুতরাং মুসলমানেরা যদি তাদের ধর্ম ও সম্প্রদায়ের জন্য ন্যায্য লড়াই না করে ... কেউ তাদের রক্ষা করতে সমর্থ হবে না।[৩৮]

বেঙ্গল প্রজাস্বত্ব সংশোধনী বিল (বেঙ্গল টিন্যান্সি এ্যামেন্ডমেন্ট বিল) নিয়ে ১৯২৮ সালে আলোচনার সময় কংগ্রেসের ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে যুবক ও অধিকতর

সংস্কারপন্থী (radical) মুসলমানদের মোহমুক্তি ঘটে; এ আলোচনার সময় কংগ্রেস/স্বরাজ্য (Swarajaya) দলের সব শাখা ঐক্যবদ্ধভাবে আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করে – ঐ আইনের উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। তারা দেখতে পায়, 'কংগ্রেস কেবলমাত্র ধনী, ভূমির মালিক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও সংখ্যালঘিষ্ঠ শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের দাবি করতে পারে, শ্রমিক ও কৃষকদের নেতৃত্ব দেওয়ার অধিকার কংগ্রেস এখনও অর্জন করতে পারেনি।'[৩৯]

অধিকাংশ মুসলমান কংগ্রেস ত্যাগ করলেও ১৯৩২ সাল পর্যন্ত তারা কোনো একক দলের আওতায় নিজেদেরকে সংগঠিত করতে পারেনি। পুরানো খেলাফত কমিটি তখন সক্রিয় ছিল না; মুসলমানদের রাজনৈতিক মত প্রচার করার জন্য কোনো বিকল্প ফোরামও তখন গঠিত হয়নি। সামগ্রিকভাবে বাঙালিদের কথা দূরে থাক, বাঙালি মুসলমানের পক্ষে কথা বলার জন্য কোনো একক মুসলমান নেতার কর্তৃত্ব বা সামাজিক প্রতিষ্ঠাও ছিল না। ফলে বাঙালি মুসলমান রাজনীতিকদের কাছ থেকে রোয়েদাদ সম্পর্কে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আসে। প্রত্যেকে লক্ষ করে যে, মুসলমান 'সম্প্রদায়ে'র জন্য ঐ রোয়েদাদে সুস্পষ্ট সুবিধা রয়েছে। তবে কিছু নেতা সম্প্রদায়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করায় দুঃখ প্রকাশ করে। কারণ তারা লক্ষ করে যে, মুসলমান স্বার্থে প্রভাবিত হলেও সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে ঐক্যের সম্ভাবনাকে রোয়েদাদে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। রোয়েদাদে যা দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি দাবি করে অন্য মুসলমানেরা। অনেকে কংগ্রেস ত্যাগ করা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সপক্ষে তাদের আনুগত্য অক্ষুণ্ন রাখে। সম্প্রদায় ভিত্তিতে আইন সভাকে বিভক্ত করায় তারা রোয়েদাদের সমালোচনা করে। পরিমিত সন্তুষ্টি ও ক্রোধের বহিঃপ্রকাশের ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায়, রোয়েদাদ সম্পর্কে তাদের ঐক্য ছিল খুব সামান্য। তবে মুসলিম শাসনের অশরীরী মূর্তির প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু ভদ্রলোকদের প্রচণ্ডতার প্রেক্ষাপটে রোয়েদাদের পক্ষে মুসলমানদের অনুকূল ধারণা ক্রমেই দানা বাঁধতে থাকে।[৪০] প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরপরই বরিশালের উদ্যমী ব্যারিস্টার ফজলুল হক ১৭ই আগস্ট রোয়েদাদের নিন্দা করেন প্রকাশ্যে এবং তা অস্পষ্ট ভাষায় নয়:

> অতি প্রচারিত সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ ... দেশের জন্য অপ্রত্যাশিত চমক ... আমাদের ভাগ্যে এ ধরনের অসঙ্গত দলিল দীর্ঘকাল আসেনি ... ঐ দলিলে যা প্রকাশ পেয়েছে তাতে জাতীয়তাবাদীদের অত্যন্ত মন্দ ধারণাই নিশ্চিত হয়েছে ... ভারতের নতুন শাসনতন্ত্রে যদি ঐ সম্প্রদায়গত বন্দোবস্ত সংযুক্ত করা হয় ... (ম্যাকডোনাল্ড) তাহলে নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, সেটি দশে যা ভালো ও সত্য আছে তা তাকে স্পর্শ করতে, এমনকি এক জোড়া চিমটা বা সাঁড়াশি দিয়েও স্পর্শ করতে অস্বীকার করবে।[৪১]

কিন্তু পরদিনই হক সাহেব সন্দেহজনক অবস্থায় ফিরে গেলেন। অতীতে জাতীয়তাবাদী সংগঠনের সাথে জড়িত ছিল এমন অনেক যুবকের একটি গ্রুপের এক আবেদনপত্রে তিনি তাঁর নাম সংযুক্ত করলেন। ঐ আবেদনপত্রে স্বীকার করা হয়:

মিশ্র অনুভূতি নিয়ে আমরা ঐ রোয়েদাদ পড়েছি। বর্তমান অবস্থায় এটা একটা অগ্রগতি বলে আমরা এর প্রশংসা করি। তবে প্রাদেশিক আইন সভায় বাঙলার মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নাতীত দাবির কথা ঐ রোয়েদাদে স্বীকার করা হয়নি; এটা হতাশাব্যঞ্জক। ছ'টি প্রদেশে মুসলমানদের স্থায়ী সংখ্যালঘিষ্ঠের মর্যাদা এবং বাস্তবে কেন্দ্রীয় আইন সভায় তাদের গুরুত্বহীন রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাঙলার মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিত্বের দাবি শুধু ন্যায্য নয়, যথার্থও বটে। ঐ দাবিকে উপেক্ষা করা উচিত হয়নি। আমরা অবশ্য পরিস্থিতিজনিত সমস্যাকে স্বীকার করি।[৪২]

বাঙলার একটা প্রসিদ্ধ মুসলমান পরিবারের সন্তান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও ঐ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। পূর্বে তিনি ছিলেন স্বদেশী এবং চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁকে একবার কোলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র পদে নিয়োগ দেন। অন্যান্য অনেক বিষয়ে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও হক ও সোহরাওয়ার্দী রোয়েদাদের ব্যাপারে একই লক্ষ্যে তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। অন্য স্বাক্ষরকারীরা হলেন আবুল কাশেম, আজিজুল হক, তমিজউদ্দিন খান ও মোশাররফ হোসেন – এঁরা সবাই ছিলেন বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শিবিরের সাথে সংশ্লিষ্ট।

অপর দিকে এ. কে. গজনবী রোয়েদাদের ব্যাপারে তাঁর হতাশার কথা ব্যক্ত করতে কোনো ভান করেননি। তিনি ছিলেন টাঙ্গাইলের একজন সম্পদশালী জমিদার, বেঙ্গল মন্ত্রিসভায় তিনি দু'বার মন্ত্রী ছিলেন এবং তিনি সাইমন কমিশনেরও একজন সদস্য ছিলেন। তিনি দৃশ্যত আশা করেছিলেন যে, রোয়েদাদে মুসলমানদের পরিষ্কারভাবে বিধিবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেওয়া হবে। ১৯১১ সালে বঙ্গ বিভাগ রদ করার সাথে রোয়েদাদের তুলনা করে তিনি বলেন যে, এই রোয়েদাদ বাঙলার মুসলমানদের '১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে সম্রাটের সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার কথা তিক্ততার সাথে স্মরণ করিয়ে দেয়।'[৪৩]

যাহোক, মুসলমানদের মতামত বিভক্ত হওয়ার জন্য বিধিবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিশ্চয়তার বিষয়টিই একমাত্র কারণ ছিল না। অনেক মুসলমান রাজনীতিবিদ 'অপরিহার্য অনিষ্টকর' হওয়া সত্ত্বেও পৃথক নির্বাচনকে গ্রহণ করে।[৪৪] অনেকে অবশ্য সাধারণ বা যৌথ নির্বাচনকেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। ১৯৩২ সালের আগস্ট মাসের প্রথম দিকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বি. পি. সিংহ রায় যৌথ নির্বাচনের প্রস্তাবসহ কাউন্সিলে একটা বিল উত্থাপন করেন – ঐ বিলে পৌরসভায় কোনো সংরক্ষিত আসনের প্রস্তাব ছিল না। ঐ প্রস্তাবে বেশ কয়েকজন মুসলমান সদস্য তাঁকে সমর্থন করেন। উদাহরণ হিসেবে আবদুস সামাদের কথা বলা যায়। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেন: 'স্থানীয় সংস্থার অভিজ্ঞতা থেকে আমার ধারণা হয়েছে যে, আসন সংরক্ষণ ছাড়াই যৌথ নির্বাচন পদ্ধতিতে আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যায় জিতিয়ে আনতে সক্ষম হব।'[৪৫] অন্য এক মুসলমান কাউন্সিলর ব্যাখ্যা করে বলেন:

ফেনী মহকুমায় ৩৭টি ইউনিয়ন বোর্ড আছে, এর সব ক'টির প্রেসিডেন্ট মুসলমান। ফেনী স্থানীয় বোর্ডের ৮ জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ৭ জনই মুসলমান, আর এক জন

হিন্দু। ধরুন, ৪৮টি আসন বা শতকরা হিসেবে কিছু আসন মুসলমানদের জন্য বরাদ্দ করা হল, তাতে অবস্থা কী দাঁড়াবে? আমরা এখন এসব বোর্ডে যেভাবে প্রধান্য বিস্তার করে আছি, তখন কি সেভাবে পারব?[৪৬]

ফজলুল হকসহ একাধিক মুসলমান কাউন্সিলর সিংহ রায়ের প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানান। আট জন মুসলমান কাউন্সিলর বিলের পক্ষে ভোট দেন এবং বিপক্ষে ভোট দেন কুড়ি জন। কিন্তু জনাব সামাদ ব্যাখ্যা করে বলেন যে, বিলের বিরোধিতাকারী কুড়ি জনের মধ্যে 'কমপক্ষে বারো জন ... কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন – ঐসব শর্তের মধ্যে ছিল পূর্ণ বয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকার পদ্ধতি চালু এবং বিশেষ স্বার্থের জন্য প্রতিনিধিত্ব বাতিলকরণ। এতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যৌথ নির্বাচনের সপক্ষে মুসলমান সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন হয়েছে।'[৪৭]

পৃথক নির্বাচন নিয়ে মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যকার বিতর্কে ক্রমবর্ধমানভাবে তাদের এই আস্থা প্রতিফলিত হয় যে, উন্মুক্ত নির্বাচনে মুসলমানেরা তাদের নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে পারবে। এই আস্থার ভিত্তি দৃঢ় হোক বা না হোক, তা প্রসারিত হয় মফস্বল থেকে; পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলায় স্থানীয় ও জেলা বোর্ডগুলোতে হিন্দু ভদ্রলোকদের প্রাধান্যকে মুসলমানেরা চ্যালেঞ্জ দিতে শুরু করে। ১৯১৯ সালের বেঙ্গল গ্রাম স্বায়ত্তশাসিত আইন (বেঙ্গল ভিলেজ সেল্ফ-গভর্নমেন্ট এ্যাক্ট) স্থানীয় অনেক লোকের ভোটাধিকারকে সীমাবদ্ধ করে। এসব স্থানীয় নির্বাচনে ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় –

একুশ বছর বয়স্ক পুরুষ যার ইউনিয়নের মধ্যে বাড়ি আছে এবং ঐ ইউনিয়নে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে জমি থাকার জন্য যে নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বের বছরে সেস (cess) হিসেবে কমপক্ষে আট আনা (বা বিকল্পরূপে ছ'আনা চৌকিদারি ট্যাক্স) প্রদান করেছে ... (বা) সে একজন গ্রাজুয়েট বা যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপ্রাপ্ত বা কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করেছে ... (এবং) উকিল ও চিকিৎসকগণ।[৪৮]

অন্য কথায়, ঐ আইনে তাদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয় যাদের কিছু সম্পত্তি বা শিক্ষা ছিল। স্থানীয় সংস্থার মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে অনেক ভাষ্যকার মফস্বলের মুসলমানদের 'সম্প্রদায়গত সচেতনতা'[৪৯] হিসেবে আখ্যায়িত করলেও প্রকৃত সত্য এই যে, বিভিন্ন জেলায় অধিক সংখ্যক মুসলমান ভোটাধিকার লাভ করে তাদের প্রয়োজনীয় জমি ও শিক্ষা থাকায়।[৫০] স্থানীয় পর্যায়ে এসব অগ্রগতি মুসলমান রাজনীতিবিদদের এ কথা বিশ্বাস করতে উৎসাহ যোগায় যে, আইন সভায় মুসলমান প্রতিনিধিত্বকে নিশ্চিত করার জন্য পৃথক নির্বাচন ও আসন সংরক্ষণের প্রয়োজন আর নেই। অপর পক্ষে তারা আস্থাশীল ছিল যে, মুসলমানেরা উন্মুক্ত নির্বাচনে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পারবে; যৌথ নির্বাচনের মাধ্যমেও তারা পরিশেষে প্রাদেশিক ক্ষমতা দখল করার জন্য তাদের সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি ও সংখ্যাধিক্যের গুরুত্বকে কাজে লাগাতে পারবে। এ কারণে অনেকে ঐসব রক্ষাকবচ ত্যাগ করতে ইচ্ছুক ছিল; এর পরিবর্তে তারা দাবি করে সার্বজনীন পূর্ণ বয়স্কের ভোটাধিকার

– যা তাদের সম্প্রদায়ের অনেককে ভোটের অধিকার প্রদান করবে। এ জন্য অনেক মুসলমান নেতা সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ থেকে 'সুবিধা' প্রাপ্তির সম্ভাবনার ব্যাপারে উদাসীন ছিল।

হিন্দু নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে ক্রমাগতভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে রোয়েদাদকে পরিবর্তন করার হুমকির প্রেক্ষিতে মুসলমান নেতারা এর সমর্থনে সংঘবদ্ধ হয়। কয়েক মাস পূর্বে রোয়েদাদকে বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত হিসেবে বর্ণনাকারী এ. কে. গজনবী ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক সভায় সভাপতিত্ব করেন। ঐ সভায় সম্প্রদায়গত বন্দোবস্তের ব্যবস্থাকে পুনরায় উন্মুক্ত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয় – তারা মনে করে এটা হবে 'অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং মুসলমান সম্প্রদায় ও সার্বিকভাবে দেশের জন্য মারাত্মক বিপজ্জনক'।[৫১] হক সাহেব সন্দেহপূর্ণ ও সতর্কভাবে রোয়েদাদ সমর্থন করেন এবং তাতে স্বাক্ষরকারী আবুল কাশেম এক মাস পর হাওড়া টাউন হলে মুসলমানদের এক সভায় সভাপতিত্ব করেন। ঐ সভায় রোয়েদাদের ওপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জোরালোভাবে প্রতিবাদ জানানো হয়।[৫২] পরবর্তী কয়েক বছরে রোয়েদাদের বিরুদ্ধে ভদ্রলোকদের বিরোধিতা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয় এবং 'মুসলিম শাসনে'র সম্ভাবনায় হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া প্রচণ্ডতায় রূপ লাভ করে। এর ফলে রোয়েদাদের পক্ষে মুসলমানদের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি আরও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। রোয়েদাদ ঘোষণার এক বছরের চেয়ে কিছু বেশি সময় পর ফজলুল হক ঘোষণা করতে উৎসাহিত হন: 'আমি যদি কোনো বিচারককে সন্তুষ্টির জন্য এ কথা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হই যে, বাঙলার হিন্দুরা গভীর স্বার্থপরতার ওপর ভিত্তিশীল সাম্প্রদায়িকতার প্রতিরূপ, তাহলে আমি ফাঁসিতে ঝুলতে প্রস্তুত আছি।'[৫৩] এভাবে ক্রমাগতভাবে রোয়েদাদ সম্পর্কে বিভক্তিমূলক প্রতিক্রিয়া আসতে থাকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে – হিন্দুরা একই সুরে এর বিরোধিতা করে, আর মুসলমানেরা এর সমর্থনে ক্রমবর্ধমানভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। এভাবে রোয়েদাদ হয়ে পড়ে বিভক্তি ও বিবাদের কেন্দ্রবিন্দু এবং তা হিন্দু ও মুসলমান রাজনীতিকদের বিভেদের মধ্যে একটা 'গোঁজ' হিসেবে কাজ করে। ঐ রোয়েদাদ বাঙলার রাজনীতিকে ক্রমবর্ধমানভাবে দুই পৃথক সম্প্রদায়গত গ্রুপে বিভক্ত করে দেয় – ঐ দুই গ্রুপ ছিল একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

পুনা চুক্তি

রোয়েদাদ নিয়ে উগ্র উন্মাদনা চলার সময় ঐ বিতর্কে আর একটা নতুন মাত্রা যোগ হয় – তা হল পুনা চুক্তি স্বাক্ষর। তফশিলি সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী সৃষ্টিতে গান্ধীর অস্বীকৃতির পরিণাম হল ঐ চুক্তির ভিত্তি।[৫৪] গান্ধী এই মত পোষণ করেন যে, অস্পৃশ্যতা হল ধর্মীয় বিষয় – রাজনৈতিক নয়। ধর্মীয় সংস্কারের মাধ্যমে হিন্দু সমাজই কেবল এ সমস্যার সমাধান করতে পারে।[৫৫] ১৯৩১ সালে গোল টেবিল বৈঠকে তফশিলি সম্প্রদায়ের জন্য প্রথম যখন স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর বিষয়টি আলোচনার জন্য উপস্থাপন করা হয় তখন গান্ধী এই

হুমকি দিয়ে আপত্তি তোলেন বলে জানা যায়: 'আমার যতটা আধিপত্য আছে ততটা গুরুত্ব দিয়ে বলছি যে, একমাত্র আমি যদি একাই এই বিষয়টির প্রতিরোধ করি তাহলে আমি আমার জীবন দিয়ে তা প্রতিরোধ করব।'[৫৬] এই হুমকি উপেক্ষা করা হয় এবং তফশিলি সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর বিধান রোয়েদাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৩২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর গান্ধী রোয়েদাদের এই বিষয়টির বিরুদ্ধে 'আমরণ অনশন' শুরু করেন।

বর্ণ প্রথা ও অস্পৃশ্যতার প্রশ্নে গান্ধীর ধারণা তফশিলি সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে ক্রমবর্ধমান স্পষ্টবাদী রাজনীতিকদের দৃঢ় বিশ্বাসের বিপরীত ছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ঐসব রাজনীতিক এই বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করে যে, তফশিলি সম্প্রদায় হিন্দু সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু-প্রভাবিত রাজনৈতিক সম্প্রদায়ে একীভূত হওয়ার বিরুদ্ধেও তারা চ্যালেঞ্জ প্রদান করে।[৫৭] এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন বোম্বাই প্রেসিডেন্সি থেকে মহার (Mahar) নেতা বি. আর. আম্বেদকার। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ধর্ম ও রাজনীতির বিষয়ে হিন্দু পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরই কেবল নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা তাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারবে। তিনি যুক্তি দেখান যে:

> 'হিন্দু ও মুসলমান, হিন্দু ও শিখ এবং হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের মধ্যকার মনোমালিন্য হিন্দু ও অস্পৃশ্যদের মধ্যকার মনোমালিন্যের সাথে তুলনীয় নয়। এই মনোমালিন্য ব্যাপক ও গভীর। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যকার মনোমালিন্য ধর্মীয় – সামাজিক নয়। আর হিন্দু ও অস্পৃশ্যদের মনোমালিন্য ধর্মীয় ও সামাজিক ... ক্ষমতা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের কাছে হস্তান্তরিত হতে যাচ্ছে সেহেতু তাদের কিছুটা হলেও রাজনৈতিক রক্ষাকবচ থাকতে হবে – মুসলমান ও অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য যেসব সুবিধা দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে উত্তম না হলেও কিছুটা সুবিধা দিতে হবে।'[৫৮]

গান্ধীর 'জেদাজেদি'র বিরুদ্ধে আম্বেদকার কিছুদিন নিজের অবস্থানে স্থির থাকলেন। কিন্তু মহাত্মা তাঁর আমরণ অনশন অব্যাহত রাখলে তিনি নরম হলেন এবং সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। ঐ চুক্তি 'পুনা চুক্তি' হিসেবে পরিচিত।[৫৯] প্রবীণ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাথে এম. সি. রাজার নেতৃত্বে অন্য গ্রুপের তফশিলি সম্প্রদায়ের নেতাদের সমঝোতার প্রেক্ষিতে ঐ চুক্তি কার্যকর হয়। এম. সি. রাজা মনে করেন যে, 'সংখ্যালঘু চুক্তির অন্যান্য স্বাক্ষরকারীরা তাঁর সম্প্রদায়কে পথে বসিয়েছে এবং এখন তাঁর সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংরক্ষিত আসনসহ যৌথ নির্বাচনে যাওয়া উচিত।'[৬০] ঐ চুক্তি স্বাক্ষরকারীরা তফশিলি সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের জন্য হিন্দু আসনের কিছু অংশ সংরক্ষণ করতে সম্মত হয়। ঐসব আসনে নির্বাচন হবে যৌথ নির্বাচনের ভিত্তিতে – সব হিন্দু ও তফশিলি সম্প্রদায়ের লোক ভোটের অধিকারী এবং যৌথভাবে তারা নির্বাচিত করবে বর্ণ হিন্দু ও তফশিলি সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের। বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রদেশে হিন্দু আসনের ভাগ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। বাঙলায় মোট আশিটি হিন্দু আসনের মধ্যে ত্রিশটি আসন তফশিলি সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত হয়। চুক্তিটি যখন স্বাক্ষরিত হয় তখন কোনো বাঙালি বর্ণ হিন্দু সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

ঐ চুক্তির ফলে বাঙলায় বর্ণ হিন্দুদের আনুপাতিক আসন সংখ্যা অনেক কমে আসে – প্রস্তাবিত আইন সভায় তাদের আসন সংখ্যা শতকরা প্রায় ৩২ ভাগ থেকে কমে ঠিক ২০ ভাগ হয়। ভদ্রলোক হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া অবিশ্বাস, উত্তেজনা ও ক্রোধে পরিণত হয়। কাউন্সিলে এন. সি. সেনগুপ্ত ঐ চুক্তিকে চিহ্নিত করেন 'রাজনৈতিক মূর্খতার কীর্তিস্তম্ভ' বলে; জে. এল. বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ণনা করেন, ঐ চুক্তিতে 'বাঙালিদের ওপর অন্যায় ও অস্বাভাবিক অবিচার' করা হয়েছে। চুক্তির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে তাঁরা যুক্তি দেখান যে, বাঙলার বর্ণ হিন্দুদের ওপর তা বাধ্যতামূলক নয়, কারণ তাঁরা ঐ ব্যবস্থার পক্ষভুক্ত ছিলেন না। তাঁরা ঘোষণা করেন যে, বাঙলার ক্ষেত্রে ঐ চুক্তি বিশেষভাবে অবৈধ। কারণ, তাঁরা বলেন, বাঙলায় অস্পৃশ্যতার অস্তিত্ব নেই। নিম্ন শ্রেণীর লোকদের জন্য আসন যদি সংরক্ষিত করতেই হয় তাহলে তার সংখ্যা চার-এর বেশি হওয়া উচিত নয়। কারণ, তাঁরা ঘোষণা করেন, ঐ প্রদেশে অস্পৃশ্য লোকের সংখ্যা বড়জোর চার লক্ষ। সংক্ষেপে বলা যায়, তাঁরা চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেন 'প্রধানমন্ত্রীর রোয়েদাদ অপেক্ষা অনেক বেশি খারাপ' বলে।[৬১]

ভদ্রলোক হিন্দুদের কাছে সম্প্রদায়গত রোয়েদাদের চেয়ে ঐ চুক্তি বড় ধরনের হুমকি হিসেবে দেখা দেয়। প্রস্তাবিত আইন সভায় উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে কমে আসে। এটা একটা বড় ধরনের হুমকি হলেও এটাই সব কিছু ছিল না। ঐ চুক্তিতে চ্যালেঞ্জ করা হয় 'হিন্দু' পরিচিতিকে – ঐ পরিচিতি ভদ্রলোক রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত হতে শুরু করে। চুক্তি অনুযায়ী বাঙলার হিন্দুদের মধ্যে যদি প্রায় অর্ধেকও 'অনুন্নত সম্প্রদায়' হয়, আর তাদের সদস্যরা অস্পৃশ্য না হলেও অন্তত 'সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে অনুন্নত'।[৬২] শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ঐক্যবদ্ধ এক হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের দাবিদার ভদ্রলোকদের দাবি যে কতটা শূন্যগর্ভ তা ঐ বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।[৬৩]

বাঙালি হিন্দু রাজনীতিকেরা ঐ চুক্তির প্রতিক্রিয়ায় বলে যে, বাঙলায় 'বর্ণ সমস্যা' নেই। তাদের ঐ দাবির কিছুটা যৌক্তিক ভিত্তি ছিল। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে সেন্সাস কমিশনার উল্লেখ করেন যে, 'ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় বর্ণ প্রথার বিষয়ে বাঙলার অবস্থান কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় আছে; কারণ এখনকার বর্ণ প্রথা ততটা উগ্র নয়।'[৬৪] তবু কমিশনারের নিজস্ব মূল্যায়নে দেখা যায়, ব্রিটিশ বাঙলায় ৬০ লাখের বেশি লোককে অস্পৃশ্য হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। ডোম, ভুঁইমালি, হাঁড়ি ও কেউরাসহ ঝাড়ুদার ও মেথর ছাড়া তিনি কমপক্ষে অন্য ৪০টি শ্রেণীর নাম তালিকাভুক্ত করেন – 'এদের সংস্পর্শে আসলে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের পবিত্র হওয়ার প্রয়োজন হয়'। ঐ তালিকায় পেশাগত শ্রেণী আছে, যেমন চামার ও মুচি – এরা বংশ পরম্পরায় চামড়া পাকা করার কাজে নিয়োজিত এবং চামড়া শ্রমিকের কাজ করে। 'সুঁড়ি'রা জড়িত মদ ব্যবসায়ের সাথে এবং পাটনি ও তিয়াররা জড়িত মাঝি ও জেলে পেশার সাথে – 'এদের সবার ছিল শ্রেণীগত স্বীকৃত পেশা এবং তাদের পেশাকে হিন্দু সমাজ ঘৃণার চোখে দেখত।' ঐ তালিকার মধ্যে ছিল আদিম

আদিবাসী গোষ্ঠী, যেমন, পশ্চিম বাঙলার বাগদি ও বাউরি এবং ময়মনসিংহের দালু, হাদি ও হাজং। এসব 'অস্পৃশ্য' গ্রুপ ছাড়াও সেন্সাস কমিশনার আঠারোটি আদিম উপজাতি এবং অন্য আরও চল্লিশটি শ্রেণীর নাম তালিকাভুক্ত করেন – পেশাগতভাবে অস্পৃশ্য না হলেও তাদের অনুন্নত শ্রেণী বলে গণ্য করা হয়।[৬৫] 'তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অবস্থা এমন যে, ভোটাধিকার বিষয়ে তাদের বিশেষ কোনো সুবিধা দেওয়া না হলে তারা তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারবে না বা তারা তাদের স্বার্থ ঠিকভাবে রক্ষা করতে পারবে না।'[৬৬] এরা হল ছোটলোক; এরা ভদ্রলোকদের জমিতে ও বাসাবাড়িতে কাজ করে,[৬৭] কিন্তু তারা বসবাস করে ভদ্র সমাজের গণ্ডির বাইরে। বাঙলার ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো রোয়েদাদ ও পুনা চুক্তিতে আভাস দেওয়া হয় যে, এতদিন ধরে ভদ্রলোক গ্রুপ দ্বারা প্রভাবিত সাংগঠনিক রাজনীতির আবদ্ধ গণ্ডিকে ছোটলোকদের অন্তর্ভুক্তির জন্য উন্মুক্ত করা যেতে পারে।

সারণি ২ : গ্রামীণ বাঙলায় শ্রেণী ও অর্থনৈতিক পার্থক্য

	উচ্চ শ্রেণী	নবশক*	মুসলমান	হরিজন	সাঁওতাল
শিক্ষিত (শতকরা হিসাব)	৫০	৩৩	১৮	৪	৩
ভূমিহীন পরিবার (শতকরা হিসাব)	১৮	১৩	২৫	৮৭	৯২
গড় সম্পদ (টাকার হিসেবে)	২৮২৩	১৫২৮	১০৮৩	৭৩	৭৬
ভূমির গড় মূল্য (টাকার হিসেবে)	২২২০	১৩৪০	১০৯৮	৩৮	৩৯
গড় বার্ষিক আয় (টাকার হিসেবে)	৪৩৬	২৩৬	১৭২	৮৪	৭৬

* মধ্যবর্তী শ্রেণীর নাম দেওয়া হয় নবশক – প্রথমে এর সংখ্যা ছিল নয়। কোনরকম আনুষ্ঠানিক পবিত্রকরণ ছাড়াই উচ্চ শ্রেণীর লোক তাদের কাছ থেকে পানি পান করতে পারে।

সূত্র: *সামারি টেবল ফর ভিলেজ ইকনমিক সার্ভেজ*, হাশিম আমীর আলী, রুরাল রিসার্চ ইন টেগরস্ শ্রীনিকেতন, *মডার্ন রিভিউ*, খণ্ড ৫৬, ১–১৬, জুলাই–ডিসেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ৪২–৪৩।

অবশ্য ভোটাধিকারের যোগ্যতা নির্দিষ্ট করে দেওয়ায় নতুন ব্যবস্থাপনার প্রভাব পড়ে সীমাবদ্ধভাবে, যাদের সম্পত্তি আছে তারাই কেবল ভোটাধিকার লাভ করে। নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে খুব কম লোকেরই ভোটাধিকারের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছিল। ১৯৩০ সালে গ্রামের ওপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায় যে, 'সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত গ্রুপিং, শ্রেণী ও ধর্ম অনুসারে সামাজিক গ্রুপিং-এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।' বীরভূমের তিনটি ক্ষুদ্র সাঁওতাল বস্তি ও পাঁচ ধরনের পাঁচটি গ্রামের ৪৪৭টি পরিবারের ওপর এক জরিপের তথ্য নিয়ে রিপোর্ট করতে গিয়ে হাশিম আমীর আলী উল্লেখ করেন:

'আমরা যখন লক্ষ করি কোনো নির্দিষ্ট পরিবার কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং তালিকাভুক্ত করি ঐ শ্রেণীটি হিন্দু সমাজের উচ্চ, মধ্য বা নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বা

> তারা মুসলমান না সাঁওতাল, তখন আমরা নিশ্চিতভাবে উল্লেখ করি ঐ পরিবারটি অর্থনৈতিক স্তরের কোন শ্রেণীতে পড়তে পারে ... মধ্য শ্রেণীর হিন্দুদের চেয়ে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের অর্থনৈতিক স্তর অনেক ওপরে। স্তর অনুযায়ী মুসলমানদের অবস্থান তৃতীয় স্তরে ... আর হাদি, ডোম ও মুচির মতো নিম্ন শ্রেণীর অবস্থান অনেক নিচে এবং সাঁওতালদের অর্থনৈতিক অবস্থান তাদের চেয়েও নিচে (সারণি ২)।[৬৮]

এই সাধারণ নমুনার মধ্যে অবশ্য ব্যতিক্রম ছিল। অনেক নিম্ন শ্রেণীর লোক কয়েক দশকের মধ্যে তাদের আর্থিক অবস্থান ও ধর্মীয় মর্যাদার উন্নয়ন ঘটায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পূর্ব ও মধ্য বাঙলার নমঃশূদ্র এবং উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলার রাজবংশীরা। উভয় গ্রুপের লোকেরা উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের উর্বর ভূমিতে পাট চাষকে তাদের উন্নতির হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে এবং এতে তারা সফল হয়। ১৯৩১ সালের আদমশুমারিতে নমঃশূদ্ররা ব্রাহ্মণের মর্যাদা দাবি করে, আর ১৯১১ সাল থেকে রাজবংশীরা দাবি করতে থাকে যে, তাদেরকে ক্ষত্রিয় হিসেবে গণ্য করা হোক। স্থানীয় রাজনীতিতে এই উভয় শ্রেণীর লোকদের উপস্থিতি অনুভূত হয়। রাজবংশীরা '১৯১৯ সালের সংস্কার আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে আসতে সক্ষম হয় ... আর ১৯২৩ সালের পর প্রত্যেকটি নির্বাচনে রংপুরের দু'টি হিন্দু আসনে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু প্রার্থীদের পরাজিত করে রাজবংশীরা জয়ী হয়। স্থানীয় বোর্ডের নির্বাচনেও তারা নির্বাচিত হতে থাকে।'[৬৯]

এই দুটো গ্রুপের মতো অন্য গ্রুপের লোকেরাও পুনা চুক্তি ও রোয়েদাদের সুযোগ নিয়ে প্রাদেশিক রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থানকে উন্নত করার চেষ্টা করে – এই সম্ভাবনাকে ভদ্রলোক রাজনীতিকেরা স্বাগত জানায়নি। নমঃশূদ্র ও রাজবংশী শ্রেণীর সমিতিগুলো জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মূল স্রোতধারা থেকে দূরে অবস্থান করে। তারা মনে করে যে, অনুগত ভূমিকায় তারা অধিক লাভবান হবে। ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত অল-বেঙ্গল নমঃশূদ্র সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে রায় সাহেব রেবতীমোহন সরকার (লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য) গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, 'ব্রিটিশ সরকার ছাড়া তাঁর সম্প্রদায় (নমঃশূদ্র) তাদের মর্যাদা ফিরে পাওয়ার সুযোগ পেত না এবং এ জন্য বর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনে (সায়মন কমিশনের বিরুদ্ধে) তাঁর সম্প্রদায়ের যোগ দেওয়া উচিত নয়, কারণ তা হবে তাদের জন্য আত্মঘাতী।' রায় সাহেবের ঐ বক্তৃতার কড়া সমালোচনা করে জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী *অমৃত বাজার পত্রিকা* : 'আমরা জানি যে, ব্রিটিশ সরকার ছাড়া 'রেবতী বাবু' নিজের নামের সাথে 'রায় সাহেব' জুড়ে দিতে পারতেন না। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার নমঃশূদ্রদের 'ক্ষমতা'য় বসাতে সাহায্য করেছে, এ বিষয়টা আমরা বুঝতে পারছি না।'[৭০] ঐ একই দিনের পত্রিকায় এক রিপোর্টে বলা হয়, ২৮ এবং ২৯শে ডিসেম্বর (১৯২৭) ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত নমঃশূদ্র সম্মেলনে সম্রাটের প্রতি নমঃশূদ্রদের আনুগত্য ঘোষণার প্রস্তাব পাস হয়। নিম্ন শ্রেণীর লোকদের উদীয়মান শ্রেণীভিত্তিক সমিতিগুলোর কার্যকলাপ সম্পর্কে ভদ্রলোকদের সংবাদপত্রে যে শত্রুতার মনোভাব ও

সন্দেহ প্রকাশ পায় তাতে তাদের এই উদ্বিগ্নতার কথা মনে করিয়ে দেয় যে, নিম্ন শ্রেণীর নেতারা হয়ত মুসলমান নেতাদের অনুসৃত 'সংখ্যালঘিষ্ঠ' বা বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির ধারা অনুসরণ করতে পারে। একটা গ্রামীণ সংঘর্ষের ঘটনা তাদেরকে আরও গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে। ঐ ঘটনায় হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাথে নমঃশূদ্র ভাগচাষীরাও যোগ দেয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়, ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যশোরের মুসলমান ও নমঃশূদ্র বর্গাদারেরা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে ধর্মঘট পালন করে – অধিকতর ভালো পারিশ্রমিক না পেলে তারা ঐসব জমিদারের জমি চাষ করতে অস্বীকার করে।[৭১] এটা অবশ্য স্পষ্ট ছিল না যে, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের সাথে যৌথ নির্বাচনের মাধ্যমে আইন সভায় নির্বাচিত হলে নমঃশূদ্র ও রাজবংশী প্রতিনিধিরা তাদের 'হিন্দু' ভাইদের 'হুইপ' মেনে নেবে কি না।

অন্য দিকে ভদ্রলোক জাতীয়তাবাদীরা সামান্য সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং নীচু শ্রেণী ও আদিম গোত্রের অধিবাসীদেরকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা সফল হয়। তারা অসহযোগ আন্দোলনের সময় বেসরকারি ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান মেদিনীপুর জমিদারি কোম্পানির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করার জন্য মেদিনীপুর 'জঙ্গল মহালে'র সাঁওতালদের উৎসাহিত করে।[৭২] অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত হওয়ার পর আরামবাগের আশেপাশের গান্ধীবাদীরা বিভিন্ন গ্রামের স্থানীয় খাদি কেন্দ্রে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলন শুরু করে।[৭৩] কয়েক বছর পর বেশ কিছু সংখ্যক স্বরাজী আদিম উপজাতি ও অস্পৃশ্যদের আনুষ্ঠানিক পবিত্রকরণ বা শুদ্ধির মাধ্যমে হিন্দু পতাকাতলে 'ফিরিয়ে' আনার· শুরু করে।[৭৪] কিন্তু বর্ণ প্রথার বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে নতুন কিছু অর্জিত হতে পারেনি। গ্রামীণ বাঙলার বিভিন্ন আশ্রমে প্রচলিত অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী খ্যাতনামা গান্ধীবাদী সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তও বর্ণ প্রথার পক্ষে যুক্তি দেখান যে, বর্ণ প্রথার প্রাচীন পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। তিনি বলেন যে, অস্পৃশ্য ও নীচু শ্রেণীর লোকদের ঘৃণা করা বর্ণাশ্রম ধর্মের বৈশিষ্ট্য ছিল না,[৭৫] বরং তা ছিল ঐ পদ্ধতির বিকৃতি এবং মুসলিম আক্রমণের পরই তা হিন্দু মতবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়।[৭৬] তবে, দাশগুপ্ত খুব অল্প সংখ্যক লোকের কাছেই তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন। ত্রিশ দশকের প্রথম দিকে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছাড়া বাঙলার উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা বর্ণভিত্তিক সমাজের পুরোহিততন্ত্রের কাঠামোকে অক্ষুণ্ন রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। উপমহাদেশের অন্য কোনো অংশের লোকদের চেয়ে তাঁরা এ ব্যাপারে কম রক্ষণশীল ছিলেন – এ ধরনের দৃষ্টান্ত প্রায় নেই। বরং ১৯৩৩ সালে কেন্দ্রীয় আইন সভায় এম. সি. রাজা অস্পৃশ্যতা বিলোপ বিল (Untouchability Abolition Bill) উত্থাপন করলে বাঙলার প্রত্যেক হিন্দু সদস্য ঐ বিলের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। পণ্ডিত সত্যেন্দ্রনাথ সেন মনে করেন যে, '... বৈবাহিক বিধানের গুরুতর লংঘনই হল অস্পৃশ্যদের উৎপত্তির মূল বৈশিষ্ট্য ... (এবং) তাদের পেশা, তাদের আচার-আচরণ ও তাদের সংস্কৃতির জন্য তারা কখনও বর্ণ হিন্দুদের সমপর্যায়ে আসতে পারে না।' অমরনাথ

দত্ত ঘোষণা করেন: 'এই লোকগুলো আগে অধিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোক, অধিক পবিত্র হোক এবং জীবনের উত্তম আদর্শ লালন করুক এবং ... তখন আমি তাদের সাথে মেলামেশা করব।'[৭৭] বাঙলার প্রতিনিধিত্বকারী ল মেম্বার বি. এল. মিত্র যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, যেহেতু 'কোনো সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ বর্ণপ্রথা প্রতিষ্ঠিত করেন নি ... সেহেতু আইনগত হস্তক্ষেপের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।' বি. পি. সিংহ রায় বিলকে প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তা 'হিন্দুদের ধর্মীয় অধিকারের ওপর সরাসরি অনধিকার প্রবেশ এবং হিন্দু সমাজের ভিত্তিকে অবমূল্যায়ন করার প্রয়াস।' এ ধরনের প্রতিক্রিয়ায় এম. সি. রাজা শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য করেন: 'এটা বিস্ময়কর ... বিরোধী দলের অধিকাংশ সদস্য বাঙলা প্রদেশের এবং তাঁরা বলেন যে, সেখানে কোনো অস্পৃশ্যতা নেই।'[৭৮] জনমত যাচাইয়ের জন্য পরে ঐ বিল প্রদেশের বিভিন্ন সংগঠনের কাছে পাঠানো হয়। বাঙলার গভর্নর ঐ বিষয়ে সব বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা জজ, ছয় জন বিচারক, 'বিভিন্ন মতবাদের প্রতিনিধিত্বকারী বাঙলার সুপরিচিত ও খ্যাতনামা' ৫৬ জন ব্যক্তিত্ব, ১৩টি বার লাইব্রেরি এবং ২৬টি স্বীকৃত সমিতি ও ধর্মীয় সংগঠনের লোকদের সাথে আলোচনা করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বাঙলায় 'ঐ বিলের বিরুদ্ধে জনমত বিস্ময়করভাবে অধিক প্রবল'।[৭৯]

পবিত্রতা, শুদ্ধতা, ও পুরোহিততন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি বাঙালি সমাজে খুব গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত বলে প্রতিভাত হয়।[৮০] এ সময় বিভিন্ন গ্রামের ওপর গবেষণা করে দেখা যায় যে, গ্রামে বর্ণ বৈষম্যকে অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করা হত। বীরভূমের গোয়ালপাড়া গ্রামের বর্ণ বৈষম্য সম্পর্কে একজন লেখক তাঁর এক গবেষণায় এ ধরনের ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। ঐ গ্রামে উপস্থিত হওয়ার পর তাঁকে দু'জন ভৃত্য রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়:

> 'একজন আমার জন্য পানি নিয়ে আসবে এবং অন্য 'অস্পৃশ্য' ভৃত্যটি দাসোচিত কাজ করবে। যাদের হাত থেকে আমি পানি পান করতে পারব তারা দাসোচিত লোকের চেয়ে অনেক উচ্চ স্তরের – দাসোচিত কাজ করে কেবলমাত্র 'অনুন্নত' সম্প্রদায়ের লোকেরা ... কিন্তু আমি ... বললাম, 'আমাদের বিশ্বভারতীর লোকদের কোনো জাত নেই ... স্পর্শযোগ্য বা অস্পৃশ্য যে কোনো একজন হলেই চলবে।' কিন্তু (আমার বন্ধু) বললেন: 'সেটা আসল কথা নয়। প্রায় সব গ্রামেব কূয়ায় অস্পৃশ্যকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় না ... এবং দ্বিতীয়ত, আপনি যদি অস্পৃশ্য লোকের হাতে পানি পান করেন তাহলে গ্রামের লোকেরা আপনাকে গ্রহণ করবে না।'[৮১]

তারাকৃষ্ণ বসু লেখেন, 'ঐ একই গ্রামের ব্রাহ্মণেরা পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ ও ডিম উৎপাদন করে – কিন্তু ব্রাহ্মণদের আত্মসম্মানবোধকে ধন্যবাদ, ব্যবহারের চেয়ে অনেক বেশি উৎপাদিত হলেও তা কখনও তারা বিক্রি করে না। ঐ সব জিনিস পচে যাবে এবং তারা তা ফেলে দেবে। আমার একজন বয়স্ক ব্রাহ্মণ বন্ধু আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে কানে কানে বলে যে, ... প্রতিদিন সকালে সে আমাকে আধ সের (দুধ) দিতে পারবে; কিন্তু সে আমাকে সতর্ক করে বলে, 'দেখবেন একথা যেন কেউ জানতে না পারে।'[৮২]

বাঙলায় অস্পৃশ্যতা নেই, ভদ্রলোকদের এই দাবি সন্দেহের উদ্রেক করে। বিশ্বভারতীর এক যুবক ছাত্র বেনুরিয়া গ্রামের একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করে:

> ডোম শ্রেণীর একটি লোক রাস্তার একপাশে অপেক্ষা করছিল। সে রাস্তা পার হতে পারছিল না; সে চিন্তা করে, এতে আমাদের অপমান করা হবে। (আমার বন্ধু) ... তার সমস্যার কথা অনুধাবন করে এবং তাকে রাস্তা পার হওয়ার কথা বলে। সে রাস্তা পার হয়ে যায়, কিন্তু এমন ইতস্তত পদক্ষেপে ও ভীতিগ্রস্ত চাহনিতে যে, মুহূর্তের মধ্যে আমার মন ভেঙ্গে যায়। বর্ণ হিন্দুরা আমাদের তৈরি করেছে এভাবেই। তবু তাদের নেতারা বলে যে, অস্পৃশ্যতার পাপ থেকে বাঙলা মুক্ত। সাবাস![৮৩]

সারা বাঙলা প্রদেশে অস্পৃশ্যতা থাকলেও ভারতের অন্যান্য অংশের মতো এখানে ততটা কঠোরভাবে তা পালন করা হয় না।[৮৪] অস্পৃশ্য লোকের সংখ্যাও এখানে আনুপাতিক হারে কম। আর্য জাতীয়তার প্রক্রিয়ায় বাঙলার অন্তর্ভুক্তি বিলম্বে হওয়া তার জাতিভেদ প্রথায় নমনীয়তা এনে দেয় বলে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয়।[৮৫] এ যুক্তিও দেখানো হয় যে, 'বাঙলার ভিন্ন ধরনের অনুপম জাতিভেদ কাঠামোর কারণেই মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টি ব্যাপকভাবে ঘটেছে।'[৮৬] যেহেতু বেশিরভাগ নীচু শ্রেণীর লোক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে গোড়ার দিকে, বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ ও ধর্মের দিক থেকে তাদের মর্যাদার স্তর ঐ বর্ণ প্রথার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়[৮৭] এবং ঐ ধারণাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। বাঙলার অনেক জেলার সুফি পীরগণ বহু লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে দিনাজপুরের কথা বলা যায় – এখানে 'পীর' ধারা ছিল খুবই জোরালো। রাজবংশীরা ইসলামের এই ভিন্ন ধারায় ধর্মান্তরিত হয় এবং তারা পরিচিত হয় 'নায়াসা' (nyasas) বলে।[৮৮] বাঙলার জাতিভেদ প্রথার প্রচলিত নিয়মে অন্য একটি বিষয় প্রভাব বিস্তার করতে পারে – ঐ বিষয়টি হল গোঁড়ামি মুক্ত নয় এমন উদার শ্রেণীর বিস্তার। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে নীচু শ্রেণীর বহু লোক ঐ উদার শ্রেণীর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তার অনুসারী হয়।[৮৯] বৈষ্ণব ধর্মীয় পদ্ধতি ছিল উপাসনার এক বিকল্প পদ্ধতি এবং ঐ পদ্ধতি ছিল সব শ্রেণীর মানুষের জন্য উন্মুক্ত; এতে বিভিন্ন জাতের একীভূত হওয়ার একটি পথ উন্মুক্ত হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে মানিক কালী ধর্মীয় পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্রমবর্ধমান কৈবর্ত জাতির হেদারাম দাস ঐ ধর্মীয় পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করেন – ঐ পদ্ধতিতে জাতিভেদ প্রথার কোনো স্থান ছিল না।[৯০] অপর দিকে দিনাজপুরের বহু সংখ্যক রাজবংশী বৈষ্ণববাদে ধর্মান্তরিত হয়।[৯১] বৈষ্ণব ধর্ম পদ্ধতিতে নীচু শ্রেণীর লোকদের উচ্চ শ্রেণীতে উত্তরণের বেশ কিছুকাল পর তাদের নীচু শ্রেণীর পরিচিতি ক্ষীণ হয়ে আসে। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে সেন্সাস কমিশনার হিন্দুদের বিভিন্ন শ্রেণীর তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ নিলে তিনি দেখতে পান, সব 'হিন্দু'র মধ্যে শতকরা ত্রিশ ভাগ হিন্দু প্রচলিত ধর্মীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয় – এদের বেশিরভাগই হল প্রধানত বৈষ্ণব ও শাক্ত (Sakta) মতবাদের বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত।[৯২] ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এ ধরনের শ্রেণীর উদ্ভব ও বিস্তার[৯৩] প্রায় দেখা যেত না, অপর দিকে শ্রেণীভেদ প্রথার অনেক কিছুই হয়ে

ওঠে অনমনীয়। এর ফলে জাতিভেদ প্রথায় ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। তদুপরি, এ ধরনের অবস্থা এমন এক সমৃদ্ধ প্রতিযোগিতামূলক ধর্মীয় ঐতিহ্যে পরিণত হয় যা বাঙলার গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্ব চর্চার বিভিন্ন প্রয়াসকে দুর্বল করে দেয়।

তাই একক 'বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ে'র কথা বলতে হলে একটা 'কাল্পনিক সম্প্রদায়'কে 'উদ্ভাবন' করতে হয়।[৯৪] পুনা চুক্তিতে বাঙলার জাতিভেদ প্রথার ব্যাপক জটিল বিষয়টি উপস্থাপন করে বর্ণ প্রথার মধ্যকার ঐ ভাঙ্গন ও ফাটল সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং তা দূর করার কথা বলা হয়। হিন্দু সমাজের প্রতিটি শাখার পক্ষে কথা বলার ব্যাপারে ভদ্রলোক রাজনীতিক ও তাদের সংগঠনগুলোর দাবির যৌক্তিকতা নিয়েও ঐ চুক্তিতে প্রশ্ন তোলা হয়। ফলে তা ভদ্রলোক রাজনীতির মূল ভিত্তির প্রতি ভয়ঙ্কর হুমকি হিসেবে দেখা দেয়।[৯৫]

ঐ চুক্তির তাৎক্ষণিক ফল হিসেবে বাঙালি হিন্দু কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সর্ব-ভারতীয় পর্যায়ের চুক্তির রূপকার এবং কংগ্রেস হাই কমান্ড ও স্বয়ং গান্ধীর সঙ্গে সম্পর্কে চিড় ধরে। বাঙালিরা যুক্তি উত্থাপন করে যে, ঐ চুক্তি হল 'বাঙালি হিন্দুদের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর এবং তাদের সংহতির জন্য নাশকতামূলক;' অনেকে এই চুক্তিকে বাঙলার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে মন্তব্য করে। জে. এল. ব্যানার্জী এই মতেরই প্রতিধ্বনি করেন; কাউন্সিলে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি ঘোষণা করেন: 'পরিস্থিতির একটা সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি হল যে, জাতীয়তাবাদের সংস্কারক নেতা নিজেকে বাঙলার জাতীয়তাবাদের জন্য সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে প্রমাণ করেছেন।'[৯৬] অধিকাংশ বাঙালি নেতা-কর্মী এজন্য ক্রুদ্ধ হন যে, চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে আলোচনার সময় তাদেরকে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং ঐ চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে 'বাঙলার হিন্দুদের সাথে আলোচনা না করে এবং (সে-কারণে সমালোচনাকারীরা মনে করে) প্রদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কোনো ধারণা ছাড়াই বা কোনো বিবেচনা না করেই।' ফলে, 'অনুন্নত শ্রেণীর (জন্য) সংরক্ষিত আসন সংখ্যা প্রদেশের জন্য সত্যিকারভাবে প্রয়োজনীয় আসন সংখ্যার আনুপাতিক হারকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।'[৯৭] বেঙ্গল কংগ্রেসের ভেতরের বা বাইরের বাঙালিরা এই উপেক্ষাকে সহজে ক্ষমা করতে পারবে না। এমন সময় ছিল যখন বাঙলার দেশপ্রেমিকরা ছিলেন কংগ্রেস সংগঠন ও আন্দোলনের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে এবং দলের আদর্শ ও নেতৃত্বের ওপর বাঙলার প্রভাব ছিল। কিন্তু এখন সেই কংগ্রেসই এমন একটা বিষয় নিয়ে বাঙলার সাথে আলোচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যা তার ভবিষ্যৎকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। বাঙালি কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের মধ্যে গান্ধীর অত্যুৎসাহী শিষ্য খুব কমই ছিল।[৯৮] কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে চিত্তরঞ্জন দাশ গান্ধীর পরাজয়কে নিশ্চিত করায় তাঁর (গান্ধীর) নেতৃত্বের প্রতি প্রায় সবাই শুধুমাত্র মৌখিক সমর্থন জানাত। দাশের মৃত্যুর পর অভ্যন্তরীণ উত্তরাধিকার নিয়ে গান্ধীর বিবাদ মীমাংসা যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তকে কোলকাতার তিনটি 'মুকুট' এনে দেয় এবং সুভাষ বসুকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় – ঐ মীমাংসা

বাঙলার কিছু সংখ্যক কংগ্রেস নেতা-কর্মীকে খুশি করতে পারলেও, তার থেকে বেশি জনকে তাঁর নেতৃত্ব থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।[৯৯] গান্ধীর নেতৃত্বের প্রশ্নে পুনা চুক্তি বাঙালির অসন্তোষকে আরও চাঙ্গা করে। পুনা চুক্তির পর প্রাদেশিক সংগঠনের সাথে হাই কমান্ডের মতবিরোধ বাঙলায় কংগ্রেস রাজনীতির মূল বিষয় হয়ে পড়ে।

কেন্দ্র ও প্রদেশ: কংগ্রেস হাই কমান্ড ও বাঙলা

১৯৩৪ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় ধাপ সমাপ্ত হলে এবং কংগ্রেসের প্রবীণ নেতারা জেল থেকে মুক্তি পেলে সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি সাম্প্রতিক শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির বিষয়ে নিজেদের দলীয় অবস্থান নিয়ে আলোচনা শুরু করে। সম্প্রদায়গত রোয়েদাদের বিস্তৃত কাঠামোর আওতায় সংস্কার নিয়ে কংগ্রেস কাজ করবে কি করবে না সে-প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেওয়া একক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। ১৯৩৩ সালের প্রথম দিকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য লন্ডনের প্রস্তাব সম্বলিত একটি সরকারি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হয়।[১০০] নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ও প্রস্তাবিত শর্ত গ্রহণ করার জন্য কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরে চাপ বাড়তে থাকে।[১০১] ১৯৩৩ সালে স্বরাজ্য পার্টি পুনর্জীবিত করার প্রচেষ্টায় গান্ধীকে অনুমোদন দিতে হয়।[১০২] একই সাথে তিনি শ্বেতপত্রের শর্তকে প্রত্যাখ্যান করেন, অথচ ঐ শ্বেতপত্রের শর্ত গ্রহণের জন্য হাই কমান্ডকে অনুরোধ জানানো হয়। পরের বছর গান্ধী সম্প্রদায়গত রোয়েদাদের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর বাকচাতুরী অব্যাহত রাখেন। জুন মাসে ওয়ার্কিং কমিটি তাঁর বিতর্কিত প্রস্তাব গ্রহণ করে – ঐ প্রস্তাবে দেখা যায় কংগ্রেস তার আগের অবস্থানে দৃঢ় আছে:

> শ্বেতপত্র তামাদি হয়ে যাচ্ছে, সম্প্রদায়গত রোয়েদাদও আপনা-আপনি অবশ্যই তামাদি হয়ে যাবে ... সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ সম্পর্কে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় সুনির্দিষ্টভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ায় এ ব্যাপারে কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। কংগ্রেস ভারতীয় জাতির সব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের দাবি করে সমানভাবে। সুতরাং সৃষ্ট মতামতের মধ্যে ভিন্নতা অব্যাহত থাকা অবস্থায় কংগ্রেস সম্প্রদায়গত রোয়েদাদকে গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে না।[১০৩]

জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের শান্ত করার এবং তাদেরকে কংগ্রেস পার্টির ছত্রছায়ায় রেখে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি গান্ধীর সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। ফলে তিনি রোয়েদাদের প্রবল বিরোধিতাকারী তাঁর দলের মদন মোহন মালব্যের মতো খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের আপত্তিকেও অগ্রাহ্য করেন।[১০৪] এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাত্র কয়েকদিন আগে গান্ধীর একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি তাঁকে বলেন যে, 'পণ্ডিত মালব্যজী সম্প্রদায়গত রোয়েদাদের বিরুদ্ধে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মধ্যে অর্ধেক এই রোয়েদাদের পক্ষে এবং (সংসদীয়) বোর্ডে বিরোধিতা আসার সম্ভাবনা আছে। মালব্যজীর কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যবস্থা যদি পেশ করা যায় তাহলে এই ডুবন্ত জাহাজকে রক্ষা করা যেতে পারে।'[১০৫] এই

ঘটনার প্রেক্ষিতে গান্ধী অবশ্য দলের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা প্রশমনের পরিবর্তে কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ পরিচিতিকে অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারেই বেশি উদ্বিগ্ন হন।

গান্ধী সম্ভবত আশা করেন যে, তাঁর গৃহীত ব্যবস্থা অর্থাৎ সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ গ্রহণ বা বর্জন না করার সিদ্ধান্ত সব দলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে, কিন্তু সেটা তাঁর ভুল ছিল। বাঙালি কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা এমন বাকচাতুরীকে সহজে গ্রহণ করতে পারে না – সম্ভাব্য ক্রোধের মাধ্যমেই তারা তাৎক্ষণিকভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে:

> প্রধানমন্ত্রীর সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ অন্যায়, অযৌক্তিক, জাতীয়তাবাদ-বিরোধী ও গণতন্ত্র-বিরোধী। এই বৈঠকের মত হল, রোয়েদাদ সম্পর্কে বেনারসে অনুষ্ঠিত গত বৈঠকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে উদাসীন ও সহানুভূতিহীন নীতি গ্রহণ করেছে তা জাতির জন্য খুবই অপমানজনক এবং ওয়ার্কিং কমিটিকে তাই ঐ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য এই বৈঠক থেকে অনুরোধ জানানো হল [১০৬]

সারা বাঙলায় সব কংগ্রেস কমিটি এই মনোভাব সমর্থন করে।[১০৭] পুনা চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার দু'বছরের মধ্যে ওয়ার্কিং কমিটি ঐ রোয়েদাদ কার্যত গ্রহণ করায় বাঙলার অধিকাংশ কংগ্রেস নেতা-কর্মীর এই সন্দেহ দৃঢ় হয় যে, কেন্দ্রের নেতারা তাদের স্থানীয় সমস্যার ব্যাপারে মোটেই গুরুত্ব দেন না। ১৯৩৫ সালের প্রথম দিকে কোলকাতায় নিখিল বঙ্গ হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে *অমৃত বাজার পত্রিকার* সম্পাদক তুষার কান্তি ঘোষের মুখে ভদ্রলোকদের মনোভাব প্রকাশ পায়। তিনি বলেন যে, 'বাঙলার শিক্ষিত হিন্দুরাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠন করেছে, তারা এর সিদ্ধান্ত সব সময়ই মান্য করেছে ... কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, (এই) কংগ্রেসই সংকটের সময় বাঙলার জন্য কোনকিছু করতে ব্যর্থ হয়েছে।'[১০৮]

বাঙলার স্বার্থের বিষয়ে হাই কমান্ডের 'বিশ্বাসঘাতকতা'য় বেঙ্গল কংগ্রেসের অনেক বাঙালির দৃষ্টিতে কেন্দ্রকে অগ্রাহ্য করা বৈধ বলে গণ্য হয়। সুভাষ বসু ও তাঁর সমর্থকদের সাথে গান্ধী ও ওয়ার্কিং কমিটির দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল সেই উত্তরাধিকার মনোনয়নের সময় থেকে। ঐ মনোনয়ন থেকে সৃষ্ট বিবাদের পর চিত্তরঞ্জন দাশ মারা যান। বেঙ্গল কংগ্রেসে সীমাহীন বিবাদ-বিসম্বাদে দলটি বিভক্ত হতে থাকে। সে-সময় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে বারবার সালিশি করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এর ফলে বেঙ্গল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বিষয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সংশ্লিষ্টতা গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। কিন্তু হাই কমান্ডের ছিল নিজস্ব লক্ষ্য: কলহে লিপ্ত বাঙালিদের স্তিমিত করার জন্য তারা উদ্বিগ্ন ছিল এবং অভ্যন্তরীণ বিরোধ মেটাতে নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করার চেয়ে তারা অধিক উদ্বিগ্ন ছিল প্রাদেশিক সংগঠনের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে।[১০৯] ১৯২৭ সালে গান্ধী কর্তৃক বেঙ্গল কংগ্রেস দলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেনগুপ্তের নিযুক্তি এবং ১৯৩৩ সালে সেনগুপ্তের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বসুর বিরুদ্ধে সেনগুপ্তের সমর্থকদের গান্ধী কর্তৃক অব্যাহত সমর্থনের উদ্দেশ্য ছিল এমন সব লোকের নিয়ন্ত্রণে বেঙ্গল কংগ্রেসকে আনা যারা কেন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করবে।[১১০] এই নীতি সুভাষ বসু ও

তাঁর সমর্থকেরা মানতে পারেনি; ১৯২৭ সালের পর থেকে তাঁরা তাঁদের নিজের পথে চলতে থাকেন এবং হাই কমান্ডের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন।[১১১]

এখন পুনা চুক্তি ও সম্প্রদায়গত রোয়েদাদে সর্বভারতীয় স্বার্থ দেখতে গিয়ে হাই কমান্ড শিষ্টাচার বর্জিতভাবে বাঙালি ভদ্রলোকদের স্বার্থকে গুরুত্বহীন বিবেচনা করায় তাতে সোরগোল পড়ে যায়। বসু গ্রুপ একে একটা ন্যায্য 'কারণ'-এর হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে। এতে তারা বহু লোকের সমর্থন আদায় করতে সমর্থ হয় এবং তাদের সমর্থকদের সংখ্যা এমন বৃদ্ধি পায় যাকে আর উপদল বলে উপেক্ষা করা যায় না। বসু গ্রুপ এখন বাঙলার পক্ষে কথা বলার অধিকার দাবি করে – প্রদেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজেদেরকে 'ডেভিড' হিসেবে চিহ্নিত করে তারা বীরোচিতভাবে কেন্দ্রের 'গোলিয়াথ'কে চ্যালেঞ্জ করে। এতে অনেক বাঙালি সাড়া দেয় এবং তারা বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি তাদের সমর্থনের কথা ব্যক্ত করে।

মদন মোহন মালব্য ও এম. এস. এ্যানি (Aney) রোয়েদাদ প্রশ্নে গান্ধীবাদী নেতৃত্বের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা নতুন দল গঠন করলে বসু ভ্রাতৃদ্বয় ও তাদের গ্রুপ অতি দ্রুত ঐ দলে যোগ দেয়। ১৯৩৪ সালের ১৮ই আগস্ট কোলকাতায় ন্যাশনালিস্ট পার্টি গঠিত হয় – ঐ দলের উদ্দেশ্য ছিল: 'আইন সভায় ও তার বাইরে সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ ও শ্বেতপত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করা এবং ঐ আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য আইন সভার নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া।'[১১২] ন্যাশনালিস্ট পার্টি গঠনের ফলে আগে থেকে বিভক্ত বেঙ্গল কংগ্রেস আবার নতুন করে বিভক্ত হয়ে গেল। মালব্য ও এ্যানির (Aney) অবস্থানের প্রতি অধিকাংশ বাঙালি কংগ্রেস নেতা-কর্মী সহানুভূতিশীল থাকলেও তাদের সবাই হাই কমান্ডের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছুক ছিল না। সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ ঘোষণার প্রেক্ষাপটে স্তিমিত হয়ে পড়া অভ্যন্তরীণ অনৈক্যে তা আবার প্রতিশোধ স্পৃহায় জেগে ওঠে এবং বেঙ্গল কংগ্রেসের দুর্বল ঐক্যকে তা আরও বিপদের মুখে ঠেলে দেয়।

আসল কথা হল, বাঙলার রাজনীতিতে বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীদের অবস্থান ছিল হাই কমান্ডকে শুধু সমর্থন করা। ১৯৩৩ সালে সেনগুপ্ত আকস্মিকভাবে মারা গেলে নেতৃত্বের ভার অর্পিত হয় কোলকাতার একজন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের ওপর। কুড়ি দশকের শেষ দিকে রায় ছিলেন একজন অত্যুৎসাহী স্বরাজ্যবাদী ও চিত্তরঞ্জন দাশের শিষ্য। দাশের মৃত্যুর পর কোলকাতার 'ক্ষমতাধর পাঁচ' (Big Five) ব্যক্তির মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। ঐ 'পাঁচ জন' ছিলেন ধনাঢ্য, সবার সাথে তাঁদের যোগাযোগ ছিল সুদৃঢ় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদের ছিল প্রবল ক্ষমতা। কুড়ি দশকের শেষ দিকে কংগ্রেস বলয়ে তাঁদের ছিল প্রবল প্রতিপত্তি এবং তাঁরাই সেনগুপ্ত ও গান্ধীর বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র বসুকে সমর্থন করেন।[১১৩] যাহোক, আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের অনেক নেতা কারাগারের অভ্যন্তরে থাকায় কংগ্রেস নেতৃত্বের বিভক্তি আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে; 'ক্ষমতাধর পাঁচ' ব্যক্তির মধ্যে বিভাজন আসে, আর কিরণ শংকর রায় ও নলিনী রঞ্জন সরকারের সাথে

যোগ দিয়ে বিধানচন্দ্র রায় বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। রায় এ সময় গান্ধী ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন এবং মৃত্যুর আগে সেনগুপ্ত যে ভূমিকা পালন করেন সেই ভূমিকায় ক্রমান্বয়ে আবির্ভূত হন – অর্থাৎ তিনি হন বাঙলায় গান্ধীর লোক। চট্টগ্রামে সেনগুপ্তের একটা সাংগঠনিক ভিত্তি ছিল এবং পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন জেলায় তাঁর সমর্থকদের বিস্তৃতি ছিল ব্যাপক – অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি পূর্ব বাঙলায় একাধিকবার ধর্মঘট পরিচালনা করেন। কিন্তু এ প্রদেশে রায়ের ক্ষমতার ভিত্তি তেমন ছিল না। আন্দোলনমুখী রাজনীতিতে তিনি কখনই জড়িত ছিলেন না এবং বেঙ্গল কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরে তাঁর প্রতি সমর্থন ছিল খুবই সামান্য। তাঁর একজন অতি অনুগত সমর্থক এ সম্পর্কে বলেন:

> 'সারা বাঙলার যুব প্রজন্ম ও (দলীয়) কর্মীদের সাথে বি. সি. রায়ের কোন যোগাযোগ ছিল না। তিনি ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর লোক। তিনি ছিলেন কংগ্রেসের একজন বিখ্যাত ও খুবই প্রভাবশালী সদস্য, আইন সভা ও (কোলকাতা পৌর) কর্পোরেশনের একজন যোগ্য লোক। আমরা ঐসব বিষয়ে তাঁকে সব সময় মর্যাদাপূর্ণ আসন দিয়েছি – কিন্তু সংগঠনের পরিচালন ব্যবস্থায় নয়।'[১১৪]

'ক্ষমতাধর পাঁচ' ব্যক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা থেকে বিরত হলে গান্ধীর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য বিধানচন্দ্র রায় বাঙলায় বেশ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য হন। পুনা চুক্তি ও রোয়েদাদ সম্পর্কে হাই কমান্ড বিতর্কিত অবস্থান গ্রহণ করলে ডা. বিধান (তাঁর নেতা তাঁকে আদর করে ঐ নামে ডাকতেন) কেন্দ্রের অজনপ্রিয় সিদ্ধান্তগুলোকে রক্ষা করতে গিয়ে এক নাজুক অবস্থায় পড়েন। বেঙ্গল কংগ্রেস আবার দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। সুভাষ ও শরৎ বসুর নেতৃত্বে পরিচালিত গ্রুপ অত্যন্ত কঠোরভাবে পুনা চুক্তি ও রোয়েদাদ এবং হাই কমান্ডকে প্রত্যাখ্যান করে; আর বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত গ্রুপ কেন্দ্রের প্রতি অনুগত থাকে এবং কিছুটা ভীরুতার সাথে কেন্দ্রের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করে নেয়।

১৯৩৪ সালের শেষ দিকে ডা. বি. সি. রায় রিপোর্ট পেতে শুরু করেন যে, 'সাধারণ জনমত ন্যাশনালিস্ট পার্টির অনুকূলে। কিন্তু যারা কংগ্রেস গণ্ডির মধ্যে আছে তারা নিজেদেরকে ন্যাশনালিস্ট পার্টির সাথে সম্পৃক্ত করতে ইতস্তত করছে।'[১১৫] নতুন প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনের সময় এগিয়ে আসার প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রের প্রতি অনুগত লোকেরাও রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হাই কমান্ডের অস্বীকৃতির সাথে একমত হতে পারছিল না। বাঙলায় তার সমস্যা অনুধাবনে কেন্দ্র উদার ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে এই আশায় ডা. বিধান রায় শরৎ বসুর উত্থাপিত প্রস্তাব সমর্থন করেন। ঐ প্রস্তাবে ছিল: 'সম্প্রদায়গত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বলা যায়, সমস্যা সর্ব-ভারতীয় হলেও বাঙলা প্রদেশের জন্য তা অত্যন্ত গভীর ও অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ... সম্প্রদায়গত ঐ সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহার করার জন্য আইন সভার অভ্যন্তরে ও বাইরে আন্দোলন পরিচালনা করা প্রাদেশিক কংগ্রেস সংগঠনের একটা কর্তব্য।'[১১৬] ঐ প্রস্তাবটি এমন সর্বসম্মতিক্রমে

পাস হয় যে তাতে সম্প্রদায়গত রোয়েদাদের প্রশ্নে অনুভূতির গভীরতা ও ব্যাপকতা প্রকাশ পায় এবং ঐ প্রশ্নে বেঙ্গল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ মতানৈক্য মিটে যায়। কিরণ শংকর রায়, যিনি বিধান রায়ের শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন, তিনি সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ নিয়ে শরৎ বসুর প্রস্তাব সমর্থন করেন।[১১৭] ওয়ার্কিং কমিটিতে ঐ প্রস্তাব প্রেরণ করার সময় ডা. রায় আশা প্রকাশ করেন যে, 'এর মাধ্যমে রোয়েদাদ সম্পর্কে ন্যাশনালিস্ট পার্টি ও কংগ্রেসের মধ্যে যে মতপার্থক্য ছিল তার নিরসন হবে।'[১১৮]

কিন্তু হাই কমান্ড এত স্পষ্ট করে বিধি ভেঙে নতুন দিকে বেঙ্গল কংগ্রেসকে ফিরিয়ে নেওয়ার অনুমতি দিল না – এমনকি প্রাদেশিক দলের সাম্প্রতিক ঐক্যকে জোরদার করার স্বার্থেও হাই কমান্ড ঐ অনুমতি দিল না। কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতারা আশংকা করল যে, রোয়েদাদের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন হলে কংগ্রেসের সাথে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সম্পর্ক আরও জটিল হবে এবং তার ফলে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব আরও তীব্র হবে। নেহেরু তাঁর দলকে বুঝালেন:

> এমন হতে পারে যে, হিন্দুরা এই আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব দিলে 'রোয়েদাদ-এর পক্ষে মুসলমানেরা অপর এক আন্দোলন শুরু করবে। এর ফলে 'রোয়েদাদ'কে টিকিয়ে রাখার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। আর এমন পরিস্থিতিকে ব্রিটিশ সরকার অবশ্যই আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। সুতরাং এক-পক্ষীয় আন্দোলনকে কংগ্রেস সমর্থন করতে পারে না।[১১৯]

১৯৩৪ সাল নাগাদ এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, 'রোয়েদাদ'-এর বিরুদ্ধে বাঙলার আন্দোলন হবে 'একপক্ষীয়' বিষয় এবং ঐ আন্দোলনে শুধু হিন্দুরাই জড়িত থাকবে – অধিকাংশ মুসলমান ঐ আন্দোলনের বিরোধিতা করবে। এই প্রেক্ষাপটে বাঙালি কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা কেন্দ্রের কাছ থেকে কোনো সুবিধা আশা করতে পারে না। রোয়েদাদের ব্যাপারে 'বাঙলার বিষয়টিকে বিশেষ ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করার প্রস্তাব' করার জন্য মহাত্মা রায়কে তিরস্কার করেন:

> সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের প্রতি অনুগত থাকার ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধির দ্বিধার কারণে বেঙ্গল কংগ্রেস প্রার্থীদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, এটা আমি বুঝি ... এই অব্যাহতি ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের অংশ না হওয়া পর্যন্ত তা কেউ অনুমোদন করতে পারে না। আর ন্যাশনালিস্ট পার্টির তৎপরতা অব্যাহত রাখার বিষয়টি ওয়ার্কিং কমিটিও অনুমোদন করতে পারে না। সুতরাং বলা যায়, যারা অব্যাহতি চাচ্ছে তারা আসলে ন্যাশনালিস্ট পার্টির সাথে সংশ্লিষ্ট হতে চায়।[১২০]

আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীদের রোয়েদাদ সম্পর্কে দলের প্রস্তাব মেনে চলার ওপর ওয়ার্কিং কমিটি গুরুত্ব আরোপ করে। দৃষ্টান্ত হিসেবে ভবেন্দ্র রায়ের কথা উল্লেখ করা যায়। বেঙ্গল কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ডে তাঁর প্রার্থিতা অনুমোদন করা হয়। কিন্তু তিনি রোয়েদাদের বিরোধিতা করার অনুমতি চাইলে কেন্দ্র থেকে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর প্রার্থিতা বাতিল করা হয়।[১২১] বি. সি. রায় অতি দ্রুত মত পাল্টান; বেঙ্গল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি

একটি নতুন প্রস্তাব পাস করে – ঐ প্রস্তাবে রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সব সুপারিশ বাদ দেওয়া হয়।[১২২] ডা. রায় আশা করেছিলেন যে, বেঙ্গল কংগ্রেসের নীতিগত এই পরিবর্তনকে হাই কমান্ড অন্য দৃষ্টিতে দেখবে। কিন্তু এটা যখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বাঙলার দলকে নিজের পথে চলতে দেওয়ার কোনো উদ্দেশ্য হাই কমান্ডের নেই তখন রায় ও তাঁর অনুসারীরা কালবিলম্ব না করে আনুগত্যের নিরাপদ পথে ফিরে এসে কেন্দ্রের অনুসৃত পথই অনুসরণ করে।

অন্য দিকে শরৎ বসু হাই কমান্ডের সাথে বিবাদ করে শুধু সময় নষ্ট করলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ বসুর মাসিক আয় ছিল দশ হাজার টাকা, তিনি ছিলেন কোলকাতার নেতৃস্থানীয় আইনজীবী। এ পেশায় তিনি প্রভূত সাফল্য অর্জন করায় ভদ্রলোক সমাজে তাঁর একটা উচ্চ মর্যাদা ছিল।[১২৩] প্রথম দিকে রাজনীতিতে তাঁর সংশ্লিষ্টতা তাঁর তেজোদীপ্ত ছোট ভাই-এর কাজে অর্থ যোগান দেওয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যাহোক, শরৎচন্দ্র বসুকে আস্তে আস্তে বাঙলার রাজনীতির আবর্তে টেনে আনা হয়। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা পারিবারিক গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরে বিস্তৃত হয় এবং এর ফলে তাঁর প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তাঁর এই প্রভাব যুবকদের সন্ত্রাসী সংগঠন 'যুগান্তর গোষ্ঠী' পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।[১২৪] এর ফলে বাঙলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বিবাদে সন্ত্রাসী যুগান্তর গোষ্ঠী বসু গ্রুপকে সমর্থন করে।[১২৫] বিশ দশকে বয়োজ্যেষ্ঠ বসু ছিলেন 'ক্ষমতাধর পাঁচ'-এর একজন এবং তিনি জে. এম. সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে তাঁর ছোট ভাই সুভাষকে ক্রমাগতভাবে সমর্থন করেন। চিত্তরঞ্জন দাশের শুরু করা 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকাটি গ্রহণ করে তিনি ঐ পত্রিকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক হন এবং পত্রিকাটিকে বসু গ্রুপের মুখপত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। চট্টগ্রাম অস্ত্র লুণ্ঠন মামলায় শরৎ বসু বন্দিদের সমর্থন করেন এবং পুলিশ প্রধান চার্লস টেগার্টকে হত্যা করার এক ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনার অভিযোগে ১৯৩২ সালে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ব্যাপারে টেগার্টের মোহমুক্তি ঘটে। তিনি (টেগার্ট) বলেন যে, শরৎ বসু হল 'তাঁর ভাইয়ের মূল শক্তি'।[১২৬] পুরো বিশ শতক ও ত্রিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত শরৎ বসু সন্ত্রাসী ও কোলকাতার নেতৃস্থানীয় রাজনীতিকদের মধ্যে তাঁর ব্যাপক সমর্থক গোষ্ঠী ও অনুচর গড়ে তোলেন – কংগ্রেসের সব ধরনের সদস্য পদের মধ্যে সন্ত্রাসীদের অবস্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। গান্ধীর সুনামের জন্য বাঙলায় বিধান রায়ের একটা মর্যাদা ছিল, কিন্তু শরৎ বসুকে তাঁর নিজের ক্ষমতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা হত।

১৯৩৬ সালে বয়োজ্যেষ্ঠ বসু জেল থেকে মুক্তি পান। সেনগুপ্ত তখন মৃত, আর সুভাষ ইউরোপে। নির্বাচনের মাধ্যমে বেঙ্গল কংগ্রেসের কর্তৃত্ব ভার নেওয়ার মতো একজন প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল হাই কমান্ডের। অতীতের সবকিছু ভুলে গিয়ে হাই কমান্ড শরৎ বসুকে পার্লামেন্টারি বোর্ডের প্রধান অর্থাৎ বাঙলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করে। তিনি বিধান রায়ের সাথে পদটিকে ভাগাভাগি করে নেন। বিধান রায় কিন্তু শরৎ বসুর সমকক্ষ ছিলেন না; হাই কমান্ড আশা করে যে, বয়োজ্যেষ্ঠ বসুর ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে রায় খর্ব করতে পারবেন; সে-আশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার জন্য পার্লামেন্টারি বোর্ডের মর্যাদাকে শরৎ বসু কাজে লাগান এবং সম্প্রদায়গত রোয়েদাদের বিষয়টিকে ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগিয়ে তিনি বাঙালি রাজনীতিতে নিজেকে এক ক্ষমতাধর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

শরৎ বসু শীঘ্র তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেন যে, তিনি গান্ধী ও হাই কমান্ডের সাথে লড়াই করতে ইচ্ছুক। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি রোয়েদাদের ব্যাপারে ওয়ার্কিং কমিটির অবস্থান প্রত্যাখ্যান করেন এবং এ কথা সুস্পষ্ট করে দেন যে, ঐ সিদ্ধান্ত বাতিল করা না হলে তিনি ন্যাশনালিস্টদের পক্ষ সমর্থন করবেন। সেই সময় শরৎ বসু ছিলেন বেঙ্গল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি।[১২৭] সেই কারণে কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই চ্যালেঞ্জকে উপেক্ষা করতে পারেননি। এ কারণে নেহেরু দাবি করেন:

> বাঙলায় আপনার কমিটির অবস্থান, সেই সঙ্গে ন্যাশনালিস্ট পার্টির অবস্থান আমাকে জ্ঞাত করুন। ভবিষ্যতে কোনো জটিলতা এড়াতে বিষয়টা স্পষ্ট হওয়া দরকার। আমরা সব গ্রুপের সাথে অবশ্যই সহযোগিতা করতে চাই। কিন্তু সাংগঠনিকভাবে আমরা নিশ্চয়ই চাই না যে, কেউ কিছু আমাদের ওপর চাপিয়ে দিক; আর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কেবলমাত্র কংগ্রেস ও সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ নীতির প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।[১২৮]

এর উত্তরে বসুর নেতৃত্বে বেঙ্গল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ব্যাখ্যা করে জানায় যে, 'সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ প্রত্যাখ্যান প্রশ্নে কংগ্রেস ন্যাশনালিস্টদের সাথে সমঝোতার বিষয়ে ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টি পিছিয়ে দেয়ায় 'প্রদেশে কংগ্রেসের কল্যাণকর স্বার্থের জন্য, বিশেষ করে আইন সভার বর্তমান নির্বাচনের জন্য, ক্ষতিকর ছিল।'[১২৯] বেঙ্গল কংগ্রেসের সেক্রেটারি উল্লেখ করেন যে, বাঙলায় জনমত হল রোয়েদাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় এবং তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেন:

> প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন হিসেবে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে গণতান্ত্রিকভাবে কাজ করতে হবে; জনমতের প্রতি, বিশেষ করে এ ধরনের মৌলিক বিষয়ে, তার শ্রদ্ধা থাকা উচিত। এ সংগঠন জনমতকে উপেক্ষা করতে পারে না। আর কোনো ভুল বুঝাবুঝি থাকলে এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, রোয়েদাদের মতো গুরুতর ভীতিকর বিষয়ে লড়াই করার প্রশ্নে বেঙ্গল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির জনমতকে উপেক্ষা করার প্রশ্নই আসে না ... নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ওয়ার্কিং কমিটি আমাদের দাবি উপেক্ষা করার ফলে এই অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।[১৩০]

নির্বাচনী প্রচারণার এই সংকটকালে নেহেরু বেঙ্গল কংগ্রেসের স্পষ্ট বিভক্তি এড়ানোর ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। তিনি বসু ও তাঁর সমর্থকদের শান্ত করার চেষ্টা করেন এবং তাঁদেরকে আশ্বস্ত করেন:

> কংগ্রেসের মধ্যে আমরা সবাই বা প্রায় সবাই এই সম্প্রদায়গত সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করতে চাই, আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে, আমরা এর সমাপ্তি দেখতে চাই ... আমি পুনরায় বলছি, 'রোয়েদাদ' বিষয়ে কংগ্রেসের নীতি সম্পর্কে যে কোনো সন্দেহকে

প্রতিহত করতে চাই। কংগ্রেস 'রোয়েদাদ'কে অপছন্দ করে, একে গ্রহণ করে না এবং একে প্রত্যাখ্যান করে। রোয়েদাদের সাথে কংগ্রেস কখনও সমঝোতা করতে পারে না, কারণ এটা হল আমাদের ঐক্য, মুক্তি ও স্বাধীনতার অগ্রগতির পথে একটা বাধাস্বরূপ। এটা হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অংশবিশেষ – এই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সংগ্রাম করে ... আমরা সবাই জানি, কংগ্রেসের ঐ সিদ্ধান্ত বাঙলাকে কত নির্মমভাবে আঘাত করেছে।

'কিন্তু', তিনি বলেন, 'বিষয়টির মোকাবেলা করতে হবে সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে ... আমি আপনাদের আরও আশ্বস্ত করতে চাই যে, বাঙলার যে কোনো লোকের মতো সম্প্রদায়গত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ওয়ার্কিং কমিটির গভীর বিরাগ আছে। তবে সমস্যার বৃহত্তর বিষয়গুলোও মনোযোগ আকর্ষণের দাবি রাখে।'[১৩১]

কিন্তু নেহেরুর 'সমস্যার বৃহত্তর বিষয়গুলো' বা অন্য কথায় কেন্দ্রের 'সর্ব-ভারতীয়' অগ্রাধিকারের বিষয়টি বাঙলার অনুভূতিকে স্পর্শকাতর করে তোলে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বাঙলার বীর পুরুষ বসু ভ্রাতৃদ্বয় নেহেরুর সমঝোতা প্রয়াসের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক ভাষায় আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন:

এটা লক্ষ করে ভাল লাগছে যে আপনি স্পষ্টত রোয়েদাদকেও প্রত্যাখ্যান করছেন, ... কিন্তু যখন আপনি বলেন যে, 'বিষয়টির [রোয়েদাদ] মোকাবিলা করতে হবে সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে', তখন আমাদের মনে আশংকা না জেগে পারে না। এখানে, বিশেষভাবে পুনা চুক্তি ও রোয়েদাদ সম্পর্কে, কংগ্রেস নীতি নিয়ে জনমত তৈরি হয়েছে যে, সর্ব-ভারতীয় রাজনীতির দাবাখেলার বোর্ডে বাঙলাকে বন্ধক দেওয়া হয়েছে – এটা হয়ত আপনার জন্য কোনো সংবাদ হতে পারে না। কংগ্রেসের উচ্চ মহলে বাঙলার জনমতকে যে মারাত্মকভাবে অবহেলা করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এতে অবাক হবারও কিছু নেই। বাঙলার সমস্যাকে সর্ব-ভারতীয় রাজনীতির আওতাভুক্ত করায় তার সমাধানের বিষয়ে আমরা স্বাভাবিকভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ি।[১৩২]

বাঙালি হিন্দুদের ক্রমবর্ধমান সংকীর্ণ প্রাদেশিক মনোভাবের জন্য এখানে তীক্ষ্ণ যুক্তিও উপস্থাপন করা হয়েছে: বাঙালিরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জনক, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের রূপকার বলে দাবি করা হলেও এখন তারা তাদেরই সৃষ্ট সংগঠনের শিকার। কেন্দ্রের ঘটনা প্রবাহের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়ে ভদ্রলোকদের রাজনীতি ক্রমাগতভাবে অন্তর্মুখী হয়ে যায় এবং বাঙলায় তাদের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে হুমকি প্রতিরোধে তারা উদ্বিগ্ন হয়। বাঙলায় ক্ষমতার অনিশ্চয়তা এবং কেন্দ্রের ওপর তাদের প্রভাব বিস্তার মারাত্মকভাবে ধস নামায় বাঙালি কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। বসু ভ্রাতৃদ্বয় পরিচালিত একটি অংশ দুই ফ্রন্টে লড়াই করতে চায় – কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াই আর বাঙলায় নিজেদের অবস্থান পুনরুদ্ধার করার অভিযান প্রয়াস। ডা. বি. সি. রায় এবং অন্যরা হাই কমান্ডের সাথে নিজেদেরকে আরও গভীরভাবে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি অধিক বিজ্ঞজনোচিত বলে মনে করেন। তাঁরা আশা করেন যে, প্রদেশের পক্ষে আলোচনার সময় কেন্দ্রে তাঁদের প্রভাব আরও শক্তিশালী হবে।

ত্রিশ দশকের শেষ দিকে দৃষ্টিভঙ্গির এই মৌলিক পার্থক্য বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিকে বিভক্ত করে দেয় – সেটা ভবিষ্যতে আর জোড়া লাগেনি। ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্বের নতুন এই বিস্ফোরণ অবিভক্ত বাঙলার শেষ দিনগুলিতে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে।

হাই কমান্ডের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল বেঙ্গল কংগ্রেসের প্রকাশ্য ভাঙ্গনকে রোধ করা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর ওপর কতিপয় নির্দেশ আরোপ করা। আইন সভা নির্বাচনে বেঙ্গল কংগ্রেস প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ন্যাশনালিস্টরা যখন তাদের নিজেদের প্রার্থীদের দাঁড় করায় এবং রোয়েদাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অঙ্গীকার-সম্বলিত নির্বাচনী ঘোষণাপত্র প্রচার করে,[১৩৩] তখন লৌহমানব বল্লভভাই প্যাটেল কেন্দ্রের মঞ্চে আবির্ভূত হন। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট বোর্ডের সভাপতি হিসেবে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, এ ধরনের বিশৃঙ্খলা সহ্য করা হবে না। তিনি সতর্ক করে দেন:

> সম্প্রদায়গত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির বক্তব্য নিয়ে বেঙ্গল নির্বাহী কমিটি যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তা সম্পূর্ণ ভুল। আপনারা যে প্রার্থীদের পক্ষে সুপারিশ করে পাঠিয়েছেন তাঁরা যদি সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নীতি ও কর্মসূচির ঘোষণাপত্র গ্রহণ না করেন তাহলে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি কমিটির পক্ষে আপনাদের সুপারিশ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।[১৩৪]

এর ফলে কেন্দ্র ও প্রদেশ সংঘর্ষের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। কিন্তু পরিশেষে দেখা যায়, বাঙলার 'বাঘ'রা পশ্চাদাপসরণ করেছে। ন্যাশনালিস্ট নিয়ন্ত্রিত বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ৮ই নভেম্বর তার নির্বাচনী ঘোষণাপত্র পরিবর্তন করে এবং সম্প্রদায়গত রোয়েদাদের প্রতিটি বক্তব্যই গ্রহণ করে। তাতে মনে হয়, প্রথম রাউন্ডেই যেন কংগ্রেস হাই কমান্ড জিতে গেল। সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নেতারা অনুধাবন করতে পারলেন যে, ভোটবাক্সে যদি তাদের দলকে কিছু দেখাতে হয় তাহলে সাময়িকভাবে হলেও সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেসের সমর্থন তাদের প্রয়োজন। চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর বেঙ্গল কংগ্রেসের দীর্ঘকালের দলীয় কোন্দলের ইতিহাস এবং আইন অমান্য আন্দোলনের সময় এর নেতৃত্বের ব্যর্থতা প্রাদেশিক নির্বাচনে কংগ্রেসের জন্য ভালো ফল নিয়ে আসতে পারেনি। মোহমুক্ত একজন কংগ্রেস-কর্মী উল্লেখ করেন, 'বাঙলার তথাকথিত কংগ্রেস নেতারা তাঁদের বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন এবং তাঁরা বাইরে আসেননি ... বাঙলায় আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ডা. বি. সি. রায় বা মি. জে. সি. গুপ্ত কোথায় ছিলেন তা আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞাসা করছি। তাঁরা নিশ্চয়ই কংগ্রেসের ধারে-কাছে ছিলেন না।'[১৩৫] অন্য একজন সমালোচক উল্লেখ করেন যে, 'সর্ব-ভারতীয় সংগঠন হিসেবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একটা ইন্দ্রজাল ছিল এবং এর উদার দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা হলেও বেঙ্গল কংগ্রেসকে সম্পূর্ণ অ-জনপ্রিয় হওয়া থেকে রক্ষা করে।'[১৩৬] বাঙলার ন্যাশনালিস্টরা তাঁদের রাজনৈতিক জীবনের এসব তিক্ত ঘটনা সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত ছিলেন। মালব্য যখন ১৯৩৪ সালে নতুন দল গঠন করেন তখন তাঁরা অনুরোধ করেন, ঐ দলটি যেন কংগ্রেসের একটা ক্ষুদ্র দল হিসেবে অক্ষুণ্ন থাকে – যেমন ছিল স্বরাজীরা, বিশ শতকে। তাঁরা

তখন যুক্তি দেখান যে, 'নতুন দলের নামের সাথে 'কংগ্রেস' শব্দটা যুক্ত না থাকলে তা বাঙলায় বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারবে না।'[১৩৭] এ ধরনের প্রায়োগিক কারণে ওয়ার্কিং কমিটির কাছে বেঙ্গল কংগ্রেস পরাজয় স্বীকার করে নেয়। কিন্তু ঐ সমঝোতা ছিল স্বল্পকালীন। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোতে বাঙলায় তাঁদের প্রচারাভিযানের সময় বসু ভ্রাতৃদ্বয় হাই কমান্ডের দুরভিসন্ধিমূলক 'সাম্রাজ্যবাদে'র কথা জোরেসোরে তুলে ধরেন।

টীকা

১. অন্যান্য রক্ষাকবচের মধ্যে ছিল প্রস্তাবিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ব্যাপারে গভর্নরের (কাউন্সিলে) ভূমিকা এবং ৯৩ ধারার বিধান – ঐ বিধান মোতাবেক প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার বাতিল করা এবং প্রদেশকে সরাসরি গভর্নর শাসনের অধীনে আনা যেত। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা দেখতে পাব যে, বাঙলায় ঐ উভয় রক্ষাকবচ ব্রিটিশ সরকার কার্যকর করে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মধ্যে যে রক্ষাকবচ অন্তর্ভুক্ত করা হয় সে-সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন সুমিত সরকার, *মডার্ন ইন্ডিয়া ১৮৮৫-১৯৪৭*, দিল্লী ১৯৮৪, পৃ. ৩৩৬–৩৩৮।

২. দেখুন লোথিয়ান থেকে উইলিংডন-এর কাছে প্রেরিত, ৮ই আগস্ট ১৯৩২, আই ও এল আর এল/পিও/৪৯ (ii)।

৩. রোনাল্ড ইনডেন, 'ওরিয়েন্টালিস্ট কনস্ট্রাকশনস্ অব ইন্ডিয়া', *মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ*, খণ্ড ২০, ৩, ১৯৮৬, পৃ. ৪০৩।

৪. এ ধরনের ধারণার কৌতূহলোদ্দীপক দৃষ্টান্ত ব্রিটিশ প্রশাসকদের স্মৃতিকথায় দেখতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের পি. ডি. মার্টিন-এর স্মৃতিকথা উল্লেখ করা যায়; তিনি ১৯৩০ সালে কালিমপং-এ তাঁর চাকুরিকালের কথা উল্লেখ করেন: 'সরকারের এবং তার প্রতিনিধি হিসেবে আমার মধ্যে পাহাড়ি লোকদের প্রতি পিতৃসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সাহসী নেপালীদের থেকে লেপচা ও ভুটিয়াদের রক্ষা করতে হবে, আবার ঐ তিন গ্রুপের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে সমতল ভূমির লোকদের থেকে, বিশেষ করে ভারতের সর্বত্র বিস্তৃত ও অর্থলগ্নীকারী মাড়োয়ারিদের থেকে।' পি. ডি. মার্টিনস মেময়ার্স, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১৮০/১৩।

৫. বাঙলায় ইউরোপীয়দের প্রতিনিধি হিসেবে বেনথলের অসন্তোষকে কিছুটা ভুল করে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ চক্রবর্তী তাঁর 'রোয়েদাদ' সম্পর্কিত আলোচনায় মনে হয় ঐ ভুল বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, ঐ রোয়েদাদের আওতায় ইউরোপীয়দেরকে 'অস্তিত্বহীন'-এ নামিয়ে আনা হবে। বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, দি কমিউনাল এওয়ার্ড অব বেঙ্গল এ্যান্ড ইটস্ ইমপ্লিকেশনস ইন বেঙ্গল, *মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ*, খণ্ড ২৩, ৩, ১৯৮৯, পৃ. ৫০৩। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ১৩৯টি আসনের মধ্যে ইউরোপীয় গোষ্ঠী ৯টি আসন লাভ করে, যা শতকরা ৬ ভাগের কিছু বেশি। ঐ রোয়েদাদের আওতায় ঐ গোষ্ঠী আনুপাতিক হারে কিছু আসন বেশি পায়; বৃদ্ধির এই হার শতকরা ৪ ভাগ।

৬. *সেন্সাস অব ইন্ডিয়া ১৯৩১: বেঙ্গল এ্যান্ড সিকিম*, খণ্ড ৫, অংশ ১; এ. ই. পোর্টারের রিপোর্ট, পৃ. ৩৮১-৩৮৮।

৭. পার্লামেন্টারি পেপারস্ অন দি মন্টেগু-চেমস্ফোর্ড রিফরমস্, কমান্ড ৮১২, পৃ. ২৯৫-২৯৯।

৮. উইলিংডন থেকে হোয়ারের কাছে প্রেরিত টেলিগ্রাম, ১৪ই জুন ১৯৩২, আইওএলআর এল/পিও/৪৯। উল্লিখিত জে এ গালাঘের (Gallagher), 'কংগ্রেস ইন ডিক্লাইন : বেঙ্গল, ১৯৩০ টু ১৯৩৯', *মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ*, খণ্ড ৭, ৩, ১৯৭৩, পৃ. ৬১৭।

৯. রোয়েদাদের শর্ত নিয়ে ইন্ডিয়া অফিসের স্যামুয়েল হোয়ার ও লর্ড জেটল্যান্ড এবং দিল্লীতে ভাইসরয় উইলিংডন-এর মতপার্থক্য সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন, হেলেন এম নুজেন্ট (Nugent), 'দি কমিউনাল এওয়ার্ড: দি প্রসেস অব ডিসিশন-মেকিং', *সাউথ এশিয়া* (এন এস), ২.১ এবং ২.২, ১৯৮৯।

১০. সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ সম্পর্কে লর্ড জেটল্যান্ডের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, জেটল্যান্ড কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর ডি/৬০৯/২২, পৃ. ২২। জেটল্যান্ড 'নাশকতামূলক আন্দোলন' সম্পর্কে বাঙলায় সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসমূলক তৎপরতাকে উল্লেখ করেছেন। তিনি নিশ্চিতভাবে আশংকা করেন যে, ঐ রোয়েদাদ সন্ত্রাসবাদের অন্য এক অধ্যায়কে উৎসাহিত করবে। এটা একটা চিন্তার বিষয় ছিল যে, রোয়েদাদের শর্ত পরিবর্তন করার জন্য বাঙালি হিন্দুরা জেটল্যান্ডের ওপর প্রভাব বিস্তার করার প্রয়াস চালায়। বাঙলার এডভোকেট জেনারেল মি. এন. এন. সরকার সতর্ক করে দেন যে, 'বাঙালি হিন্দুরা যদি মনে করে তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের কার্যকারিতার ওপর তাঁদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তাহলে সন্ত্রাসী কাজ থেকে অধিকাংশ লোক সরে আসবে। অথচ প্রস্তাবিত গঠন কাঠামো এমন যে, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ হয়ে তারা আইন সভা থেকে দূরে থাকার জন্য উৎসাহ পাবে।' মি. এন. এন. সরকারের স্মারকপত্র, জেটল্যান্ড কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর ডি/৬০৯/২১(এইচ)/এ।

১১. 'বেঙ্গল এ্যান্ড দি পুনা প্যাক্ট', লর্ড জেটল্যান্ডের নোট, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর ডি/৬০৯/২১(এইচ)/এ।

১২. এই সময়ে বাঙলায় কংগ্রেস রাজনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, রজত কান্ত রায়, *সোসাল কনফ্লিক্ট এ্যান্ড পলিটিক্যাল আনরেস্ট ইন বেঙ্গল ১৮৭৫–১৯২৭*, নিউ দিল্লী, ১৯৮৪; বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, *সুভাষচন্দ্র বসু এ্যান্ড মিডল-ক্লাস রেডিক্যালিজম*; তনিকা সরকার, *বেঙ্গল ১৯২৮–১৯৩৪; দি পলিটিকস্ অব প্রোটেস্ট*, নিউ দিল্লী, ১৯৮৭; জে এ গালাঘের (Gallagher), কংগ্রেস ইন ডিক্লাইন।

১৩. *এ্যাডভান্স*, ১৭ই আগস্ট ১৯৩২।

১৪. *লিবার্টি*, ১৭ই আগস্ট ১৯৩২।

১৫. *আনন্দ বাজার পত্রিকা*, ১৭ই আগস্ট ১৯৩২।

১৬. *দৈনিক বসুমতী*, ১৭ই আগস্ট ১৯৩২।

১৭. *অমৃত বাজার পত্রিকা*, ২০শে আগস্ট ১৯৩২।

১৮. জে. এ. গালাঘের (Gallagher), *কংগ্রেস ইন ডিক্লাইন*, পৃ. ৬০২-৬০৭। যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা স্থানীয় ও জেলা বোর্ডের নির্বাচন হত। সেখানে সংরক্ষিত আসন ছিল না।

১৯. বর্ধমান বিভাগে তারা ছিল জনসংখ্যায় শতকরা ১৪.১৪ ভাগ; ১৯২৩-২৪ এবং ১৯৩১-৩২ সালের মধ্যে স্থানীয় বোর্ডগুলোতে মুসলমানদের সদস্য সংখ্যা শতকরা ১১.৮ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫.৪ ভাগ হয়। অপর দিকে, ঢাকা বিভাগে মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা প্রায় ৭১ ভাগ হলেও স্থানীয় বোর্ডগুলোতে তাদের সদস্য সংখ্যা আনুপাতিক হারে ছিল না; ১৯৩২ সাল

নাগাদ তারা শতকরা মাত্র ৬৩.৫ ভাগ আসন লাভ করে। রাজশাহী বিভাগেও তারা পেছনে ছিল। তাদের জনসংখ্যা শতকরা ৬২.২৪ ভাগ হলেও ১৯৩২ সাল নাগাদ তারা (ঐ বছরে) শতকরা মাত্র ৫৪.৯ ভাগ আসনে জয়ী হয়। চট্টগ্রাম বিভাগ ছিল সাধারণ এই নিয়মের ব্যতিক্রম। এটাই ছিল একমাত্র মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বিভাগ যেখানে স্থানীয় বিভাগগুলোতে মুসলমানেরা সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করে। এপেনডিক্স জি, *রেজুলিউশন রিভিউইং দি রিপোর্টস্ অন দি ওয়ার্কিং অব ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ইন বেঙ্গল ডিউরিং দি ইয়ার ১৯২৩-২৪ আনটিল ১৯৩১-৩২*, কোলকাতা, ১৯২৪-৩২।

২০. গালাঘের (Gallagher) এই বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন। বরং তিনি যুক্তি দেখান যে, পশ্চিম বাঙলার জেলাগুলোতে যৌথ নির্বাচনে হিন্দুরা লাভবান হবে এবং পূর্ব বাঙলায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অন্য দিকে বিশ দশকের শেষ ও ত্রিশ দশকের প্রথম দিকে সারা বাঙলায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি ঘটে। বিশেষ করে পশ্চিম বাঙলার হিন্দু প্রধান এলাকাগুলোতে তাদের প্রতিনিধিত্ব, সামগ্রিক জনসংখ্যায় তাদের আনুপাতিক হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্বীকৃত হিন্দুপ্রধান এলাকাগুলোতে মুসলমানেরা হিন্দু আধিপত্যকে প্রকৃতপক্ষে চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করে। এই যে ধারা, তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

২১. অতীতের কথা স্মরণ করে সুভাষ বসু স্বীকার করেন যে, রোয়েদাদ হল একটা 'সাম্রাজ্যবাদী চাতুরী ... এটি ভারতীয়দের এতটাই বিভক্ত করে দেয় যা সামান্য শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের কার্যকারিতাকে যথেষ্টভাবে অকার্যকর করে তুলতে পারে।' তবু তাঁর 'আপত্তি রোয়েদাদের ভিত্তির বিরুদ্ধে ছিল না, তাঁর আপত্তি ছিল এর ফলাফলের বিরুদ্ধে। বাঙলার জনসংখ্যা অনুযায়ী হিন্দু প্রতিনিধিত্বকে স্বীকার করা হলে তিনি হয়ত রোয়েদাদ মোতাবেক আসন বণ্টনকে মেনে নিতেন।' বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, *দি কমিউনাল এওয়ার্ড অব ১৯৩২*, পৃ. ৫১৯।

২২. *অমৃত বাজার পত্রিকা*, ১৮ই আগস্ট ১৯৩২।

২৩. লর্ড জেটল্যান্ডের কাছে বাঙলার হিন্দুদের স্মারকলিপি, ৪ঠা জুন ১৯৩৬। *'বেঙ্গল এ্যান্টি-কমিউনাল এওয়ার্ড মুভমেন্ট, এ রিপোর্ট'* শিরোনামে তা একটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়; কোলকাতা, ১৯৩৬, পৃ. ৪। এতে অন্যান্যের মধ্যে স্বাক্ষর করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, তুলসীচরণ গোস্বামী, রমানন্দ চ্যাটার্জী এবং নারাজোলের রাজা দেবেন্দ্রলাল খান।

২৪. জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় এই মর্মে একটা চিন্তা খুবই শক্তিশালী ছিল যে, কোনো সম্প্রদায়ের 'পশ্চাৎপদতা'ই নিরাপত্তার দাবির জন্য একমাত্র বৈধ ভিত্তি হওয়া উচিত। ঐ চিন্তাধারায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদেরকে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি আবেগপ্রসূত উদারতা ও সমঝোতা প্রকাশের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। দেখুন সর্বপল্লী গোপাল, 'নেহেরু এ্যান্ড মাইনরিটিজ', *ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, খণ্ড ২৩ (স্পেশাল নাম্বার), ৪৫-৪৭, ১৯৮৮, পৃ. ২৪৬৩-২৪৬৬।

২৫. *'বেঙ্গল এ্যান্টি-কমিউনাল এওয়ার্ড মুভমেন্ট'*-এ প্রকাশিত রাধাকুমুদ মুখার্জীর বক্তৃতা, পৃ. ২২। রোয়েদাদকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁর প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি ঐ বক্তৃতা দেন। প্রস্তাবটি আইন সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০-২৬। মুখার্জীর উত্থাপিত বাঙলায় হিন্দু ও মুসলিম দুই জাতির যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের বিষয়টির সঙ্গে এবং প্রায় এক দশকের মধ্যে জিন্নাহ যে পাকিস্তানের দাবি তোলেন তার একটি নিশ্চিত সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। জিন্নাহর পাকিস্তান

দাবির মধ্যকার একটা তুলনামূলক ধারণা স্পষ্ট ও কৌতূহলজনক। পাকিস্তান প্রশ্নে জিন্নাহর যুক্তরাষ্ট্রীয়ভিত্তিক চিন্তাধারা সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন আয়েশা জালাল, *দি সোল স্পোকস্‌ম্যান*, পৃ. ১৭৪-১৭৫, ৫৫২-৫৫৮।

২৬. বি. সি. চ্যাটার্জী, *দি বিট্রেয়াল অব ব্রিটেন এ্যান্ড বেঙ্গল* (তারিখ অনুল্লিখিত)। জেটল্যান্ড কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর ডি/৬০৯/২১/(এইচ) বি।

২৭. এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার জন্য চতুর্থ অধ্যায় দেখুন।

২৮. উদ্বোধনী ভাষণে সভাপতি (কোলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক) সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন: 'আসন্ন সংস্কারের প্রেক্ষাপটে হিন্দুরা তাদের প্রয়োজন ও দাবি সম্পর্কে তাদের রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে গভীর সংকটের মুখোমুখি হয়েছে।' আলবার্ট হলে ১৯৩২ সালের ২৮শে জুলাই কোলকাতার হিন্দু নাগরিকদের সভার রিপোর্ট, গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল, স্পেশাল ব্রাঞ্চ (অতঃপর কেবল জিবিএসবি বলে উল্লেখ করা হবে), ফাইল নং ৬২১৮/৩১।

২৯. *বেঙ্গল এ্যান্টি-কমিউনাল এওয়ার্ড মুভমেন্ট*-এর শিরোনামপত্রে কার্য-নির্বাহকদের নাম যেভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

৩০. স্মারকলিপি প্রদানকারীদের সংবাদ মাধ্যমকে দেয়া বিবৃতি, ১৯৩৬ সালের ২৫শে জুন। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯।

৩১. বাঙলার তিনটি সংখ্যাধিক্য শ্রেণী হল মাহিষ্য, নমঃশূদ্র ও রাজবংশী। তারা একত্রে বাঙলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে ছিল শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ। অপর দিকে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা শতকরা ছিল মাত্র ১৩.৫ ভাগ। *সেন্সাস অব ইন্ডিয়া*, খণ্ড ৫, পৃ. ৪৫৩।

৩২. সম্পূর্ণ নগরভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারা বৈচিত্র্যের বিষয়ে দেখুন সুমন্ত ব্যানার্জী, *দি পারলার এ্যান্ড দি স্ট্রিটস্‌ এলিট এ্যান্ড পপুলার কালচার ইন নাইনটিনথ্‌ সেনচুরি ক্যালকাটা*, কোলকাতা, ১৯৮৯।

৩৩. বর্ধমানের মহারাজা কর্তৃক উপস্থাপিত লর্ড জেটল্যান্ডের কাছে প্রেরিত হিন্দু নেতৃবৃন্দের স্মারকলিপি, ৪ঠা জুন ১৯৩৬। জেটল্যান্ড কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর ২০৭/৬।

৩৪. 'হিন্দু নেতৃবৃন্দের মেনিফেস্টো', তারিখ অনুল্লিখিত, বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল হিন্দু সভা কর্তৃক ১৯৩২ সালে প্রচারিত। জিবিএসবি ফাইল নং ৬২১৮/৩১।

৩৫. *বেঙ্গল এ্যান্টি-কমিউনাল এওয়ার্ড মুভমেন্ট*, পৃ. ৫।

৩৬. চিত্তরঞ্জন দাশ কর্তৃক উদ্ভাবিত চুক্তি – স্থানীয় সংস্থাসমূহে ক্ষমতা ভাগাভাগি সম্পর্কে বাঙলায় হিন্দু ও মুসলমান রাজনীতিকদের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠাই এর মূল বৈশিষ্ট্য। ঐ চুক্তিতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গ্রহণ করা হয় এবং স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, প্রত্যেক জেলার স্থানীয় পরিষদসমূহে শতকরা ৬০ ভাগ আসন হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের। এই চুক্তি অনুযায়ী ১৬টি জেলায় মুসলমানেরা স্থানীয় পরিষদগুলি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করবে, কারণ তারা সেখানে ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ; পশ্চিম ও কেন্দ্রীয় বাঙলার ৯টি জেলার স্থানীয় পরিষদ নিয়ন্ত্রণ করবে হিন্দুরা। কিন্তু ঐ চুক্তি কখনও যেন কার্যকর না হয় সেজন্য কংগ্রেসের ভেতর ও বাইরে এর বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রবল আপত্তি উত্থাপিত হয় এবং বলা হয় যে, তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে ঐ চুক্তিরও

মৃত্যু ঘটে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন রজত রায়, *সোস্যাল আনরেস্ট এ্যান্ড পলিটিক্যাল কনফ্লিক্ট ইন বেঙ্গল*, পৃ. ৩১০-৩১৬; উজ্জ্বলকান্তি দাশ, দি বেঙ্গল প্যাক্ট অব ১৯২৩ এ্যান্ড ইটস্ রিএ্যাকশনস্, *বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট*, খণ্ড ৯৯, ১, ১৮৮, ১৯৮০, পৃ. ২৯-৪৫।

৩৭. ১৯২৪ সালের নির্বাচনে স্বরাজ্য সমর্থকদের পক্ষে প্রচারের জন্য তমিজউদ্দীন খান বিভিন্ন জেলা সফর করেন। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় ঐ পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করেন, দেখুন তাঁর *দি টেস্ট অব টাইম: মাই লাইফ এ্যান্ড ডেইজ*, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১২২।

৩৮. *ঢাকার দাঙ্গা*: রক্ষণশীল মুসলিম পত্রিকা '*শরীয়তে ইসলাম*'-এর সম্পাদকীয়, পঞ্চম বর্ষ, সংখ্যা ২, ফাল্গুন, ১৩৩৬ বাঙলা সাল। উদ্ধৃত মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *বেঙ্গলি মুসলিম পাবলিক ওপিনিয়ন এ্যাজ রিফ্লেক্টেড ইন দি বেঙ্গলি প্রেস: ১৯০১-১৯৩০*, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৯৯।

৩৯. 'কংগ্রেস ও মন্ত্রিত্ব', কংগ্রেস সমর্থক বলে পরিচিত পত্রিকা, *সওগাত*, বর্ষ ৬, নং ১১, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ বাঙলা সাল। উদ্ধৃত মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *বেঙ্গলি মুসলিম পাবলিক ওপিনিয়ন*, পৃ. ৯৯-১০০।

৪০. রোয়েদাদ সম্পর্কে বিদ্যুৎ চক্রবর্তী তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণায় ঐ বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, 'বাঙলায় মুসলমান প্রতিক্রিয়া অনুকূল ছিল' এবং তাঁর যুক্তির সমর্থনে নির্বাচিত মুসলমান রাজনীতিকদের কথা উদ্ধৃত করেন। চক্রবর্তীর মতে, ফজলুল হক ঐ রোয়েদাদকে 'স্পষ্ট অগ্রগতি' বলে গণ্য করেন এবং সে-কারণে তিনি ঐ রোয়েদাদের ব্যাপারে 'সন্তুষ্ট' ছিলেন। বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, *দি কমিউনাল এওয়ার্ড*, পৃ. ৫০৩-৫০৪।

৪১. *অমৃত বাজার পত্রিকা*, ১৭ই আগস্ট ১৯৩২।

৪২. *প্রাগুক্ত*, ১৮ই আগস্ট ১৯৩২। এই মধ্যপন্থী বিবৃতির প্রতিক্রিয়ায় *অমৃত বাজার পত্রিকা* হক সাহেবকে তাঁর 'নিজের ধর্মাবলম্বীদের বিকৃত রুচির সহায়তা' করার জন্য সমালোচনা করে।

৪৩. *অমৃত বাজার পত্রিকা*, ১৮ই আগস্ট ১৯৩২।

৪৪. মুজিবুর রহমান, *মুসলমান*, ২৫শে ডিসেম্বর ১৯২৫। উদ্ধৃত, কেনেথ ম্যাকফারসন, *দি মুসলিম মাইক্রোজম, কোলকাতা, ১৯১৮ টু ১৯৩৫*, ওয়েজবাডেন, ১৯৭৪, পৃ. ৮৬।

৪৫. *অমৃত বাজার পত্রিকা*, ১৮ই আগস্ট ১৯৩২।

৪৬. মৌলভী ফজলুর রহমানের বিবৃতি, *প্রাগুক্ত*, ১৬ই আগস্ট ১৯৩২।

৪৭. *প্রাগুক্ত*, ৭ই আগস্ট ১৯৩২।

৪৮. *বেঙ্গল ভিলেজ সেল্ফ-গভর্নমেন্ট এ্যাক্ট অব ১৯১৯*, *ইউনিয়ন বোর্ড ম্যানুয়াল*, খণ্ড ১, আলিপুর ১৯৩৭।

৪৯. সুভাষচন্দ্র বসু থেকে মতিলাল নেহেরু, ১২ই জুলাই ১৯২৮, এ আই সি সি পেপারস্, ফাইল নং ২/১৯২৮।

৫০. এই অগ্রগতির ব্যাপক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হবে।

৫১. *ইন্ডিয়ান এ্যানুয়াল রেজিস্টার*, ১৯৩২, খণ্ড ২, জুলাই-ডিসেম্বর, পৃ. ১২৬।

৫২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।

৫৩. *স্টেটস্‌ম্যান*, ১২ই অক্টোবর ১৯৩৩। উদ্ধৃত, কেনেথ ম্যাকফারসন, *দি মুসলিম মাইক্রোজম*, পৃ. ১২৬।

৫৪. কথাটিকে ১৯৩২ সালে বেঙ্গল সরকার হিন্দু সমাজের মধ্যে সবচেয়ে নীচু শ্রেণীর লোক অর্থাৎ অস্পৃশ্য জাতিকে বুঝাতে 'তফশিলি সম্প্রদায়' প্রতিশব্দটির ব্যবহার শুরু করেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন এস. কে. গুপ্ত, *দি সিডিউলড্ কাস্টস্ ইন মডার্ন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স: দেয়ার ইমারজেন্সি এ্যাজ এ পলিটিক্যাল পাওয়ার*, নিউ দিল্লী, ১৯৮৫।

৫৫. অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে গান্ধীর মতামত এবং পুনা চুক্তির সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে রবিন্দর কুমার, *গান্ধী, আম্বেদকার এ্যান্ড দি পুনা প্যাক্ট*, অকেশনাল পেপারস্ ইন হিস্ট্রি এ্যান্ড সোসাইটি, নং ২০। নেহেরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম এ্যান্ড লাইব্রেরি, নিউ দিল্লী, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫। সমসাময়িক একটি বিবরণ পাওয়া যায় – পিয়ারীলাল, *দি এপিক ইস্ট*, আহমেদাবাদ, ১৯৩২।

৫৬. ইন্ডিয়ান রাউন্ড টেবল কনফারেন্স (সেকেন্ড সেশন), প্রসিডিংস অব দি ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটি এ্যান্ড দি মাইনরিটিজ কমিটি, ক্যালকাটা, খণ্ড ৩, পৃ. ১৩৮৫। এছাড়া উদ্ধৃতি আছে রবিন্দর কুমার, *গান্ধী, আম্বেদকার এ্যান্ড দি পুনা প্যাক্ট*, পৃ. ১৬।

৫৭. তফশিলি সম্প্রদায়ের রাজনীতিতে উত্থান সম্পর্কে বিস্তারিত ইতিহাসের জন্য দেখুন এস. কে. গুপ্ত, *দি সিডিউলড্ কাস্টস্*।

৫৮. বি. আর. আম্বেদকার, *গান্ধী এ্যান্ড গান্ধীইজম*, জলন্ধর, ১৯৭০, পৃ. ৫৭-৫৮।

৫৯. ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর 'অনশন' দ্রুত মূল ইস্যুতে রূপান্তরিত হলে সেই ক্রমবর্ধমান চাপের কাছে আম্বেদকার-এর নতি স্বীকারের একটা কারণ হল এই যে, তিনি এই ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন যে – গান্ধী যদি মারা যান তাহলে সারা দেশে অস্পৃশ্য ও নীচু শ্রেণীর হিন্দুরা 'ব্যাপক সহিংসতার শিকার' হবে। এই প্রেক্ষিতে গান্ধীর অদ্বিতীয় রাজনৈতিক পদ্ধতির বিরুদ্ধে তাঁর অন্য কিছু করার সুযোগ ছিল কম। দেখুন রবিন্দর কুমার, *গান্ধী, আম্বেদকার এ্যান্ড দি পুনা প্যাক্ট*, পৃ. ২১।

৬০. গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া (জিওআই), হোম পলিটিক্যাল ফাইল নং ৪১/৪/১৯৩২।

৬১. এন. এন. মিত্র (সম্পাদিত), *ইন্ডিয়ান এ্যানুয়াল রেজিস্টার*, ১৯৩৩, খণ্ড ১, জানুয়ারি–জুন, পৃ. ৩।

৬২. বাঙলায় 'তফশিলি 'সম্প্রদায়'-এর তালিকা প্রস্তুত করা হয় 'সামাজিক ও রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতা'র ভিত্তিতে। কারণ মনে করা হয় যে, অস্পৃশ্যতার সংজ্ঞা ও বিচারের নীতি 'প্রদেশের বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে গ্রহণযোগ্য হবে না'। অস্পৃশ্যতার সংজ্ঞার এই ভিত্তিতে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমন 'পশ্চাৎপদ' ৮৬টি শ্রেণীর তালিকা প্রস্তুত করেন। গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল, এ্যাপয়েন্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট। রিফর্মস, রেজুলিউশন ১২২ এ. আর., জেটল্যান্ড কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর ডি/৬০৯/২১(এইচ)/এ।

৬৩. আত্মবিরোধী হলেও একথা সত্য যে, হিন্দু সমাজের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ঐক্যকে দৃঢ় করাই ছিল পুনা চুক্তির লক্ষ্য। তফশিলি সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে ম্যাকডোনাল্ডের ওপর প্রভাব বিস্তার করা গান্ধীর অনশনের উদ্দেশ্য ছিল না, এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তফশিলি সম্প্রদায়ের নেতারা যেন স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিচিতির দাবি না করে। নির্বাচন (ফ্রানসাইজ) কমিশনার মি. লোথিয়ান লক্ষ্য করেন যে, 'ভারতের অন্য কোনো সমস্যার চেয়ে অনুন্নত শ্রেণীর সমস্যা নিয়ে অনেক বেশি অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে ... বিভিন্ন অনুন্নত শ্রেণীর বিষয়ে উচ্চ থেকে নীচু স্তরের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, আর অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরা পৃথক নির্বাচন দাবি করছে এজন্য যে, আইন সভায় নিজেদের

পছন্দমতো প্রতিনিধি পাওয়ার এটাই তাদের জন্য একমাত্র উপায়। উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা এ কারণে খুবই ভীত হয়ে পড়ে যে, হিন্দু সমাজের একটা বড় অংশ অনুন্নত শ্রেণী হিসেবে পৃথক রাজনৈতিক পরিচয়ে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে ভারতে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি হুমকির মুখে পড়েছে ... এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে চলেছে যেখানে মুসলমান, অনুন্নত শ্রেণী এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু শ্রেণী একসঙ্গে মিলে তাদের বিপরীতে সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত হতে পারে।' লোধিয়ান থেকে আন্ডারসন-এর কাছে প্রেরিত, ৪ঠা মে ১৯৩২। জন আন্ডারসন কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/২০৭/৩। গান্ধী এই বিভক্তিকে রোধ করার জন্য অনশন করেন।

৬৪. *সেন্সাস অব ইন্ডিয়া,* খণ্ড ৫, পৃ. ২৮৯।

৬৫. *প্রাগুক্ত,* দ্বাদশ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৯৪-৫০১। সেন্সাসের বিভিন্ন খণ্ড ও গেজেটিয়ারে জাতিসমূহের সংখ্যা ও শ্রেণীকরণ সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা প্রয়োজন। স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় এমন বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দিয়ে প্রশাসকেরা যেভাবে জাতিসমূহকে দেখত ও পরিমাপ করত এক্ষেত্রে প্রায় সেটাই অনুসৃত হয়েছে। সেন্সাসে উল্লিখিত তথ্য ব্যবহারের কতিপয় সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন এম. সিংগার ও বি. এস. কোহন (সম্পাদিত), *স্ট্রাকচার এ্যান্ড চেঞ্জ ইন ইন্ডিয়ান সোসাইটি,* শিকাগো; ১৯৬৪-তে প্রকাশিত বার্নার্ড কোহন, 'নোটস্ অন দি হিস্ট্রি অব দি স্টাডি অব ইন্ডিয়ান সোসাইটি এ্যান্ড কালচার'; রাশমী পান্থ, 'দি কগনিটিভ স্ট্যাটাস অব কাস্ট ইন কলোনিয়াল এথনোগ্রাফি: এ রিভিউ অব সাম লিটারেচার অন দি নর্থ ওয়েস্ট প্রভিন্সেস এ্যান্ড আওধ', *ইন্ডিয়ান ইকোনমিক এ্যান্ড সোস্যাল হিস্ট্রি রিভিউ,* খণ্ড ২৪, ২, ১৯৮৭, পৃ. ১৪৫-১৬২। কিন্তু ঐসব তালিকা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করলে তাতে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় এবং সেই সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যাবে যাতে মনে হবে তারা 'হিন্দুত্ব' ও 'হিন্দু সমাজে'র ব্যাপক পরিচিতিতে সহাবস্থান করে আসছে।

৬৬. *সেন্সাস অব ইন্ডিয়া,* খণ্ড ৫, পৃ. ৪৯৯।

৬৭. ১৯১১ সালে বাঙলায় ১৫,৭০,০০০ শ্রমিকের মধ্যে ১৪,৪২,০০০ শ্রমিক ছিল 'অনুন্নত শ্রেণী'র। প্রদেশের মোট কৃষকদের মধ্যেও তারা ছিল শতকরা ৬০ ভাগ। এস. কে. গুপ্ত, *দি সিডিউল্ড কাস্টস্ ইন মডার্ন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স,* পৃ. ৯৯।

৬৮. হাশিম আমীর আলী, 'রুরাল রিসার্চ ইন টেগোরস্ শ্রীনেকতন', *মডার্ন রিভিউ,* খণ্ড ৫৬, ১-৬, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ৪২। শান্তিনিকেতনের একটি গ্রুপ কর্তৃক কয়েকটি গ্রাম জরিপের ফলাফল এতে তুলনামূলকভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

৬৯. *হু আর দি ডিপ্রেসড্ ক্লাসেস ইন বেঙ্গল? হোয়াট ইজ দেয়ার নাম্বার?* – হিন্দু মহাসভা, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রচারিত পুস্তিকা। জেটল্যান্ড কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর ডি/৬০৯/২১/এইচ বি।

৭০. *অমৃত বাজার পত্রিকা,* ১লা জানুয়ারি ১৯২৮।

৭১. তনিকা সরকার, *বেঙ্গল ১৯২৮-১৯৩৪,* পৃ. ৩৯-৪০।

৭২. স্বপন দাশগুপ্ত, 'আদিবাসী পলিটিক্স ইন মিদনাপুর, সি ১৭৬০-১৯২৪', রনজিৎ গুহ (সম্পাদিত), *সাবল্টার্ন স্টাডিজ ৪,* নিউ দিল্লী, ১৯৮৫।

৭৩. তনিকা সরকার, *বেঙ্গল ১৯২৮-১৯৩৪*, পৃ. ২৬-২৭।

৭৪. তনিকা সরকার, 'জিতু সান্তাল'স্ মুভমেন্ট ইন মালদা, ১৯২৪-১৯৩২ : এ স্টাডি ইন ট্রাইবাল প্রোটেস্ট,' রনজিৎ গুহ (সম্পাদিত), *সাবলটার্ন স্টাডিজ ৪*, পৃ. ১৩৬।

৭৫. 'বর্ণাশ্রমধর্ম' কথাটির মধ্য দিয়ে বেদ-এ নির্দেশিত জীবনের চারটি স্তরের কর্তব্য সম্পর্কিত দর্শন বর্ণিত হয়েছে।

৭৬. সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, *ভারতে সাম্যবাদ*, কোলকাতা, ১৯৩০। উদ্ধৃত, তনিকা সরকার, *বেঙ্গল ১৯২৮-৩৪*, পৃ. ২৭-২৮।

৭৭. লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলি ডিবেটস অন দি আনটাচেবিলিটি এ্যাবোলিশন বিল, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া, হোম পলিটিক্যাল ফাইলস্ ৫০/৭/৩৩ এবং ৫০/১১/৩৪।

৭৮. লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলি ডিবেটস অন দি আনটাচেবিলিটি এ্যাবোলিশন বিল, ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪। জিওআই, হোম পলিটিক্যাল ফাইল নং ৫০/৭/৩৩, এন এ আই।

৭৯. 'অপিনিয়নস অন দি আনটাচেবিলিটি এ্যাবোলিশন বিল', নং ১, *প্রাগুক্ত।*

৮০. পবিত্রতা, শুদ্ধতা ও পুরোহিততন্ত্র এবং জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন লুইস ডিউমন্ট, *হোমো হায়ারার্কিকাস – দি কাস্ট সিস্টেম এ্যান্ড ইটস্ ইমপ্লিকেশন্স্* (মার্ক সেইন্সবুরি কর্তৃক অনূদিত), লন্ডন, ১৯৭০।

৮১. তারাকৃষ্ণ বসু, 'গোয়ালপাড়া নোটস্', হাশিম আমীর আলী, *দেন এ্যান্ড নাউ (১৯৩৩-১৯৫৮)-এ স্টাডি অব সোসিও-ইকোনমিক স্ট্রাকচার এ্যান্ড চেঞ্জ ইন সাম ভিলেজেস্ নিয়ার বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি, বেঙ্গল*, নিউ দিল্লী, ১৯৬০-এর পরিশিষ্ট এ।

৮২. *প্রাগুক্ত*।

৮৩. জিতেন তালুকদার, 'বেনুরিয়া নোটস্', পরিশিষ্ট বি, *প্রাগুক্ত*।

৮৪. এস. কে. গুপ্ত, *দি সিডিউল্ড কাস্টস্ ইন মডার্ন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স*, পৃ. ৯৯-১০০। এইচ. এইচ. রেইজলি বাঙলায় এমন কোনো শ্রেণীর কথা বলেননি 'যাদের স্পর্শ' অপবিত্র করে দেয়। এইচ. এইচ. রেইজলি, *দি ট্রাইবস্ এ্যান্ড কাস্টস্ অব বেঙ্গল, ইথ্নোগ্রাফিক্যাল গ্লোসারি*, কোলকাতা, ১৮৯১।

৮৫. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *কাস্ট, পলিটিক্স এ্যান্ড দি রাজ, বেঙ্গল ১৮৭২-১৯৩৭*, কোলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ১৮।

৮৬. পার্থ চ্যাটার্জী, 'কাস্ট এ্যান্ড পলিটিক্স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল', গেইল অমভেট (সম্পাদিত), '*ল্যান্ড, কাস্ট এ্যান্ড পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়ান স্টেটস*', নিউ দিল্লী, ১৯৮২, পৃ. ৮৮-১০১, এন ২।

৮৭. বাঙালি মুসলমানদের বংশ ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন ক্যারোল প্রিন্ডল, 'অকুপেশন এ্যান্ড অর্থোপ্রেক্সি ইন বেঙ্গলি মুসলিম র‍্যাংক', ক্যাথারিন পি এউইন (সম্পাদিত), *শরিয়াত এ্যান্ড এ্যামবিগুইটি ইন সাউথ এশিয়ান ইসলাম*, নিউ দিল্লী, ১৯৮৮।

৮৮. এফ. ডাব্লু. স্ট্রং, *ইস্টার্ন বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার – দিনাজপুর*, এলাহাবাদ, ১৯১২, পৃ. ৩৬-৩৭। উদ্ধৃত, গৌতম ভদ্র, 'দি মেন্টালিটি অব সাবলটার্নিটি: *কান্তনামা* অর *রাজধর্ম*', রনজিৎ গুহ (সম্পাদিত), *সাবলটার্ন স্টাডিজ ৪*, নিউ দিল্লী, ১৯৮৯।

৮৯. এর মধ্যে একমাত্র চৈতন্যের সম্প্রদায় ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, জে. এন. ভট্টাচার্য, '*হিন্দু কাস্টস এ্যান্ড সেক্টস*, কোলকাতা, ১৯৭৩; রমাকান্ত চক্রবর্তী, '*বৈষ্ণবিজম ইন বেঙ্গল*', কোলকাতা, ১৯৮৫ এবং এস. দাশগুপ্ত, '*অবসকিউর রিলিজিয়াস কাল্টস*, কোলকাতা, ১৯৬৯। আরও কত বিচিত্রভাবে নীচ বর্ণের গোত্রগুলি ব্রাহ্মণ্য ধর্মমতের সঙ্গে ঐ ধর্মমতের বিরোধী ধর্ম বিশ্বাস একই সঙ্গে পালন করে তার চমৎকার বিবরণের জন্য দেখুন সুমিত সরকার, 'দি কল্কি অবতার অব বিক্রমপুর: এ ভিলেজ স্ক্যান্ডাল ইন আর্লি টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি বেঙ্গল', এবং পার্থ চ্যাটার্জী, 'কাস্ট এ্যান্ড সাবলটার্ন কনসাসনেস'– *সাবলটার্ন স্টাডিজ ৪*।

৯০. এস. কে. গুপ্ত, '*দি সিডিউল্ড কাস্টস্ ইন মডার্ন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স*, পৃ. ৯৯-১০০।

৯১. গৌতম ভদ্র, 'দি মেন্টালিটি অব সাবলটার্নিটি', পৃ. ৬০।

৯২. *সেন্সাস অব ইন্ডিয়া*, ১৯৩১, খণ্ড ৫, পৃ. ৩৯৩। ঐসব প্রশ্নের উত্তরে এত 'দুর্বল সাড়া' পাওয়া যায় যে তাতে সেন্সাস কমিশনার হতাশ হন। দৃশ্যত তিনি সন্দেহ পোষণ করেন যে, হিন্দুদের মধ্যে একটা বড় অংশ প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী এক বা একাধিক গোত্র বা প্রথার সঙ্গে যুক্ত।

৯৩. রমাকান্ত চক্রবর্তী তাঁর *বৈষ্ণবিজম ইন বেঙ্গল* পুস্তকে এমন শ্রেণীর মোট সংখ্যা ছাপ্পান্ন বলে উল্লেখ করেছেন, পৃ. ৩৪৯।

৯৪. এসব মতবাদ ধার করা হয়েছে নিম্নলিখিত পুস্তক থেকে – এরিখ হসবম ও টেরেন্স রেঞ্জার (সম্পাদিত), *দি ইনভেনশন অব ট্রেডিশন*, কেমব্রিজ, ১৯৮৪; বেনেডিক্ট এ্যান্ডারসন, *ইমাজিনড় কমিউনিটিজ – রিফ্লেকশনস্ অন দি অরিজিন এ্যান্ড স্প্রেড অব ন্যাশনালিজম*, লন্ডন, ১৯৯০।

৯৫. এই চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে ভদ্রলোক রাজনীতিকদের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হবে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে।

৯৬. বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে জে. এল. ব্যানার্জীর বক্তৃতা, ১৪ই মার্চ ১৯৩৩। *ইন্ডিয়ান এ্যানুয়াল রেজিস্টার*, ১৯৩৩, খণ্ড ১, জানুয়ারি–জুন, পৃ. ১২।

৯৭. ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উদ্যোগে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দুদের এক সভায় পাস করা প্রস্তাব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৯।

৯৮. গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, '*কনস্ট্রেনস্ ইন বেঙ্গল পলিটিক্স ১৯২১-৪১, গান্ধীয়ান লিডারশীপ*', কোলকাতা, ১৯৮৪; লিওনার্ড গর্ডন, *বেঙ্গল : দি ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট*। উভয় পুস্তকে বাঙালি কংগ্রেস নেতা-কর্মী এবং কেন্দ্রে গান্ধীর নেতৃত্বের কোন্দল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৯৯. উত্তরাধিকার নিয়ে লড়াই এবং মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গান্ধীর ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য দেখুন রজতকান্ত রায়, *সোস্যাল কনফ্লিক্ট এ্যান্ড পলিটিক্যাল আনরেস্ট ইন বেঙ্গল*, পৃ. ৩৪৫-৫০।

১০০. *প্রোপজালস্ ফর ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনাল রিফর্ম*, কমান্ড ৪২৬৮ অব ১৯৩৩।

১০১. দলের তৎকালীন জেনারেল সেক্রেটারি জে. বি. কৃপালনী পরে বলেন: 'ক্ষমতা গ্রহণের জন্য জনমত এতটা প্রবল ছিল তা কেউ কল্পনা করতে পারেনি ... পাঞ্জাব ও বেঙ্গল ছাড়া সব প্রদেশই ছিল ক্ষমতা গ্রহণের পক্ষে।' কৃপালনী টু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬।

বি. এন. পাণ্ডে, *দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট, ১৮৮৫–১৯৪৭, সিলেক্ট ডকুমেন্টস*, লন্ডন, ১৯৭৯, পৃ. ৯৮।

১০২. বি. সি. রায় পেপারস, পার্ট ২, সাবজেক্ট ফাইল ৩৩/১৯৩৩।

১০৩. এম. এন. মিত্র (সম্পাদিত), *ইন্ডিয়ান এ্যানুয়াল রেজিস্টার*, খণ্ড ২, জুলাই–ডিসেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ২০৭।

১০৪. জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গান্ধীর উদ্বেগকে বাঙলার অনেক মুসলমান কংগ্রেস নেতা-কর্মী স্বাগত জানায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে আবুল মনসুর আহমদের কথা বলা যায়; তিনি বলেন: 'কংগ্রেস এই মধ্যপন্থী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া দেশকে একটা আসন্ন বিপর্যয় হইতে রক্ষা করিল।' আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ. ৮৫-৮৬।

১০৫. কে. এম. মুনশী টু গান্ধী, ৮ই জুন ১৯৩৪। কে. এম. মুনশী, *ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনাল ডকুমেন্টস্, খণ্ড ১, পিলগ্রিমেজ টু ফ্রিডম*, বোম্বে, ১৯৬৭, পৃ. ৩৭৫।

১০৬. পাবনা জেলা সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক পাসকৃত প্রস্তাব, এ আই সি সি পেপারস্, ফাইল নং জি-২৪/১৯৩৪-৩৬।

১০৭. ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের বিরোধিতা করে প্রস্তাব দেয় ঝিনাইদহ, পাবনা, বীরভূম, বর্ধমান, কোলকাতা, হিলি, বরিশাল, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া কংগ্রেস কমিটিগুলো। এসব বিষয় ও নেতা-কর্মীদের দুর্দশার বর্ণনা করা হয়েছে এমন বেশ কিছু দলিল পাওয়া যাবে এ আই সি সি পেপারস্-এ, ফাইল নং জি ২৪/১৯৩৪-৩৬।

১০৮. এন. এন. মিত্র (সম্পাদনা), *ইন্ডিয়ান এ্যানুয়াল রেজিস্টার*, খণ্ড ১, জানুয়ারি–জুন ১৯৩৫, পৃ. ১২।

১০৯. দশ বছর পর কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সংক্রান্ত বিরোধে কিছু কিছু বিষয়ে গভীরে ঢোকার চেষ্টা করে। এমন এক ঘটনায় তৎকালীন সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক জে. বি. কৃপালনী স্পষ্টত সমস্যা অনুধাবনে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হন। তাঁর সীমাবদ্ধতা বুঝতে তিনি সমর্থ হন, আর সেটা প্রকাশ পায় যখন তিনি এ সময় বাঙলার একজন আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে লেখেন: 'বলতে দ্বিধা নেই যে এই অফিস আপনাকে রক্ষা করতে সামান্যই সাহায্য করতে পারে। কেবল এক বাঙালিই অন্য অপর বাঙালিকে পাকড়াও করতে পারে।' দেখুন জে. বি. কৃপালনী থেকে জে. কে. ধর-এর কাছে প্রেরিত, ১৮ই জুলাই ১৯৩৯, এ আই সি সি পেপারস্, ফাইল নং পি-৫ (পার্ট-১)/ ১৯৩৯-৪০।

১১০. বসু এবং সেনগুপ্তের মধ্যে সমঝোতা প্রচেষ্টার পরিবর্তে গান্ধী ১৯২৭ সালে কোলকাতার তিনটি অমীমাংসিত 'মুকুট' সেনগুপ্তকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ঐ তিনটি 'মুকুট' হল – বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, কোলকাতার মেয়র এবং কাউন্সিলে স্বরাজ্য পার্টির নেতৃত্ব।

১১১. দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বসু গ্রুপের প্রতিনিধিত্বকারী কিরণ শংকর রায় ওয়ার্কিং কমিটির মধ্যস্থতাকারী পি. সীতারামাইয়াকে ১৯২৯ সালে লেখেন: 'আমরা মনে করি যে, আপনি একজন বিচারক হওয়ার যোগ্য নন এবং ঘটনা সম্পর্কে নিরপেক্ষ রিপোর্ট করার যোগ্যতা আপনার আছে কিনা আমাদের সন্দেহ আছে।' কিরণ শংকর রায় থেকে পি. সিতারামাইয়ার কাছে প্রেরিত, এ আই সি সি পেপারস, ফাইল নং জি ১২০/১৯২৯।

১১২. কোলকাতায় জাতীয়তাবাদীদের সম্মেলনে পাস করা প্রস্তাব, ১৮ই আগস্ট ১৯৩৪। এন. এন. মিত্র (সম্পাদিত), *ইন্ডিয়ান এনুয়াল রেজিস্টার*, খণ্ড ২, জুলাই–ডিসেম্বর ১৯৩৪, পৃ. ২১২।

১১৩. 'ক্ষমতাধর পাঁচ' ব্যক্তির মধ্যে অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন – সুভাষচন্দ্র বসুর বড় ভাই ও খ্যাতনামা ব্যারিস্টার শরৎচন্দ্র বসু, রাজা কিশোরী লাল গোস্বামীর পুত্র তুলসী গোস্বামী (জমিদারি দেখাশোনা করার জন্য তিনি অক্সফোর্ড থেকে ফিরে আসেন এবং পাটের ব্যবসায়েও তাঁর যথেষ্ট স্বার্থ ছিল), ধনাঢ্য সলিসিটর নির্মলচন্দ্র চন্দর এবং বিমা ব্যবসায়ে বিত্ত অর্জনকারী প্রথম বাঙালিদের একজন ধনী ব্যক্তি নলিনী রঞ্জন সরকার।

১১৪. সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, এনএমএমএল ওরাল ট্রান্সক্রিপ্ট নং ৩০১, পৃ. ১২৫-১২৬।

১১৫. আর. পাল চৌধুরী থেকে বি. সি. রায়-এর কাছে প্রেরিত, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৩৪। বি. সি. রায় পেপারস্, পার্ট ২, ফাইল নং ৩৬ (অংশ ১)/১৯৩৩-৩৪।

১১৬. শরৎ বসুর কাছ থেকে জওহরলাল নেহেরুর কাছে পাঠানো পত্রের সংলগ্নী, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৬, এ আই সি সি পেপারস, ফাইল নং জি-২৪। ১৯৩৪-৩৬।

১১৭. বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি রিপোর্ট, এ আই সি সি পেপারস্, ফাইল নং পি-৬ (অংশ ১)/১৯৩৬।

১১৮. বিধানচন্দ্র রায় থেকে গোবিন্দ বল্লভ পন্থ-এর কাছে প্রেরিত, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৩৬, *প্রাগুক্ত*।

১১৯. ন্যাশনালিস্ট পার্টির জগৎ নারায়ণ লালের কাছে জওহরলাল নেহেরু কর্তৃক প্রেরিত, ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৬, এ আই সি সি পেপারস, ফাইল নং ২৪/১৯৩৬।

১২০. গান্ধী থেকে বি. সি. রায়-এর কাছে প্রেরিত, ৩০শে আগস্ট ১৯৩৪; বি. সি. রায় পেপারস্, অংশ ২, ফাইল নং ৩৬ (অংশ ১)/১৯৩৩-৩৪।

১২১. মওলানা এ. কে. আজাদের প্রচারিত বিবৃতি, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৩৪, *প্রাগুক্ত*।

১২২. বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারির কাছ থেকে ওয়ার্কিং কমিটির সব সদস্যের কাছে প্রেরিত, ১৩ই নভেম্বর ১৯৩৬। এ আই সি সি পেপারস্, ফাইল নং ২৪/৭১০/১৯৩।

১২৩. বলা হয়ে থাকে যে, তিনি এমনভাবে জীবনযাপন করতেন যা একজন ইংরেজ ব্যারিস্টার বা বিচারকের জীবনযাপন পদ্ধতির চেয়ে পৃথক ছিল না। জিওআই, হোম পলিটিক্যাল ফাইল নং ৩১/২৭/৩২।

১২৪. পুলিশ কমিশনার উল্লেখ করেন যে, ১৯২৮ সালে শরৎ বসু 'বিপ্লবী দলে'র আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন এবং ঐ দলের কর্মীদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য 'বেঙ্গল ইনসিওরেন্স এ্যান্ড রিয়েল প্রপার্টি কোম্পানি'র পরিচালন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে মনোরঞ্জন গুপ্ত ও অন্যান্য সন্ত্রাসীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। চার্লস টেগার্ট, হিস্ট্রি শিট এ্যান্ড সিনপসিস অব শরৎ বোস'জ এ্যাকটিভিটিজ, জিওআই, হোম পলিটিক্যাল ফাইল নং ৩১/২৭/৩২।

১২৫. কল্পনা দত্ত (চট্টগ্রাম অস্ত্র লুণ্ঠন-এর একজন প্রধান ব্যক্তিত্ব) পরে বলেন: '১৯২৯ সালের কংগ্রেস নির্বাচনে সূর্য সেনের এই গ্রুপ (যুগান্তর) প্রাদেশিক নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র বসুকে ভোট দেয় এবং সূর্য সেনকে সেক্রেটারি পদে নির্বাচিত করা সহ জেলা (চট্টগ্রাম) কংগ্রেস-এর সকল পদ দখল করে নেয়।' কল্পনা দত্ত, *চিটাগাং আরমারি রেইডার্স, রেমিনিসসেনসেস*, নিউ দিল্লী, ১৯৭৯, পৃ. ৩।

১২৬. চার্লস টেগার্ট, হিস্ট্রি শিট এ্যান্ড সিনপসিস অব শরৎ বোস'জ এ্যাকটিভিটিস, জিওআই, হোম পলিটিক্যাল ফাইল নং ৩১/২৭/৩২। শরৎ বসুর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, *শরৎ বোস কমেমোরেশান ভলিউম*, শরৎ বসু একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত, কোলকাতা, ১৯৮২ এবং শিশির কুমার বোস, *রিমেমবারিং মাই ফাদার*, কোলকাতা, ১৯৮৮। ঐ সময়ে বাঙলার রাজনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য সূত্র হিসেবে শরৎ ও সুভাষ বসুর ব্যক্তিগত কাগজ-পত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐসব নথিপত্রকে সব গবেষকদের সম্পদ হিসেবে গণ্য না করে তা পারিবারিক সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়।

১২৭. বি পি সি সি'র অফিস কর্মকর্তাদের তালিকা: এ আই সি সি পেপারস্, ফাইল নং পি-৬ (পার্ট ১)/ ১৯৩৬।

১২৮. বি পি সি সি'র সেক্রেটারির কাছে জওহরলাল নেহেরু, ১৩ই জুলাই ১৯৩৩, এ আই সি সি পেপারস্, ফাইল নং পি-৬ (পার্ট ২)/১৯৩৬।

১২৯. বি পি সি সি প্রস্তাব, ১২ই জুলাই ১৯৩৬। জওহরলালের কাছে প্রেরিত বি পি সি সি সেক্রেটারির সংলগ্নী, ১৮ই জুলাই ১৯৩৬, এ আই সি সি পেপারস্, ফাইল নং পি-৬ (অংশ ১)/ ১৯৩৬।

১৩০. *প্রাগুক্ত*।

১৩১. বি পি সি সি সেক্রেটারির কাছে জওহরলাল নেহেরু, ৬ই আগস্ট ১৯৩৬, প্রাগুক্ত।

১৩২. জওহরলাল নেহেরুর কাছে বি পি সি সি সেক্রেটারি, ১৩ই আগস্ট ১৯৩৬, এ আই সি সি পেপারস্, ফাইল নং পি-৬ (অংশ ১)/ ১৯৩৬।

১৩৩. শরৎচন্দ্র বসুর কাছে জওহরলাল নেহেরু, ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৬। *শরৎ বোস কমেমোরেশান ভলিউম*, পৃ. ২২৬-২২৭।

১৩৪. বি. সি. রায়ের কাছে বল্লভ ভাই প্যাটেল, ৯ই অক্টোবর ১৯৩৬, এ আই সি সি পেপারস্, ফাইল নং জি-২৪/৭১০/ ১৯৩৬। আরও উদ্ধৃত হয়েছে জে. এ. গালাঘের, *কংগ্রেস ইন ডিক্লাইন*, পৃ. ৬৪১।

১৩৫. ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের কাছে বি পি সি সি সেক্রেটারি, ১৩ই নভেম্বর ১৯৩৬, *প্রাগুক্ত*।

১৩৬. ড. সৈয়দ মাহমুদের কাছে সুনীল কুমার বসু, ৫ই মে ১৯৩৪, এ আই সি সি পেপারস্, ফাইল নং জি-২৫/১৯৩৪-৩৫।

১৩৭. জওহরলাল নেহেরুর কাছে অমূল্যপ্রসাদচন্দ্র, ২৩শে নভেম্বর ১৯৩৭, এ আই সি সি পেপারস্, ফাইল নং পি-৫ (অংশ ১)/১৯৩৭।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাঙলার রাজনীতিতে মফস্বলের অভ্যুদয়

এটা বলা হয়ে থাকে যে, বাঙলার ওপর কোলকাতা শহর যেভাবে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করে থাকে ভারতের অন্য কোনো শহর তার নিজের অঞ্চলের ওপর তেমনভাবে করে না।[১] অবশ্য ১৯৩০ সালের দিকে পল্লি অঞ্চল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান এলাকা হিসেবে আবির্ভূত হয়। আলোচনা ও বিতর্কের ক্ষেত্রে গ্রামীণ বিষয়াদি প্রাধান্য পেতে শুরু করে এবং নগরভিত্তিক বিষয়ের প্রাধান্য ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে, ফলে কোলকাতা তার অতীতের প্রাধান্য কিছুটা হারিয়ে ফেলে। বাঙলার রাজনীতিতে মফস্বলের উত্থানের সাথে ত্রিশের দশকে দুটো বিষয় লক্ষ করা যায়। প্রথমটি হল, অর্থনৈতিক মন্দা এবং এর ফলে কৃষি উৎপাদন সম্পর্কিত সঙ্কট; দ্বিতীয়টি হল, ১৯৩৫ সালের সংস্কার আইনের ফলে নতুন ভোটাধিকারপ্রাপ্ত গ্রামীণ নির্বাচকমণ্ডলীর ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও প্রতিপত্তি। অর্থনৈতিক মন্দা ও কৃষি সঙ্কটের কারণে মফস্বলে অস্থিরতা ও সংঘর্ষ বৃদ্ধি পায়, আর ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন এই সংঘর্ষকে প্রাদেশিক আইন সভার অভ্যন্তরে টেনে আনে। পল্লি এলাকাকে রাজনীতিকরণের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে 'সাম্প্রদায়িক' ধারার রাজনীতির ক্রমবর্ধমান মেরুকরণ। পরবর্তী দু' দশকে বাঙালি রাজনীতির গতিধারা গঠনে মূল ভূমিকা পালন করে পল্লি অঞ্চলের ঐ রাজনীতিকরণ প্রক্রিয়া।

কোলকাতা একটা বড় শহর হওয়া সত্ত্বেও বাঙলা হল প্রধানত একটা গ্রামীণ সমাজ। গঙ্গা অববাহিকায় জালের মতো ছড়ানো এই নদী অঞ্চল এক সময় খুবই উর্বর ছিল; ভারতের অন্যান্য এলাকায় এখান থেকে চাল রপ্তানি করা হত। কিন্তু ক্রমান্বয়ে বাঙলার নদী ব্যবস্থার অবনতি, রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণের ফলে যার আরও অবনতি ঘটে এবং অববাহিকার কিছু কিছু এলাকায়, বিশেষ করে পশ্চিম ও উত্তর বাঙলায়, ভূমিস্তর পানিতে প্লাবিত হবার স্তর থেকেও উঁচু হয়ে যাওয়ায় জমির উর্বরতা কমে যায়।[২] পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোর জমির উর্বরতা বজায় থাকলেও বিংশ শতাব্দীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ায় কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে জমিতে উৎপাদনের হার কমতে থাকে এবং ১৯৩০ সালের দিকে বাঙলা চাল আমদানির এলাকায় পরিণত হয়।[৩]

বাঙলায় অধিকাংশ ভূমি চাষাবাদ করে ছোট ছোট জমির মালিক রায়তেরা (চাষি)[৪], তবে সারা প্রদেশের চিত্র একরকম নয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে জমির মালিকানা ও রায়তি স্বত্বের ক্ষেত্রে একটি জটিল অবস্থার উদ্ভব হয়। জমির এবং রাজস্ব জমাদানকারী জমিদারদের মাঝে একটি বিশাল মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়।[৫] খাজনা আদায়ের বিস্তৃত ও প্রায় অপরিবর্তনীয় কাঠামোর গুরুভার বহন করা সত্ত্বেও কৃষকদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যথেষ্ট সমৃদ্ধি অর্জন করে। এর ফলে সাধারণ রায়তদের তুলনায় তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়; আর অন্যরা বর্গাদার বা বর্গাচাষি ও কৃষি শ্রমিকে পরিণত হয়।[৬] এই সমৃদ্ধ কৃষকেরা, যারা এখন বই-পুস্তকে শ্রেণীগত পরিভাষায় 'জোতদার'[৭] হিসেবে পরিচিত তারা, সম্মিলিতভাবে জমিদারের বর্ধিত খাজনা, জমি হস্তান্তর বাবদ সালামি ও অন্যান্য স্থানীয় ট্যাক্স (আবওয়াব) প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। প্রজাস্বত্ব আইন চালুর ফলে, ১৮৮৫ সালের আইন প্রবর্তনের পর, সম্পত্তির মালিকানা স্বত্বের চেয়ে তার উপর রায়তি স্বত্বের 'প্রচলিত' অধিকারকে আরও শক্তিশালী করে। খাজনা খেলাপি চাষিরা জমিদারদের দাবির বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিতে পারে এবং এর আওতায় জমিদারদের বিরুদ্ধে জোতদারদের হাত আরও শক্তিশালী হয়।[৮] এই শতাব্দীতে অর্থনীতিতে চিনি (আখ), পাট ও পান চাষের মতো নগদ অর্থকরী ফসল অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় রায়তদের মধ্যকার ব্যবধান ত্বরান্বিত হয়। যেসব কৃষক পরিবারের কাছে কিছু নগদ অর্থ ছিল এবং যারা ঐসব নতুন ফসল উৎপাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক নিয়োগ করতে পারত তাদের জন্য বাড়তি সুযোগের সৃষ্টি হয়। পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলার গরিব কৃষক পরিবারগুলোও দাদন ব্যবসায়ী বা অর্থলগ্নীকারকদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে পাট চাষ শুরু করে। কিন্তু পাট বিক্রি করে তারা যে লাভ করতে পারত তা ধার করা অর্থের সুদ যোগাতেই শেষ হয়ে যেত। ফলে ঐসব পরিবার আগের চেয়ে আরও গরিব হয়ে পড়ে এবং ঋণের চক্রে আটকা পড়ে যায়।

গ্রামীণ বাঙলার কৃষক শ্রেণীর মধ্যকার পার্থক্যের মাত্রা ও চাষকেন্দ্রিক সম্পর্কের কাঠামো জেলা থেকে জেলা এবং অঞ্চল থেকে অঞ্চলে বিভিন্ন রকম ছিল। আঁদ্রে বেতিলি ১৯৭৪ সালে উল্লেখ করেন যে, জোতদার-বর্গাদার (ধনী কৃষক-ভাগচাষি) সম্পর্ক এবং এর ফলে সৃষ্ট উচ্চ মাত্রার ব্যবধান উত্তর বাঙলায় কয়েকটি জেলায় এবং ২৪ পরগণা জেলায় নতুনভাবে উদ্ধারকৃত আবাদি জমির এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল।[৯] এই ভিত্তিকে অবলম্বন করে অতি সাম্প্রতিক কালে সুগত বসু বলেন যে, জমিদারদের কর্তৃত্ব প্রতিহত করতে যথেষ্ট শক্তিশালী জোতদার-রায়তেরা ছিল জোতদার-বর্গাদারদের সম্পর্কের কাঠামোয় সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলে এই চিত্রটি ছিল ভিন্ন রকম; পূর্ব বাঙলার ঘন জনবসতিপূর্ণ জেলাগুলোতে তুলনামূলকভাবে অভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রাধান্য ছিল, অথচ পশ্চিম বাঙলার জমিদারেরা বিশেষ করে নিজস্ব খাস জমিতে উৎপাদন তদারকি ও কৃষি শ্রমিক নিয়োগের কাজে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিল। এই অঞ্চলে এদেরকেই অতি উন্নত শ্রেণীর লোক বলে বসু মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে, উত্তর বাঙলার সীমান্ত অঞ্চল

ও সাম্প্রতিককালে চাষাবাদের আওতায় আসা ২৪ পরগণা জেলার কিছু এলাকা ছাড়া অন্য কোথাও ধনী কৃষক বা জোতদার ছিল না। তিনি আরও বলেন যে, ত্রিশ দশকের প্রথম ভাগের পূর্বে জমিদারি ক্ষমতা হ্রাস পায়নি; শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে জমিদারি আয় হ্রাস পেলেও খাজনার বদলে অর্থলগ্নী বা ঋণ দান আয়ের প্রধান সূত্র হিসেবে গণ্য হয় এবং নতুন প্রজন্মের জমিদার-অর্থলগ্নীকারী বা তালুকদার-মহাজনদের ক্ষমতা আয়ের স্থানকে দখল করে।[১০]

গ্রামীণ বাঙলার কৃষি ভূমি সম্পর্কিত বিষয়ে স্থানীয় ও আঞ্চলিক পার্থক্যের চিত্র বসুর গবেষণা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তদুপরি, সাধারণ কৃষকদের চাষাবাদে ঋণ দানের ক্রমবর্ধমান মূল ভূমিকা এবং পরিবর্তিত বিশ্ব বাজারে ঐ অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান অরক্ষিত অবস্থাও ঐ গবেষণায় স্থান পায়। তবে বিংশ শতাব্দীতে বাঙলায় কৃষকদের শ্রেণীগত পার্থক্যে ব্যতিক্রম ছিল এবং তা উত্তর বাঙলার সীমান্ত এলাকার কিছু কিছু অঞ্চলে ও সুন্দরবন এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল বলে তিনি যে যুক্তি উপস্থাপন করেন তা অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। বুকানন-হ্যামিলটন যেসব অতি ক্ষমতাধর ও সম্পদশালী জোতদার সম্পর্কে বর্ণনা করেন[১১] তাকে ঐসব এলাকার বিশেষ দৃশ্যমান বিষয় বলে স্বীকার করতে হয়। বিভিন্ন গবেষণা পুস্তকের দিকে সামান্য দৃষ্টি দিলেও দেখা যায় যে, সারা প্রদেশে পরিমিত সমৃদ্ধ কৃষক ছিল অনেক।[১২] তাদের মধ্যে অনেকের ভূ-সম্পত্তি এত বেশি ছিল যে, পারিবারিক শ্রম দিয়ে তা চাষাবাদ করা সম্ভব ছিল না। সে-কারণে তারা তাদের জমিতে ভাগচাষি নিয়োগ করত। সেটেলমেন্ট চলাকালে মধ্য বাঙলার পাবনা ও বগুড়া জেলায় লক্ষ করা যায় যে, 'প্রভাবশালী ও সম্পদশালী জোতদার, যারা নিজেদের রায়ত বলে দাবি করত, তাদের বর্গাচাষের জমি ছিল অনেক।'[১৩] মধ্য পশ্চিম বাঙলার বর্ধমান জেলায় দেখা যায় যে, 'পারিবারিকভাবে চাষাবাদ করা অসুবিধাজনক হওয়ায় বহু সম্পত্তির অধিকারী রায়তেরা এত বেশি ভাগচাষি নিয়োগ করত যা সত্যি বিস্ময়কর।'[১৪] পূর্ব বাঙলার নোয়াখালী জেলার সেটেলমেন্ট অফিসার মন্তব্য করেন যে, অনেক মুসলমান কৃষক 'মধ্যস্বত্বভোগী হাওলাদার ও তালুকদার, এমনকি জমিদার হিসেবে উন্নীত হয়েছে, কিন্তু তারা সব একই (কৃষক) শ্রেণীর।'[১৫] উত্তর ময়মনসিংহে অনেক রায়ত 'তালুকি অংশ ক্রয় করে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে উন্নীত হয়েছে।'[১৬] বীরভূম জেলার লোহাগড়া গ্রামের মুসলমানদের ওপর পরিচালিত গবেষণায় হাশিম আমীর আলী ঐ গ্রামের অধিবাসীদের সম্পর্কে বলেন:

> তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি ধনী, তার সম্পত্তির মূল্য ৩৪ হাজার টাকা ... তাদের মধ্যে অনেকের আর্থিক অবস্থা ছিল বেশিরভাগ সদগোপ ও কায়স্থদের আর্থিক অবস্থার মতো। কিন্তু সব মুসলমান পরিবারই সম্পদশালী ছিল না। বস্তুত তাদের প্রায় অর্ধেকের আর্থিক অবস্থা অস্পৃশ্যদের মতো ছিল – সত্যি বলতে কি তাদের এক তৃতীয়াংশ ঐসব নীচু শ্রেণীর পরিবারগুলোর চেয়েও গরিব ছিল।[১৭]

পূর্ব বাঙলার প্রাণকেন্দ্র ফরিদপুর জেলায়ও অনেক ধনী কৃষক ছিল। কৃষকদের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে বসুর ধারণা বিশেষভাবে জে. সি. জ্যাকের ফরিদপুর সম্পর্কে

গবেষণার ওপর নির্ভরশীল। জ্যাক তাঁর ঐ গবেষণায় কৃষকদের একটি 'সমজাতীয় শ্রেণী'[১৮] হিসেবে বর্ণনা করেন। ঐ একই লেখক অপর এক অধ্যায়ে মুসলমান 'সমৃদ্ধশালী কৃষক' শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন, যাদের সন্তানেরা 'মুসলমান ব্যবসায়ী, অল্প জমির মালিক এবং ... কেরানি হয়েছেন।[১৯] ফরিদপুরের তমিজউদ্দিন খান উল্লেখ করেন, তাঁর শ্বশুর 'সচ্ছল' রায়ত ছিলেন এবং তাঁর (শ্বশুরের) 'উর্ধ্বতন জমিদারেরা ছিল ব্রাহ্মণ'। তিনি তাঁর জমিতে 'নীচু শ্রেণীর হিন্দুদের' অধস্তন প্রজা হিসেবে বন্দোবস্ত দেন।[২০] বাল্যকালে তমিজউদ্দিন খান একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যান, ঐ বিদ্যালয়ের মালিক 'ঝাপু খান ... ছিলেন আমাদের এলাকার সবচেয়ে ধনী মুসলমান। প্রতিবেশীদের মধ্যে জমি কারও ছিল না; তিনি একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীও ছিলেন।'[২১] কৃষকদের শ্রেণীকরণে বসু যতটা না উল্লেখ করেছেন তার চেয়ে বেশি সম্পদশালী কৃষকদের উপস্থিতি সর্বত্র দৃশ্যমান ছিল বলে মনে করা হয়। আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে, জোতদারদের মধ্যে অনেকে ছিল মুসলমান।[২২]

তদুপরি, ব্যাপকভাবে অর্থলগ্নীর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার জন্য শতাব্দীর প্রথম দশকে সাধারণভাবে জমিদারেরা সম্পদশালী ছিল – বসুর এ বক্তব্য সমসাময়িক সূত্র সমর্থন করে না। পূর্ব বাঙলার সবচেয়ে বড় জেলা ময়মনসিংহ; এ জেলার গেজেটিয়ার থেকে দেখা যায় যে, 'সাধারণ জোতদারেরা যে খাজনা তুলত সেই তুলনায় খাজনায় জমিদারের অংশ কম ছিল। 'প্রত্যক্ষ রায়তের অধীন কৃষকের জমি থেকে প্রাপ্ত খাজনা বড় জমিদারের অধীন জমি থেকে প্রাপ্ত খাজনার চেয়ে সামান্য বেশি ... আর সাধারণ জোতদারের অধীন কোর্ফা রায়ত বা অধীন প্রজাদের খাজনা দিতে হত প্রায় দ্বিগুণ।'[২৩] সাচ্‌সে (Sachse) মনে করেন না যে, জমিদার বা মধ্যস্বত্বভোগী রায়তিরা অর্থলগ্নীর মাধ্যমে আরাম-আয়েশের জীবনযাপন করতে পারে: 'হিন্দু ভদ্রলোকদের অধিকাংশই সামান্য তালুকদার ও রায়তি স্বত্বের অধিকারী ... যারা আদায়কৃত খাজনার ওপর চলতে পারত না তারা ... জমিদারদের চাকরি করত ... অধিকাংশ জমির অধিকারী হল মাত্র কয়েকজন বড় জমিদার ... (কিন্তু) প্রশ্নাতীত আর্থিকভাবে সচ্ছল এস্টেটের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প।'[২৪]

বড় জমিদারদের অধিকাংশই ছিল কোলকাতায় বসবাসকারী এবং জমিদারি এলাকায় 'অনুপস্থিত লোক'। 'দুর্নীতিপরায়ণ ও অনুপযুক্ত আমাল' (খাজনা আদায়কারী)-দের দ্বারা তারা প্রতারিত হত, এবং তাদের এস্টেট 'মামলা ও অপব্যয়ের কারণে' দুর্বল হয়ে পড়ে।[২৫] অধিকাংশ সময় নগরে অবস্থান করে এইসব 'অনুপস্থিত' জমিদারের পক্ষে অর্থলগ্নী করে সম্পদশালী হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ছিল না। বছরের যে মাসগুলোয় খুব অভাব হয় ও কৃষকদের ঘরে চাল ফুরিয়ে যায় সে-সময় পাওনা আদায়ের জন্য ফসল কাটার মওসুমে গ্রামে উপস্থিত থাকতে পারলে গ্রামীণ সুদের কারবার লাভজনক হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন যে, তাঁর পিতা যশোরে রাড়ুলির বেশ বড় জমিদারি এস্টেট পান উত্তরাধিকার সূত্রে। মফস্বলে ফিরে গিয়ে তিনি দাদন ব্যবসা শুরু করেন:

(আমার বাবাকে) লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হয়, কারণ তিনি ছিলেন আমার পিতামহের একমাত্র জীবিত পুত্র ... পারিবারিক এস্টেট দেখাশোনার জন্য বাড়িতে আর কেউ ছিল না ... তিনি যে ভূ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন তার বার্ষিক আয় ছিল প্রায় ছ'হাজার টাকা। ... তাঁর কাছে বেশ নগদ অর্থ ছিল। তিনি দাদন ব্যবসা শুরু করেন – কয়েক বছর ধরে এই ব্যবসা ছিল লাভজনক।[২৬]

কিন্তু কয়েক বছর পর রায়ের বাবা কোলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। কারণ এ সময় তাঁর পুত্ররা স্কুলে যাওয়ার বয়সে উপনীত হয়:

তাঁর পুত্ররা যাতে সেই সময়ের সর্বোত্তম শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে সে-জন্য আমার বাবা স্বাভাবিকভাবে চিন্তিত ছিলো ... (ঠিক হয় যে) আমরা যাতে তাঁদের ব্যক্তিগত তদারকি ও সুস্থকর প্রভাব থেকে বঞ্চিত না হই সে-জন্য আমার মাতাপিতা কোলকাতায় চলে আসবেন। কিন্তু এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বেশ কিছু অলঙ্ঘনীয় সমস্যা ছিল। তাঁর এস্টেট ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকের সমষ্টি; তিনি একজন ক্ষুদ্র ব্যাংকার ও দাদন ব্যবসায়ী হিসেবে জীবন শুরু করেন। সে-কারণে তাঁকে জমি বন্ধক রেখে মানুষকে টাকা ধার দিতে হত। সুতরাং এটা তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক ছিল যে, তিনি তাঁর নিজের সব পরিচালনার জন্য কর্মস্থলেই উপস্থিত থাকবেন এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য দূরবর্তী কোনো স্থানে থাকতে পারবেন না।[২৭]

কোলকাতায় যাওয়ার একটা হিতকর ফল তাঁর পুত্রদের শিক্ষার ওপর পড়ে: পি. সি. রায় বড় হয়ে তাঁর সময়ের একজন প্রসিদ্ধ ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত হন। কিন্তু তাঁর এই সাফল্য পরিবারের সৌভাগ্যের জন্য খুবই সামান্য হিতকর ফল বয়ে আনতে পেরেছিল। যুবক প্রফুল্ল বিশ্ববিদ্যালয়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করার পর তাঁর পিতা 'মারাত্মক আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হন। তাঁর এস্টেটগুলো একটার পর একটা বিক্রি হয়ে যেতে থাকে। ঋণদাতা থেকে এক ধাপেই ঋণগ্রহীতাতে পরিণত হওয়া আর কি ... আমার পিতামাতা মফস্বলের বাড়িতে ফিরে গেলেন এবং সেখানেই বসবাস করতে লাগলেন, আর আমি ও আমার সব ভাই চলে গেলাম লজিংয়ে।'[২৮]

শিক্ষালাভ বা চাকুরি পাওয়ার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী অনেক ভদ্রলোক পরিবার কোলকাতা বা মফস্বল শহরে বসতি স্থাপন করে – পারিবারিক এস্টেট থেকে তাদের জন্য খাজনা ও সুদ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা উত্তরোত্তর কষ্টকর হয়ে পড়ে। স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাসরত জমিদার ও সামান্য তালুকদারেরা দাদন ব্যবসা ফলপ্রসূভাবে পরিচালনা করতে সমর্থ হয়। অন্তত ময়মনসিংহের কথা বলা যায়, যেখানে তারা খাজনা থেকে প্রাপ্ত আয় সংকুচিত হবার প্রেক্ষাপটে বেতনভোগী চাকুরিজীবীতে পরিণত হয়। বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষ করে বর্ধমান জেলায় একই রকম ধারা লক্ষ করা যায়। বর্ধমানের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয় যে, 'জমির ওপর জমিদার শুধুমাত্র বার্ষিক বৃত্তিভোগীতে পরিণত হয়েছে, তাদের সামান্য এস্টেট থেকে খাজনা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা ছাড়া ঐসব এস্টেট নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না,' আর 'সাধারণভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, পত্তনিদার ও উপ-পত্তনিদারেরা যেসব জমিদারদের কাছ থেকে জমি বন্দোবস্ত নিয়েছে সম্মিলিতভাবে তারা সেসব জমিদারের তুলনায় অনেক

বেশি সম্পদশালী।'[২৯] একইভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র হাওড়ার কথা বলা যায় – 'গ্রামীণ এলাকায় জমিদারেরা থাকে অনুপস্থিত, তারা বসবাস করে কোলকাতা বা অন্য শহরে।'[৩০] এই অবস্থার কারণে জমিদারি এস্টেট আর্থিক দিক থেকে খুব সামান্যই লাভজনক হতে পেরেছে; উপরন্তু ঐ অবস্থা অনেক ক্ষেত্রে রায়তদেরকে তাদের জমিদারদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করতে উৎসাহিত করেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে পাবনার কথা উল্লেখ করা যায়:

> অনুপস্থিত জমিদারদের অনেকে বিরাট সম্পত্তির মালিক ছিল। একই সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এস্টেটগুলো খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায় এবং এগুলোতে ব্যাপকভাবে দরপত্তনি দেওয়া হয়। এতে রায়তদের অবস্থানে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। দৃঢ় ও সুন্দরভাবে পরিচালিত এস্টেটের জমিদারদের ক্ষমতা ছিল ব্যাপক। কিন্তু খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়া এস্টেটে তারা ছিল দুর্বল এবং এসব জায়গায় সর্বত্রই ছোট ছোট অংশীদারেরা সব সময় ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থাকত। এমতাবস্থায় জমিদারদের বিরুদ্ধে রায়তদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি ঐ জেলায়, বিশেষ করে সিরাজগঞ্জ মহকুমায়, ছিল খুবই সাধারণ ব্যাপার।[৩১]

এভাবে সমসাময়িক সময়ে প্রকাশিত রিপোর্টের ওপর ভাসা-ভাসা দৃষ্টি দিলেও মনে হয়, সুগত বসুর মডেলকে খুব সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা উচিত। এমনকি ত্রিশ দশকের পূর্বেও জমিদারি এস্টেটগুলো ক্রমাগত দুর্বল ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং খাজনা আদায়কারীরা ঠিকভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়। বিংশ শতাব্দীতে শহরে বসবাসরত অনেক ভদ্রলোক পরিবারের জীবনযাত্রার মান ধীরে ধীরে কমে যাওয়ার ক্ষেত্রে তার প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাড়ুলির জমিদারদের কোলকাতার বাসস্থান ত্যাগ করে শতাব্দীর শেষ দিকে জেলা শহরে বসবাস করতে হয়। এমনকি মহেশগঞ্জের বহু সম্পত্তির অধিকারী পালচৌধুরীদের মতো সফল জমিদারেরাও তাদের বিনিয়োগকে বিভিন্নমুখী করতে এবং আয়ের বিকল্প সূত্র অনুসন্ধান করতে বাধ্য হন, কারণ এ শতাব্দীর প্রথম দশকেই তাদের খাজনা থেকে আয়ের পরিমাণ কমে যায়।[৩২] কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার, সামান্য তালুকদার ও মধ্যবর্তী রায়তি স্বত্বের অধিকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবচেয়ে বেশি। ঢাকায় পরিচালিত জরিপ ও সেটেলমেন্ট চলাকালে দেখা যায়, নতুন বর্ধিত খাজনা 'ভূমির ক্রমবর্ধমান মালিকদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, (আর) জমির খাজনার ওপর নির্ভরশীল জমিদারদের অবস্থার নিশ্চিতভাবে ক্রম-অবনতি ঘটবে। যে শ্রেণীর জমিদারেরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা হল ক্ষুদ্র জমিদার – হোক না তারা জমির মালিক বা রায়তি স্বত্বের অধিকারী।'[৩৩]

ঐ একই গ্রুপের লোক সম্পর্কে জে. সি. জ্যাক ১৯১৫ সালে লেখেন:

> অর্ধ শতাব্দী ধরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকায় এবং তা ঘনঘন বৃদ্ধি পাওয়ায় এই শ্রেণীর লোকের ওপর এমন দুর্ভাগ্যজনক ফলাফল বয়ে এনেছে যে, তাদের মধ্যে অনেককেই প্রায় অনাহার অবস্থায় বসবাস করতে হয় ... জানা যায় যে, ভদ্রলোকদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা অনেক এবং অনেক পরিবারের অবস্থা দয়ার উদ্রেক করে ও তাদের দুঃখ-কষ্ট খুবই মারাত্মক।[৩৪]

ভদ্রলোকদের ভিত্তি হল এই সাধারণ জমিদার ও তালুকদার শ্রেণী। এদের মধ্যে অনেকে মফস্বল শহরে জমিদার ও তালুকদার হিসেবে বসবাস করে এবং অনেকে নতুন সুযোগের প্রত্যাশায় নগরে চলে যায়। যারা মফস্বল ত্যাগ করে নগরে চলে যায় তারা দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি অনুভব করে; খাজনা আদায়ের ক্রমাবনতি তাদের আয়ের ওপর মারাত্মক আঘাত হানে। শহরের চাকুরি তাদের ক্রমহ্রাসকৃত আয়ের দুর্দশা মোচনের একটি উপায় হিসেবে দেখা দেয়। কিন্তু এ ধরনের সুযোগ ছিল খুবই সীমিত এবং চাকুরি পাওয়া ক্রমেই কষ্টকর হয়ে পড়ে। ভারতীয়দের সামান্য কিছু লোক আমলাতন্ত্রের উচ্চ স্তরের আকর্ষণীয় পদে যাওয়ার সুযোগ পায়; কেউ কেউ উচ্চতর পেশা ও ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়। কিন্তু এ জন্য যত সম্পদ ও যোগাযোগের দরকার তা খুব অল্প ভদ্রলোক পরিবারের ক্ষমতার মধ্যে ছিল। শহরের জীবন ছিল প্রতিযোগিতাপূর্ণ। অধিকাংশ ভদ্রলোক পরিবারকে তাই প্রশাসনের নিম্ন পর্যায়ের কম বেতনের চাকুরি, শিক্ষকতা ও প্রাইভেট ফার্মে ক্লার্ক হিসেবে কাজ করে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং বেতন ও খাজনা থেকে প্রাপ্ত অর্থের মূল্যমান কমে যাওয়ায় শহরের ভদ্রলোক সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ক্রমেই ধসে পড়ে। পূর্বের অধ্যায়ে যেমনটি বলা হয়েছে, এই অবনতি শহরের ভদ্রলোক রাজনীতির পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

অপর দিকে মফস্বলে বসবাসকারী এস্টেটের আয়ের ওপর নির্ভরশীল উপস্থিত জমিদার ও তালুকদার সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় তাদের অবস্থা ধরে রাখতে সমর্থ হয়। বড় বড় এস্টেটের জমিদার অবশ্য গোমস্তা, পাইক ও বরকন্দাজ নিয়োগের মাধ্যমে রায়তদের কাছ থেকে পুরো খাজনা ও অন্যান্য অবৈধ প্রাপ্য আদায় করতে সফল হয়। তাদের হিসাবরক্ষক ও রাজস্ব আদায়কারীর ওপরও তারা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে সমর্থ হয়।[৩৫] অনেকে আবার অত্যন্ত চড়া সুদে দাদন ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে; খাতকদের মধ্যে প্রায় সবাই যেহেতু তাদের প্রজা ছিল, সেহেতু নিয়মিতভাবে পাওনা অর্থ প্রদানে তারা তাদেরকে বাধ্য করে।[৩৬] প্রদেশের কিছু কিছু এলাকায় বিশেষ করে পশ্চিম অঞ্চলের জেলাগুলোতে জমিদারেরা ক্রমাগতভাবে নগদ অর্থের পরিবর্তে উৎপাদিত দ্রব্যে খাজনা গ্রহণ করে এবং খেলাপি প্রজার জমি খাস জমি হিসেবে অধিকারে নিয়ে আসে। ঐসব খাস জমি তারা তাদের পূর্বে নগদ অর্থে খাজনা প্রদানকারী প্রজাদের কাছে উৎপাদিত পণ্যে খাজনা পরিশোধকারী বর্গাদার, আধিয়ার বা কোর্ফা রায়ত হিসেবে বন্দোবস্ত দেয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে মোকাবেলা করার জন্য এটা একটা ফলপ্রসূ পদক্ষেপ ছিল। এই ব্যবস্থায় নগদ অর্থের পরিবর্তে মূল্যবান পণ্য প্রাপ্তি জমিদারদের জন্য আরো বেশি সুবিধা নিশ্চিত হয়।[৩৭] গ্রামের অনেক জমিদার পরিবার এভাবে তাদের কর্তৃত্ব নিশ্চিত করে।

কিন্তু অর্থনৈতিক মন্দা অধিকাংশ সফল উপস্থিত জমিদার ও তালুকদারের জন্যও বিপর্যয় ডেকে আনে। ১৯২৯ সালের আগে জমিদারদের সংকটের ব্যাপকতা নিয়ে বহু বিতর্ক আছে। তবে অধিকাংশ পর্যবেক্ষক একমত পোষণ করেন যে, ঐ বছরে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার কারণে জমিদারি খাজনা ব্যাপকভাবে কমে আসে।[৩৮] অর্থকরী ফসল

যেমন, পাট (পূর্ব ও উত্তর বাঙলার অনেক জেলায় উৎপাদিত হত) এবং প্রধান খাদ্যশস্য চালের দাম আকস্মিকভাবে কমে যাওয়ায় অর্থনৈতিক মন্দার প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয়। অনেক জমিদার নগদ খাজনার পরিবর্তে উৎপাদিত পণ্য খাজনা হিসেবে গ্রহণ করা সত্ত্বেও ১৯৩০-এর দশকে বাঙলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে মুদ্রা ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে চালু ছিল। অধিকাংশ কৃষক তাদের ছোট ছোট, বিশেষ করে অলাভজনক জমির খাজনা ও অন্যান্য পাওনা কষ্ট করে হলেও নগদ অর্থে প্রদান করত। ফসল উৎপাদনের সাথে সাথে তারা তা বাজারে নিয়ে যেত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং চাষের জমি ক্রমাগত ভাগ হতে থাকায় জমির ওপর চাপ বাড়তে থাকে এবং এর ফলে কৃষকেরা তাদের পারিবারিক প্রয়োজন মেটাতে, বীজ, কৃষি সরঞ্জাম ও গবাদি পশু কিনতে এবং ধর্মীয় ও লৌকিকতামূলক অনুষ্ঠানের জন্য সুদসহ ফেরতযোগ্য ঋণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে এমনকি খাদ্য, কাপড় ও বাসস্থান নিশ্চিত করতেও ঐ ধরনের ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পায়। যেসব জেলায় পাট উৎপাদিত হত সেখানে দাদন ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে প্রায়ই অগ্রিম ঋণ দেওয়া হত – দাদন ব্যবসায়ীদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল কোলকাতার পাট রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। সাধারণভাবে অতি সহজে ঋণ পাওয়া যেতো এবং ঐসব জেলার কৃষকদের দেনার পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। পাট ছিল মূলধন বৃদ্ধির ফসল এবং প্রতি বছর পাট চাষের জন্য অগ্রিম অর্থ পাওয়ার ওপর অধিকাংশ কৃষক নির্ভরশীল ছিল। অন্যান্য চাউল উৎপাদন এলাকাতেও ১৯৩০ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত গ্রামীণ অর্থনীতিতে ঋণ ব্যবস্থা অপরিহার্য বলে গণ্য হয়। ঋণের ওপর সুদের কোনো বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ ছিল না এবং ঐ সুদের হার ছিল খুবই বেশি। এর ফলে কোনো কৃষক পরিবার একবার ঋণ গ্রহণ করলে ঋণ করা মূলধন পরিশোধ করা তাদের পক্ষে প্রায় আর সম্ভব হত না। এভাবে ঋণের চক্র পিতার থেকে পুত্রে এবং এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরিত হত।

১৯৩০ সালে দ্রব্যমূল্যের আকস্মিক পতন সামগ্রিক অনিশ্চিত ব্যবস্থাকে একেবারে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পাটের দাম দ্রুত কমে যাওয়ায় পাট রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ও দাদন ব্যবসায়ীরা অগ্রিম অর্থ দেওয়া বন্ধ করে দেয়। কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ কমে আসে – তারা ঋণপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। খাজনা ও দেনা পরিশোধ করতেও ব্যর্থ হয়। ফলে পেশাদার বেনিয়া মহাজন ও স্থানীয় তালুকদারেরা, যারা মহাজনি বা সুদের ব্যবসা করত, তাদের সাবেক মক্কেলদের ঋণ প্রদান বন্ধ করে দেয়। গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থা বলতে গেলে উঠে যায়। এর ফলে কৃষক পরিবারের ওপর বিপর্যয় নেমে আসে:

> পাটের অধিক উৎপাদন এবং নজিরবিহীন মূল্য হ্রাসের ফলে ১৯৩০ সালে এই সংকট সৃষ্টি হয় – কৃষকেরা তাদের দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনেও অক্ষম হয়ে পড়ে। অন্য সময় এমন পরিস্থিতিতে তারা গ্রামের মহাজনের সহায়তায় পরিস্থিতি মোকাবেলা করত, কিন্তু এবার অর্থ প্রাপ্তির উৎস সত্যিকারভাবে বন্ধ ছিল। গ্রামের সুদ ব্যবসায়ীদের হাতে সব সময় বেশি অর্থ জমা থাকত না – তারা টাকা ধার দিত, পাওনা টাকা আদায় করত, আবার সেই

টাকা ধার দিত। ১৯৩০ সালে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। পাওনা টাকা তারা খুব কমই আদায় করতে সক্ষম হয় – ঋণ গ্রহীতারা ঋণের টাকা ফেরত দিতে অক্ষম হয়, আর ঋণ প্রত্যাশীরাও ঋণ পেতে ব্যর্থ হয়।[৩৯]

পণ্যমূল্যের আকস্মিক পতন এবং গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে পড়ায় অনেক কৃষক পরিবার নগদ অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে জমিদারদের আরোপিত খাজনা ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ করার জন্য নগদ অর্থ যোগাড় করতে তারা ব্যর্থ হয়। খাজনা ও সুদ আদায়ের পরিমাণ আকস্মিকভাবে কমে যাওয়ায় জমিদারদের নিজেদের অস্তিত্বও হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। রায়তদের কাছ থেকে খাজনা ও সুদ আদায় কমে যাওয়ায় তাদের প্রতিক্রিয়া হয় কঠোর এবং কৃষকদেরকে পাওনা পরিশোধে বাধ্য করার জন্য তাদের মধ্যে অনেকে আইনের আশ্রয় নেয়। ফলে জমিদার ও তার প্রজাদের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি ঘটে – এই বিরোধের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল খাজনা ও সুদ প্রদানের বিষয়টি। ক্রমে ক্রমে বহু কৃষক জমিদারদের দাবির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বিক্ষোভ করতে শুরু করে, যে পরিস্থিতিকে জেলা কর্মকর্তারা 'ঋণ পরিশোধ না করার খারাপ মানসিকতা' বা অনাদায়ি ঋণের ওপর আরোপিত সুদ ও খাজনা প্রদানের দায়বদ্ধতা স্বীকারে অনীহা বলে বর্ণনা করেন। নজিরবিহীন দুঃখ-কষ্টের প্রেক্ষাপটে খাজনা ও সুদ প্রদান থেকে বিরত থাকার বিষয়টি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া। কিন্তু কর্মকর্তা ও জমিদারেরা সন্দেহ প্রকাশ করে যে 'ঋণ পরিশোধ না করার খারাপ মানসিকতা'-কে উৎসাহিত করা হয়েছে, এমনকি কিছু নেতা তাদেরকে সংগঠিত করেছে। এর ফলে গ্রামীণ সমাজে খাজনা আদায়কারী ও প্রজাদের মধ্যে মেরুকরণ সৃষ্টি হয়। টিপেরার নদীবিধৌত ঘনবসতিপূর্ণ মুসলিম-প্রধান এলাকার নবীনগর শহরে জমির স্থানীয় হিন্দু মালিকেরা 'শান্তিরক্ষী সমিতি' গঠন করে। ঐ সমিতি অভিযোগ করে:

> কিছু লোক পুরোদস্তুর বলশেভিকবাদ প্রচার করছে। এই এলাকার বর্তমান সাধারণ অর্থনৈতিক দুর্দশার সুযোগ নিয়ে তারা বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করছে। তারা প্রকাশ্য বা গোপন সভায় সাধারণ জনগণ, কৃষক ও চাষিকে বিশেষ করে মুসলমানদেরকে সুদ-ব্যবসায়ী, ব্যবসাদার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে দাবি তুলতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়। মতলববাজ এসব লোকদের প্রচারে বেশ ফল হয়েছে। এতে শুধু পুঁজিপতি ও মজুরদের মধ্যে দ্রুত বিভেদ সৃষ্টি হয়নি, বাকি খাজনা ও ঋণের ক্ষেত্রে পাওনা টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রেও অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। ঋণ-খেলাপিদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করতে আগ্রহী আইন মান্যকারী নাগরিকদের ওপর অত্যাচার, ভূমি দখল বা সঙ্ঘবদ্ধ দল কর্তৃক ধান কেটে নেওয়ার বিষয় কারও কাছে গোপন নেই ... যেসব স্থানীয় বাজার স্থানীয় জমিদার কর্তৃক পরিচালিত হয় সেসব বয়কট করা হয়েছে এবং ... আগের মতো সহজে সাধারণ খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় না।[৪০]

খাজনা আদায় ও ঋণ পরিশোধ কমে যাওয়ার বিষয়টি প্রদেশের অন্যান্য অংশেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, এবং ১৯৩৩ সাল নাগাদ ব্রিটিশ প্রশাসকেরা মন্তব্য করতে থাকে যে, সারা বাঙলায় 'ঋণ পরিশোধ না করার খারাপ মানসিকতা' ছড়িয়ে পড়েছে। ঐ অবস্থা

বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় পূর্ব ও উত্তর বাঙলার পাট উৎপাদনকারী এলাকায়। বিভিন্ন রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, 'এতে কোনো সন্দেহ নেই যে কৃষকেরা, বিশেষ করে রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের কৃষকেরা, নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে মনোযোগী হয়ে উঠছে।'[৪১] টিপেরায় একদল কংগ্রেস কর্মী স্থানীয় প্রজাদের বিক্ষোভকে অসহযোগ আন্দোলনে পরিচালিত করার চেষ্টা করে। এটা ছাড়া গ্রামীণ এলাকায় কংগ্রেস তেমন সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে বা ১৯৩০ দশকের গোড়ার দিকে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল ঐ একই উদ্দেশ্যে কাজ করেছে এমন কোনো প্রমাণ প্রায় পাওয়া যায় না। এ সময় অবশ্য এ সবের কোনো দলগত রাজনীতির আবরণ বা বাহ্যিকভাবে সাম্প্রদায়িক পরিচিতি ছিল না; প্রথম দিকে 'ঋণ পরিশোধ না করার খারাপ মানসিকতা' বাঙলার ভূস্বামী ও খাজনা আদায়কারী শ্রেণীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হবার পর থেকেই খাজনা ও ঋণ পরিশোধের ওপর ভিত্তি করে বাঙলায় সুবিধাপ্রাপ্ত হিন্দু-মুসলমান উভয় বাঙালি উচ্চ শ্রেণীর লোকদের জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক কাঠামোটি গড়ে উঠেছিল।

ঋণ পরিশোধ না করা ঐ মূল কাঠামোর ভিত্তিতে আঘাত হানে এবং তা সমাজের ব্যাপক ও শক্তিশালী অংশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই শ্রেণীর মধ্যে একটি অংশকে হিন্দু

সারণি ৩ : মধ্যবর্তী রায়তি স্বত্ব বিক্রয় ও হস্তান্তর : ১৯২৯-৩৭

জেলা	রায়তি স্বত্ব ও মুকারারি জমি বিক্রয়ের সংখ্যা	
	১৯২৯-৩০	১৯৩৭-৩৮
বর্ধমান	৬,৫৩৭	১৪,৬১৯
বীরভূম	৩,৯১৪	৫,৭৮৮
বাকুড়া	৬,৮০৭	৮,২৩০
হুগলী	৩,১৮৩	৩,২৪৯
হাওড়া	২,৯৩৬	৬,২০৬
ঢাকা	২,৩৮১(ক)	৩,০৩৮
ফরিদপুর	২,৯১৪	৩,৯২৫
মুর্শিদাবাদ	২,২৩৩(ক)	৩,১২৬
রংপুর	২৭৭	১,০৩৩
বগুড়া	৬২৫	৮৭৪

ক. ১৯২৯-৩০ সালের সংখ্যা পাওয়া যায়নি, ফলে পরবর্তী বছর তথা ১৯৩০-৩১ সালের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।

সূত্র : এ্যানুয়াল রিপোর্টস অব দি রেজিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট (গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল), ১৯২৯-৩০ এবং ১৯৩৭-৩৮; উদ্ধৃত সৌগত মুখার্জী, 'এ্যাগ্রেরিয়ান ক্লাস ফরমেশন', পৃ. পিই ১৩-১৪।

ভদ্রলোক গ্রুপ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়; এর মধ্যে আছে উভয় শ্রেণীর শহরের ভদ্রলোক, পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন, সুবিন্যস্ত ও রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত শ্রেণী, যারা খাজনা আদায়কারী ভূস্বামীদের মতো জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে জমি ও এস্টেট এবং গ্রামের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রেখে চলত এবং গ্রামের ঐ আত্মীয়রা যারা ছিল হিন্দু ভূস্বামী, যারা জমিদারি, সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও সুদ ব্যবসার মাধ্যমে দীর্ঘদিন থেকে স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করে আসছিল। শেষের এই গ্রুপটি অর্থাৎ গ্রামীণ অপেক্ষাকৃত কম সম্ভ্রান্ত এই শ্রেণীটি অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব অনুভব করে খুবই মারাত্মকভাবে। গত কয়েক দশকে এদের অনেকেই অবশ্য কড়াকড়িভাবে খাজনা আদায় করে, সুদে টাকা খাটিয়ে এবং যেখানে সম্ভব সেখানে খাজনার পরিবর্তে উৎপাদিত পণ্য গ্রহণ করে নিজেদের জীবনযাত্রার মান বজায় রেখেছিল। কিন্তু এখন ঐসব পদ্ধতি অর্থহীন হয়ে পড়ল যখন আদেশ পালনে রায়তদের মধ্যে নতুন একটি অবাধ্যতা দেখা দিল এবং খাজনা পরিশোধে বা অন্য রকম দেনা পরিশোধে তারা আগের চেয়ে কম উৎসাহ দেখাতে লাগল। শস্য মাড়াইয়ের পর খাজনা হিসেবে সংগৃহীত উৎপাদিত শস্যের বাজার মূল্য ছিল খুবই কম, কারণ সে-সময় পণ্যের দাম একেবারেই পড়ে যায়। অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হওয়ার পর অনেক বড় বড় জমিদার রাজস্ব পরিশোধে খেলাপি হয়ে পড়ল যা 'উচ্চ পর্যায়ের রায়তি স্বত্বাধিকারীদের অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াল।'[৪২] খাজনা থেকে আয়ের ক্রমাবনতি এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে শহরের ভদ্রলোক পরিবারগুলো আগে থেকেই আর্থিক চাপের মধ্যে ছিল। জমির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করাও এখন তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। সে-কারণে অধিক সংখ্যক মধ্যবর্তী রায়তি স্বত্বের অধিকারীরা তাদের মালিকানা নামমাত্র দামে বিক্রি ও হস্তান্তর করে দেয় (সারণি ৩)। পশ্চিম বাঙলার প্রাণকেন্দ্রে মুকারারি জমির বিক্রি ও হস্তান্তর নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়।[৪৩] অর্থনৈতিক মন্দা তাই অনেক ভদ্রলোক পরিবারের ওপর মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলে – কেউ কেউ দরিদ্র হয়ে পড়ে, কেউ কেউ বাঙালি গ্রামীণ সমাজে তাঁদের সুবিধাপ্রাপ্ত মর্যাদা বজায় রাখার সংগ্রামে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে পড়ে।

কৃষকদের একটা বড় অংশ তাদের ছোট ছোট জমি থেকেই জীবনধারণ করার সংগ্রাম করছিল। ছোট ছোট জমির ওপর চাষাবাদ ও পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য তারা নির্ভরশীল ছিল ঋণের ওপর। অর্থনৈতিক মন্দা তাদের জন্য নিরাময়হীন বিপর্যয় ডেকে আনে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক জমি তাৎক্ষণিকভাবে বিক্রি করে দেওয়া হয় এবং বহু কৃষক তাদের সাবেক রায়তি স্বত্বের জমিতে নিজেরাই বর্গাদারে পরিণত হয়।[৪৪] কিন্তু সব কৃষক পরিবার সমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। সংখ্যায় সামান্য হলেও কিছু সংখ্যক কৃষক পরিবার ছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধশীল। এইসব জোতদার ও বড় বড় রায়ত পরিবারের কাছে অর্থনৈতিক মন্দা সমৃদ্ধির জন্য নতুন সুযোগ এনে দেয়। তাদের যে জমি ছিল তা থেকে উৎপাদিত ফসল তাদের পরিবারের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট ছিল; বাড়তি ফসল তারা দীর্ঘদিন ধরে মজুত করে রাখতে পারত। নতুন ফসল উৎপাদিত হওয়ার ঠিক আগে শস্যের দাম যখন বৃদ্ধি পেত তখন তারা তাদের মজুদ পণ্য হয় বিক্রি করে দিত, আর না হয়

পণ্যের বিনিময়ে পণ্য পাওয়ার ব্যবস্থায় তাদের সেই শস্য কম ভাগ্যবান প্রতিবেশীদের ধার দিত, যাদের ফসল উৎপাদনের পর সুদসহ পণ্য দিয়ে ঐ ধার পরিশোধ করতে হত। ঋণগ্রস্ত কৃষক পরিবার এ ধরনের ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে তাদের জমি হস্তান্তরিত হয়ে যেত ঋণদাতাদের কাছে। অনেক জোতদার এভাবে প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হয়।[৪৫] একই সাথে, 'ঋণ পরিশোধ না করার খারাপ মানসিকতা'র প্রভাবে এইসব ধনী চাষিরা তাদের উপরস্থ জমিদারদের খাজনা প্রদান ও পাওনা পরিশোধ থেকে বিরত থাকে। অর্থনৈতিক মন্দা থেকে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ভীতি ছড়িয়ে ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তারা জমিদারদের বিরুদ্ধে তাদের হাত শক্তিশালী করে। এরাই হল সেই সর্বত্র দৃশ্যমান জোতদার যারা ত্রিশ ও চল্লিশ দশকে 'সারা দেশে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে।'[৪৬] এরা স্থানীয় তালুকদার জমিদারদের একেবারে দুর্বল করে দেয় এবং প্রতিবেশীদের আরও গরিব করে দেয়। সম্পদ ও প্রভাব বৃদ্ধি করার জন্যই তারা এসব কাজ করে। এভাবে কৃষিপ্রধান বাঙলায় অর্থনৈতিক মন্দা একটা চরম অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করে। এ অবস্থা ছিল খাজনা গ্রহণকারী ও সুদের কারবারী শ্রেণীর কর্তৃত্বের ওপর হুমকিস্বরূপ, এবং কৃষিপ্রধান সমাজের দুর্বল লোকদের জন্য তা নজিরবিহীন দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একই সাথে, এই অবস্থা জোতদারদের হাতকে শক্তিশালী করে। এই পরিস্থিতি দেশের পল্লি অঞ্চলে সামাজিক মেরুকরণ প্রক্রিয়ায় নতুন মাত্রা সংযোজন করে।

১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে এমন-সব প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করা হয় যার মাধ্যমে কৃষি প্রশ্নে উত্তেজনার বিষয়টি রাজনৈতিক কার্যকলাপের মূল ধারায় স্থান করে নেয় – ঐ আইনে মফস্বল এলাকায় দলীয় রাজনীতির সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। ঐ আইনে নির্বাচকমণ্ডলীর পরিধি আরও বিস্তৃত করা হয়; এর ফলে আগের চেয়ে গ্রামীণ বাঙলার সামাজিক বৈশিষ্ট্য তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আরও বেশি করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আইন সভার আটাত্তরটি 'সাধারণ' বা হিন্দু আসনের মধ্যে মাত্র বারোটি আসন শহর এলাকার জন্য বণ্টন করা হয়, বাকি ছেষট্টিটি আসন গ্রামীণ নির্বাচকমণ্ডলীর জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। 'মুসলিম' আসন বণ্টনে গ্রামীণ আসনগুলোকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। মোট ১১৭টি মুসলমান আসনের মধ্যে ১১১টি আসনই গ্রামীণ এলাকার জন্য সংরক্ষিত করে রাখা হয়। বাঙলার রাজনীতি, যা এতদিন শুধু কোলকাতা মহানগরী এলাকায় কেন্দ্রীভূত ছিল এবং প্রধানত নগরভিত্তিক ইস্যু নিয়েই যে রাজনীতি আবর্তিত হত – ঐ রাজনীতিকে এখন পল্লি অঞ্চলে প্রায় ঠেলে দেওয়া হল। ১৯৩৫ সালের আইনে পরিবর্তন সূচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিবাদী রাজনীতির জন্য মাঝে মাঝে প্রয়োজন ছাড়া বেঙ্গল কংগ্রেস পল্লি অঞ্চলের বিষয়ে খুব বেশি দৃষ্টি দিত না। অসহযোগ আন্দোলন বা আইন অমান্য আন্দোলনের কোনোটাই মফস্বল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। পল্লি বাঙলায় কোনো রাজনৈতিক দল তাদের সাংগঠনিক ভিত্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেনি। কিন্তু এখন হঠাৎ করে পল্লি বাঙলা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে – প্রাদেশিক আইন সভায় ক্ষমতা লাভের জন্য এখন আগ্রহী কোনো দল বা উপদলকে পল্লি অঞ্চলে জয়ী হতেই হবে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন কার্যকর হওয়ার পর মফস্বলে জয়লাভ করার জন্য সব দল ও রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। একাধিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মুসলমান নেতা বহু আগেই অনুধাবন করেন যে, পল্লি এলাকায় মুসলমানদের সংখ্যা অনেক এবং এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে ১৯১৪ সালেই কৃষকদের একটা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে কোলকাতার একদল যুবক মুসলিম নেতা অংশগ্রহণ করেন – আকরম খাঁ ও ফজলুল হকের মতো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ঐ দলে ছিলেন। এসব লোকের মধ্যে কেউ সাধারণভাবে পরিচিত 'আশরাফ' শ্রেণীর মুসলমান নেতা ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন আগে থেকেই টাকা-পয়সাওয়ালা অভিজাত পরিবারের যুবক সদস্য। এসব পরিবারের যুবকদের মধ্যে প্রায় সবাই বিদেশের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। ২৪ পরগণা জেলার হাকিমপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মোহাম্মদ আকরম খাঁ। স্থানীয় মাদ্রাসায় তিনি লেখাপড়া করেন এবং প্রথমে তিনি পরিচিতি লাভ করেন ঐতিহ্যগতভাবে একজন মুসলমান পণ্ডিত ব্যক্তি বা মওলানা হিসেবে। ১৯০৫ সালে প্রগ্রেসিভ বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল মোহামেডান এসোসিয়েশন গঠনের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অতি উৎসাহী খেলাফতবাদী এবং রাজদ্রোহমূলক কার্যকলাপের সাথে জড়িত থাকার জন্য তিনি ১৯২২ সালে জেলে যান। *মোহাম্মদী* ও *আজাদ*সহ তিনি একাধিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন – কোলকাতার মুসলমানেরা এসব পত্রিকা ব্যাপকভাবে পড়ত।[৪৭] এসব পত্রিকা সম্পাদনের মাধ্যমে আকরম খাঁ একজন খ্যাতনামা মওলানা হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন।

আবুল কাশেম ফজলুল হকের অতীত ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। পূর্ববঙ্গের মুসলমান-প্রধান বাকেরগঞ্জ জেলার বরিশাল মহকুমায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার 'আশরাফ' বা উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ বলে দাবি করলেও আসলে তাঁরা ছিলেন সাধারণ তালুকদার,[৪৮] অধিকন্তু তাঁরা ছিলেন বাঙলাভাষী। হক ছিলেন পল্লি এলাকার একজন লোক, এবং কোলকাতার মুসলিম রাজনীতির কর্তৃত্বে ফারসি-ভাষী প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের কাছে দল-বহির্ভূত একজন। তিনি অবশ্য মফস্বল এলাকায় জন্মগ্রহণ করার ক্ষতি পূরণ করেন লেখাপড়ায় অসামান্য সুনাম এবং বাগ্মিতায় অসাধারণ ক্ষমতা অর্জন করে। তাঁর আজীবন প্রতিদ্বন্দ্বী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাঙলার শীর্ষস্থানীয় এক মুসলমান পরিবারের সন্তান। তিনি জনাব হককে মূল্যায়ন করেন একজন 'অসামান্য বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন, বিরাট স্মৃতিশক্তির অধিকারী, গভীর পাণ্ডিত্য এবং মানুষের চরিত্র এবং সাধারণ লোকের মনের কথা অনুধাবনের গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ বলে ... তিনি তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা ও বাকপটুতার মাধ্যমে বাঙলার মানুষের আবেগকে প্রভাবিত করেন।'[৪৯] জনাব হক লেখাপড়া করেন অবিভক্ত বাঙলায়; আইন পেশায় আশার পর তিনি খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও আইনজ্ঞ স্যার আশুতোষ মুখার্জীকে পরামর্শদাতা হিসেবে পান।[৫০] প্রথম জীবনে তিনি ছোট জেলা শহরে আইন পেশা শুরু করেন এবং রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। পরে তিনি সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেন। প্রার্থিত পদোন্নতি না পাওয়ায় তিনি ১৯১২ সালে সরকারি

চাকুরি ত্যাগ করেন। এ সময় তিনি একজন সার্বক্ষণিক রাজনীতিবিদ এবং ঢাকা থেকে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। হিন্দু ও মুসলমান নির্বাচকমণ্ডলীর এলাকা ঢাকা ছিল ভদ্রলোকদের একটা শক্তিশালী ঘাঁটি এবং এখান থেকে তিনিই প্রথমবারের মতো মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

শুরু থেকেই জনাব হকের রাজনৈতিক জীবনের যাত্রাপথ হয় বিসর্পিল এবং লক্ষ্যহীন। মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্স এবং ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগ গঠনের সাথে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। পরে তিনি যুবক মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের একজনে পরিণত হন। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে যে কয়জন বাঙালি স্বাক্ষর করেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। পরের বছর অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ও সর্ব-ভারতীয় মুসলিম লীগের যৌথ অধিবেশনে ফজলুল হক সভাপতিত্ব করেন। জনাব হক তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরুর দিকে কোলকাতায় খেলাফত আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা হলে তিনি খেলাফত আন্দোলনের মূল প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, খেলাফত আন্দোলনের প্রস্তাবিত কর্মসূচি অনুযায়ী সরকারি স্কুল ও কলেজ বয়কট করা হলে তা মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতির কারণ হবে। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে জনাব হক মুসলমানদের জন্য স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট হন যা 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর' হয়। এই 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানেরা তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত ... কারণ তিনি তাদের জন্য চাকুরির ব্যবস্থা করেন, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেন'।[৫১] জনাব হকের রাজনীতিতে কয়েকটি বিষয়ের অপূর্ব সমন্বয় ঘটে; এর মধ্যে ছিল তাঁর নিজস্ব ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ, বাঙালি স্বদেশপ্রেম ও মুসলমান জনপ্রিয়তাবাদ (Muslim Populism)। অবস্থানুযায়ী তিনি যে কোনো একটি বিষয়কে গুরুত্ব দিতেন। সুযোগ সন্ধানী ছিলেন তিনি; বিশেষ কোনো সময়ে তিনি যে কাজ করতেন তা তিনি নিজে বিশ্বাস করার মতো করেই সম্পাদন করতেন। তাঁর গভীর আন্তরিকতা ও উদারতা উপকথার মতোই ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি বাঙলার নেতৃবৃন্দের মধ্যে একজন প্রাণপ্রিয় নেতা হয়ে ওঠেন।

আকরম খাঁ ও ফজলুল হক উভয়ে মুসলিম রাজনীতির নতুন গ্রুপের প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন। শিক্ষা ও চাকুরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য যে সুযোগ দেওয়া হয় তা গ্রহণে বাঙালি মুসলমান পরিবারের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে – এসব ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার নীতি ব্রিটিশরা আগেই সজ্ঞানে গ্রহণ করেছিল।[৫২] ফজলুল হকের মতো অনেক পরিবার ছিল গ্রামীণ 'আশরাফ' শ্রেণীর চেয়ে 'সামান্য কম' মর্যাদাসম্পন্ন।[৫৩] তবে এসব পরিবারের মধ্যে অনেক পরিবারই ছিল অবস্থাপন্ন বা জোতদার – যে জোতদারদের অভ্যুদয় সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। মোহামেডান এডুকেশনাল কমিটি ১৯১৪ সালে সন্তোষের সাথে উল্লেখ করে যে, আগের চেয়ে মুসলমানেরা এখন বেশি সংখ্যায় স্কুলে যাচ্ছে। এ বক্তব্যের সমর্থনে ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে, 'কৃষকেরা সম্প্রতি

পাট ব্যবসায়ে বেশ লাভবান হয়েছে এবং এর ফলে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি তাদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।'[৫৪] এই শতাব্দীর প্রথম চার দশকে মুসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে – আগে ছিল চার ভাগের এক ভাগ, এখন দ্বিগুণের বেশি।[৫৫] তবে মুসলমান ছাত্রদের অর্ধেকের বেশি প্রাথমিক শিক্ষা শেষে স্কুল ত্যাগ করে। ১৯৪০ সালের এক হিসেবে দেখা যায়, আর্টস কলেজে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা পাঁচ জনের মধ্যে এক জনের কম, আর পেশাগত প্রশিক্ষণ কলেজে তাদের সংখ্যা দশ জনের মধ্যে এক জনের চেয়ে সামান্য বেশি। কৃষক পরিবারের যেসব মুসলমান ছাত্র উচ্চ শিক্ষার জন্য শহরে আসত তাদের মধ্যে প্রায় সবাই এমন গরিব ছিল যে, তারা হোস্টেলে থাকতে পারত না। তারা হয় আত্মীয়ের বাসায় থাকত এবং থাকা-খাওয়ার জন্য ঐ পরিবারের ছেলেমেয়েকে লেখাপড়ায় সাহায্য করত। এই পদ্ধতিকে বলা হত 'জায়গির' থাকা এবং এর ফলে কিছু গরিব মুসলমান ছাত্র শহরে থেকে মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজে পড়ার সুযোগ পায়।[৫৬] দৃষ্টান্ত হিসেবে তমিজউদ্দিন খানের কথা উল্লেখ করা যায়। দূরবর্তী এলাকা কুচবিহারে অবস্থিত কলেজে বিনা বেতনে পড়ার জন্য তিনি তাঁর ফরিদপুরের গ্রাম ছেড়ে যান। কলেজে পড়ার জন্য বেতন দিতে হত না ঠিকই, কিন্তু ঐ কলেজের ফারসি বিভাগের একজন অধ্যাপক তমিজউদ্দিনের সহায়তায় এগিয়ে না এলে সেখানে তাঁর পড়া হত না। তমিজউদ্দিনের মতো অসহায় ছাত্রদের জন্য ঐ অধ্যাপক তাঁর সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন। একজন মুসলমান পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরের বাসায় তিনি তমিজউদ্দিনকে 'আবাসিক ছাত্র-কাম-শিক্ষক' হিসেবে থাকার ব্যবস্থা করে দেন।[৫৭] পরে তিনি কোলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে লেখাপড়ার সুযোগ পান। কিন্তু 'জুবিলী হোস্টেলে থাকার জন্য তাঁর অর্থ ছিল না। তাঁর সমস্যার বিষয়টি অনুধাবন করে ঐ হোস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্ট তাঁকে তৎকালীন মুন্সেফ জনাব হাসিবুদ্দীন আহমদের বাসায় 'জায়গির' থাকার ব্যবস্থা করে দেন।'[৫৮] শেষে তমিজউদ্দিন খান অনার্সসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন – ফরিদপুর জেলায় তিনিই প্রথম মুসলমান যিনি অনার্সসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

যেসব মুসলমান ছেলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে লেখাপড়া করার সুযোগ পায় তাদের সংগ্রামের কাহিনীর এটা একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। এরা হল 'প্রথম প্রজন্মের'[৫৯] ছাত্র এবং তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী কৃষকদের সন্তান। শিক্ষক, কেরানি, মুন্সেফ বা উকিল হওয়ার জন্য যেসব যুবক মফস্বল শহরে যায় তাদের মধ্যে গ্রামীণ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে – তারা অমার্জিত ভাষায় কথা বলে, গ্রামের লোকদের মতো পোশাক পরে ও খাদ্য খায়। ফজলুল হকের জেলা শহর বাকেরগঞ্জ নিয়ে গবেষণা করার পর জে. সি. জ্যাক শিক্ষিত মুসলমানদের সম্পর্কে যে বর্ণনা দেন তা হল:

> [তারা] বসবাস করে ঠিক কৃষকদের মতো, কৃষক পরিবার থেকেই তারা উঠে এসেছে। মুসলমান ব্যবসায়ী, সামান্য জমির মালিক মুসলমান ও মুসলমান কেরানিদের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য। এরা সাধারণত অবস্থাপন্ন চাষি পরিবারের সন্তান। তাদের আচার-আচরণ ও জীবনযাপনের মান তাদের পিতাদের মতোই।[৬০]

ভাবী বিদ্বানদের সবাই 'ইংরেজি' শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি; অনেক মুসলমানকে স্থানীয় বিদ্যালয়, মক্তব ও মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতে হয়। নতুন এই ধারা সম্পর্কে ১৯১৭ সালে বাঙলার জনশিক্ষা পরিচালক মন্তব্য করেন: 'পুত্রকে শিক্ষাদানে আগ্রহী এই এলাকার সফল মুসলমান কৃষক তার পুত্রকে মুসলিম আইন, সাহিত্য, যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্র শিক্ষার জন্য এবং হাদিস ও তফসির অধ্যয়ন করার জন্য মাদ্রাসায় পাঠায়।'[৬১] বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে কোনরকম সামাজিক দাবি ছাড়াই পল্লির সাধারণ পরিবারের সদস্যদের এসব স্কুলে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে অনেকে 'মোল্লা' হিসেবে গ্রামীণ সমাজে ধর্মীয় নেতার মর্যাদা লাভ করে। মাদ্রাসা শিক্ষা কিছুটা ভিন্ন ধরনের এবং ইংরেজি মাধ্যমিক স্কুলের চেয়ে ঐ শিক্ষার মান কিছুটা নিম্ন পর্যায়ের। ফলে মাদ্রাসায় শিক্ষিত মুসলমানেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে বা শহরে পার্থিব চাকুরি প্রাপ্তির প্রতিযোগিতায় সফল হতে ব্যর্থ হয়।[৬২] তবে স্কুলগামী মুসলমান ছাত্র সংখ্যার তুলনায় মাদ্রাসাগামী ছাত্রের সংখ্যা ছিল খুবই কম।[৬৩]

সমাজে 'আশরাফ'[৬৪] মর্যাদা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণীর এসব মুসলমান ১৯৩০ সালের দিকে বাঙলার রাজনীতির পুরোভাগে চলে আসে। অথচ এসব লোকের জন্ম, জীবনধারা ও সংস্কৃতি সাধারণভাবে ছিল নীচু স্তরের। সেই সময় পর্যন্ত হক সাহেবের মতো মুসলমান রাজনীতিকেরা ছিলেন নগর-ভিত্তিক বিষয় নিয়ে ব্যস্ত। স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, মিউনিসিপ্যালিটি ও কাউন্সিলসমূহে ভদ্রলোক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে অনেক নেতা সংগ্রামরত ছিলেন এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসন ও স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে মফস্বলের অধিক সংখ্যক অবস্থাপন্ন মুসলমান কৃষকদের ভোটাধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়ায় ফজলুল হক, তমিজউদ্দিন খান ও আকরম খাঁর মতো রাজনৈতিক নেতা প্রাদেশিক রাজনীতিতে নিজেদের ক্ষমতা প্রমাণের সুযোগ পান। সাধারণ চলতি ভাষায় বাকপটু, পল্লি এলাকার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত এসব নেতা মুসলিম রাজনীতিতে ঐতিহ্যগতভাবে কর্তৃত্বের অধিকারী সম্ভ্রান্ত লোকের চেয়ে মুসলমান কৃষক সমাজের মুখপাত্র হিসেবে নিজেদেরকে আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরতে সমর্থ হন। এঁরা কৃষক প্রজা পার্টিকে পরিচালিত করেন; এঁরাই বাঙলায় কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করতে সাহায্য করেন।

লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের কয়েকজন মুসলমান সদস্য কৃষক প্রজা পার্টি গঠন করেন। ১৯২৮ সালের বেঙ্গল টিন্যান্সি এ্যাক্ট পাস হওয়ার পর প্রজা ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার প্রয়াসে চাপ সৃষ্টিকারী একটা গ্রুপ গঠনের উদ্দেশ্যে তাঁরা ঐ পার্টি গঠনে উৎসাহিত হন।[৬৫] এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেন ফজলুল হক, তিনি নব গঠিত 'কাউন্সিল প্রজা পার্টি'র নেতা নির্বাচিত হন। তমিজউদ্দিন খান হন এ পার্টির সচিব। কাউন্সিলের বাইরে থেকে সমর্থন দেওয়ার জন্য তাঁরা ১৯২৯ সালে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠন করেন – এর প্রথম সচিব হন আকরম খাঁ এবং ফজলুল হক হন ভাইস-প্রেসিডেন্টগণের মধ্যে একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। ত্রিশ দশকের প্রথম দিকে নতুন এই সংগঠন কৃষি সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে

মফস্বল এলাকায় সম্মেলন করে। অর্থনৈতিক মন্দার সময় পূর্ব বাঙলায় ব্যাঙের ছাতার মতো যেসব 'কৃষক সমিতি' গড়ে ওঠে সেই সব সমিতির প্রায় সবার সাথে এই সংগঠন সংযোগ গড়ে তুলতে শুরু করে।

যা হোক, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পাস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই নতুন সংগঠন ব্যাপকভাবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি।[৬৬] হঠাৎ করেই নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি সবার উত্তেজিত আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় – শহরের মুসলমান রাজনীতিকেরা ব্যাপকভাবে এর প্রতি আকৃষ্ট হন। একজন খ্যাতনামা কৃষককর্মী আবুল মনসুর আহমদ তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেন যে, 'তৎকালে (১৯৩৫ সালে) প্রজা সমিতি বাঙলার মুসলমানদের একরূপ সর্বদলীয় প্রতিষ্ঠান ছিল। কংগ্রেসী-অকংগ্রেসী, সরকার-ঘেঁষা, সরকার-বিরোধী, সকল দলের মুসলমান রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর সমাবেশ ছিল এই প্রজা সমিতিতেই।'[৬৭] কৃষি সম্পর্কিত বিষয়ে একমাত্র মুসলমান সংগঠন প্রজা সমিতি হয়ে ওঠে দলবদ্ধ হওয়ার একটি স্থান। সব দলের মুসলমানেরা এখানে এসে সমবেত হন – যেন কৃষক নেতা হিসেবে নিজেদের পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত এবং কৃষকদের তাঁরা সমর্থন লাভ করতে পারেন। ঐ একই বছরে সমিতির প্রেসিডেন্টের পদটি খালি হয় – সময় নষ্ট না করে সব গ্রুপের লোকেরা ঐ পদের কর্তৃত্ব দখলে আনার জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। আকরম খাঁ ও ফজলুল হককে কেন্দ্র করে দুটো গ্রুপ গঠিত হয় – তাঁরা সভাপতির পদটি দখল করার জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। আকরম খাঁর গ্রুপকে সহায়তা করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো নগরকেন্দ্রিক ক্ষমতাশালী নেতারা। কৃষিভিত্তিক সংগঠনের ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দীর অবশ্য আগ্রহ ছিল না, তবে তিনি পল্লি এলাকার ভোটের গুরুত্বকে স্বীকার করতেন। ফজলুল হকের গ্রুপে ছিল অনেক যুবক কর্মী যেমন, ময়মনসিংহের আবুল মনসুর আহমদ, নদীয়ার শামসুদ্দিন আহমদ এবং যশোরের নওশের আলী – এঁরা সবাই ছিলেন 'ইংরেজি' শিক্ষিত পেশাজীবী[৬৮] ও কংগ্রেসের সমর্থক। এঁরা ছিলেন সাধারণভাবে তরুণ। তাঁরা নিজেদের পুরানো ধারার নেতৃত্বের র‍্যাডিক্যাল ও প্রগতিশীল বিকল্প হিসেবে তুলে ধরেন।[৬৯] সমিতির কর্তৃত্বের দখল নিয়ে বাঙালির মধ্যে যা হয় তা-ই শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল। সমিতি দু'ভাগ হয়ে গেল। হক সাহেব খণ্ডিত একটি অংশের নেতৃত্ব দিলেন – ঐ অংশের তিনি নামকরণ করলেন কৃষক প্রজা পার্টি। কয়েক মাস ধরে আকরম খাঁ বিভক্ত নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির নেতৃত্ব দিলেন – অচিরেই মুসলিম লীগের সাথে একীভূত না হওয়া পর্যন্ত ঐ সমিতি টিকে ছিল।

হক সাহেবের কর্মীরা প্রজা সমিতি ত্যাগ করার সময় অধিকাংশ কৃষক সংগঠন সাথে করে নিয়ে যায়। অবিলম্বে তারা উত্তর ও পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন এলাকায় একাধিক নতুন সমিতি গঠন করে; এসব এলাকায় সমর্থন প্রাপ্তির জন্য তাদের কাজ করার সুযোগ ছিল। ১৯৩৬ সালের মে মাসে রাজশাহী জেলার নাটোরে একটা শাখা অফিস খোলা হয়।[৭০] ঐ মাসে ময়মনসিংহের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এক রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, ঐ জেলায় প্রজা সমিতির অনেক অফিস খোলা হয়েছে। তিনি বলেন, 'অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা (আইন

সভার) নতুন নির্বাচনের প্রচারণার সাথে সংশ্লিষ্ট।' ময়মনসিংহে কৃষক প্রজা পার্টির মূল চালিকা শক্তি ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। বাঙলায় কৃষক আন্দোলনের প্রথম দিকের বিষয় তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেন। ঐ সময় আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন 'তরুণ অসফল উকিল, একজন ভালো বক্তা এবং বাঙলা ভাষার একজন ভালো লেখক'। ময়মনসিংহে কৃষক প্রজা পার্টির প্রচারণার খরচ যোগাতেন অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৌলভী আবদুল মজিদ; ময়মনসিংহ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মতে, 'তিনি ছিলেন এমন বোকা যে, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়ার মিথ্যা আশায় তিনি তাঁর কষ্টার্জিত নগদ অর্থ ব্যয় করেন।'[৭১] ধনবাড়ির নওয়াব ও তাঁর পুত্র হাসান আলী স্থানীয়ভাবে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন – ঐ ছাপাখানার নাম 'মিলন প্রেস'। এ প্রেস থেকেই কৃষক প্রজা পার্টির সাময়িক পত্রিকা 'চাষী' প্রকাশিত হয়।[৭২] প্রথম দিকে এসব কাজকে সরকারের জন্য অমঙ্গলসূচক বলে আশংকা করা হয়। পল্লি অঞ্চলে বসবাসরত সরকারের অনেক সাবেক সহযোগী নির্বাচনী রাজনীতির ঘোলা পানিতে নেমে পড়েন।

নবগঠিত কৃষক প্রজা পার্টির নেতারা ছিলেন বিভিন্ন শ্রেণী থেকে আগত। তাঁরা কৃষক ছিলেন না। আবুল মনসুরের মতো ফজলুল হকও প্রদেশের একটা শহরে আইনজীবী হিসেবে জীবন শুরু করেন। মজিদ সাহেব ছিলেন একজন সরকারি কর্মচারী। অন্য একজন নামকরা কৃষক নেতা ও কৃষক প্রজা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শামসুদ্দিন আহমদ ছিলেন নদীয়া জেলা থেকে আগত একজন উকিল। অন্যান্যের উত্থান হয় আরও সামান্য অবস্থা থেকে। তমিজউদ্দিন খানের পিতা ছিলেন কৃষক, ফরিদপুরে তাঁর চাষাবাদের জন্য ছিল মাত্র তিন একর জমি।[৭৩] ময়মনসিংহের এক ক্ষুদ্র জোতদার পরিবার থেকে আসেন শাহ আবদুল হামিদ।[৭৪] আর নওশের আলী 'তাঁর জীবন শুরু করেন নড়াইল মহকুমার সিভিল কোর্টে একজন প্রসেস সার্ভার হিসেবে'।[৭৫] তাঁদের প্রায় সবাই মোটামুটি শিক্ষিত ছিলেন এবং মফস্বল শহরে তাঁদের জীবন শুরু করেন। তাঁরা তাঁদের গ্রামীণ সাংস্কৃতিক আচার-আচরণ অক্ষুণ্ন রাখেন। আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন একজন শিক্ষিত আইনজীবী। তাঁকে বলা হয় 'একজন উৎসাহী কর্মী। ক্ষমতা লাভ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর নম্র ব্যবহার কৃষকদের মন জয় করে।'[৭৬] পল্লি এলাকার নতুন ভোটারদের আস্থা অর্জন করতে তাঁরা সক্ষম ছিলেন; এই ভোটারদের অধিকাংশই ছিলেন জোতদার – নতুন পদ্ধতিতে ভোটের অধিকার প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট সম্পদ তাঁদের ছিল। হক সাহেবের নেতৃত্বে পরিচালিত পার্টিতে অনেক জোতদারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়; ১৯৩৭ সালের মধ্যে পাঁচ জন জোতদারসহ এগারো জন পেশাজীবী এবং দু'জন সাবেক সরকারি কর্মচারী নির্বাচনী বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত হন।[৭৭]

প্রজা পার্টির ঘোষিত লক্ষ্য ছিল ক্ষতিপূরণ ছাড়াই জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধন করা। এর কর্মসূচিতে ছিল খাজনা মাফ ও ঋণ রহিত করা। এ ধরনের সম্ভাবনা চাষিদের অবশ্যই খুশি করে এবং এ ধরনের আশা হাজার হাজার গরিব ও নিম্ন শ্রেণীর লোকদের উৎসাহিত করে। তবে কৃষক প্রজা পার্টির মূল স্লোগান 'জমিদারি নিপাত যাক' (Down

with Zamindari) ছিল ধনী কৃষকদের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন– কেননা এরা সরাসরি জমিদারদের কাছ থেকেই জমির মালিকানার অধিকার পেয়েছিল। জমিদারদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে তারাই ছিল সোচ্চারভাবে সমালোচনামুখর। কারণ তাদের আর্থিক ও সামাজিক কল্যাণের পথে জমিদারদের ক্ষমতা ছিল প্রধান বাধা। অধীন-প্রজা (কোর্ফা) ছিল সবচেয়ে বেশি গরিব; জমিদারের চেয়ে তাদের ওপর বেশি অত্যাচার করত রায়তি স্বত্বের অধিকারী বা পতনিদার – কারণ তাদের কাছ থেকেই তারা জমি গ্রহণ করত। রায়তি স্বত্বের অধিকারী বা পতনিদার জমিদারকে যে খাজনা দিত তার চেয়ে বেশি তারা আদায় করত অধীন-প্রজাদের কাছ থেকে। যাহোক, কৃষক নেতাদের মধ্যে এই 'নতুন জনপ্রিয়' বাগ্মীরা[৭৮] চাষিদের মধ্যকার এই ভিন্নতাকে দূর করে শুধুমাত্র জমিদার ও দাদন ব্যবসায়ীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। কৃষক আন্দোলনের মূল লক্ষ্যবস্তু হিসেবে জমিদার ও সুদ ব্যবসায়ীদের বেছে নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন মুসলমান গ্রুপের মধ্যকার সাংস্কৃতিক ঐক্য ও সাধারণ উদ্দেশ্যকে সঙ্ঘবদ্ধ করা, এবং কৃষক প্রজা পার্টি সে-কাজটি করতেই সচেষ্ট ছিল। অবস্থাপন্ন কৃষক, মধ্যবিত্ত মুসলমান, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কেরানি ও সামান্য ভূমির মালিক এবং চাষিদের, যাদের মধ্য থেকে এদের উৎপত্তি, 'আচার-আচরণ ও জীবনযাত্রার মান' ছিল একই ধরনের।[৭৯] জমিদার ও সুদ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়। কারণ মুসলমান জনগণের বিরুদ্ধে তারা তাদেরকে হিন্দু অত্যাচারী হিসেবে গণ্য করে। জ্যাক উল্লেখ করেন যে, সাধারণ লোক ও হিন্দু ভদ্রলোক জমিদার, খাজনা আদায়কারী বা বেনিয়াদের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তা লক্ষ করার মতো:

> ভূস্বামী, কেরানি, পেশাজীবী লোক যেমন ডাক্তার, উকিল ও পাদ্রিরা এক আলাদা শ্রেণীর লোক। এই তিনটি হল উচ্চ শ্রেণীর লোক এবং এরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সাধারণ লোকের চেয়ে পৃথকভাবে বসবাস করে আসছে। এদের চাহিদা বেশি এবং এদের টাকা খরচ করার উপায়ও ভিন্ন; এরা আহার করে কম, কিন্তু ভালো ভালো অনেক ধরনের খাবার খায়। এদের বাড়ি তৈরি করা হয়েছে একটি ভিন্ন ধরনের প্ল্যান অনুযায়ী এবং ঐ সব বাড়ি উত্তম আসবাবপত্র দিয়ে সজ্জিত। এদের পোশাক উন্নত মানের ও রঙ-বেরঙের ... অন্য এক শ্রেণীর লোক আছে যাদের জীবনযাত্রার মান তাদের নিজস্ব – যা কিনা শ্রমিক শ্রেণী ও 'সম্মানিত' শ্রেণীর লোকদের চেয়ে পৃথক – এরা হল হিন্দু দোকানদার ... এদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনেক, এদের বাড়িতে অনেক চাকর-বাকর থাকে, এদের বাড়ি বেশ বড়, মজবুতভাবে তৈরি ও সুন্দর আসবাবপত্র দিয়ে সজ্জিত। এরা বাসায় চাকর-বাকরদের জন্য যে অর্থ খরচ করে তার চেয়ে বেশি খরচ করে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য।[৮০]

উচ্চ শ্রেণীর লোকের পরিবর্তে 'সাধারণ জনগণে'র বক্তৃতামঞ্চ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করার সুযোগ কৃষক প্রজা পার্টি গ্রহণ করে। ঐ উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে শুধু হিন্দু ভদ্রলোকই ছিল না, সমৃদ্ধ মুসলমানেরাও ছিল – তারাই সার্বিক পরিস্থিতির ওপর ঐতিহ্যগতভাবে কর্তৃত্ব করত। কোলকাতায় বসে যারা কলকাঠি নাড়ত তারা তাদের গ্রামীণ আত্মীয় বলে ফজলুল হকের মতো লোকদেরও অতীতে উপেক্ষা করে এসেছে অথচ এখন ফজলুল হক ও তাঁর অনুসারীদের কাছে ঐ পরিচিতি প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছ থেকে ক্ষমতা

ছিনিয়ে আনার উপায় হিসেবে মূল্যবান সম্পদ হয়ে দাঁড়াল, অবশ্য যদি পরিচিতিকে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা যায়। এজন্য তাদের একান্ত প্রয়োজন ছিল গ্রামীণ পৃষ্ঠপোষকতা – এমন-সব লোক যাদের স্থানীয় পর্যায়ে মর্যাদা আছে ও ভোটারদের ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা আছে। কারণ তাদেরকেই অতীত মনিবদের বিরুদ্ধে কৃষক প্রজা পার্টির হয়ে লড়াইয়ে ব্যবহার করতে হবে। অর্থনৈতিক মন্দার পর মন্দা থেকে লাভবান অনেক জোতদার ক্ষমতার অংশীদার হবার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। 'জনগণের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করা'র জনপ্রিয় প্রতিশ্রুতি দিয়ে কৃষক প্রজা পার্টির কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল।[৮১] কিন্তু এটি এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল যাতে বিশেষ করে জোতদার গ্রুপই আকৃষ্ট হতে পারে। ঐ কর্মসূচিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ, ভূমির খাজনা হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ করা, জমি ক্রয় করার ক্ষেত্রে জমিদারদের অগ্রক্রয়ের অধিকার বাতিল, আবওয়াব ও নজর সালামিসহ অন্যান্য স্থানীয় করের (cesses) বিলোপ এবং ঋণ সালিশি বোর্ড গঠনের দাবি অন্তর্ভুক্ত হয়,[৮২] যা জমিদারদের ব্যাপক ক্ষমতার বিরুদ্ধে নিষ্পেষিত প্রজা-মালিকদের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য ছিল খুবই কার্যকর উপায়। কৃষকদের বিভিন্ন স্তর থেকে ক্রমাগত উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে পার্টি নেতৃত্ব ও দলীয় কর্মসূচিতে কোনো দিক-নির্দেশনা ছিল না। ঐসব সমস্যার মধ্যে ছিল – কম ভাগ্যবান প্রতিবেশীদের ক্ষতিসাধন করে জোতদারদের সমৃদ্ধি, ক্ষুদ্র জমির মালিকদের ক্রমবর্ধিত হারে জমি হস্তান্তর ও বিক্রি, এবং ভাগচাষি ও কৃষি শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি। এসব কারণে কৃষক প্রজা পার্টিকে 'জোতদারদের পার্টি' বলে খোলাখুলিভাবে দোষারোপ করা হয়। এ অভিযোগের মধ্যে সত্য ছিল বলে আবুল মনসুর আহমদ স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন:

> বাংলার প্রজা আন্দোলনকে এঁদের অনেকেই জোতদার আন্দোলন বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। নিছক কথা হিসেবে ওঁদের অভিযোগ অনেকখানি সত্য ছিল ... কিন্তু আমার ওঁদের ও-মত ছিল তৎকালের জন্য আল্ট্রা-লেফটিজম ... আমার জ্ঞান-বিশ্বাস মতে, তৎকালীন প্রজা-আন্দোলনই ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে যুগোপযোগী গণ-আন্দোলন।[৮৩]

তাই কৃষক প্রজা পার্টি এমনি একটা মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয় এবং এর ডানায় ভর করে প্রধানত মুসলমান জোতদার ও নতুনভাবে ভোটাধিকারপ্রাপ্ত লোকেরা বাঙলার রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। অতীতে মুসলমান জোতদারেরা স্থানীয়ভাবে তাদের ক্ষমতার প্রকাশ ঘটালেও প্রাদেশিক রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা ছিল খুবই সামান্য। সারা বাঙলায় স্থানীয় বোর্ডগুলোতে তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে এ কথাই প্রমাণ করে যে, ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে সংখ্যালঘু জেলাগুলোতেও মুসলমানেরা যৌথ নির্বাচনকে নিজেদের অনুকূলে ব্যবহার করতে শেখে।[৮৪] ১৯৩৬ সালে দেখা যায়, তেরোটি জেলায় মুসলিম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দৃঢ়ভাবে,[৮৫] আর মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলায় স্থানীয় বোর্ডের সব আসনের অর্ধেক পেয়েছে মুসলমান সদস্যরা। ঐ বছরে সারা বাঙলার সব স্থানীয় বোর্ডের আসনে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল অর্ধেকের কিছু বেশি।[৮৬]

স্থানীয় পর্যায়ে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মূলত এক শ্রেণীর মুসলমান কৃষকের ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির প্রতিচ্ছবি; উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে এ ধরনের চিত্র বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। এসব জেলায় 'অধিকাংশ ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট ছিলেন জোতদার শ্রেণীর এবং তাদের জমির পরিমাণ ছিল ত্রিশ থেকে তিনশ একর পর্যন্ত'।[৮৭] যারা (জোতদারেরা) এতদিন ধরে জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে নিজেদের রাজনীতিতে সীমিত রেখেছিল তারা এখন থেকে প্রাদেশিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। তারা কৃষক প্রজা পার্টিকে একটা সুবিধাজনক মঞ্চ হিসেবে পায় – সেখানে তাদের উপস্থিতিকে তারা সরব করে তোলে। এভাবেই মন্দার সময় পল্লি অঞ্চলে সৃষ্ট তীব্র মতবিরোধটি এখন প্রাদেশিক পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে। পূর্বে জমিদার-প্রজা, সুদ ব্যবসায়ী-ঋণগ্রহীতা ও জোতদার-বর্গাদারদের মধ্যকার বিক্ষিপ্ত উত্তেজনা শুধু স্থানীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল, এখন তা প্রাদেশিক রাজনীতিতে বিস্তৃত হয়। আগে জমি সংক্রান্ত বিরোধে কোনো কোনো এলাকায় মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক রঙ চড়ানো হত,[৮৮] এখন তা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাদেশিক রাজনীতির মেরুকরণে শক্তিশালী উপাদানে পরিণত হল। প্রজাস্বত্ব আইন, মালিকানা স্বত্ব, সুদের হার ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে নতুন আইন সভায় প্রধানত মুসলমান কৃষক প্রতিনিধিরা সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ করতে থাকে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জমিদারি পদ্ধতির সুবিধাভোগীরা, যারা প্রধানত ছিল হিন্দু, জোটবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। এই জোট বাঁধার ক্ষেত্র ও বৈশিষ্ট্যে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।[৮৯]

তবু এ কথা অবশ্য বলা যায় না যে, জোতদার-জমিদার প্রতিযোগিতা সরাসরি সাম্প্রদায়িকতায়, আরও স্পষ্ট করে, হিন্দু-মুসলমান বিরোধে রূপ লাভ করে। এটা গ্রহণ করা ঠিক নয় যে, রজত ও রত্না রায় যেভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন, 'এটাও ছিল পূর্ব বাঙলায় জোতদার ও জমিদারদের মধ্যকার বিরোধ, যে বিরোধ নিরবচ্ছিন্ন এবং সামগ্রিকভাবে প্রদেশে মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে ইন্ধন যোগায়, যার ফলে ১৯৪৭ সালে বাঙলা ভাগ চূড়ান্ত হয়।'[৯০] এ কথা স্বীকার্য যে, জমিদারদের অধিকাংশই ছিল উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু এবং অধিকাংশ কৃষক ও অনেক জোতদার ছিল মুসলমান। পূর্ব বাঙলায় অবশ্য মুসলমান জমিদারের সংখ্যা একেবারে কম ছিল না। ঢাকার নওয়াব এবং খাজা মহিউদ্দিন ফারুকীর মতো লোকের বড় বড় এস্টেট একাধিক জেলায় বিস্তৃত ছিল। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে, কৃষক প্রজা পার্টির নেতারা সাধারণত তাদের সম্প্রদায়গত পছন্দকে গুরুত্বহীন বিষয় হিসেবে রাখতে সচেতন ছিল; আইন সভা নির্বাচনের প্রচারের সময় নিজেদের নিরপেক্ষতা প্রমাণের জন্য তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ক্ষমতাশালী মুসলমান জমিদারদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বেছে নেয়। ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসে টিপেরা জেলার কুমিল্লায় সমবেত চার হাজার মুসলমানের এক জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় জনাব ফজলুল হক 'সাধারণভাবে সব জমিদার এবং নির্দিষ্টভাবে স্যার নাজিমুদ্দিন ও স্যার কে. জি. এম. ফারুকীর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। নির্বাচনী প্রচারণায় সরকারি অর্থ ব্যয় এবং গরিবদের স্বার্থ উপেক্ষা করার জন্য তিনি তাঁদের অভিযুক্ত করেন।'[৯১] কৃষক প্রজা আন্দোলনের কর্মসূচি ও

পদ্ধতি ধর্মভিত্তিক ছিল না – নির্বাচনে শুধু মুসলমান আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও এ দলটি তার অসাম্প্রদায়িক অবস্থান বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিল। আসলে কৃষক প্রজা পার্টি নয়, শহর ও গ্রামের ঐতিহ্যবাহী মুসলিম আশরাফ নেতৃবৃন্দ নতুন মুসলমান ভোটারদের মন জয় করার জন্য মুসলিম ঐক্যের প্রচেষ্টা চালায়।

ঢাকার নওয়াব হাবিবুল্লাহর উদ্যোগে ১৯৩৬ সালের মে মাসে 'নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচির ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা' করার লক্ষ্যে একটা নতুন মুসলমান দল গঠিত হয়।[৯২] ঢাকার নওয়াবের কোলকাতা বাসভবনে গঠিত এ দলের উদ্দেশ্য ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাদেশিক মুসলিম লীগের স্থান দখল করা। 'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি' নামে গঠিত এ দলের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন নওয়াব সাহেব; জলপাইগুড়ির অপর একজন নওয়াব মোশাররফ হোসেন হন এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট। দলের সেক্রেটারি হন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং ট্রেজারার হন কোলকাতার ব্যবসায়ী হাসান ইস্পাহানী। নতুন এ দলটি ছিল মূলত বাঙলার একাধিক প্রসিদ্ধ ও ক্ষমতাশালী মুসলমান পরিবারের মধ্যে একটা নির্বাচনী ঐক্যজোট বিশেষ। সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য প্রতিশ্রুত রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ এবং নতুন কৃষক প্রজা পার্টির চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করতে হলে এই পরিবারগুলোর অভ্যন্তরীণ বিরোধ ভুলে নতুন প্রতিযোগীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু এই জোট নতুন বেঙ্গল প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রাণশক্তি ও কেন্দ্রবিন্দু এবং রাজনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই ঐক্যজোটের সদস্যদের পূর্ব-পরিচয় আলোচনা করা খুবই প্রয়োজন।

ঢাকার নওয়াবেরা মূলত ছিল কাশ্মীর থেকে আগত সফল চামড়া ব্যবসায়ী। প্রথমে তারা দিল্লী যায় এবং পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঢাকায় আসে। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের পর এই পরিবার জমিজমায় অর্থ বিনিয়োগ করে – বাঙলার উড়নচণ্ডী নওয়াবদের কাছ থেকে তারা জমি ক্রয় করে। এর পরবর্তী বছরগুলোতে তারা স্থানীয় বিভিন্ন পরিবারে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে – নতুন এলাকায় তাদের ক্ষমতাকে জোরদার করার ব্যাপারে ঐসব পরিবার তাদের সাহায্য করে। ১৮৩৫ সালে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত একটা ফরাসি ফ্যাক্টরি বিল্ডিং ক্রয় করে এবং প্রাচীন নওয়াবদের দালানের মতো করে সেটি নতুন করে পুনর্নির্মাণ করে ঐ বিল্ডিং-এর নামকরণ করে 'আহসান মনজিল'। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত এই রাজকীয় বাড়িটি হয়ে ওঠে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান ঘাঁটি; পরবর্তীকালে এই বাড়িটি শুধু ঢাকার জন্য নয়, সারা বাঙলার জন্য মুসলিম লীগের হেডকোয়ার্টার হিসেবে গণ্য হয়। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় সরকারের প্রতি সুস্পষ্টভাবে আনুগত্য প্রকাশ করায় সরকার একটু দেরিতে হলেও, ১৮৭৫ সালে, আবদুল গনিকে 'নওয়াব' উপাধি প্রদান করে। দু'বছর পর ঐ উপাধিকে তাদের বংশগত উপাধি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।[৯৩] ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় ঐ পরিবারটি পরবর্তী কয়েক দশক ধরে আরও সমৃদ্ধি অর্জন করে। ১৯১২ সালে বাঙলা বিভক্তি রদ না হওয়া পর্যন্ত তারা ব্রিটিশদের প্রতি দৃঢ়ভাবে অনুগত ছিল। ১৯১৬ সালে নওয়াব সলিমুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন।

অবশ্য মৃত্যুর আগেই ব্রিটিশদের ব্যাপারে তাঁর মোহমুক্তি ঘটেছিল। কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারীরা পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশদের প্রতি অনুগত থাকে এবং খেলাফত আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে।

কুড়ির দশকে পরিবারটি আবার নতুন মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। নওয়াবের এক চাচাতো ভাই খাজা নাজিমুদ্দিন প্রমাণ করেন যে, বিশ্বস্তরা এখনও তাদের কৃতজ্ঞ মনিবের কাছ থেকে প্রভূত পুরস্কার আশা করতে পারে:

> বেঁটে ও বিশাল বপু, খানেওয়ালা হিসেবে পরিচিত এবং ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্যে সদা প্রস্তুত ব্যক্তি ... পরিধানে শেরোয়ানি, চুড়িদার পাজামা ও ফেজ টুপি, পায়ে ক্ষুদ্রাকৃতির জুতা ... হাতে থাকত হাতলওয়ালা একটা বেতের লাঠি। তিনি একটা কাল ও ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করতেন।[৯৪]

কেম্ব্রিজে পড়াশোনা শেষে খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকা মিউসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হন। তিনি শিক্ষামন্ত্রী হন ১৯২৯ সালে, এবং শেষে ১৯৩৫ সালে তিনি ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য হন। তাঁর পরিবারের লোকদের দাবি, তাঁদের পূর্ব পুরুষেরা ছিলেন 'পারস্যের' অধিবাসী, তাঁরা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতেন উত্তর ভারতের মুসলিম পরিবারের সাথে এবং তাঁরা উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারদর্শী ছিলেন। ১৯৩৪ সাল নাগাদ এই পরিবারের পারিবারিক এস্টেটের পরিমাণ ছিল 'প্রায় দুই লাখ একর' এবং পূর্ব বাঙলার সাতটি জেলায় তা বিস্তৃত ছিল। এছাড়া শিলং ও আসামে তাঁদের সম্পত্তি ছিল ... বছরে তাঁদের খাজনা আদায় হত প্রায় 'এক লাখ কুড়ি হাজার পাউন্ড'।[৯৫] সম্পদ, সামাজিক মর্যাদা ও ব্রিটিশ সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য ঢাকার নওয়াব পরিবার বাঙলায় প্রভূত ক্ষমতাশালী একমাত্র মুসলিম পরিবার হিসেবে গণ্য হয়।

নতুন দলের ট্রেজারার হাসান ইস্পাহানী ছিলেন প্রদেশের মুসলমান ব্যবসায়ীদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী। ইস্পাহানী পরিবার ছিল মূলত ইরানী ব্যবসায়ী এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে তারা বোম্বাই ও মাদ্রাজে বসতি স্থাপন করে। এই শতাব্দীর শুরুতে তারা নীল ব্যবসায়ের জন্য বাঙলায় আসে। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে তারা কোলকাতায় তাদের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে। লন্ডনে একটা শাখা অফিসসহ এটা একটা প্রধান রপ্তানি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।[৯৬] বিংশ শতাব্দীতে অর্থ ও নেতৃস্থানীয় লোক দিয়ে এই পরিবার খেলাফত আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৩২ সালে যুবক ইস্পাহানীরা কোলকাতায় 'নিউ মুসলিম মজলিশ' প্রতিষ্ঠা করেন। কেম্ব্রিজের সেন্ট জন কলেজে হাসান লেখাপড়া করেন এবং আইন ব্যবসা শুরু করার জন্য তাঁকে ১৯২৪ সালে ডেকে আনা হয়। কোলকাতায় ফিরে আসার পর তিনি তাঁর পারিবারিক ব্যবসা 'এম এম ইস্পাহানী লিমিটেড'-এ যোগ দেন। ১৯৩৩ সালে তিনি কোলকাতা কর্পোরেশনে নির্বাচিত হন।[৯৭] ইস্পাহানীর মাধ্যমে ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি কোলকাতার মুসলমান ব্যবসায়ীদের সাথে একটা ঐক্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয় – এসব ব্যবসায়ীর মধ্যে অনেকে খেলাফত আন্দোলনে অর্থ সাহায্য করে।

নতুন মুসলিম পার্টির তৃতীয় প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তিনি বাঙলার নেতৃস্থানীয় আশরাফ পরিবারের সদস্য ছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে বাঙলায় মুসলমানদের জন্য ব্রিটিশ সরকার যেসব নতুন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে তা গ্রহণে সোহরাওয়ার্দী পরিবার বিশেষভাবে সফল হয়। সোহরাওয়ার্দীর চাচা হাসান সোহরাওয়ার্দী কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান ভাইস চ্যান্সেলর হন। সোহরাওয়ার্দী বিংশ শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা মুসলিম নেতা স্যার আবদুর রহীমের পরিবারে বিয়ে করেন।[৯৮] সোহরাওয়ার্দী তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন খেলাফত আন্দোলনের সময় এবং তিনি কয়েক বছর খেলাফত কমিটির সচিব ছিলেন। অন্যান্য খেলাফতবাদীদের মতো বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দাশ চুক্তি সম্পাদনের পর তিনি স্বরাজ্য পার্টিতে যোগ দেন ও কোলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র নিযুক্ত হন। কোলকাতা-দাঙ্গার পর ১৯২৬ সালে তিনি অবশ্য স্বরাজ্য পার্টির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং কোলকাতার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে তিনি 'অনেক শ্রমিক ইউনিয়ন ও এমপ্লয়িজ ইউনিয়নকে সংগঠিত করেন – এর মধ্যে কিছু ছিল সম্প্রদায়গত এবং কিছু ছিল সাধারণ যেমন, নাবিক, রেলওয়ে কর্মচারী, পাট ও মিল শ্রমিক, রিকসাওয়ালা, কোচোয়ান, ঘোড়া-মহিষ টানা গাড়ির চালক ও খানসামা।' তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেন যে, 'কমিউনিস্ট শ্রমিক সংগঠনের বিরোধিতায় আমি যে চেম্বার অব লেবার প্রতিষ্ঠিত করি এক সময় তাতে ৩৬টি ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য হয়।'[৯৯] এ সময় অর্থাৎ ১৯২৬ সালের দাঙ্গার পর সোহরাওয়ার্দী বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত মুসলমানদের পক্ষ সমর্থন করেন (বস্তির একজন কুখ্যাত অপরাধীসহ)[১০০] এবং তিনি কোলকাতার অপরাধ জগতের সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলেন।[১০১] ১৯৩০ সাল নাগাদ সোহরাওয়ার্দী সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোক, শ্রমিক ও কোলকাতায় অপরাধ জগতের হোতাদের মধ্যে ব্যাপক ও বিভিন্নমুখী যোগাযোগ গড়ে তোলেন।

১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন অনুযায়ী শহর এলাকায় মুসলমানদের জন্য মাত্র ছ'টি আসন বরাদ্দ করা হয়, এর মধ্যে চারটি আসনই ছিল কোলকাতায়।[১০২] ফলে কোলকাতার মুসলমানদের ওপর সোহরাওয়ার্দী ও ইস্পাহানীর যত প্রভাবই থাকুক না কেন, আইন সভার আসনের ব্যাপারে এটা ছিল তাদের জন্য অতি সামান্য পুরস্কার। প্রাচীন মুসলিম পরিবারগুলোর সামাজিক প্রতিপত্তিকে রাজনৈতিক ক্ষমতায় রূপান্তর করার জন্য ইউনাইটেড মুসলিম পার্টিকে পল্লি এলাকার ভোটের একটা অংশ পেতে হবে, এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায়। ধানের ক্ষেতে জুতা পরে কাদা মাড়াবার প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা এসব আশরাফ ভদ্রলোকের কারও ছিল না; এ কারণে তাঁরা কৃষক সংগঠন ও এর নেতাদের ইউনাইটেড মুসলিম পার্টিতে নিয়ে আসার জন্য তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। প্রথম দিকে তাঁদের এ নীতি কিছুটা সফল হয় – আকরম খাঁ ও তাঁর নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির কিছু লোকের ইউনাইটেড মুসলিম পার্টিতে যোগদান নিশ্চিত হয়।[১০৩] পল্লি এলাকায় ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি ছিল বেশ জনপ্রিয়। ১৯৩৬ সালের জুন মাসে ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি

একটা সাব-কমিটি গঠন করে – ঐ সাব-কমিটির উদ্দেশ্য ছিল প্রজা পার্টির নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করে 'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টির টিকিটে নির্বাচন করার জন্য তাদের সহযোগিতা কামনা করা'।[১০৪] কিন্তু ফজলুল হক এমন লোক ছিলেন না যে তিনি তাঁর ব্যাপক সাফল্যকে সহজে ত্যাগ করবেন – তিনি হিসাব করে দেখেন যে, পল্লি এলাকার ভোটের সহায়তায় ব্যাপক সাফল্য এখন তাঁর অনুকূলে। হক সাহেব বিশ্বাস করতেন যে, তিনি মানুষের উপকার করতে পারেন এবং তিনি নিজেও উপকৃত হতে চান। পল্লি এলাকা তাঁর নির্বাচনী এলাকা, এ কথা তাঁর দাবি করার সময় এসেছে। ঢাকার পরিবারকেও তিনি চ্যালেঞ্জ করতে প্রস্তুত, যে পরিবারকে তিনি দীর্ঘদিন ধরে 'ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত বাঙলার আত্মস্বীকৃত নেতা' বলে অবজ্ঞা করেছেন।[১০৫] ফলে, ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি নেতাদের প্রসারিত সহযোগিতার হাতকে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন এবং ঢাকার নওয়াবদের জেলাগুলোতেই তাঁদের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করলেন। ঐসব জেলার ভোটারদের তিনি 'কৃষকের সত্যিকার প্রতিনিধিদের' সমর্থন করতে বলেন।[১০৬]

অতীতের দিন থাকলে প্রবীণ আশরাফ নেতৃবৃন্দ নিজেকে স্বতন্ত্র হিসেবে জাহির করা এ ধরনের স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে উপেক্ষা করতেন। কিন্তু এবার পল্লি বাঙলার আত্মস্বীকৃত নেতা হিসেবে হক সাহেবের নতুন ভূমিকাকে তাঁরা উপেক্ষা করতে পারলেন না। হক সাহেবকে বাগে আনতে ব্যর্থ হয়ে ইউনাইটেড মুসলিম পার্টির নেতারা প্রদেশের বাইরে থেকে সাহায্যের প্রত্যাশা করলেন। ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে ইস্পাহানী জিন্নাহকে বাঙলায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁর আশা ছিল হক সাহেব এই সর্বভারতীয় নেতার কর্তৃত্বকে গ্রহণ করবেন। জিন্নাহ সে-সময় সর্ব-ভারতীয় মুসলিম লীগের পুনর্গঠন এবং ঐ দলকে নিজের কর্তৃত্বে আনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। বাঙলার রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের এই সুযোগকে তাই তিনি সাদরে গ্রহণ করলেন। আগস্ট মাসে তিনি কোলকাতায় আসলেন এবং অনতিবিলম্বে নওয়াবের দলকে মুসলিম লীগে যোগদান করানোর বিষয়টি নিশ্চিত করলেন। কিন্তু হক সাহেবের ব্যাপারে জিন্নাহর সফলতা ছিল খুবই সামান্য। কৃষকদের ঘোষিত নেতা হিসেবে হক সাহেব তাঁর মর্যাদার ওপর আস্থাশীল ছিলেন এবং তিনি তাঁর নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিতে অত্যন্ত অপছন্দ করলেন। এ কারণে তিনি জিন্নাহর শর্তকে অস্বীকার করলেন। অহমিকার এ প্রকাশ জিন্নাহ সহজভাবে নিলেন না। পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি এই প্রাণবন্ত রাজনীতিককে বাগে আনার চেষ্টা করেন, সব সময় হক সাহেবকে তিনি আখ্যায়িত করেন একজন 'অসম্ভব লোক' হিসেবে।[১০৭] কিন্তু এই সময়ে বাঙলায় জিন্নাহর সফরে বেশ কিছু লাভ হল। বাঙলায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগকে তিনি পুনর্গঠিত করতে সফল হন। তিনি নিশ্চিত করেন যে, এই দলের নেতৃত্ব বাঙলার সম্পদশালী ও সুপরিচিত মুসলিম পরিবারগুলোর হাতেই থাকবে। ঐ নেতৃত্ব যদি তাঁর অধীনে নাও থাকে তবু তা মোটামুটিভাবে তাঁর কাছে ঋণী থাকবে। এভাবে বাঙলায় মুসলিম লীগের পুনর্জন্ম হল। ফজলুল হক ও কৃষক প্রজা পার্টি এ দলের বাইরে রয়ে গেল।

উভয় দল তাই একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে নির্বাচন করল। স্বতন্ত্র নির্বাচনের একটা প্রত্যাশিত ফল হল এই যে, কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী দাবিদারদের নির্বাচনে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে লড়াই করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং বাঙলার সাধারণ নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টি বা মুসলিম লীগের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসেবে কংগ্রেস আবির্ভূত হল না, কারণ কোনো মুসলিম আসনের জন্য কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। এই নির্বাচনী লড়াই চলল দুই প্রধান মুসলিম দলের মধ্যে। কংগ্রেস বা হিন্দু সভার পরিবর্তে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে তাদের বাগ্মিতা ও কর্মসূচির প্রচার করল। বাঙলার মুসলমানদের স্বার্থের 'সত্যিকার' প্রতিনিধিত্বের দাবি নিয়েই বরং কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগ একে অপরের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হল।

কৃষক প্রজা পার্টি অবশ্য প্রকাশ্যে সম্প্রদায়গত প্রচার থেকে বিরত রইল, তারা দৃষ্টি দিল কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর। হক সাহেব বক্তৃতামঞ্চে প্রধানত ডাল-ভাতের কথা প্রচার করতেন, জমিদারি প্রথা বাতিলের কথা বলতেন এবং 'স্বরাজে'র আহ্বান জানাতেন। তাঁর দলীয় কর্মসূচির ঘোষণায় রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির কথা বলা হয় – এ রকম দাবি সাধারণত করত কংগ্রেস। এতে মনে হয়, হক সাহেব তখনও বেঙ্গল কংগ্রেসের সাথে একটা সমঝোতায় আসতে আগ্রহী ছিলেন। বিস্ময়কর ব্যাপার, কংগ্রেসের দৃষ্টি দিয়ে দেখা যাবে যে, কৃষক প্রজা পার্টি কোনো হিন্দু বা তফশিলি সম্প্রদায়ের আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। অথচ ঐ দলে হিন্দু বা তফশিলি সম্প্রদায়ের লোক ছিল এবং এদের মধ্যে অনেকে ছিল জোতদার।[১০৮] হক সাহেবের প্রচারণার মূল লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের ভোট লাভ করা। নোয়াখালী জেলার লক্ষ্মীপুরে এক জেলা সম্মেলনের কর্মসূচি শুরু হয় শহুরে স্বেচ্ছাসেবকদের এক মিছিলের মধ্য দিয়ে – ঐ মিছিলের ধ্বনি ছিল 'আল্লাহু আকবর ও জমিদারি নিপাত যাক'। একই সম্মেলনে কোলকাতা থেকে আগত এক হিন্দু সদস্যের তোলা 'সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ ও সংশোধিত শাসনতন্ত্র' বাতিলের প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়।[১০৯] অন্য এক কৃষক প্রজা প্রার্থী সৈয়দ নওশের আলী প্রতিটি গ্রামে একটি করে নলকূপ দেবার প্রতিশ্রুতি দেন, এ কারণে যশোরের নড়াইলের গ্রামবাসীদের কাছ থেকে তিনি জোর সমর্থন লাভ করেন। মুসলমানদের কাছেও তিনি নির্দিষ্টভাবে আবেদন রাখেন। 'অন্তত একবার তিনি এক এলাকার মুসলমান ভোটারদের জানান যে, কাউন্সিলে যদি তাদের একজন ভালো প্রতিনিধি না থাকে তাহলে তাদের প্রার্থনা শূন্যে ভেসে যাবে এবং তা আল্লাহর কাছে পৌঁছাবে না।'[১১০] হক সাহেব অবশ্য কংগ্রেসকে নির্বাচনের পর একটা আঁতাতের আভাস দেন। কিন্তু কংগ্রেসের কাছে তাঁর দলের নির্বাচনী পরিচিতি নিষ্প্রভ হয়ে যাক এটা তিনি কখনো চাননি। হক সাহেব স্বীয় জেলা বাকেরগঞ্জের মাদারীপুর এসে দেখতে পান যে, কংগ্রেস সোসালিস্ট লালমোহন সেন তাঁর (হক সাহেব) নামে একটা মিটিং আহ্বান করেছেন। হক সাহেব বিরক্তির সাথে ঐ মিটিং-এ যোগদান করতে অস্বীকার করেন এবং এর পরিবর্তে তিনি নিজেই পৃথক একটা মিটিং আহ্বান করেন। এভাবে হক সাহেব '(কংগ্রেস) কৃষক সমিতি আন্দোলন থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক' করে রাখেন এবং এ কথা স্পষ্ট করে দেন যে, 'তাঁর দল লালমোহন সেনের সংগঠন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা'।[১১১]

অপর দিকে মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রচারণায় শুধুমাত্র মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের এবং সামগ্রিকভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের কল্যাণের আহ্বান জানানো হয়। হক সাহেবের সাথে প্রকাশ্যে বিবাদ শুরু হওয়ার আগে পল্লি এলাকার মুসলমান ভোটারদের ব্যাপারে লীগের পদক্ষেপে দ্বিধাগ্রস্ততা দেখা যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে, ১৯৩৬ সালের জানুয়ারি মাসে নাজিমুদ্দিন নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও চাটখিল যান 'কৃষক নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য, তাঁরা কী বলতে চান তা শোনার জন্য ... এবং কৃষক সমিতির কার্যাবলি সঠিক পথে পরিচালনার জন্য ... তিনি বলেন যে, তাঁদের সমিতিগুলোর উচিত সরকারি স্বীকৃতি গ্রহণ করা।'[১১২] কয়েক মাস পর সোহরাওয়ার্দী বলেন যে, তাঁদের নতুন দলকে জনগণ তাদের 'স্বার্থের অভিভাবক' হিসেবে স্বীকার করে নেবে।[১১৩] লীগ দাবি করে যে, তাদের 'প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল প্রজা ও শ্রমিকদের ভাগ্যের উন্নতি করা'।[১১৪] যাহোক, বিষয়টি যখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে নির্বাচনে পুনর্গঠিত মুসলিম লীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হল কৃষক প্রজা পার্টি, তখন লীগ তার কর্মসূচিতে নির্দিষ্টভাবে 'মুসলিম সম্প্রদায়ে'র জন্য 'উন্নয়ন' কথাটি সংযোজন করে। এই প্রচারণায় সম্প্রদায়ের মধ্যকার সব পার্থক্য এবং আশরাফ ও আতরাফ, শহরের ধনী ও পল্লির গরিব মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান চাপা পড়ে যায়। লীগের সম্ভ্রান্ত লোকদের কাছে ইসলাম ধর্ম ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট ও একমাত্র প্লাটফরম এবং এই প্লাটফরম থেকেই তারা যুক্তিসংগতভাবে পল্লি এলাকার মুসলমান ভোটারদের ভোট দাবি করতে পারে। সোহরাওয়ার্দী নিজে ততটা ধার্মিক মুসলমান ছিলেন না। তাঁর সমসাময়িক পরিচিত এক ব্যক্তির মতে, তিনি ছিলেন 'নীতিজ্ঞানশূন্য; কিন্তু তিনি সাম্প্রদায়িক বা ধার্মভীরু ছিলেন না। তিনি শূকরের মাংস খেতেন, স্কচ পান করতেন এবং এক রাশিয়ান অভিনেত্রীকে তিনি বিয়ে করেন।'[১১৫]

> তিনি তাঁর অবসর সময়ে ... সুন্দরী মহিলাদের সঙ্গে নাচতেন, তাদের সঙ্গ উপভোগ করতেন, তাদের সাথে বাইরে বেড়াতে যেতেন, পশ্চিমা সঙ্গীতের নামিদামি রেকর্ড শুনতেন – এরকম রেকর্ডের সংখ্যা তার এক হাজারেরও বেশি ছিল ... (এবং) তাঁর ক্ষুদ্র মুভি ক্যামেরা দিয়ে তিনি ছবি তুলতেন।[১১৬]

এই একই সোহরাওয়ার্দী, এবং লীগের তাঁর আধুনিক ও পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন সহকর্মীরা ইসলামের নামে নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমে পড়লেন। কৃষকদের 'সত্যিকার প্রতিনিধিত্বের দাবিদার' কৃষক প্রজা পার্টির বিকল্প মুসলিম নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে গিয়ে উচ্চ শ্রেণীর এই মুসলমানেরা অনেক লোকপ্রিয় পন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। মুসলমানদের ঐক্য গড়তে মুসলিম সাম্প্রদায়িক বাগাড়ম্বর করা হয়। এটি জোতদার-জমিদারদের বিরোধের ক্ষেত্রে একটি নতুন দিক উন্মোচন করে; মুসলমান ও হিন্দুদের সরাসরি লড়াইয়ে যতটা নয়, মুসলমান 'সম্প্রদায়ে'র নিজেদের মধ্যে এই লড়াই প্রায় গৃহযুদ্ধের রূপ লাভ করে। এই বাগাড়ম্বর আসলেই ছিল মুসলমান সংগঠনগুলোর বিরোধের ফল। উদীয়মান মুসলমান গ্রুপের মুখপাত্ররা যারা ঐসব সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা বলত, তারা সেটা করত হিন্দু ভদ্রলোক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে।

কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী প্রচারণার মূল কেন্দ্র হয়ে ওঠে পটুয়াখালী (উত্তর) নির্বাচনী এলাকা – এটা ছিল পল্লি এলাকার একটা মুসলমান নির্বাচনী এলাকা ও 'রাজনৈতিকভাবে অনগ্রসর'। ঐ এলাকা ছিল ঢাকার নওয়াবের ব্যক্তিগত এস্টেটের অংশ। নির্বাচনী প্রচার চলার সময় ফজলুল হক তাঁর রাজনৈতিক ধারার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নাটকীয় ভঙ্গিতে খাজা নাজিমুদ্দিনকে তাঁর পছন্দমতো যে কোনো নির্বাচনী এলাকায় সরাসরি তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চ্যালেঞ্জ দেন। এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নাজিমুদ্দিন পটুয়াখালী (উত্তর) নির্বাচনী এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। ১৯২৭ সালে এই এলাকায় ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। তিনি ধারণা করেন যে, হক সাহেবের কর্মসূচির চেয়ে তাঁর সুনাম ও ইসলামের প্রতি আহ্বান পল্লি এলাকার ভোটারদের ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করবে।[১১৭] নাজিমুদ্দিন সাহেবের নির্বাচনী প্রচারণার জন্য 'আহসান মনজিলে'র সব ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিকে কাজে লাগানো হয়। এমনকি গভর্নর স্যার জন এ্যান্ডারসন পটুয়াখালী সফর করে এবং খাজা সাহেবকে নির্বাচনে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।[১১৮] হক সাহেব অবশ্য ঢাকার পরিবারের বিরুদ্ধে একজন যোগ্য প্রার্থী ছিলেন। তিনি পটুয়াখালীর ভোটারদের বলেন যে, এ সংগ্রাম হল 'জমিদার ও কৃষকদের মধ্যকার সর্বাত্মক সংগ্রাম'। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, নির্বাচনে জিততে পারলে 'আল্লাহর রহমতে আমি সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে জমিদারি প্রথা বাতিল করব'।[১১৯] পটুয়াখালীর নতুন ভোটাবদের মন জয় করার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল। নির্বাচনে নাজিমুদ্দিন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন, তিনি ভোট পান হক সাহেবের প্রাপ্ত ভোটের অর্ধেকের কম (হক সাহেব ১৩,৭৪২ এবং নাজিমুদ্দিন ৬,৩০৮ ভোট পান)।[১২০] বিজয়ের উল্লাসে হক সাহেব ঘোষণা করেন, 'কৃষকদের দাবি পূরণে হক সরকার ব্যর্থ হলে আমি রাইটার্স বিল্ডিং-কে লালদিঘিতে নিক্ষেপ করব।'[১২১]

পটুয়াখালীতে বিজয়ের ফলে কৃষক প্রজা পার্টির মনোবল বেড়ে যায়। নাজিমুদ্দিন এই পরাজয়কে কখনও ভুলতে পারেননি। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কোলকাতার দুটো পৃথক নির্বাচনী এলাকা থেকে জয়ী হন। তিনি একটি আসন ছেড়ে দেন এবং সেই আসন থেকে উপ-নির্বাচনে নাজিমুদ্দিনকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত করে আনেন। এভাবে খাজা সাহেব নতুন বঙ্গীয় আইন সভায় পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকতে সক্ষম হন। নির্বাচনে পরাজয়ের সামান্যতম সম্ভাবনা আছে এমন কোনো আসনে তিনি আর কখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। ঘটনা যা-ই হোক না কেন, সরকারের সাথে নাজিমুদ্দিনের সংশ্লিষ্টতা তাঁর প্রতিকূলে চলে যায়। এ ধরনের কাহিনী প্রচলিত আছে যে, মুসলিম লীগের একজন কর্মী পটুয়াখালীর একজন চাষিকে জিজ্ঞাসা করে – 'নাজিমুদ্দিন সাহেব তোমাদের জন্য এত কিছু করলেও তোমরা ফজলুল হক সাহেবকে ভোট দিলে কেন?' ঐ চাষি কড়া জবাব দেয়: 'উনি তামাকের ওপর ট্যাক্স বসালেন কেন, আর পোস্টকার্ডের দাম বাড়ালেন কেন?' তাকে বলা হল যে, ট্যাক্স বাড়ায় কেন্দ্র, প্রাদেশিক সরকার নয়। ঐ চাষি তখন উত্তর দেয়: 'উনি

যদি ভাইসরয়ের কাছে চিঠি লিখতেন তাহলে সমস্যার সমাধান হত। তিনি ভাইসরয়ের লোক।'[১২২]

ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানো সত্ত্বেও নাজিমুদ্দিন সাহেব পল্লির ভোটারদের সমর্থন পেতে ব্যর্থ হন। মাত্র এক দশকের কম সময় আগে যেখানে মারাত্মক ও দীর্ঘস্থায়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, সেই নির্বাচনী এলাকাতেও তিনি তাদের ভোট পেতে ব্যর্থ হন। সে-কারণে পটুয়াখালীর ঘটনা থেকে 'মুসলমান পরিচিতির অযৌক্তিক শক্তি' সম্পর্কে একটা সন্দেহ দেখা দেয় – এই সন্দেহ পূর্ব বাঙলার সব চাষির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অথচ ঐ শক্তিই 'পাকিস্তান আন্দোলনে' পরিচালিত হয় বলে বিশ্বাস করা হয়।[১২৩] বলা হয় যে, তুলনার দিক দিয়ে প্রায় অভিন্ন এবং 'অভিন্ন ধরনের রায়তি স্বত্ব ও বাজার সম্পর্কে'র অংশীদার এই মুসলমান কৃষকেরা নিজেদের মধ্যে একটি 'উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সামঞ্জস্য' গড়ে তোলে।[১২৪] এই সামঞ্জস্য একটা 'সম্প্রদায়গত ঐক্যে'র রূপ ধরে প্রকাশ পায়।[১২৫] আর এই সম্প্রদায়গত ঐক্য 'মুসলমান খাজনা গ্রহণকারীকে (যেখানে তারা আছে) কৃষক সমাজের অংশ হিসেবে গণ্য করতে সহায়ক হয়।'[১২৬] 'কৃষকদের এই সম্প্রদায়গত সচেতনতা'[১২৭] বাঙালি সমাজের সাম্প্রদায়িকতার অন্তরালে গতির সঞ্চার করে বলে মনে করা হয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে যে, 'বাঙলায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যার ক্ষেত্রে ভূমি সংক্রান্ত বিষয় যুক্ত না হলে বিভাগের রাজনীতি ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না এবং তা মিশ্র-জাতীয়তাবাদের শক্তিশালী ধারায় ভেসে যেত।'[১২৮]

কিন্তু পটুয়াখালীর নির্বাচন ও নাজিমুদ্দিনের অপমানকর পরাজয় অন্য একটি বিষয়ের প্রতি দিক-নির্দেশ করে – মুসলমান কৃষক শ্রেণীর মধ্যে 'সাম্প্রদায়িকতা' একটি বিদ্যমান বিষয় এমন ধারণা করা ভুল হতে পারে। এই নির্বাচনী এলাকায় সাম্প্রদায়িক বিরোধের ইতিহাস বর্তমান থাকা এবং নাজিমুদ্দিন সাহেব প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িক নির্বাচনী প্রচারণা চালানো সত্ত্বেও তিনি পটুয়াখালীর পল্লি এলাকার মুসলমান ভোটারদের সমর্থন পেতে ব্যর্থ হন। সারা পূর্ব বাঙলার পল্লি এলাকায় একই ধারা পরিলক্ষিত হয় – মুসলিম লীগের চেয়ে ৬টি আসন বেশি পেয়ে কৃষক প্রজা পার্টির আসন সংখ্যা হয় ৩৩টি, আর মুসলিম লীগ পায় ২৭টি আসন (একমাত্র ঢাকা জেলাতেই মুসলিম লীগ পায় ৯টি আসন – এ জেলায় দলের বিজয়ের মূল কারণ ছিল নিঃসন্দেহে নওয়াবদের প্রভাব)। সার্বিকভাবে মুসলিম লীগ নগর নির্বাচনী এলাকায় ভালো ফল পায় – এখানে তারা ৬টি আসনে জয়লাভ করে। মফস্বলের ছোট ছোট শহর এলাকায়ও মুসলিম লীগ ভালো ফল পায় যেমন, ২৪ পরগণা, ঢাকা ও উত্তর বাঙলা, বিশেষ করে রংপুর জেলায় ৭টি আসনের মধ্যে তারা জয়লাভ করে ৫টি আসনে। কৃষক প্রজা পার্টির প্রার্থীরা পূর্ব বাঙলার পল্লি অঞ্চলে ভালো ফল পায় – খুলনা, ময়মনসিংহ, বাকেরগঞ্জ ও নোয়াখালীতে তারা সব আসনে জয়লাভ করে। মোট মুসলমান ভোটের শতকরা ৩১.৫ ভাগ ভোট পেয়ে কৃষক প্রজা পার্টি সর্বমোট ৩৬টি আসন পায়; অথচ শতকরা ২৭.১০ ভাগ ভোট পেয়ে মুসলিম লীগ নতুন পরিষদে ৩৯টি আসন লাভ করে।[১২৯] বাকি ৩৯টি মুসলিম আসন পায় স্বতন্ত্র প্রার্থীরা; এসব প্রার্থীর 'অধিকাংশ ছিল

স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী, নিজ নিজ এলাকার ভোটারদের ওপর তাদের প্রত্যেকেরই কর্তৃত্ব ছিল। অনেকে এই আশায় নির্বাচনে প্রার্থী হয় যে, তাদেরকে অর্থ দিয়ে কেউ তার সপক্ষে নিয়ে যাবে।'[১৩০]

টিপেরা কৃষক সমিতি নামে অপর একটি কৃষক সংগঠন নির্বাচনে টিপেরায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে – ঐ জেলার সাতটি আসনের মধ্যে সমিতি জয়লাভ করে ৫টি আসনে। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের এক সদস্য মৌলভী এমদাদুল হক ১৯১৯ সালে কৃষক সমিতি গঠন করেন। কিন্তু ত্রিশ দশকের প্রথম দিকে এই সমিতির কর্তৃত্ব চলে যায় স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সংশ্লিষ্ট 'অধিক সক্রিয় ও উৎসাহী' লোকদের হাতে।[১৩১] ১৯৩৬ সালে অবশ্য এই সমিতির নামকরণ করা হয় 'কৃষক ও শ্রমিক সমিতি' এবং তা স্থানীয় কংগ্রেস সংগঠনের সাথে দূরত্ব বজায় রেখে চলে। এ সময় সমিতির নেতৃত্ব দেন 'অতি চরমপন্থী' এবং 'সাম্যবাদী' নেতা ইয়াকুব আলী ও ওয়াসিমুদ্দিন আহমদ।[১৩২] শেষোক্ত ব্যক্তি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে টিপেরা কেন্দ্রীয় নির্বাচনী এলাকা থেকে মন্ত্রী, জমিদার ও নওয়াব স্যার কে. জি. এম. ফারুকীকে পরাজিত করে নির্বাচিত হন।[১৩৩]

একজন মুসলমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ও রাজনীতিকের সম্প্রদায়ভিত্তিক আহ্বান গ্রামের মুসলমান ভোটারেরা কিভাবে প্রতিহত করে তার একটা দৃষ্টান্ত এখানে পাওয়া যায়। এখানে ভোটাররা কৃষক আন্দোলনের স্থানীয় কর্মীদের সমর্থন করে। টিপেরা সমিতি ও কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী সাফল্যে স্পষ্ট হয় যে, মুসলমান কৃষকদের 'সাম্প্রদায়িক' মুসলিম লীগকে ভোট দেওয়া কোনমতেই স্বতঃস্ফূর্ত পছন্দের ভোট ছিল না। বস্তুত কৃষক ও জোতদার আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট কৃষক প্রজা পার্টি এবং টিপেরা কৃষক ও শ্রমিক সমিতি তাদের কার্যাবলি, কর্মসূচি, সদস্যভুক্তি ও আহ্বানে 'সাম্প্রদায়িক' ছিল না। অথচ উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের দল মুসলিম লীগ ইসলাম ও মুসলিম পরিচিতির আহ্বানে ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। তুলনামূলকভাবে পরস্পর পার্থক্যহীন বাঙলার কৃষক সম্প্রদায়ের ঐক্যের অনুভূতি কোনভাবেই যেমন নিছক ধর্মভিত্তিক ছিল না, তেমনি তাকে সব সময় স্বতঃস্ফূর্ত সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতার রাজনীতি বলে ধরে নেয়া যায় না। রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে সমতাবাদী (বা জনপ্রিয়) ধর্মনিরপেক্ষ কর্মসূচি কৃষক সম্প্রদায়কে সমভাবে সংগঠিত করা যেত – যা তাদের কৃষি সমস্যা, প্রাত্যহিক জীবনের অন্যান্য অভিজ্ঞতা ও সামাজিক পরিচিতির সঙ্গে সরাসরিভাবে সংশ্লিষ্ট, যার পেছনে ধর্মের কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না।

কংগ্রেস ও মফস্বল

এসব পরিস্থিতির কারণে বেঙ্গল কংগ্রেস চরমভাবে উভয় সংকটের সম্মুখীন হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন জমির মালিকানা এবং ঐ বন্দোবস্তের সাথে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধায় সৃষ্ট সামাজিক পরিবেশ থেকে কংগ্রেস তার অধিকাংশ সমর্থককে বেছে নেয়। বাঙলায় কংগ্রেস ছিল মোটামুটিভাবে একটা ভদ্রলোকদের দল। অতীতে ভদ্রলোকদের মতো নগর ও পল্লি

এলাকায় কংগ্রেসের অবস্থান ভালো ছিল। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের সমাপ্তি ও চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর দলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল দেখা দেয়। অতঃপর দলের কার্যক্রম নগর এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে এবং মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে সর্বশক্তি নিয়োগ করে এর নেতারা সন্তুষ্ট থাকে। অনেক জেলা সদরে দলের উপস্থিতি থাকলেও এর শক্তিশালী ভিত ছিল নগরভিত্তিক। বিভিন্ন জেলায় দলের অফিস ছিল অবশ্যই সদর মহকুমায়, আর এই সদর মহকুমা ছিল প্রশাসনের মূল কেন্দ্র।[১৩৪] জেলার ভদ্রলোকদের মধ্য থেকে এই দলের সদস্য নেওয়া হত – দলের সদস্যদের মধ্যে ছিল স্কুল-শিক্ষক, উকিল, বেতনভোগী কর্মচারী, এবং নিশ্চিতভাবে ছিল ছাত্ররা।[১৩৫] ত্রিশ দশকের প্রথম দিকে বেঙ্গল কংগ্রেস হয়ে পড়ে পুরোপুরি শহরভিত্তিক, তবে ভূমি সম্পর্কিত স্বার্থের সাথে এই দলের সম্পর্ক তখনও বর্তমান ছিল। দলের অনেক নেতা ছিল 'অনুপস্থিত' জমিদার – মফস্বল এলাকায় তাদের অনেক এস্টেট ছিল এবং তাদের যে কোনভাবেই হোক খাজনা আদায় সংক্রান্ত স্বার্থ ছিল। ঢাকার তেওতায় কিরণ শঙ্কর রায়ের বিরাট এস্টেটের জমিদারি ছিল, তুলসী চরণ গোস্বামীর পিতা (রাজা কিশোরী লাল গোস্বামী) ছিলেন একজন সম্পদশালী ভূস্বামী এবং রাজা পিয়ারী মোহন মুখার্জীর প্রপৌত্র তারকনাথ মুখার্জীর উত্তর পাড়ায় অনেক বড় বড় এস্টেট ছিল। যুগান্তর গ্রুপের নেতা (যিনি পরে বেঙ্গল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হন) সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ ছিলেন এক জমিদার পরিবারের সন্তান – ময়মনসিংহে তাদের অনেক ভূ-সম্পত্তি ছিল। ময়মনসিংহ জেলা কংগ্রেসের তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বাবু বিজয় রায় চৌধুরী ছিলেন তুলসী ঘাটার জমিদার।[১৩৬] অনেক কংগ্রেস নেতার মোটামুটি ভালো সম্পত্তি পল্লি এলাকায় ছিল – অধিকাংশ কংগ্রেস নেতা-কর্মীর শরিকানায় ও মধ্যস্বত্বের অধিকারে বিভিন্ন এস্টেটে খাজনা আদায়ের অধিকার ছিল। তদুপরি কংগ্রেসের কর্মকাণ্ড বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিল মফস্বল এলাকার জমির মালিক ও সুদ ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতার ওপর। তনিকা সরকার উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন জেলায় গান্ধীবাদী কল্যাণমূলক কাজে তাদের অর্থ সাহায্যের বিষয়টি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, বিক্রমপুরের আউটশাহী গ্রামের আশ্রমের পৃষ্ঠপোষক ছিল স্থানীয় জমিদার ইন্দুভূষণ গুপ্ত এবং বরিশাল আশ্রমের পৃষ্ঠপোষক ছিল রামচন্দ্রপুরের জমিদার কালিপ্রসন্ন গুহচৌধুরী। গঙ্গাজল ঘাটার ন্যাশনাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন স্থানীয় জমিদারের এক পুত্র। সোনামুখী ও পত্রস্বরে স্থানীয় জমিদার এবং শিমলিপলে গান্ধীবাদী কাজ শুরু করেন স্থানীয় রাজ-পরিবারের একটি শাখা।[১৩৭] গৌরীপুরের জমিদার বাবু ব্রিজেন্দ্র কিশোর তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের খরচের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন – ময়মনসিংহ জেলা কংগ্রেসের ফান্ডে তিনি নিয়মিত উদারভাবে দান করতেন।[১৩৮]

বেঙ্গল কংগ্রেসের রাজনীতিতে ভদ্রলোক সদস্যের এই প্রাধান্য দলের সামাজিক রক্ষণশীলতাকেই প্রতিবিম্বিত করে। এমনকি গান্ধী-যুগে জনসমর্থনের ব্যাপক প্রয়াসের সময় বাঙলার কংগ্রেস নেতৃত্ব জনসাধারণের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে তা ছিল গভীরভাবে পিতৃসুলভ। 'গ্রাম পুনর্গঠন' কাজে নিয়োজিত গান্ধীবাদীদের পক্ষে জমিদারদের

ক্ষমতার অপব্যবহারকে উপেক্ষা করা কঠিন ছিল। বাঙলার অন্যতম গান্ধীবাদী নেতা সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের মতে জমিদারদের ক্ষমতার অপব্যবহার ঐতিহ্যবাহী জমিদারি পদ্ধতির ধ্বংসের একটা লক্ষণ। ঐতিহ্যগতভাবে একজন জমিদার হবেন, তাঁর মতে, একজন আলোকিত 'সার্বভৌম ব্যক্তি', যিনি ন্যায়বিচার সম্পাদন করেন, তাঁর প্রজাদের রক্ষা করেন এবং পল্লি বাঙলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন পরিচালনা করেন বদান্যতার সাথে।[১৩৯] জমিদারেরা যদি এসব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করেন তাহলে ধরে নিতে হবে যে, সরকার তাদেরকে শুধু খাজনা আদায়কারীতে পরিণত করেছে। পল্লি বাঙলার সব সমস্যার সমাধান হিসেবে দাশগুপ্ত পল্লি সমাজের প্রধান হিসেবে জমিদারকে তার যথাযথ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলেন। তিনি একজন উত্তম জমিদার ও প্রজার মধ্যে স্বার্থের কোনো বিরোধের আশংকা করেননি। তিনি কামনা করেন যে, 'কৃষকেরা এমনভাবে শিক্ষালাভ করবে যেন তারা সন্তুষ্টির সাথে গ্রামে বসবাস এবং নির্দোষ জীবন যাপন করতে পারে।'[১৪০] পল্লি বাঙলার সমস্যার সমাধানের জন্য 'গ্রাম পুনর্গঠন'কে চিত্তরঞ্জন দাশ একমাত্র উপায় বলে বিশ্বাস করতেন। তিনি গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই পঞ্চায়েত 'গ্রামের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি ও পানি সরবরাহ, নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা, শিল্প ও কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা এবং ছোটখাট বিবাদ মীমাংসা' করবে।[১৪১] দাশ বা বেঙ্গল কংগ্রেসে তাঁর উত্তরাধিকারীরা কেউ স্পষ্টভাবে বাস্তবতার মুখোমুখি হতে ইচ্ছুক ছিলেন না; পল্লি বাঙলায় স্বার্থের বিরোধ এত গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছে যার সমাধান এ ধরনের সহজ উপায়ে সম্ভব নয়। ১৯২৮ সালের *বেঙ্গল টিন্যান্সি এমেন্ডমেন্ট বিল*-এর প্রতিক্রিয়ায় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র নির্মল বিশ্বাস পোষণ করে মন্তব্য করে: 'জমিদার ও রায়তদের মধ্যকার সব বিরোধের সমাধান উভয় পক্ষের সন্তুষ্টিতে সম্ভব না হওয়ার কোনো কারণ নেই।' এই পত্রিকা এমনও দার্শনিক উক্তি করে যে, 'পুরানো সুবিধা ভোগকারী এক পক্ষের কাছে অন্য পক্ষের নতুন দাবি সমন্বয় সাধন করতে কেন সমস্যা হবে' তা বোধগম্য নয়।[১৪২] বস্তুত কংগ্রেসের বিভিন্ন দল একটা বিষয়ে অভিন্ন মত পোষণ করে যে, জমিদারি অধিকারকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। পার্টির মধ্যে তিক্ত দলগত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও ১৯২৮ সালের টিন্যান্সি এ্যামেন্ডমেন্ট বিলের বিভিন্ন শর্তের বিরুদ্ধে একজন ছাড়া স্বরাজবাদী ৪০ জন কাউন্সিলরের সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে ভোট দেয়।[১৪৩] ১৯৩০ সালে তারা আবার একটা বিলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয় – সে বিলে প্রস্তাব করা হয় যে, প্রাথমিক শিক্ষার খরচ পল্লি এলাকার জমিদারি এস্টেটের ওপর ন্যস্ত করা হবে। বিশ শতকের শেষ দিকে কংগ্রেস শহর এলাকায় সরে আসার পরও এর নেতারা মফস্বল এলাকায় তাদের ভূ-সম্পত্তির স্বার্থের ব্যাপারে পূর্বের অঙ্গীকার অক্ষুণ্ন রাখে। তারা মফস্বলকে ছেড়ে আসলেও তাকে পরিত্যাগ করেনি।

পল্লি বাঙলার সমস্যার সাথে যুক্ত হয় অর্থনৈতিক মন্দা বিশেষ করে কৃষকদের খাজনা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি অনেক কংগ্রেস নেতা-কর্মীকে ভাবিয়ে তোলে। খাজনা পরিশোধের পরিমাণ কমে যায় এবং মধ্যবর্তী রায়তি স্বত্বের অধিকারীরা তাদের জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। ফলে গ্রামের আয়ের সূত্রের ওপর নির্ভরশীল ভদ্রলোক পরিবারগুলো

কষ্টে পড়ে।[১৪৪] কৃষিজাত পণ্যের দাম কমে যাওয়ায় শহরে যারা চাকুরি করত তাদের অর্জিত নগদ অর্থের সত্যিকার মূল্য বেড়ে যায়, জমি থেকে আয় কম হবার ক্ষতি কিছুটা হলেও তারা পুষিয়ে নেয়। কিন্তু পল্লি এলাকায় বসবাসকারী ভদ্রলোক, উপস্থিত জমিদার ও তালুকদারেরা অর্থনৈতিক মন্দার কারণে সত্যিকারভাবে কষ্টের মধ্যে নিপতিত হয়। খাজনা আদায় আকস্মিকভাবে হ্রাস পায়, পাওনা আদায় প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং কৃষিপণ্য বিক্রয় থেকে অর্জিত আয় কমে যায়। 'খাজনা না দেওয়ার খারাপ মানসিক অবস্থা' সারা বাঙলায় ছড়িয়ে পড়ার পর ১৯৩৩ সাল নাগাদ পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোর 'হিন্দু সম্প্রদায়' ঐ 'আন্দোলন প্রসারের বিরুদ্ধে উৎকণ্ঠা' প্রকাশ করতে শুরু করে।[১৪৫] খাজনা পরিশোধে বাধ্য করার জন্য অনেক জমিদার আদালতের শরণাপন্ন হয়; অন্যরা বল প্রয়োগের মাধ্যমে খাজনা আদায়ের জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে, অবাধ্য কৃষকদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য লাঠিধারী পাইক নিয়োগ করে। 'একাধিক উচ্ছেদ মামলা' দায়ের করে হুগলীর জমিদারেরা খাজনার জন্য তাদের প্রজাদের ওপর অবৈধ চাপ প্রয়োগ করে বলে জানা যায়।[১৪৬] সালতোরা থানায় 'অবিলম্বে খাজনা পরিশোধে বাধ্য করতে স্থানীয় জমিদারেরা তাদের প্রজাদের ধান কাটা থেকে বিরত রাখার জন্য বরকন্দাজ নিয়োগ করলে'[১৪৭] বাঁকুড়া জেলায় জমিদার ও প্রজাদের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। জমিদার হিন্দু এবং প্রজা মুসলমান হলে এ ধরনের ঘটনা 'সাম্প্রদায়িক' ঘটনা বলে দৃঢ়তার সঙ্গে চিহ্নিত করা হতে থাকে। বীরভূম জেলার লবপুর থানার একটি ঘটনা দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'ধানের কর্জ সম্পর্কিত ব্যাপারে এক হিন্দু জমিদার একজন মুসলমান প্রজাকে আক্রমণ করতে তার মুসলমান বরকন্দাজকে নির্দেশ দিলে' গোলযোগ শুরু হয়।[১৪৮] একজন মুসলমান প্রজার বিরুদ্ধে খাস জমির অধিকার প্রাপ্তির ডিক্রি পাওয়ার পর এক হিন্দু জমিদার বিরোধপূর্ণ জমিতে নির্মিত মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার হুমকি দিলে হাওড়ায় এক ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে।[১৪৯]

পশ্চিম বাঙলার জেলাগুলোতে জমিদার ও তাদের প্রজাদের মধ্যে অত্যন্ত তিক্ততাপূর্ণ বিরোধ দেখা দেয়। কিন্তু উত্তর ও পূর্ব বাঙলার পাট উৎপাদনের বিভিন্ন জেলায় হিন্দু সুদ ব্যবসায়ীরাই আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। নোয়াখালীতে কৃষক সমিতির সদস্যদের এই বলে সন্দেহ করা হয় যে, তারা হিন্দু সুদ ব্যবসায়ীদের গবাদি পশু চুরি করা ও মেরে ফেলার সঙ্গে জড়িত। ঐ একই জেলার অম্বনগরে একজন হিন্দু সুদ ব্যবসায়ীর বাড়িতে আক্রমণ চালানো হয় – ঐ আক্রমণ 'পূর্বপরিকল্পিত ডাকাতি' বলে প্রতীয়মান হয়। আক্রান্ত ব্যক্তিকে নির্যাতন করা হয় বলে জানা যায়।[১৫০] 'পাওনা খাজনা সম্পূর্ণ মাফ' করার জন্য স্থানীয় কৃষক সমিতি পরিচালিত আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ঐ আক্রমণ চালানো হয়। মুসলমান স্বেচ্ছাসেবকেরা একটা ছাপানো ঘোষণাপত্র প্রচার করে – ঐ ঘোষণাপত্রের বক্তব্য ছিল: 'কৃষকেরা দেশ ও দেশের সম্পদের মালিক না হওয়া পর্যন্ত শান্তি আসবে না।'[১৫০] এর ফলে কৃষক স্বেচ্ছাসেবক ও স্থানীয় হিন্দু ভদ্রলোকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

অতীতেও মুসলমান কৃষক ও হিন্দু জমিদারদের মধ্যে গোলযোগ অবশ্যই ছিল [১৫২] কিন্তু ঐসব গোলযোগের সঙ্গে বিশেষভাবে 'সাম্প্রদায়িকতা'র সম্পর্ক ছিল না।[১৫৩] কিন্তু ভদ্রলোকেরা নিশ্চিতভাবে মুসলমান কৃষকদের আক্রমণকে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে ব্যাখ্যা করত। স্থানীয় হিন্দুদের ওপর গোঁড়া মুসলমানদের এ ধরনের আক্রমণের ঘটনাকে, এমনকি তা অর্থনৈতিক কারণে হলেও, সাম্প্রদায়িক আক্রমণ বলে চিহ্নিত করা হত। ১৯৩০ সালে সংঘটিত কিশোরগঞ্জের একটি ঘটনা সম্পর্কে এক পুস্তিকার বিবরণ থেকে এ রকম বিষয় জানা যায়। ঐ সময় মুসলমান কৃষকেরা ক্ষমতাশালী হিন্দু জমিদার ও সুদ ব্যবসায়ী বাবু কৃষ্ণ চন্দকে আক্রমণ করে।[১৫৪] একদল মুসলমান জমিদারের সুদৃঢ়ভাবে নির্মিত বাড়ির চারপাশ ঘিরে ফেলে এবং তারা জমিদারের কাছে রক্ষিত ঋণের সব দলিলপত্র ফেরত দেওয়ার দাবি জানায়। কৃষ্ণ চন্দ তা দিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু উন্মত্ত জনতা তাঁকে হুমকি দিলে তিনি ও তাঁর পুত্র তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। এর ফলে কিছু লোক নিহত ও কিছু লোক আহত হয়। বন্দুক চালিয়ে তৃপ্ত জমিদারের গুলি ফুরিয়ে গেলে তাঁর একজন হিন্দু চাকর উন্মত্ত জনতাকে পুনরায় ফিরে আসার আহ্বান জানায়। সে তাদেরকে আশ্বস্ত করে যে, তার মনিবের হাতে আর গুলি নেই। প্রতিশোধ গ্রহণে আগ্রহী জনতা আবার ফিরে আসে। তারা হতভাগ্য জমিদার ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যা করে এবং তাঁর বাড়ি ও মটরগাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে।[১৫৫] এ ঘটনাটি ছিল অর্থনৈতিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত – সাম্প্রদায়িক বিষয়ের সাথে নয়। জমিদারের চোখ ধাঁধানো সম্পদ জনতার ক্রোধকে উত্তেজিত করে।[১৫৬] অভূতপূর্ব দুঃখ-কষ্টের সময় খাতকদের প্রতি জমিদারের সহানুভূতির অভাব এবং নিরস্ত্র জনতার ওপর নৃশংস আক্রমণ শুধু মুসলমান প্রজাকে নয়, তার হিন্দু গৃহভৃত্যকেও উত্তেজিত করে। কিন্তু পুস্তিকার লেখকেরা ঐ ঘটনাকে সাম্প্রদায়িকভাবে প্ররোচিত আক্রমণের ঘটনা হিসেবে চিত্রিত করে:

দুঃখের কথা বলব কারে প্রাণে ধৈর্য্য মানে নারে,
অপূর্ব্ব এক ঘটনা হয়েছেরে ভাই।
ময়মনসিংহের জিলার অধীনে কিশোরগঞ্জ এলাকাধীন
৬০ ষাইট থানা গ্রাম লুটে নিয়েছেরে ভাই ॥
মুসলমানের অত্যাচারে বাড়ী ছেড়ে বনান্তরে
কত লোক যে অনাহারে মরে ছেড়ে ভাই।
মুসলমানগণ দলে ২ আসিয়া হিন্দুকে বলে,
দলিল পত্র যাহা আছে দেও নিয়ে যাই ॥
বড়লোকের দালান বাড়ী, গরিবের ভাতের হাড়ি,
চক্ষের সাম্‌নে যাহা পড়ে ছেড়ে কথা নাই।[১৫৭]

ন্যায়পরায়ণ জমিদারদের পরোপকারমূলক শাসনের অধীন কৃষক সমাজের প্রতি পিতৃসুলভ দৃষ্টির কারণে ভদ্রলোক হিন্দুরা প্রায়শ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয় যে, গ্রামের মনিবদের বিরুদ্ধে কৃষকদের কোনো অভিযোগ থাকতে পারে, ঐসব অভিযোগের সাথে সম্প্রদায়গত কোনো সম্পর্ক প্রায় নেই। এসব বিরোধের পেছনে যে মারাত্মক অর্থনৈতিক

সমস্যা থাকতে পারে তা নিয়ে প্রায় অধিকাংশ কংগ্রেস নেতা-কর্মী অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয় – তারা এটাকে সাধারণভাবে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বলে ব্যাখ্যা করে। তাই যশোর জেলার নড়াইল মহকুমায় এক হিন্দু জমিদারের বিরুদ্ধে মুসলমান ও নমঃশূদ্র বর্গাদারেরা একত্রিত হলে বেঙ্গল কংগ্রেস মত প্রকাশ করে যে, ঐ ঘটনাটি নেহায়েতই 'সাম্প্রদায়িক' ঘটনা।[১৫৮]

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের শর্ত মোতাবেক নির্বাচনে ভালো ফল পাওয়ার জন্য গ্রামীণ সমাজের ঐ শ্রেণীর লোকের কাছে আবেদন করা ছাড়া কংগ্রেসের আর কোনো উপায় ছিল না – অথচ ঐ শ্রেণীর লোকের প্রতি কংগ্রেস দীর্ঘকাল ধরে উপেক্ষা করেছে। নতুন আইন সভার মোট ২৫০টি আসনের মধ্যে ১৭৮টি আসনের সদস্য নির্বাচিত হবে পল্লি এলাকার ভোটারদের দ্বারা। সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ অনুযায়ী কংগ্রেস যদি শুধু হিন্দুদের জন্য বরাদ্দকৃত আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, তাহলেও তাদেরকে মোট ৮০টি হিন্দু নির্বাচনী এলাকার মধ্যে ৬৬টি পল্লি এলাকার নির্বাচনী এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। এসব এলাকার ভূমি সংক্রান্ত বিরোধকে শুধুমাত্র 'সাম্প্রদায়িক' বিরোধ বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। বেঙ্গল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে কোলকাতার পরিচিত পরিবেশ থেকে পল্লি বাঙলার মূল্যবান ভোটের সন্ধানে মফস্বল এলাকায় ঠেলে ফেলে দিয়ে ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করে।

নতুন ভোটারদের নিয়ে অঙ্কের হিসাব এবং পল্লি বাঙলায় অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব বেঙ্গল কংগ্রেসের সামনে মারাত্মক হুমকি হিসেবে দেখা দেয়। কৃষক ভোটারদের সমর্থন আদায়ে চেষ্টা করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু এ সময়ে মফস্বল এলাকায় তাদের চিরাচরিত সমর্থক, জমিদার ও মধ্যবর্তী রায়তি স্বত্বের অধিকারীদের অধিকাংশই ছিল ভীষণ সংকটের মধ্যে। নিয়মতান্ত্রিক আমূল সংস্কারপন্থী কৃষকদের কাছে কংগ্রেসের লোকেরা হুমকির সম্মুখীন হওয়ায় গ্রামের নতুন ভোটারদের মন জয় করার জন্য তাদেরকে দলীয় ব্যানারে কৃষক আন্দোলন অনুমোদন করার কথা বিবেচনা করতে হয়। অতীতে, এমনকি অসহযোগ আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়েও দলের নেতৃত্ব খাজনা বন্ধের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়টি অব্যাহতভাবে প্রত্যাখ্যান করে।[১৫৯] পল্লি অঞ্চলে এ ধরনের বিক্ষোভমূলক কর্মসূচি বেঙ্গল কংগ্রেস আগেও নিয়েছে, কিন্তু সব সময় এমন ইস্যুগুলো বেছে নিয়েছে যার লক্ষ্য ছিল ব্রটিশরা – স্থানীয় জমিদার বা সুদ ব্যবসায়ীরা নয়। অসহযোগ আন্দোলনের সময় কাঁথি ও তমলুকে সম্পদশালী মাহিষ্য কৃষকদেরকে ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট করার ব্যাপারে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল সফল হন। বীরভূমে সেটেলমেন্টের কাজ প্রতিহত করার জন্য জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কৃষকদের প্রতি আহ্বান জানান।[১৬০] কিন্তু সাঁওতাল আন্দোলনের সময় স্থানীয় নেতারা যখন খাজনা প্রদান বন্ধ রাখার এমনকি মেদিনীপুর জমিদারি কোম্পানির মতো ব্রিটিশ মালিকানাধীন এস্টেটেও খাজনা প্রদান বন্ধ করার আহবান জানায়, তখন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ তাদের সাথে ছিল না; কংগ্রেস

নেতারা খাজনা বন্ধ আন্দোলন সমর্থন করতে রাজি ছিল না।[১৬১] ত্রিশ দশকে জমিদারদের লবি কংগ্রেস নেতৃত্বকে খাজনা বন্ধ আন্দোলনকে থামিয়ে দেওয়ার উদ্যোগকে জোরদার করার জন্য আগের চেয়ে অনেক বেশি প্ররোচিত করে, ঠিক যে সময়টাতে খাজনা বন্ধ রাখতে আগ্রহী পল্লি এলাকার ভোটারদের ভোটেরই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল কংগ্রেসের।

এ রকম পরিস্থিতিতে বেঙ্গল কংগ্রেস নির্বাচনে আদৌ প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করলে বিস্মিত হবার কিছু ছিল না।[১৬২] প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের আকর্ষণীয় পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা তাদের ছিল না। রোয়েদাদকে এমনভাবে দেখা হয়েছিল। পল্লি বাঙলার প্রতিনিধিত্বের দাবি কতটা অসার এবং মফস্বল এলাকায় তাদের সামাজিক ও সাংগঠনিক ভিত্তি যে কতটা ফাঁপা, নির্বাচনে সেটা স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসার আশঙ্কা দেখা দিল। কিন্তু হাই কমান্ড যেহেতু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত একবার নিয়ে ফেলেছে, সেহেতু দলের বাঙলা শাখাকেও তা মেনে নিতে হবে এবং সর্বশক্তি দিয়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ হতে হবে। সৌভাগ্যবশত কৃষকদেরকে দলের পতাকাতলে আনতে সচেষ্ট ও আগ্রহী সামান্য কিছু লোকের একটি দল বেঙ্গল কংগ্রেসের ছিল। দলের সামাজিক ভিত্তির প্রসার ও ঐতিহ্যগত রক্ষণশীলতা পরিহার করার জন্য কংগ্রেসের কিছু নেতা-কর্মী সব সময় সচেষ্ট ছিল। এ সময় তারা দেখতে পায় যে, তাদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো কংগ্রেস সংগঠনকে সক্রিয় কর্মী দিয়ে সহযোগিতা করেছে। তাদের অনেক বড় বড় নেতা দেওলি ও আন্দামান বন্দি শিবিরে কারারুদ্ধ ছিল। সেখানে তারা মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়। ত্রিশ দশকের মধ্য ভাগে কারারুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে তারা কংগ্রেসে ফিরে আসে। সন্ত্রাসী আন্দোলনের সমান আগ্রহ নিয়ে তারা শ্রমিক ও কৃষককে সংঘবদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। ১৯৩৬ সালের জুন মাসে *স্টেটসম্যান* পত্রিকা 'ভারতীয় গ্রামে লাল এজেন্ট' (রেড এজেন্ট ইন ইন্ডিয়ান ভিলেজেস) শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে; ঐ রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর কোলকাতায় উত্তেজনা দেখা দেয়। ঐ নিবন্ধে বলা হয়:

> মস্কো-প্রশিক্ষিত কমিউনিস্টদের কপট প্রচারণায় ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকদের মন বিষিয়ে উঠেছে ... সাবেক সন্ত্রাসীরা এখন কমিউনিস্টদের বিভিন্ন পদে যোগদান করছে। তাদের বর্তমান পদ্ধতি 'শান্তিপূর্ণ' হলেও এমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে, তাদের আন্দোলন প্রতিহত করা না হলে ভারত একটা সাংঘাতিক বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রত্যক্ষ করবে।[১৬৩]

ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করে বাঙলার গভর্নর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 'সংঘবদ্ধ সোসালিস্ট ও কমিউনিস্ট প্রচারণা (বিভিন্ন জেলায়) শুরু হতে পারে', সেখানে 'সাম্যবাদী ধারায় যোগ দেওয়ার লক্ষণ অত্যন্ত স্পষ্ট'।[১৬৪]

১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে বেঙ্গল পাবলিক সিকিউরিটি এ্যাক্টের আওতা কোলকাতার বাইরে ২৪ পরগণা ও হুগলী জেলায় বিস্তৃত করা হয় – উদ্দেশ্য ছিল 'কোলকাতা ও তার আশপাশের এলাকায় ক্রমবর্ধমান মিটিং ও মিছিলের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ঐসব মিটিং-মিছিলে কমিউনিজমের মূলনীতি প্রচার এবং বিপ্লবী আন্দোলনের সুপরিচিত

প্রতীক প্রদর্শন করা হত।'[১৬৫] কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া কৌশল হিসেবে ১৯৩৫ সালে কংগ্রেসের সাথে কাজ করার লক্ষ্যে 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট' গঠন করে। এর ফলে যুবক কমিউনিস্টদের বেঙ্গল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পথ সুগম হয়; তারা দলের অভ্যন্তরে একটা র‍্যাডিক্যাল উইং গঠন করে এবং জাতীয়তাবাদী উদ্দেশ্য সাধনে কৃষকদের সংগঠিত করার জন্য গ্রামে যেতে প্রস্তুত হয়। তবে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটিতে এই র‍্যাডিক্যালরা ছিল একেবারেই সংখ্যালঘু। কংগ্রেস দল তার রক্ষণশীল চিন্তা-চেতনায় দৃঢ় থাকে। ১৯৩৬ সালের নির্বাচনের পূর্বে বাঙলায় কংগ্রেস যে কৃষক আন্দোলন শুরু করে তাতে পরস্পর-বিরোধী শক্তির অবস্থান স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় – এরা ত্রিশ দশকের মধ্য সময় পর্যন্ত দলকে পরস্পর-বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত করে।

টিপেরা কৃষক সমিতির ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিভিন্ন চাপের ফলে কংগ্রেস-সংশ্লিষ্ট কৃষক সমিতিগুলো খুবই নাজুক অবস্থায় রয়েছে। ত্রিশ দশকের প্রথম দিকে টিপেরা সমিতি স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের কর্তৃত্বে পরিচালিত হয়। ঐ সময় মুকুলেশ্বর রহমানের নেতৃত্বে দলকে পুনর্গঠিত করা হয়।[১৬৬] 'অত্যন্ত সক্রিয় ও উদ্যমী' লোকেরাই এই সমিতিকে পুনর্গঠিত করে। এঁদের মধ্যে ছিলেন রহমান সাহেব স্বয়ং, আবদুল মালেক, আবদুল জলিল এবং বাবু কামিনী কুমার দত্ত। এদের সবারই ব্রিটিশ-বিরোধী 'রাজদ্রোহী' কাজে সংশ্লিষ্টতা ছিল দীর্ঘ দিনের। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উল্লেখ করেন:

> শেষোক্ত ব্যক্তি ঐ আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি, এবং তিনি অর্থ সরবরাহ করেন। তিনি কুমিল্লার একজন নামকরা উকিল এবং তার যথেষ্ট সামাজিক প্রভাব আছে ... সাধারণভাবে (গোপন সভায়) তিনি জমিদারদের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে আক্রমণ করে বক্তৃতা করেন। কুমিল্লা শহরে সমিতির প্রধান অফিস আছে – আরও একটা ক্ষুদ্র অফিস আছে যেখানে মৌলভী মুকুলেশ্বর রহমান বসবাস করেন। স্থানীয় কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গে এই সমিতির একটি পারস্পরিক যোগাযোগ আছে এবং আসলে এর সব প্রভাবশালী নেতা স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিরও সদস্য।[১৬৭]

কুমিল্লা শহরে সমিতির কর্মকাণ্ডে কংগ্রেস প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হত। ১৯৩১ সালে মে দিবসের র‍্যালিতে জনতা লাল পতাকা উত্তোলন করে। কিন্তু নেতারা যে প্রস্তাব পাস করে তাতে বিপ্লবাত্মক কোনো কথা ছিল না – জমিদারি প্রথা বাতিল বা বন্ধ করার কোনো দাবি ঐ প্রস্তাবে ছিল না – কুমিল্লায় বেশিরভাগ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেস নেতা-কর্মীরাও বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক ছিল। তারা আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচির ব্যাপক কাঠামোর মধ্যে থেকে কৃষক আন্দোলনকে অব্যাহত রাখতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু পল্লি এলাকায় আন্দোলনকে অব্যাহত রাখা কষ্টকর হয়ে পড়ে। নবীনগর ও কসবা থানার চান্দিনা, বানিয়াচং ও লাকসামে তথা জেলার সর্বত্র কৃষক সমিতি গড়ে ওঠে। সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন গড়ে ওঠে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায়; এ সম্পর্কে বলা হয়:

> প্রায় প্রতিটি গ্রামেই সমিতি কাজ শুরু করেছে ... মহাজনেরা ছাড়া গ্রামের প্রায় সবাই ঐসব সমিতির সদস্য হয়েছে। সমিতিগুলো এখন দাবি করছে যে, মহাজনদেরকে

> তাদের দলিল-পত্র ফেরত দিতে হবে এবং কিভাবে ও কখন দেনা পরিশোধ করা হবে সে-ব্যাপারে সমিতিগুলোই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। মহাজনেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ দলিলপত্র ফেরত দিয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। তারা এখন নিজেদেরকে সমিতির নেতাদের দয়ার ওপর ছেড়ে দিয়েছে। জমিদারদের বিরুদ্ধে সমিতির নেতারা খুবই সক্রিয়; তারা জমিদারদের নিজস্ব খাস জমিতে ধান কাটার অনুমতি দিচ্ছে না। স্থানীয় জমিদারদের অধীনে কাজ না করার জন্য স্থানীয় মজুরদের প্ররোচিত করা হচ্ছে; বাইরের মজুরদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। অনেক স্থানে গ্রাম সমিতিগুলো সালিশি আদালত স্থাপন করেছে।[১৬৮]

এই সময়ে বিদ্যমান ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে কংগ্রেস নির্ধারিত সীমিত কর্মসূচির বাইরে কৃষকদের কার্যকলাপ বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। স্থানীয় বিষয়গুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে কংগ্রেস টিপেরা জেলায় কৃষকদের সংগঠিত করার আশা করেছিল। এখানে 'উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু লোকের বসবাস ঢাকা, ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জের তুলনায় অনেক কম ছিল। ১৯১১ সালে টিপেরায় ছিল প্রতি এক জন খাজনা আদায়কারীর বিপরীতে আটচল্লিশ জন খাজনা প্রদানকারী ... (এবং) প্রদেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় এখানে জমিদারদের এজেন্টদের সংখ্যা ছিল খুবই কম।'[১৬৯] তবু এই জেলায় কৃষক রাজনীতি ছিল সামাজিকভাবে বিভক্ত, জমিদার ও অর্থলগ্নীকারীদের বিরুদ্ধে এবং ঐ রাজনীতি বিশেষ করে দূরবর্তী গ্রামগুলোতে ছিল হিংসাত্মক।[১৭০]

সুতরাং এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, টিপেরার বাইরে অন্য কোনো জেলায় কংগ্রেস কৃষক আন্দোলনকে বিস্তৃত করার চেষ্টা করেনি। কৃষক সংগঠন বিপজ্জনক ও নিয়ন্ত্রণহীন বলে প্রমাণিত হয়; ভূমি স্বার্থেও ছিল হুমকিস্বরূপ, যে স্বার্থ বজায় রাখতে অধিকাংশ কংগ্রেস নেতা ছিল বদ্ধপরিকর। সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পূর্বে এটা স্পষ্ট ছিল না যে, পল্লি এলাকায় একটা বৃহত্তর ভিত্তি গড়ে না তুললে নতুন আইন সভায় কংগ্রেস টিকে থাকতে পারবে না। যে কারণে কংগ্রেস অত্যন্ত ভীত হয়ে এমন সব নমনীয় কৃষি সংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করে, যাতে কোনো বিপদে না পড়ে।

টিপেরায় সমিতি নেতাদের মধ্যে আশরাফউদ্দিন আহমদ চৌধুরী ও আবদুল মালেকের মতো লোকের কোলকাতা কংগ্রেস নেতাদের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁরা সংগঠনের অধিক 'চরমপন্থী' লোকদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকেন। খেলাফত আন্দোলনের সময় থেকেই এই দুই নেতা বেঙ্গল কংগ্রেসের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কসবা থানার আবদুল মালেক ছিলেন একজন 'গরিব মানুষ; একটা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিতে' তাঁর বেশ কিছু টাকা দেনা ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় 'রাজদ্রোহী' কাজের অপরাধে তিনি জেল খাটেন।[১৭১] কুমিল্লার উকিল আশরাফউদ্দিন ছিলেন বসুর একজন উল্লেখযোগ্য অনুসারী।[১৭২] এই দু'জন লোকই ছিলেন টিপেরায় কৃষক আন্দোলনের সামনের শ্রেণীর নেতা। জেলা প্রশাসনের মতে 'কৃষকদের বিষয়ে সব ধরনের অনিষ্ট ও কষ্টের ব্যাপারে আবদুল মালেক ও আশরাফউদ্দিনের চেয়ে দায়ী ব্যক্তি জেলায় আর কেউ

ছিল না'[১৭৩] – কিন্তু নির্বাচনের প্রাক্কালে সমিতির চরমপন্থী অংশ তাদের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে। কারণ:

> এটা প্রকাশ পায় যে, অভ্যন্তরীণ তীব্র মতভেদের ফলে বর্তমানে আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। একটা নতুন শাখা গঠিত হয়েছে যার মূল সদস্যদের মধ্যে আছে অছিমুদ্দিন আহমদ ও ইয়াকুব আলী। তারা সাধারণ কৃষকের মধ্যে আশরাফউদ্দিন চৌধুরী যে একজন সত্যিকার কৃষক নয়, এমন অভিযোগ উত্থাপন করে তাঁর অযোগ্যতা প্রমাণের চেষ্টা করছে। তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদের তারা জমিদার, সুদ ব্যবসায়ী ও উকিলদের গ্রুপ বলেও দোষারোপ করছে।[১৭৪]

আন্দোলনে আশরাফউদ্দিন চৌধুরী তাঁর প্রভাব ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করলে উভয় গ্রুপের মধ্যে বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। ১৯৩৬ সালের মে মাসের শেষ দিকে শিবপুরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে 'এক গ্রুপ অপর গ্রুপের বিরুদ্ধে গালিগালাজ করে বক্তৃতা দেয়। এর ফলে মারামারি লাগার উপক্রম হলে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।' এমনকি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটও লক্ষ করেন যে ঐ বিরোধ 'ব্যক্তিগত শত্রুতা'র চেয়ে আরও কিছু বেশি। ঐ বিরোধ থেকে স্পষ্ট হয় যে, 'রাজনীতিতে উভয় পক্ষের মধ্যে পার্থক্য আছে – আশরাফউদ্দিনের পক্ষ হল সাধারণভাবে গঠনতান্ত্রিক, আর ইয়াকুব আলীর পক্ষ হল কমিউনিস্ট।'[১৭৫] স্থানীয় সমিতির পক্ষ থেকে সৃষ্ট চাপ এবং কৃষকদের ভোট জয় করার ক্রমবর্ধমান প্রবল প্রতিযোগিতার ফলে কৃষকদের স্বার্থের প্রতি আশরাফউদ্দিন তাঁর দায়বদ্ধতার কথা প্রমাণে বাধ্য হন। এ কারণে তাঁর বক্তৃতা ক্রমশ 'রক্ষণশীল জমিদারদের দৃষ্টিতে অধিক আপত্তিকর বলে গণ্য হয়'।[১৭৬] বাম শক্তির আক্রমণের কারণে আশরাফউদ্দিন বাধ্য হয়ে 'কৃষকদের সমর্থন আদায়ের জন্য ব্যাপক প্রচারণা'য় অংশ নেন। এসব প্রচারণায় তিনি জমিদারদের 'দেশের শত্রু' হিসেবে আখ্যায়িত করতে থাকেন।[১৭৭] কংগ্রেস পার্টির জন্য এটা ছিল একটা বিপজ্জনক বিষয়। একজন রাজভক্ত মুসলমান ভূ-স্বামী খাজা ফারুকীকে লক্ষ করে আশরাফউদ্দিন যাচ্ছেতাই ভাষায় আক্রমণ করতে থাকেন। এই আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় খাজা ফারুকী আশরাফউদ্দিনের দুই ঘনিষ্ঠ সঙ্গি আবদুল মালেক ও আনোয়ারুল্লাহর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন।[১৭৮] এত করেও আশরাফউদ্দিন তাঁর প্রতিপক্ষদের জমিদার-বিরোধী চরম মতবাদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারেননি। শেষে একজন খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা হিসেবে তিনি দলীয় চিন্তাধারায় স্থির থাকেন এবং কৃষি সংস্কারের ব্যাপারে তাঁর আহ্বানকে নমনীয় করেন। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে মৌলভী অছিমুদ্দিন আবদুল মালেককে 'কোণঠাসা' করে ফেলেন।[১৭৯] এই ব্যক্তিই ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব সংশোধনী বিলের বিতর্কিত সংশোধন উপস্থাপনের জন্য দায়ী ছিলেন। জুলাই মাসের দিকে স্থানীয় প্রশাসন জানায় যে, 'আশরাফউদ্দিনের প্রভাব তাঁর চরমপন্থী প্রতিপক্ষদের তুলনায় ক্রমান্বয়ে কমে আসছে।'[১৮০] টিপেরা কৃষক সমিতির প্রার্থী হিসেবে অছিমুদ্দিন আহমদ টিপেরা কেন্দ্রীয় পল্লি নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে তিনি খাজা ফারুকীকে ব্যাপক ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন।[১৮১] অপরদিকে আশরাফউদ্দিন বা তাঁর সহযোগী কেউ নির্বাচনে জিততে পারেননি। কোলকাতার কংগ্রেস

নেতৃত্ব সমিতির নতুন 'চরমপন্থী' নেতৃত্বের ব্যাপারে কোনকিছু করতে অস্বীকার করে। এমনকি এই আন্দোলনের শুরু থেকে 'মূল চালিকাশক্তি' হিসেবে পরিচিত টিপেরার কংগ্রেস নেতা কামিনী কুমার দত্তকে পরিষদ নির্বাচনে কংগ্রেস টিকেট দিতে অস্বীকার করা হয়। কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে দত্ত 'বিদ্রোহী' প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।[১৮২] নির্বাচনে তিনি পরাজিত হলেও ২৩ হাজারের বেশি ভোট পান।[১৮৩]

টিপেরার অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, বেঙ্গল কংগ্রেসের জন্য কৃষক সম্পর্কিত বিষয়টি ছিল একটি 'শাঁখের করাত'। কংগ্রেস নেতারা কর্মসূচির যে পরিমিত সীমা নির্ধারণ করে দেয় তাতে স্থানীয় পর্যায়ে কৃষক আন্দোলনের কোনো সুযোগ ছিল না; কংগ্রেসের অর্থে পরিচালিত সমিতিগুলো প্রদেশ নির্দেশিত নিয়ম-শৃঙ্খলা মানতে কম আগ্রহী ব্যক্তিদের হাতে পড়ে, তারা কৃষক আন্দোলনে আরও 'চরম' পন্থা অবলম্বনে আগ্রহী ছিল। এমনকি নির্বাচনী প্রচারণার শেষ পর্যায়েও প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ জেলা স্তরে গঠিত কৃষক সমিতিগুলোর ব্যাপারে সামান্যই উৎসাহ দেখায়। ১৯৩৬ সালের মে মাসে বরিশালে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির সদস্যরা একটা কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠানের 'চেষ্টা করে – সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল ঐ জেলার কৃষক সমিতিগুলো গঠন করা।' এর নেতৃত্বে ছিলেন সাম্যবাদী লালমোহন সেন এবং যুগান্তর সংগঠনের স্থানীয় সদস্যরা।[১৮৪] কয়েকজন জমিদারি গোমস্তার 'খাজনা অনাদায়ের কারণে প্রজাদের জমি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার লক্ষ্যে' বেতুর (Betur)-এর কংগ্রেস নেতা জগদীশচন্দ্র পালিত বাঁকুড়ার 'কোতুলপুর ও পত্রস্বর এলাকায় ও তার আশেপাশে প্রজা সমিতিগুলোকে সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেন'।[১৮৫] তবে ঐসব সমিতিকে কংগ্রেস নেতৃত্ব সামান্যতম সাহায্য করেছে এমন কোনো সাক্ষ্য পাওয়া যায় না; তাদের আয়োজিত সভায় বা র‍্যালিতে কোনো সিনিয়র কংগ্রেস নেতা যোগদান করেনি।

এমনকি শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত মেদিনীপুরেও প্রাদেশিক কংগ্রেস খুব দ্রুত নামে মাত্র কংগ্রেস পরিচালিত স্থানীয় কৃষক সমিতিগুলোর ওপর কর্তৃত্ব হারায়। '১৯৩৩ সাল নাগাদ মেদিনীপুরে কংগ্রেস সংগঠন একটা নতুন র‍্যাডিক্যাল গ্রুপের প্রভাবে চলে আসে – ঐ গ্রুপ কংগ্রেসের সাথে তাদের যোগাযোগের কথা অস্বীকার করে এবং গান্ধীর কার্যকলাপে অসন্তোষ প্রকাশ করে।'[১৮৬] আইন সভা নির্বাচনের মাত্র কয়েক দিন আগে ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে জেলা কংগ্রেস কৃষক সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কোনরকম অযাচিত মন্তব্য ছাড়াই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একে কৃষকদের জন্য একটি বিলম্বিত উদ্যোগ গণ্য করেন এভাবে যে, 'কংগ্রেস ইউনিয়ন বোর্ড সংস্থায় পরাজিত হয়েছে এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা একাধিক আসনে পরাজয়ের আশংকা করছে।'[১৮৭] শরৎ বসু ও প্রফুল্ল ঘোষের 'কংগ্রেস প্রার্থীদের জন্য উৎসাহিত করার' প্রচেষ্টা সত্ত্বেও খুব কম লোক তাতে সাড়া দেয়। কোলকাতা থেকে আগত এই দু'জন ব্যক্তি এক সভায় ভাষণ দেন, কিন্তু সেদিন হাটবার থাকা সত্ত্বেও সভাতে খুব অল্প লোক জমায়েত হয় এবং তাঁদের 'বক্তৃতায় বারবার বাধা সৃষ্টি করা হয়'। বক্তৃতা শেষ হলে স্থানীয় একজন ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে স্পষ্টভাবে বলে: 'কংগ্রেস তাদের কাছে শুধু ভোট চাওয়ার জন্য এসেছে ... কিন্তু যখন তারা দুর্দশার মধ্যে ছিল তখন কংগ্রেসকে দেখা যায়নি।'[১৮৮]

পল্লি এলাকায় ভোটারদের মন জয় করতে বেঙ্গল কংগ্রেসের প্রচারণা ছিল কমবেশি দুর্বল ও অসংগঠিত। স্থানীয় কৃষক সমিতিগুলো প্রায়শ প্রাদেশিক সংগঠনের সমর্থন পায়নি। যেসব স্থানে জনগণের ওপর এসব সমিতির সামান্য হলেও প্রভাব ছিল, সেসব এলাকায় সমিতির নেতারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কংগ্রেসের মনোনয়ন পায়নি। এমনকি টিপেরায় কংগ্রেসকে ত্রিপুরা কৃষক সমিতির কৃষকেরা দৃঢ় সমর্থন দেওয়া সত্ত্বেও কোনো মুসলিম আসনে কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ব্যর্থ হয়। 'সাধারণ' হিন্দু আসনে কোনো নামকরা কৃষক কর্মীকে কংগ্রেস থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি।[১৮৯] কংগ্রেসের বড় কর্তাদের এই ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, কংগ্রেসের সাথে কৃষকদের মাখামাখির ফলে অত্যন্ত অনুগত অনেক সমর্থক দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। ১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের ম্যাজিস্ট্রেটকে স্থানীয় কিছু গণ্যমান্য হিন্দু নেতা বলে যে, 'কমিউনিজম বা কোনো ধ্বংসাত্মক নীতির প্রতি হিন্দুদের মধ্যে সমর্থন প্রায় নেই; আর এসব কারণে কংগ্রেস পুরোপুরি অসুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। এ কথা অবশ্য স্পষ্ট করে বলা হয় যে, অধিকাংশ হিন্দু তেজস্বী হিন্দু প্রার্থীকে, সে যদি কংগ্রেসের লোকও হয়, ভোট দেবে।'[১৯০]

মফস্বল এলাকার হিন্দু জনসাধারণ কংগ্রেসের মধ্যে র‍্যাডিক্যালিজমের কোনো লক্ষণ দেখলেই স্বাভাবিকভাবেই ভীত হয়ে পড়ে। কৃষক প্রার্থীদের যথেচ্ছ পরিশ্রমের ফলে তাদের খাজনা ও ঋণ আদায় কমে যায়। হিন্দু জমিদারেরা তাই চাচ্ছিল কংগ্রেসের কাছ থেকে নমনীয় নির্বাচনী প্রচারণা। নির্বাচনের জন্য যতটা সম্ভব টাকা সংগ্রহ করার জন্য কংগ্রেসের পক্ষে তার মফস্বল এলাকার সম্পদশালী পৃষ্ঠপোষকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ঝুঁকি নেয়া সম্ভব ছিল না। প্রায় ক্ষেত্রেই যেসব প্রার্থী নিজেরাই নির্বাচনে অর্থ যোগান দিতে সক্ষম তাদেরকেই কংগ্রেস মনোনয়ন দিত। দল থেকে অর্থ পাওয়ার পরিবর্তে এরাই বরং দলকে অর্থ দিত। কংগ্রেস প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করার পর স্পষ্টভাবে দেখা গেল যে, এক্ষেত্রে আর্থিক বিষয়কেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বেঙ্গল কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ডের সভাপতি ড. বি. সি. রায় একজন প্রার্থীর অনুকূলে অন্য প্রার্থীকে কেন বাদ দেওয়া হয়েছে তার ব্যাখ্যা দেন এভাবে: 'ড. ধর খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন না ... কারণ তিনি অর্থ খরচ করতে প্রস্তুত নন ... ঢাকা ও ময়মনসিংহের জন্য আমাদের প্রার্থী পরিবর্তন করতে হয়েছে। সূর্য টেলিফোন করে জানায় যে, সে টাকা যোগাড় করতে পারছে না। সে-কারণে আমরা শ্রীযুক্ত কুমার শংকর রায়কে মনোনয়ন দিয়েছি।'[১৯১] কিরণ শংকর রায়ের চাচাত ভাই কুমার শংকর ছিলেন ঢাকার এক ধনী জমিদার। যশোরের সাধারণ গ্রামীণ নির্বাচনী এলাকার জন্য যাকে কংগ্রেসের মনোনয়ন দেওয়া হয়, তিনি 'কংগ্রেস নির্বাচনী তহবিলে কুড়ি হাজার টাকা প্রদান করেন'।[১৯২] মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উল্লেখ করেন:

> অর্থের অভাবে কংগ্রেসের কাজ এখন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে মনে হয়। সাধারণ নির্বাচনী এলাকায় তারা কাদের মনোনয়ন দেবে সে-বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। ঘাটাল-ঝাড়গ্রাম নির্বাচনী এলাকায় প্রথমে বাবু কিশোরীপতি রায়কে মনোনয়ন দেওয়ার প্রস্তাব হয়, কিন্তু ঐ প্রস্তাব স্থগিত করা হয়। কারণ কংগ্রেস বিবেচনা করছে যে, ঐ আসনে নারাজোলের রাজাকে মনোনয়ন দেওয়া উত্তম হবে।[১৯৩]

পরিশেষে, ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী প্রচারণায় সক্রিয় উভয় রায়কে এবং ধনাঢ্য সদগোপ জমিদার নারাজোলের জমিদারকে কংগ্রেস থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়।[১৯৪] কিন্তু অর্থ সংকটে নিপতিত কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ড অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়াকে প্রাধান্য দেয়। নির্বাচকমণ্ডলীতে ব্যাপক পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ লোকদের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পরিবর্তন না হওয়ার এটা একটা কারণ; পুরাতন পরিষদের সদস্য কমপক্ষে পনেরো জন কংগ্রেস নেতা ১৯৩৬-৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস টিকিটে সফলতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।[১৯৫] পল্লি এলাকার সামান্য কয়েকটি নির্বাচনী আসনে মেদিনীপুরের কিশোরপতি রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র মাল এবং দিনাজপুরের নিশীথনাথ কুণ্ডুর মতো কয়েকজন স্থানীয় কর্মীকে দলে অন্তর্ভুক্ত করে – এঁরা আইন অমান্য আন্দোলনের সময় সফলতা অর্জন করেছিলেন। তবে পল্লি এলাকার অধিকাংশ নির্বাচনী এলাকায় কৃষক সমিতির কর্মীদের বাদ দেওয়া হয় এবং মনোনয়ন দেওয়া হয় সম্পদশালী ভদ্রলোক সদস্যদের। স্থানীয় পল্লি এলাকার ভোটারদের বিচারে তারা ক্ষতিকর বিবেচিত হল না, বরং এই গ্রুপ অর্থাৎ স্থানীয় জমিদার, তালুকদার, ছোট শহরের উকিল, বণিক ও ব্যবসায়ীরা কংগ্রেস সংগঠনের ওপর তাদের প্রভাবকে দৃঢ় করে। কংগ্রেসের সব বিষয়ে এক সময় কোলকাতার বাবুরা খবরদারি করত, এখন মফস্বলে তাদের এই অধস্তন লোকেরাই নিজেদের বিষয়ে কর্তৃত্ব নেয়।

ত্রিশ দশকের মধ্যভাগে বেঙ্গল কংগ্রেসে দুটো নতুন গ্রুপ প্রাধান্য লাভ করে। এক গ্রুপের মধ্যে ছিল র‍্যাডিক্যালরা – তাদের আগ্রহ ছিল কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় কংগ্রেস এগিয়ে আসুক। পল্লি নির্বাচনী এলাকায় ৬৬টি হিন্দু আসনের মধ্যে কংগ্রেস জয়ী হয় ৩৫টি আসনে।[১৯৬] পল্লি এলাকার নির্বাচনী এলাকায় কংগ্রেস দল খারাপ ফল করে, এ বিষয়টি তাই কংগ্রেস কর্তৃক র‍্যাডিক্যালদের দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন কর্মপন্থা গ্রহণের গুরুত্বকে তুলে ধরে। অন্য গ্রুপটি ছিল মফস্বলের ভদ্রলোক। তারা ছিল কৃষকদের যে কোনো প্রকার সুবিধা দেওয়ার বিরোধী – দলকে ঐতিহ্যগত রক্ষণশীল চিন্তা-চেতনায় ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তারা ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দলের নিয়ন্ত্রণে এই উভয় গ্রুপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেঙ্গল কংগ্রেসের রাজনীতিতে একটি সূক্ষ্ম অথচ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে।

টীকা

১. জে. এ. গালাঘের, *কংগ্রেস ইন ডিক্লাইন,* পৃ. ৫৯৬।

২. রজত কান্ত রায়, 'দি ক্রাইসিস অব বেঙ্গল এগ্রিকালচার, ১৮২০-১৯২৭, দি ডিনামিকস্ অব ইমমবিলিটি', *ইন্ডিয়ান ইকনমিক এ্যান্ড সোসাল হিস্ট্রি রিভিউ,* ১০, ৩, ১৯৭৩। তমিজউদ্দিন খান বলেন যে, তাঁর পারিবারিক ভূসম্পত্তি ছিল 'খেয়ালি বড় নদী পদ্মার পাড়ের কাছাকাছি ... প্রতি বছরই এ নদীর পাড় ভাঙত' এবং তা সাত বারে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। 'সপ্তম বার

পাড় ভাঙ্গার সময় শুধু আমাদের বাড়িঘরই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়নি, অবশিষ্ট ভূসম্পত্তিও নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।' তমিজউদ্দিন খান, *দি টেস্ট অব টাইম*, পৃ. ২।

৩. রজত কান্ত রায়, 'দি ক্রাইসিস অব বেঙ্গল এগ্রিকালচার', পৃ. ২৬০; সুগত বসু, *এ্যাগ্রেরিয়ান বেঙ্গল: ইকনমি সোসাল স্ট্রাকচার এ্যান্ড পলিটিক্স ১৯১৯-১৯৭৭*, দিল্লী, ১৯৮৬, পৃ. ৪৪-৪৫।

৪. ১৯৩১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায় যে, সামগ্রিকভাবে বাঙলায় শতকরা ৬৫.৯ ভাগ জমি চাষ করে মালিক রায়ত বা মালিক চাষি, শতকরা ২১.১ ভাগ চাষ করে ভাগচাষি ও শতকরা ১৩.১ ভাগ চাষ করে ভাড়া করা শ্রমিক। দেখুন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *বেঙ্গল ১৯২০-১৯৪৭, দি ল্যান্ড কোয়েশ্চেন*, কোলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৪১।

৫. দৃষ্টান্ত হিসেবে বাকেরগঞ্জ জেলার কথা উল্লেখ করা যায় ... জমির মালিকানা কাঠামোর স্তর ছিল এ রকম: দু'হাজার একরের জমিদারি এস্টেটের দু'শ টাকার রাজস্ব ভাগ করে দেওয়া হয় একশ টাকার খাজনায় পাঁচশ একর জমির চারটি তালুকদারিতে; এর পরবর্তী ধাপে আছে পঁচিশ টাকা খাজনার পঁচিশ একর জমির আশিটি হাওলাদারি; এবং সর্বশেষ ধাপে পনেরো টাকার খাজনায় ৬.২৫ একর জমির ৩২০ জন রায়ত। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২। আরও দেখুন তপন রায়চৌধুরী, 'পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট ইন অপারেশন: বাকেরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট, ইস্ট বেঙ্গল', আর. ই. ফ্রাইকেন বার্গ (সম্পাদিত), *ল্যান্ড কন্ট্রোল এন্ড সোসাল স্ট্রাকচার ইন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি*, ম্যাডিসন, ডাব্লু আই এস, ১৯৬৯।

৬. ১৯৭০ দশকে প্রথম এই যুক্তি উত্থাপন করেন রত্নলেখা ও রজত রায়। দেখুন রত্নলেখা রায়, *চেঞ্জ ইন বেঙ্গল এ্যাগ্রেরিয়ান সোসাইটি সি. ১৭৫০-১৮৫০*, দিল্লী, ১৯৭৯; রজত কান্ত রায়, 'দি ক্রাইসিস অব বেঙ্গল এগ্রিকালচার', এবং রজত ও রত্না রায়, 'জমিদারস্ এ্যান্ড জোতদারস: এ স্টাডি অব রুরাল পলিটিক্স ইন বেঙ্গল', *মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ*, খণ্ড ৯, ১ (১৯৭৫), পৃ. ৮১-১০২। সেই সময় থেকে অন্য গবেষকগণ 'জোতদার গবেষণা'-কে আরও উন্নত ও সূক্ষ্ম করেন এবং বাঙলার কৃষিভিত্তিক গবেষণায় তা মূল গবেষণা হিসেবে বিবেচিত হয়।

৭. 'জোতদার' কথাটি ব্যবহার করা হয় উত্তর বাঙলার অবস্থাপন্ন চাষিদের বোঝাবার ক্ষেত্রে। অন্যান্য এলাকায় ব্যবহার করা হয় অন্য শব্দ, যেমন, যশোরে 'গাঁতিদার', বাকেরগঞ্জে 'হাওলাদার', এবং দক্ষিণ মেদিনীপুরে 'চাকদার', কোনরকম ভুল বোঝাবুঝি এড়াবার জন্য সারা প্রদেশের অবস্থাপন্ন চাষিদেরকে 'জোতদার' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৮. ক্ষুদ্র চাষিদের 'প্রথাগত' অধিকার রক্ষার জন্য জমির ওপর পূর্ণ মালিকানা নিষিদ্ধ করার জন্য ঔপনিবেশিক আইনের কার্যপদ্ধতি জানার জন্য দেখুন ডি. এ ওয়াশব্রুক, 'ল, স্টেট এ্যান্ড এ্যাগ্রেরিয়ান সোসাইটি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া', *মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ*, খণ্ড ১৫, ৩ (১৯৮১), পৃ. ৬৪৯-৭২১।

৯. আঁদ্রে বেতিলি, 'ক্লাস স্ট্রাকচার ইন এ্যান এ্যাগ্রেরিয়ান সোসাইটি: দি কেস অব দি জোতদারস্', তাঁর *স্টাডিজ ইন এ্যাগ্রেরিয়ান সোসাল স্ট্রাকচার*-এ অন্তর্ভুক্ত, নিউ দিল্লী, ১৯৭৪।

১০. সুগত বসু, *এ্যাগ্রেরিয়ান বেঙ্গল*। ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন কৃষকদের মধ্যকার বিভেদ সম্পর্কে অন্য যেসব বই-পুস্তক আছে তার সাথে বসুর মডেলের বিরোধ আছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখুন হামজা আলভি, 'ইন্ডিয়া : ট্রানজিশন ফ্রম ফিউডালিজম টু ক্যাপিটালিজম', *জার্নাল অব কনটেম্পরারি এশিয়া*, খণ্ড ১০, ১৯৮০, পৃ. ৩৫৯-৩৯৮, এবং একই লেখকের 'ইন্ডিয়া এ্যান্ড

দি কলোনিয়াল মোড অব প্রোডাকশন', জন সেভিলি ও রালফ্ মিলিবান্ড (সম্পাদিত), *সোসালিস্ট রেজিস্টার*, লন্ডন, ১৯৭৫, পৃ. ১৬০-১৭৯; উৎস পাটনায়েক, *দি এ্যাগ্রেরিয়ান কোয়েশ্চেন এ্যান্ড দি ডেভলপমেন্ট অব ক্যাপিটালিজম ইন ইন্ডিয়া*, নিউ দিল্লী, ১৯৮৬ এবং একই লেখকের 'ক্লাস ডিফারেনসিয়েশন উইদিন দি পিজান্ট্রি', *ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, খণ্ড ২, ১৯৭৬, পৃ. ৮২-১০১। বাঙলায় এই প্রভেদ নির্ণয় সম্পর্কিত যুক্তির জন্য দেখুন অমিত ভাদুড়ী, 'দি ইভুলিউশন অব ল্যান্ড রিলেশনস্ ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া আন্ডার ব্রিটিশ রুল', *ইন্ডিয়ান ইকনমিক এ্যান্ড সোসাল হিস্ট্রি রিভিউ*, খণ্ড ১৩, ১৯৭৬, পৃ. ৪৫-৫৮; আতিউর রহমান, *পিজান্টস্ এ্যান্ড ক্লাসেস: এ স্টাডি ইন ডিফারেনসিয়েশন ইন বাংলাদেশ*, লন্ডন, ১৯৮৮; পার্থ চ্যাটার্জী 'দি কলোনিয়াল স্টেস্ট এ্যান্ড পিজান্ট রেজিস্ট্যান্স ইন বেঙ্গল ১৯২০-১৯৪৭', *পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট*, খণ্ড ১১০, ১৯৮৬, পৃ. ১৬৮-২০৪; অশোক সেন, পার্থ চ্যাটার্জী ও সৌগত মুখার্জীর গবেষণা *থ্রি স্টাডিজ অন দি এ্যাগ্রেরিয়ান স্ট্রাকচার অব বেঙ্গল*, ক্যালকাটা, ১৯৮২; বি. বি. চৌধুরী, 'দি প্রসেস অব ডিপিজ্যান্টাইজেশন ইন বেঙ্গল এ্যান্ড বিহার, ১৮৮৫-১৯৪৭', *ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল রিভিউ*, খণ্ড ২, ১৯৭৫-৭৬, পৃ. ১০৫-১৬৫, এবং এ্যালান স্মলি (Alan Smalley), 'দি কলোনিয়াল স্টেট এ্যান্ড এ্যাগ্রেরিয়ান স্ট্রাকচার ইন বেঙ্গল, *জার্নাল অব কনটেমপরারি এশিয়া*, খণ্ড ১৩, ১৯৮৩, পৃ. ১৭৬-১৯৭।

১১. ফ্রান্সিস বুকানন-হামিল্টন, *এ জিয়োগ্রাফিক্যাল, স্ট্যাটিসটিক্যাল এ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল ডেসক্রিপশন অব দি ডিস্ট্রিক্ট – এ জিলা অব দিনাজপুর ইন দি প্রভিন্স অর সুবা অব বেঙ্গল*, কোলকাতা, ১৮৮৩।

১২. 'জোতদার থিসিস' নিয়ে রজত রায়ের সাম্প্রতিক গবেষণায় নতুন করে একথা বলা হয়েছে, দেখুন রজত রায়, 'দি রিট্রিট অব দি জোতদারস্?' *ইন্ডিয়ান ইকনমিক এ্যান্ড সোসাল হিস্ট্রি রিভিউ*, খণ্ড ২৫, ২, ১৯৮৮, পৃ. ২৩৭-২৪৭।

১৩. ডি. ম্যাকফারসন, *সার্ভে এ্যান্ড সেটেলমেন্ট রিপোর্ট অব পাবনা এ্যান্ড বগুড়া (১৯২১-২৯)*, কোলকাতা, ১৯৩০ (অতঃপর এসএসআর বলা হবে), পৃ. ৫৪ আরও উদ্ধৃত হয়েছে পার্থ চ্যাটার্জী, *বেঙ্গল ১৯২০-৪৭*, পৃ. ৫৪।

১৪. কে. এ. এল. হিল, *বাডওয়ান এসএসআর (১৯২৭-৩৪)*, কোলকাতা, ১৯৪০, পৃ. ৩২।

১৫. ডব্লু. এইচ. থম্পসন, *নোয়াখালী এসএসআর, (১৯১৫-১৯)*, কোলকাতা, ১৯১৯, পৃ. ২৭।

১৬. এফ. এ. স্যাচসে, *ময়মনসিংহ এসএসআর (১৯০৮-১৯)*, কোলকাতা, ১৯১৯, পৃ. ৪১।

১৭. হাশিম আমীর আলী, *দেন এ্যান্ড নাউ, ১৯৩৩-১৯৫৮, এ স্টাডি অব সোসিও-ইকনমিক স্ট্রাকচার এ্যান্ড চেঞ্জেস ইন সাম ভিলেজেজ নিয়ার বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি বেঙ্গল*, নিউ দিল্লী, ১৯৬৬, পৃ. ৪৫।

১৮. জে. সি. জ্যাক, *ইকনমিক লাইফ অব এ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট*, অক্সফোর্ড, ১৯১৬, পৃ. ৮১।

১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮-৬৯।

২০. তমিজউদ্দিন খান, *দি টেস্ট অব টাইম*, পৃ. ৫৮।

২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮।

২২. মনে রাখতে হবে যে, জ্যাক ফরিদপুরের অবস্থাপন্ন 'মুসলমান' কৃষকদের কথা উল্লেখ করেছেন, আর তমিজউদ্দিন খান যে প্রাথমিক স্কুলে পড়তে যান তার মালিক একজন মুসলমান

কৃষক, নাম ঝাপু খান; তমিজউদ্দিন খানের শ্বশুরও অবস্থাপন্ন মুসলমান ভদ্রলোক, নাম বশিরউদ্দিন আহমদ। তমিজউদ্দিন খান, *দি টেস্ট অব টাইম*, পৃ. ৭০। সেটেলমেন্ট অফিসার উল্লেখ করেন যে, নোয়াখালীতে *মুসলমান* কৃষকেরা নিজেদের মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীতে উন্নীত করেছে: বর্ধমানের অধিকাংশ খাজনামুক্ত রায়তি *আইমাদারেরা* ছিলেন মুসলমান। দেখুন আঁদ্রে বেতিলি, 'দি কেস অব দি জোতদারস্', পৃ. ১২৮। দিনাজপুরের সেটেলমেন্ট অফিসার হিসেবে এফ. ও. বেল যেসব জোতদারের সাক্ষাৎ পান তাদের অধিকাংশই মুসলমান এবং কয়েকজন রাজবংশী। দেখুন বেলের 'নোটস্ অন রুরাল ট্রাভেলস্ ইন দিনাজপুর', ১৯৩৯, এফ. ও. বেল পেপারস্, আইওএলআর, এমএসএস ইইউআর ডি/৭৩৩/২।

২৩. এফ. এ. সাচসে, *ময়মনসিংহ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার*, আলীপুর, ১৯১৭, পৃ. ৩২।

২৪. *প্রাগুক্ত*।

২৫. *প্রাগুক্ত*।

২৬. প্রফুল্লচন্দ্র রায়, *লাইফ এ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্সেস অব এ বেঙ্গলি কেমিস্ট*, ক্যালকাটা, ১৯৩২, পৃ. ১০-১১।

২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩-২৪।

২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫-৪৬।

২৯. পতনিদার ও দর-পতনিদার হল জমির মধ্যবর্তী ভোগদখলকারী। এরা জমিদারদের খাজনা দেয় এবং প্রায় ক্ষেত্রেই কৃষকদের কাছে উচ্চ খাজনায় জমির বন্দোবস্ত দেয়। জে. সি. কে. পিটারসন, *বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার*, আলীপুর, ১৯১০, পৃ. ৪৭।

৩০. এল. এস. এস. ও'ম্যালে, মনমোহন চক্রবর্তী, *হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার*, আলীপুর, ১৯০৯, পৃ. ২৮।

৩১. এল. এস .এস. ও'ম্যালে *পাবনা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার*, আলীপুর, ১৯২৩, পৃ. ৪১।

৩২. রত্নলেখা রায়, 'দি চেঞ্জিং ফরচুন্স অব দি বেঙ্গলি জেন্ট্রি', পৃ, ৫১১-৫১৯।

৩৩. এফ. ডি. আসকোলি, *ঢাকা এসএসআর (১৯১০-১৭)*, কোলকাতা, ১৯১৭, পৃ. ৪৪-৪৫।

৩৪. জে. সি. জ্যাক, *বাকেরগঞ্জ এসএসআর (১৯০০-০৮)*, কোলকাতা, ১৯১৫, পৃ. ৮৭-৮৮।

৩৫. আকিনোবু কাওয়াই, *ল্যান্ডলর্ডস এ্যান্ড ইম্পিরিয়াল রুল: চেইঞ্জ ইন বেঙ্গল এগ্রেরিয়ান সোসাইটি, সি. ১৮৮৫-১৯৪০*, ২ খণ্ড, টোকিও, ১৯৮৬ এবং ১৯৮৭। চারটি বড় জমিদারি এস্টেটের ওপর তিনি গবেষণা করেন এবং তিনি লক্ষ করেন যে, ঐ চারটি এস্টেট প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এবং তার পরবর্তী সময়েও কার্যকরভাবে খাজনা আদায় অব্যাহত রাখে। রজত রায় স্বীকার করেন যে, ত্রিশ দশক পর্যন্ত অনেক বড় বড় এস্টেট সুষ্ঠুভাবে কার্য পরিচালনা করে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারি অর্থনৈতিক মন্দার পূর্বেও কার্য পরিচালনায় ততটা সফল ছিল না। রজত রায়, 'দি রিট্রিট অব দি জোতদারস্?', পৃ. ২৩৯।

৩৬. দেখুন সুগত বসু, *এ্যাগ্রেরিয়ান বেঙ্গল*, পৃ. ১০০-১০৫, 'ভদ্রলোক' জমিদারদের মধ্যে তালুকদার মহাজনদের বিবরণ *হু রিমেইন্ড অন দি ল্যান্ড*, দেখুন, পৃ. ১৯২।

৩৭. দেখুন রামকৃষ্ণ মুখার্জী, *দি ডিনামিকস্ অব রুরাল বেঙ্গল – এ স্টাডি অব দি ইকনমিক স্ট্রাকচার ইন বেঙ্গল ভিলেজেস*, বার্লিন, ১৯৫৭; পার্থ চ্যাটার্জী, *বেঙ্গল ১৯২০-১৯৪৭*, সুগত বসু, *এ্যাগ্রেরিয়ান বেঙ্গল*।

৩৮. রজত ও রত্না রায়, 'জমিদারস্ এ্যান্ড জোতদারস্ – এ স্টাডি অব রুরাল পলিটিকস ইন বেঙ্গল', 'দি রিট্রিট অব দি জোতদারস্?'; সুগত বসু, *'এ্যাগ্রেরিয়ান বেঙ্গল'* আকিনোবু কাওয়াই, *'ল্যান্ডলর্ডস এ্যান্ড ইম্পিরিয়াল রুল'* পার্থ চ্যাটার্জী, *'বেঙ্গল ১৯২০-১৯৪৭'*, অশোক সেন, পার্থ চ্যাটার্জী ও সৌগত মুখার্জী, *স্টাডিজ অন দি এ্যাগ্রেরিয়ান স্ট্রাকচার অব বেঙ্গল*, সৌগত মুখার্জী, 'এ্যাগ্রেরিয়ান ক্লাস ফরমেশন ইন মডার্ন বেঙ্গল, ১৯৩১-১৯৫১', *ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, খণ্ড ২১, ৪, ২৫ জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. পিই ১১– পিই ২৭–। এ বিষয়ে তাঁরা একমত হলেও বিষয়ের গুরুত্ব নিয়ে তাঁদের মতভেদ আছে।

৩৯. রিপোর্ট অব দি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অব টিপেরা, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৩১, গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল, হোম কনফিডেনশিয়াল পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট (অতঃপর জিবি এইচসিপিবি) ফাইল নং ৮৪৯/৩১ (১-৯)।

৪০. এ. বি. দত্ত থেকে পলিটিক্যাল সেক্রেটারির কাছে, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৩১, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৮৪৯/৩১ (১-৯)।

৪১. জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৮৪৯/৩৩।

৪২. দেখুন সৌগত মুখার্জী, 'এ্যাগ্রেরিয়ান ক্লাস ফরমেশন, পৃ. পিই - ১৩।

৪৩. রায়তি স্বত্ব বিক্রয় ও হস্তান্তরের পূর্ণ বিবরণের জন্য দেখুন, *প্রাগুক্ত*।

৪৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. পিই ১৫-১৬।

৪৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. পিই-১৭। রায়তি স্বত্ব হস্তান্তর ও জোতদারদের বর্ধিত হারে অগ্রিম শস্যে ঋণ প্রদান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন পার্থ চ্যাটার্জী, *বেঙ্গল ১৯২০-৪৭*, পৃ. ১৪২-১৬৫।

৪৬. রজত কান্ত রায়, 'দি রিট্রিট অব দি জোতদারস্?', পৃ. ২৪০।

৪৭. হুমাইরা মোমেন, *মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল: এ স্টাডি অব কৃষক প্রজা পার্টি এ্যান্ড দি ইলেকশনস্ অব ১৯৩৭*, ঢাকা ১৯৭২, পরিশিষ্ট ৩, পৃ. ৮৮-৮৯।

৪৮. হারুণ-অর-রশিদ, *দি ফোরশ্যাডোইং অব বাংলাদেশ – বেঙ্গল মুসলিম লীগ এ্যান্ড মুসলিম পলিটিক্স ১৯৩৬-৪৭*, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৬৪।

৪৯. এম. এইচ. আর. তালুকদার (সম্পাদিত), *মেমোয়ার্স অব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী*, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১০৪।

৫০. রাজমোহন গান্ধী, *আন্ডারস্টাডিং দি মুসলিম মাইন্ড*, নিউ দিল্লী, ১৯৮৮, পৃ. ১৯০। জীবন-বৃত্তান্তের জন্য দেখুন এ. এস. এম. আবদুর রব, *এ. কে. ফজলুল হক*, লাহোর, ১৯৬৬।

৫১. কাজী আহমদ কামাল, *পলিটিসিয়ানস্ এ্যান্ড ইনসাইড স্টোরিজ – এ গ্লিম্পস মেইনলি ইনটু দি লাইভস্ অব ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী এ্যান্ড মওলানা ভাসানী*, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ১।

৫২. ঔপনিবেশিক বাঙলায় মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের অভ্যুদয় সম্পর্কে জানতে দেখুন তাজিন এম. মুর্শীদ, 'দি বেঙ্গল মুসলিম ইন্টেলিজেনসিয়া, ১৯৩৭-৭৭. দি টেনশন বিটুইন দি রিলিজিয়াস এ্যান্ড দি সিকিউলার', ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড, ডি. ফিল. থিসিস, ১৯৮৫।

৫৩. রফিউদ্দিন আহমদ 'সামান্য কম মর্যাদা সম্পন্ন আশরাফ' শব্দটি ব্যবহার করেন। বাঙলাভাষী এই সব বাঙালি নিজেদের সম্পর্কে দাবি করত যে, তাদের পূর্বপুরুষ বিদেশী এবং এই দাবির

সপক্ষে কিছু সম্পত্তি ও সম্পদ তাদের ছিল। *দি বেঙ্গল মুসলিমস্, ১৮৭১-১৯০৬: এ কোয়েস্ট ফর আইডেন্টিটি*, নিউ দিল্লী, ১৯৮৮, পৃ. ১৫।

৫৪. *রিপোর্ট অব দি কমিটি অন মুহাম্মাদান এডুকেশন*, ১৯১৪; উদ্ধৃত, তাজিন মুর্শিদ-এর 'দি বেঙ্গল মুসলিম ইন্টেলিজেনসিয়া', পৃ. ১৭।

৫৫. ঐ সংখ্যা ১৯০১-২ সালে শতকরা ২৭.৭ ভাগ এবং ১৯৩৯-৪০ সালে ছিল শতকরা ৪.১ ভাগ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩।

৫৬. অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের সাথে সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ১১-১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। বাঙলায় মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়ে অধ্যাপক রাজ্জাক তাঁর প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে আমার সাথে মত বিনিময় করার জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

৫৭. তমিজউদ্দিন খান, *দি টেস্ট অব টাইম*, পৃ. ৬৩-৬৪।

৫৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯।

৫৯. অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের সাথে সাক্ষাৎকার।

৬০. জে. সি. জ্যাক, *ইকনমিক লাইফ অব এ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট*, পৃ. ৬৮।

৬১. উদ্ধৃত রফিউদ্দিন আহমদ, *দি বেঙ্গল মুসলিমস্*, পৃ. ১৪২।

৬২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭-৩২।

৬৩. মাদ্রাসায় মুসলমান ছাত্রদের আনুপাতিক হার ১৮৮১-৮২ সালে ছিল শতকরা ০.৮১ ভাগেরও কম, ১৯২৬-২৭ সালে তা বেড়ে গিয়ে হয় শতকরা ৪.৮৯ ভাগ। তাজিন মুর্শিদ, দি বেঙ্গল মুসলিম ইন্টেলিজেনসিয়া, পৃ. ৪৫-৪৬। মুসলমানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে মাদ্রাসার জনপ্রিয়তাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন জনাব রফিউদ্দিন আহমদ। মুর্শিদের গবেষণায় দেখা যায়, ধর্মনিরপেক্ষ দেশীয় বা পশ্চিমা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার পরিবর্তে অনেক মুসলমান অল্প খরচ ও সহজে শিক্ষা প্রাপ্তির জন্য ধর্মীয় শিক্ষাকে দ্বিতীয় পছন্দের উত্তম শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করে।

৬৪. মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক সফল পরিবারে বিয়ে করে ও আশরাফ ধরনের নাম ও পদবি গ্রহণ করে আশরাফ মর্যাদা (আশরাফি) লাভের চেষ্টা করে। তারা আতরাফ ভালো মানুষের মর্যাদা লাভ করে। দেখুন, রফিউদ্দিন আহমদ, *দি বেঙ্গল মুসলিমস্*, পৃ. ২৭।

৬৫. *দি বেঙ্গলি*, ৩রা জুলাই, ১৯২৯; উদ্ধৃত, হারুণ-অর-রশিদ, *দি ফোরশ্যাডোইং অব বাংলাদেশ*, পৃ. ৩২।

৬৬. মফস্বল এলাকায় অনুষ্ঠিত প্রজা সম্মেলনে হক সাহেব ও তাঁর দলের লোকেরা বিশেষ কোনো আগ্রহ দেখাননি। ১৯৩৫ সালের প্রথম দিকে হক সাহেব ঢাকায় প্রজা সম্মেলন উদ্বোধন করতে সম্মত হন, কিন্তু তিনি তাঁর কথা রাখতে ব্যর্থ হন। বজলুর রহমান খান, *পলিটিক্স ইন বেঙ্গল ১৯২৭-৩৬*, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৩১।

৬৭. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ৯১।

৬৮. হারুণ-অর-রশিদ, *দি ফোরশ্যাডোইং অব বাংলাদেশ*, পৃ. ৬৪।

৬৯. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ. ৯২।

৭০. রিপোর্ট অব দি রাজশাহী ডিভিশনাল কমিশনার, লোকাল অফিসার্স ফোর্টনাইটলি কনফিডেনসিয়াল রিপোর্টস্, (অতঃপর এলওএফসিআর বলা হবে) ১৯৩৬ সালের মে মাসের প্রথম পক্ষ, জিবি এইচ সিপিবি ফাইল নং ৫৬/৩৬।

৭১. রিপোর্ট অব দি ঢাকা ডিভিশনাল কমিশনার, *প্রাগুক্ত*।

৭২. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ. ১০২।

৭৩. তমিজউদ্দিন খান, *দি টেস্ট অব টাইম*, পৃ. ৩।

৭৪. বজলুর রহমান খান, *পলিটিক্স ইন বেঙ্গল*, পৃ. ২৭, এন. ১২৫।

৭৫. পি. ডি. মার্টিন মেমোয়ার্স, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১৮০/১৩।

৭৬. রিপোর্ট অব দি রাজশাহী ডিভিশনাল কমিশনার, এলওএফসিআর, ১৯৩৬ সালের মে মাসের প্রথম ফোর্টনাইট, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৫৬/৩৬।

৭৭. হারুণ-অর-রশিদ, *দি ফোরশ্যাডোইং অব বাংলাদেশ*, পৃ. ৬৫।

৭৮. দেখুন টি. জে. বায়ার্স, *চরণ সিংহ ১৯০২-১৯৪৭: এ্যান এ্যাসেসমেন্ট*, পাটনা, ১৯৮৮।

৭৯. জে. সি. জ্যাক, *ইকনমিক লাইফ অব এ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট*, পৃ. ৬৮।

৮০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯। এখানে গুরুত্ব আরোপিত।

৮১. শীলা সেন, *মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল ১৯৩৭-১৯৪৭*, নিউ দিল্লী, ১৯৭৬, পৃ. ৭৯।

৮২. কৃষক প্রজা পার্টির কর্মসূচি ও ঘোষণাপত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন হোমায়রা মোমেন, *মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল;* শীলা সেন, *মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল*; বজলুর রহমান খান, *পলিটিক্স ইন বেঙ্গল*; হারুণ-অর-রশিদ, *দি ফোরশ্যাডোইং অব বাংলাদেশ।*

৮৩. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ. ৬৪-৬৫।

৮৪. ১৯৩৬ সাল নাগাদ মুসলমানেরা বর্ধমানের কটোয়া স্থানীয় বোর্ডের শতকরা ৩৮ ভাগ, বীরভূম জেলার রামপুর হাট মহকুমায় শতকরা ৪৪.৪ ভাগ, হাওড়ার উলুবাড়িয়া স্থানীয় বোর্ডে শতকরা ২৫ ভাগ, বশিরহাটে শতকরা ৪৬.৬ ভাগ এবং বারাসাতে শতকরা ৫০ ভাগ আসন অধিকার করেছিল (বশিরহাট ও বারাসাত হল ২৪ পরগণা জেলায়)। এসব এলাকায় হিন্দুরা ছিল বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। *রেজুলেশনস্ রিভিউইং দি রিপোর্টস্ অন দি ওয়ার্কিং অব ডিস্ট্রিক্ট, লোকাল এ্যান্ড ইউনিয়ন বোর্ডস ইন বেঙ্গল*, ১৯৩৬, পরিশিষ্ট জি।

৮৫. শতকরা এই হার ছিল – যশোর ৬০.২ ভাগ, ঢাকা ৫৭.৮ ভাগ, বাকেরগঞ্জ ৬৪.৪ ভাগ, চট্টগ্রাম ৭৩.৩ ভাগ, টিপেরা ৬৩.৮ ভাগ, নোয়াখালী ৭৩.৩ ভাগ, রাজশাহী ৬৪.৪ ভাগ, বগুড়া ৭৪.১৭ ভাগ এবং পাবনা ৬৬.৬ ভাগ। *প্রাগুক্ত*।

৮৬. ১৯৩৫-৩৬ এবং ১৯৩৬-৩৭ সালের মধ্যে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৪৬.৮ ভাগ থেকে ৫০.৮ ভাগে পৌঁছায়। *প্রাগুক্ত*।

৮৭. এফ. ও. বেল, *দিনাজপুর এসএসআর*, পৃ. ১৬-১৭। আরও দেখুন এফ. ও. বেল-এর 'নোটস্ অন রুরাল ট্রাভেলস্ ইন দিনাজপুর, ১৯৩৯', আইওএলআর এমএসএস ইইউআর ডি/৭৩৩/১, পৃ. ৪২, ৭৪।

৮৮. উদাহরণ হিসেবে দেখুন, ১৯৩০ সালে ঢাকা ও কিশোরগঞ্জে দাঙ্গার ওপর তনিকা সরকারের গবেষণা, 'কমিউনাল রায়টস্ ইন বেঙ্গল', অন্তর্ভুক্ত মুশিরুল হাসান (সম্পাদিত) *কমিউনাল এ্যান্ড প্যান-ইস্‌লামিক ট্রেন্ডস্ ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া*, নিউ দিল্লী, ১৯৮৫। অতি

সাম্প্রতিককালে সুরঞ্জন দাশ বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে পল্লি বাংলায় 'সাম্প্রদায়িক' দাঙ্গার কারণকে শ্রেণীভিত্তিক বলে মন্তব্য করেন। সুরঞ্জন দাশ, 'কমিউনাল রায়টস্ ইন বেঙ্গল, ১৯০৫-১৯৪৭', ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড, ডি. ফিল থিসিস, ১৯৮৭।

৮৯. বজলুর রহমান খান যুক্তি দেখান যে, কৃষক প্রজা পার্টিকে দেখা উচিত 'বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা অংশের রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে, যেখান থেকে তারা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও ঐতিহ্যগত মুসলমান নেতৃত্বকে আক্রমণ করে।' মধ্যবিত্ত কৃষক প্রজা পার্টির নেতৃত্বের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার বৈশিষ্ট্যের গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, ঐ নেতৃত্ব দলের গ্রামীণ জোতদার শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবকে উপেক্ষা করে, অথচ এই শ্রেণীর লোক বাঙলার রাজনীতিতে একটা নতুন শক্তি হিসেবে সংগঠিত হয়। তারা ভূমি সম্পর্কিত বিরোধকে সুদূর মফস্বল এলাকা থেকে আইন সভায় নিয়ে আসে যা প্রদেশিক রাজনীতিতে নতুন মাত্রা ও ধারার সূচনা করে। বি. আর. খান, *পলিটিক্স ইন বেঙ্গল*, পৃ. ২৯।

৯০. রজত এবং রত্না রায়, 'জমিদারস্ এ্যান্ড জোতদারস্: এ স্টাডি অব রুরাল পলিটিক্স ইন বেঙ্গল', পৃ. ১০১।

৯১. চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের রিপোর্ট, জিবি এলওএফসিআর, মে ১৯৩৬-এর প্রথম পক্ষ।

৯২. *দি স্টেটস্ম্যান*, ২৫শে মে, ১৯৩৬।

৯৩. কাজী আহমদ কামাল, *পলিটিসিয়ানস্ এ্যান্ড ইনসাইড স্টোরিজ*, পৃ. ১১৬-১১৭। ঢাকার প্রথম পরিবার সম্পর্কিত এক কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাস জানা যায়।

৯৪. এস. রহমতুল্লাহর মেমোয়ার্স, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর ডি/১৮০/৪।

৯৫. পি. ডি. মার্টিন মেমোয়ার্স, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর ডি/১৮০/১৩। ১৯৩৩-৩৪ সালে মার্টিন ছিল নওয়াবের এস্টেটের চিফ ম্যানেজার।

৯৬. কেনেথ ম্যাকফারসন, *দি মুসলিম মাইক্রোসম*, পৃ. ২১২। পুরো জীবন বৃত্তান্তের জন্য দেখুন এম. এ. এইচ. ইস্পাহানী, *কায়েদ-ই-আজম জিন্নাহ এ্যাজ আই নিউ হিম*, করাচি, ১৯৬৬।

৯৭. জেড. এইচ. জায়েদী (সম্পাদিত), *এম. এ. জিন্নাহ – ইস্পাহানী করেসপন্ডেন্স: ১৯৩৬-১৯৪৮*, করাচি, ১৯৭৬।

৯৮. এম. এইচ. আর. তালুকদার (সম্পাদিত), *দি মেমোয়ার্স অব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী*, পৃ. ১০৬-১০৭। সোহরাওয়ার্দী পরিবারের একটা ইতিহাস পাওয়া যাবে – বেগম শায়েস্তা ইকরামউল্লাহ, *ফ্রম পর্দা টু পার্লামেন্ট*, লন্ডন, ১৯৬৩।

৯৯. *দি মেমোয়ার্স অব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী*, পৃ. ১০৬।

১০০. তার নাম মিনা পেশোয়ারী। ১৯২৬ সালের কোলকাতা-দাঙ্গার সময় বেশ কয়েকজনকে হত্যার অভিযোগে তাকে খোঁজা হয়। তাকে জামিন দেওয়ার জন্য সোহরাওয়ার্দী পুলিশের সাথে যোগাযোগ করেন। হামিদুল হক চৌধুরী, *মেমোয়ার্স*, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৪৫।

১০১. কাজী আহমদ কামাল, *পালেটিসিয়ানস্ এ্যান্ড ইনসাইড স্টোরিজ*, পৃ. ৫৪।

১০২. এগুলো হল উত্তর কোলকাতা, দক্ষিণ কোলকাতা, হুগলী-কাম-হাওড়া (মিউনিসিপ্যাল) ও ব্যারাকপুর (মিউনিসিপ্যাল)। বাকি দুটো নগরকেন্দ্রিক নির্বাচনী এলাকা হল ২৪ পরগণা (মিউনিসিপ্যাল) ও ঢাকা (মিউনিসিপ্যাল)। দেখুন ফ্রানসাইজ, ইলেকশনস্ ইন বেঙ্গল, আইওএলআর এল/পি এবং জে/৮/৪৭৫।

১০৩. শীলা সেন, *মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল, ১৯৩৭-১৯৪৭*, নিউ দিল্লী, ১৯৭৭, পৃ. ৭৪-৭৫।

১০৪. *দি স্টেটস্‌ম্যান*, ২রা জুন, ১৯৩৬।

১০৫. কাজী আহমদ কামাল, *পলিটিসিয়ানস্ এ্যান্ড ইনসাইড স্টোরিজ*, পৃ. ১৯।

১০৬. *দি স্টেটস্‌ম্যান*, ১৩ই জুলাই, ১৯৩৬।

১০৭. ফজলুল হক কখনও জিন্নাহকে তাঁর জনপ্রিয় উপাধি 'কায়েদে আজম' নামে ডাকেননি। কাজী আহমদ কামাল, *পলিটিসিয়ানস্ এ্যান্ড ইনসাইড স্টোরিজ*, পৃ. ১৮।

১০৮. শীলা সেন, *মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল*, পৃ. ৮১।

১০৯. চট্টগ্রাম ডিভিশনাল কমিশনারের রিপোর্ট, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৫৬/৩৬, এলওএফসিআর, জুন মাসের প্রথম ফোর্টনাইট, ১৯৩৬।

১১০. পি. ডি. মার্টিন মেমোয়ার্স, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর ডি/১৮০/১৩।

১১১. ঢাকা ডিভিশনাল কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম পক্ষ, ১৯৩৬, জিবি এইচসিপি বি ফাইল নং ৫৬/৩৬।

১১২. চট্টগ্রাম ডিভিশনাল কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় পক্ষ, ১৯৩৬, *প্রাগুক্ত*।

১১৩. *দি স্টেটস্‌ম্যান*, ২৬শে মে ১৯৩৬।

১১৪. হুমাইরা মোমেন, *মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল*, পৃ. ৪৮।

১১৫. লেখক কর্তৃক নিখিল চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার, নিউ দিল্লী, ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯। মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিমের সেক্রেটারি হিসেবে নিখিল চক্রবর্তী কাজ করেন। সে-কারণে তিনি ভালভাবে সোহরাওয়ার্দীকে জানতেন।

১১৬. এস. রহমতউল্লাহ মেমোয়ার্স, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর ডি/১৮০/১৪ক।

১১৭. পটুয়াখালীর দাঙ্গার আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন পার্থ চ্যাটার্জী, এ্যাগ্রেরিয়ান রিলেশনস্ এ্যান্ড কমিউনালিজম ইন বেঙ্গল, *১৯২৬-১৯৩৫*, রনজিত গুহ (সম্পাদিত), *সাবলটার্ন স্টাডিজ* ১, দিল্লী, ১৯৮২, পৃ. ২২-২৪; তনিকা সরকার, *বেঙ্গল ১৯২৮-৩২: দি পলিটিক্স অব প্রোটেস্ট*, পৃ. ২৫-২৬; সুরঞ্জন দাশ, *কমিউনাল রায়টস্ ইন বেঙ্গল*, পৃ. ১৮১-১৮২।

১১৮. কাজী আহমদ কামাল, *পলিটিসিয়ানস্ এ্যান্ড ইনসাইড স্টোরিজ*, পৃ. ১১৮-১২০।

১১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০।

১২০. 'ফ্রানসাইজ, ইলেকশনস্ ইন বেঙ্গল, ১৯৩৬-৩৭', আইওএলআর এল/পি এবং জে/৭/১১৪২।

১২১. কাজী আহমদ কামাল, *পলিটিসিয়ানস্ এ্যান্ড ইনসাইড স্টোরিজ*, পৃ. ২০-২১।

১২২. *প্রাগুক্ত*।

১২৩. সুগত বসু, 'দি রুটস্ অব কমিউনাল ভাইয়োলেন্স ইন রুরাল বেঙ্গল– এ স্টাডি অব দি কিশোরগঞ্জ রায়টস্, ১৯৩০', *মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ*, ১৬, ৩, ১৯৮২, পৃ. ৪৯১। অতি সম্প্রতি সুরঞ্জন দাশ যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন যে, 'মুসলমান জনগণের সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় পরিচিতি, বলতে গেলে দেখামাত্রই সনাক্ত করা যায়' আর 'এতে মুসলমান সমাজের শীর্ষ

স্থানীয়দের সংযুক্তি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির সম্ভাবনা (লেখকের নিজস্ব) জিইয়ে রাখে'। সুরঞ্জন দাশ, 'কমিউনাল রায়টস্ ইন বেঙ্গল', পৃ. ২৫-৩৪।

১২৪. *প্রাগুক্ত*, ৪৬৮-৪৬৯।

১২৫. তাজুল ইসলাম হাশমী বলেন যে, বিশ শতকের মধ্য ভাগ থেকে 'মুসলমান কৃষকদের সাম্প্রদায়িক সংহতি শ্রেণী সংহতির চেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে'। তাজুল ইসলাম হাশমী, 'দি কমিউনালাইজেশন অব ক্লাস স্ট্রাগল: ইস্ট বেঙ্গল পিজ্যান্ট্রি, ১৯২৩-২৯, *ইন্ডিয়ান ইকনমিক এ্যান্ড সোসাল হিস্ট্রি রিভিউ*, ২৫, (১৯৮৮), পৃ. ৮৯।

১২৬. পার্থ চ্যাটার্জী বলেন যে, 'কৃষকদের আত্ম-সচেতনতার বৈশিষ্ট্যই হল ধর্মীয়', দেখুন তাঁর 'এ্যাগ্রেরিয়ান রিলেশনস এ্যান্ড কমিউনালিজম', পৃ. ১১, ৩১।

১২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২।

১২৮. সুগত বসু, *দি কিশোরগঞ্জ রায়টস্*, পৃ. ৪৬৩।

১২৯. বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলি ইলেকশন রেজাল্টস, ১৯৩৬, আইওএলআর এল/পি এবং জে/৭/১১৪২।

১৩০. ঢাকা ডিভিশনাল কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় পক্ষ, ১৯৩৬, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৫৬/৩৬।

১৩১. এঁরা হল মুকুলেশ্বর রহমান, কামিনী কুমার দত্ত এবং আবদুল মালেক – ব্রিটিশ বিরোধী 'রাজদ্রোহী' কাজের সাথে তাঁরা দীর্ঘদিন থেকে জড়িত ছিলেন। টিপেরা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩১, জিবি হোম পল ফাইল নং ৮৪৯/৩১ (১-৯)।

১৩২. চট্টগ্রাম ডিভিশনাল কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, জুন মাসের প্রথম ফোর্টনাইট, ১৯৩৬ এবং জুলাই মাসের প্রথম ফোর্টনাইট, ১৯৩৬, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৫৬/৩৬।

১৩৩. বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলি, ইলেকশন রেজাল্টস ১৯৩৬, আইওএলআর এল/পি এবং জে/১১৪২।

১৩৪. বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সচিব ১৯২৯ সালে লেখেন যে, 'অধিকাংশ সদস্যই শহরে থাকেন ... জেলা কংগ্রেস কমিটির কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলো জেলা শহরে অবস্থিত'। কিরণ শংকর রায় থেকে মতিলাল নেহেরুর কাছে, ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯। এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং পি-২৪/১৯২৯।

১৩৫. বাহ্যত সবাই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত – জেলা কংগ্রেস কমিটি ও বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মধ্যে অধিকাংশ পত্র যোগাযোগ হত ইংরেজি ভাষায়।

১৩৬. সুরেন্দ্র মোহন ঘোষের সাথে সাক্ষাৎকার, এনএমএমএল, ওরাল ট্রান্সক্রিপ্ট, নং ৩০১, পৃ. ১-১০, ১৯৪।

১৩৭. তনিকা সরকার, *বেঙ্গল ১৯২৮-১৯৩৪*, পৃ. ৩০-৩১।

১৩৮. সুরেন্দ্র মোহন ঘোষের সাথে সাক্ষাৎকার, এনএমএমএল ওরাল ট্রান্সক্রিপ্ট নং ৩০১, পৃ. ১২০, ১২৫। তারকেশ্বর সত্যগ্রহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন রজত কান্ত রায়, *সোস্যাল কনফ্লিক্ট এ্যান্ড পলিটিক্যাল আনরেস্ট ইন বেঙ্গল*, পৃ ৩৩৩-৩৩৪ এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও অন্যান্য, *সত্যগ্রহজ ইন বেঙ্গল ১৯২১-১৯৩৯*, কোলকাতা, ১৯৭৭।

১৩৯. সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, *ভারতের সাম্যবাদ*, কোলকাতা, ১৯৩০।

১৪০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫।

১৪১. রজত কান্ত রায়, *সোস্যাল কনফ্লিক্ট এ্যান্ড পলিটিক্যাল আনরেস্ট ইন বেঙ্গল*, পৃ. ২১২। আরও দেখুন বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, 'পিজান্টস্ এ্যান্ড দা বেঙ্গল কংগ্রেস, ১৯২৮-৩৮', *সাউথ এশিয়া রিসার্চ*, ভলিউম ৫, ১, মে, ১৯৮৫, পৃ. ৩২।

১৪২. *অমৃত বাজার পত্রিকা*, ১০ই আগস্ট ১৯২৮। আরও উদ্ধৃত হয়েছে, পার্থ চ্যাটার্জী, *বেঙ্গল ১৯২০-১৯৪৭*, পৃ. ৮১।

১৪৩. *প্রসিডিংস অব দি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল*, ৩রা এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯২৮, পৃ. ৮২৩-৮২৪, ৯২৭-৯২৮। আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন গৌতম চট্টোপাধ্যায়, *বেঙ্গল ইলেক্টোরাল পলিটিক্স এ্যান্ড ফ্রিডম স্ট্রাগল, ১৮৬২-১৯৪৭*, নিউ দিল্লী, ১৯৮৪, পৃ. ১০৪-১১৫, এবং পার্থ চ্যাটার্জী, *বেঙ্গল, ১৯২০-১৯৪৭*, পৃ. ৮৭-৯৫।

১৪৪. ভূমি হস্তান্তর বিষয়ে গবেষণা শেষে সৌগত মুখার্জী মন্তব্য করেন যে, 'বিভিন্ন দৃষ্টান্ত থেকে এটা মনে হয় যে, পুরনো মধ্যবর্তী রায়তি স্বত্বাধিকারীরা ভূমির স্বত্ব বিক্রি করে দেওয়াকে অধিক লাভজনক মনে করে।' দেখুন তাঁর 'এ্যাগ্রেরিয়ান ক্লাস ফরমেশন ইন মডার্ন বেঙ্গল', পিই-১৩। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন শহরের ভদ্রলোক।

১৪৫. জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৮৭৩/৩৩।

১৪৬. প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় পক্ষ, ১৯৩৬, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৫৬/৩৬।

১৪৭. বর্ধমান ডিভিশন কমিশনারের রিপোর্ট. এলওএফসিআর, ডিসেম্বর মাসের প্রথম পক্ষ, ১৯৩৭, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ১০/৩৭।

১৪৮. জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৭৫২/৩৬।

১৪৯. জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ২৮১/৩৬।

১৫০. নোয়াখালী ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট। এলওএফসিআর, মে মাসের প্রথম পক্ষ, ১৯৩৭, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ১০/৩৭।

১৫১. চট্টগ্রাম ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, মে মাসের দ্বিতীয় পক্ষ, ১৯৩৬, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৫৬/৩৬। রাজশাহী জেলার নন্দীগ্রাম থানায় একটা ঘটনা ঘটে: 'প্রকাশ্য দিবালোকে একজন (হিন্দু) মহাজন ঐ এলাকায় খুন হয়।' স্থানীয় প্রশাসন ঐ খুনের ঘটনাকে সংশ্লিষ্ট করে 'মহাজনের পাওনা পরিশোধ না করার আন্দোলনের সাথে ... নির্বাচনী প্রচারণায় যুক্ত লোকেরা এর পেছনে আছে।' চট্টগ্রাম ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, মে মাসের দ্বিতীয় ফোর্টনাইট, ১৯৩৬, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৫৬/৩৬।

১৫২. দেখুন তনিকা সরকার, 'কমিউনাল রায়টস্ ইন বেঙ্গল'; পার্থ চ্যাটার্জী, 'এ্যাগ্রেরিয়ান রিলেশনস্ এ্যান্ড কমিউনালিজম ইন বেঙ্গল'; সুরঞ্জন দাশ, 'কমিউনাল রায়টস্ ইন বেঙ্গল'।

১৫৩. সুরঞ্জন দাশ দেখিয়েছেন যে, পল্লি এলাকার দাঙ্গার এ ধরনের কারণ হল অর্থনৈতিক বিরোধ। উত্তেজিত জনতার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল সাধারণভাবে সম্পত্তি ও ঋণপত্রের

দলিল – মূর্তি বা মন্দির নয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সুদ ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের আক্রমণ করা হয়েছে। *প্রাগুক্ত*।

১৫৪. লক্ষ্মীকান্ত কীর্তনীয়া ও কুমুদ ভট্টাচার্য, *গানের বহি, লুটের গান*, ময়মনসিংহ, ১৯৩০।

১৫৫. ঐ ঘটনার পুরোটাই বর্ণনা করেন সুরঞ্জন দাস, 'কমিউনাল রায়টস্ ইন বেঙ্গল'। ১৯৩০ সালের কিশোরগঞ্জ দাঙ্গার ঘটনায় একজন জমিদার নিহত হয় এবং এ ধরনের ঘটনা মাত্র একটাই।

১৫৬. দালান বাড়ি ও নতুন কেনা মোটরগাড়ির ওপর বিশেষভাবে উন্মত্ত জনতার রোষ আপতিত হয় বলে মনে হয়।

১৫৭. *গানের বহি, লুটের গান*, তৃতীয় গান।

১৫৮. তনিকা সরকার, *বেঙ্গল, ১৯২৮-১৯৩৪*, পৃ. ৪০।

১৫৯. স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরা খাজনা বন্ধ করাকে উৎসাহিত করেছে, কিছু কিছু এলাকায় এমন ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটেছে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এলাকাগত পার্টি নেতৃত্বে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের প্রেক্ষাপটে বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ঐ ধরনের আন্দোলন সমর্থন করে। হুগলী জমিদারের বিরুদ্ধে স্থানীয় গান্ধীবাদী কর্মীদের আরামবাগ আন্দোলনের কথা দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে – এ বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন হিতেশ রঞ্জন সান্যাল। ঐ জমিদার ছিলেন একজন নামকরা কংগ্রেসের নেতা তুলসী চরণ গোস্বামী, কিন্তু তিনি ছিলেন কংগ্রেসের অন্য শিবিরের নেতা। হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ থেকে গোস্বামীকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। এর পরপরই শ্রেণী সংগ্রামে রূপ লাভ করার আগেই ঐ আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়। দেখুন হিতেশ রঞ্জন সান্যাল, 'ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট ইন আরামবাগ,' *অন্য অর্থ*, সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ এবং বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, 'পিজান্টস্ এ্যান্ড দি বেঙ্গল কংগ্রেস', ১৯২৯-৩৮', পৃ. ৩৫-৩৬।

১৬০. *দি হিস্ট্রি অব দি নন-কোঅপারেশন এ্যান্ড খিলাফত মুভমেন্টস্ ইন বেঙ্গল*, জিবি এইচসিপিবি, ফাইল ৩৯৫/১৯২৪।

১৬১. স্বপন দাশগুপ্ত, 'আদিবাসী পলিটিক্স ইন মেদিনীপুর', বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, 'পিজান্টস্ এ্যান্ড দি বেঙ্গল কংগ্রেস', পৃ. ৩২।

১৬২. ১৯৩৬ সালের প্রথম দিকে জে. বি. কৃপালনী বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করেন যে, 'পাঞ্জাব ও বাঙলা ছাড়া অফিসের দায়িত্বভার গ্রহণের পক্ষে জনমত ছিল প্রবল।' রাজেন্দ্র প্রসাদের কাছে জে. বি. কৃপালনীর লিখিত পত্র, ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬; অন্তর্ভুক্ত বি. এন. পাণ্ডে, *দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট: সিলেক্ট ডকুমেন্টস্*, পৃ. ৯৮।

১৬৩. *দি স্টেটস্‌ম্যান*, ১২ই জুন ১৯৩৬। চট্টগ্রাম অস্ত্র লুণ্ঠন মামলার একজন আসামী কল্পনা দত্ত কমিউনিজমে দীক্ষিত হন। দেখুন, তাঁর *চট্টগ্রাম আর্মারী রেইডার্স রেমিনিসেন্স*। আরও দেখুন, ডেভিড এম লাউসে, *বেঙ্গল টেরোরিজম এ্যান্ড দি মার্কসিস্ট লেফট – এ্যাসপেক্টস অব রিজিওনাল ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়া*, ১৯০৫-১৯৪২, কোলকাতা, ১৯৭৩।

১৬৪. বেঙ্গল গভর্নরের ফোর্টনাইটলি রিপোর্ট (এফ আর) প্রথম পক্ষ, জুন ১৯৩৬, জিওআই, হোম, পল ফাইল নং ৭/১১/৩৬, এনএআই।

১৬৫. হ্যালেটের কাছে লিখিত ব্লান্ডির রিপোর্ট, ৩১শে আগস্ট ১৯৩৬, জিওআই, হোম পল ফাইল নং ৬/৭/৩৬। জুলাই মাসে বেঙ্গল প্রশাসন রিপোর্ট করে যে, 'পুলিশ কমিশনার তথ্য সংগ্রহ করেছেন, ৮৫টি মিটিং-এ কমিউনিস্ট পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং কমিউনিজমের পক্ষে বক্তৃতা দেওয়া হয়। ১৯৩৬ সালের ২রা এপ্রিল থেকে ২৮শে জুন মোট ৮৭ দিনে এসব মিটিং কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়।' টুইনহাম থেকে হ্যালেট, ২৬শে জুলাই, ১৯৩৬; জিওআই, হোম পল, ফাইল নং ৭/১১/৩৬।

১৬৬. ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৩১; জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৮৪৯/৩১, ক্রমিক নং ১-৯।

১৬৭. *প্রাগুক্ত*।

১৬৮. *প্রাগুক্ত*।

১৬৯. সুগত বসু, *এ্যাগ্রেরিয়ান বেঙ্গল*, পৃ. ১৮৩।

১৭০. 'শান্তি রক্ষী সমিতি'র অনারারি সেক্রেটারি ড. এ. বি. দত্তের কাছ থেকে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের পলিটিক্যাল সেক্রেটারির কাছে, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৩১; জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৮৪৯/৩১ (১-৯)।

১৭১. জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৯৫/৩৭।

১৭২. আশরাফউদ্দিনের জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত বিবরণের জন্য দেখুন, জালালউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, *রাজ বিরোধী আশরাফউদ্দিন আহমদ চৌধুরী*, ঢাকা, ১৯৭৮।

১৭৩. জিবি এইচসিপিবি, ফাইল নং ৯৫/৩৭।

১৭৪. চট্টগ্রাম ডিভিশন কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, জুন মাসের প্রথম ফোর্টনাইট, ১৯৩৬, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৫৬/৩৬।

১৭৫. *প্রাগুক্ত*।

১৭৬. *প্রাগুক্ত*, দ্বিতীয় পক্ষ, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬।

১৭৭. *প্রাগুক্ত*, প্রথম পক্ষ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬।

১৭৮. 'নওয়াব ফারুকীর কেরামতি' এবং 'ফারুকী সাহেবের চালবাজী' শিরোনামে দুটো পুস্তিকা লেখা ও প্রচারের জন্য তাদের দু'জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৯৫/৩৭।

১৭৯. চট্টগ্রাম ডিভিশনের কমিশানরের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, এপ্রিল ১৯৩৬, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৫৬/৩৬।

১৮০. প্রাগুক্ত, প্রথম পক্ষ, জুলাই ১৯৩৬।

১৮১. *বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলি*, ইলেকশন রেজাল্টস্, ১৯৩৬-৩৭, আইওএলআর এল/পি এবং জে/৭/১১৪২।

১৮২. এআইসিসিসি পেপারস্, ফাইল নং ই-৫/১৯৩৬-৩৭।

১৮৩. *বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলি*, ইলেকশন রেজাল্টস্, ১৯৩৬-৩৭. আইওএলআর এল/পি এবং জে/৭/১১৪২।

১৮৪. ঢাকা ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, মে ১৯৩৬, এইচসিপিবি ফাইল নং ৫৬/৩৬।

১৮৫. বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, ডিসেম্বর, ১৯৩৬, প্রাগুক্ত।

১৮৬. গভর্নরের রিপোর্ট, ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসের দ্বিতীয় ফোর্টনাইট, আইওএলআর এল/পি এবং জে/১৯৩৩; উদ্ধৃত, বিদ্যুৎ চক্রবর্তী', 'পিজান্টস এ্যান্ড দি বেঙ্গল কংগ্রেস', পৃ. ৩৪।

১৮৭. বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, জুন ১৯৩৬, জিবি এফসিপিবি ফাইল নং ৫৬/৩৬।

১৮৮. গভর্নরের পাক্ষিক রিপোর্ট, প্রথম পক্ষ, জানুয়ারি ১৯৩৭, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ১০/৩৭।

১৮৯. কুমিল্লার কামিনী বাবু 'স্বতন্ত্র' প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন; বেতুরের জগদীশ পালিত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করেননি। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলি, ইলেকশন রেজাল্টস্, ১৯৩৬-৩৭। আইওএলআর এল/পি এবং জে/৭/১১৪২।

১৯০. প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, নভেম্বর ১৯৩৬, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৫৬/৩৬।

১৯১. যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে বিধানচন্দ্র রায়, ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৪। বি. সি. রায় পেপারস্, অংশ ২, ৩৬ (অংশ-১)/১৯৩৪, এনএমএমএল।

১৯২. প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, অক্টোবর ১৯৩৬, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৫৬/৩৬।

১৯৩. মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট, *প্রাগুক্ত*।

১৯৪. রায় জয়লাভ করেন ঝাড়গ্রাম-ঘাটাল থেকে, আর রাজা জয়লাভ করেন মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় নির্বাচনী এলাকা থেকে।

১৯৫. তাঁরা হলেন প্রমথনাথ ব্যানার্জী, শরৎচন্দ্র বসু, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সুভাষ বসু, যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, জে. এম. দাশগুপ্ত, যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, প্রভুদয়াল হিমাত সিংহ, দেবেন্দ্রলাল খান, মন্মথনাথ রায়, কিরণ শংকর রায়, নলিনী রঞ্জন সরকার, বিধানচন্দ্র রায় এবং নগেন্দ্রনাথ সেন।

১৯৬. বিজয়ী আসনগুলোর মধ্যে ২৮টি আসন ছিল 'সাধারণ' অথবা বর্ণ হিন্দু নির্বাচনী এলাকার। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলি, ইলেকশন রেজাল্টস্, ১৯৩৬-৩৭। আইওএলআর এল/পি এবং জে/৭/১১৪২।

তৃতীয় অধ্যায়

বেঙ্গল কংগ্রেসের পরিচিতি সংকট

'প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের' যুগকে পণ্ডিতগণ তীব্রতর সাম্প্রদায়িক চেতনার যুগ বলে স্বীকার করতে শুরু করেন। এ সময়ে সংঘবদ্ধ রাজনীতি সম্প্রদায়-ভিত্তিক ধারায় ক্রমবর্ধমান হারে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে যে ৬টি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে কংগ্রেস সরকার পরিচালনা করে, বলা হয়ে থাকে যে, মুসলমানদের দৃষ্টিতে ঐ ৬টি প্রদেশে 'হিন্দু রাজ'-এর অশরীরী মূর্তি কংগ্রেস নীতিতে স্ফীত হয়।[১] বাঙলায় হিন্দুরা যথেষ্ট সংখ্যায় থাকলেও তারা ছিল উচ্চকণ্ঠ সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রয়োগে বড়জোর কনিষ্ঠ অংশীদার; ফলে এখানকার পরিস্থিতি একটি ভিন্ন দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু এখানেও সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভক্তি সম্প্রদায়গত ধারায় অনমনীয় হয়ে ওঠে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে বাঙলায় চার বার মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং প্রতিটি মন্ত্রিসভাই বিভিন্ন রাজনৈতিক স্বার্থের মধ্যে একটা স্থায়ী সমঝোতা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু ১৯৪৫ সাল নাগাদ ব্রিটিশ শাসন সমাপ্তি নিয়ে গভীরভাবে দেন-দরবার শুরু হলে বাঙলার রাজনীতিকদের মধ্যে সমঝোতার মনোভাব প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না। এ সময়ের কয়েকটি বছর ছিল খুবই জটিল – দল-উপদলগুলো ছিল বহুধাবিভক্ত, তারা দ্রুত পক্ষ বদল করছিল বা নতুন করে সংঘবদ্ধ হচ্ছিল। এ অধ্যায়ে ঐ সময়ে নেয়া রাজনৈতিক কৌশলের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়নি, বরং যেসব পরিবর্তন ও জোটবদ্ধতার কারণে রাজনীতি গভীরভাবে সাম্প্রদায়িক আবর্তে পতিত হয়েছিল সে-সবকে চিহ্নিত করতে বেঙ্গল কংগ্রেসের প্রধান প্রধান প্রবণতার প্রতি এখানে আলোকপাত করা হয়েছে।

কংগ্রেস এবং 'বাম' উদ্যোগ

কৃষক প্রজা ও মুসলিম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার প্রধান হিসেবে ফজলুল হক বাঙলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল (এপ্রিল-ফুল করার দিনে) শপথ গ্রহণ করেন। ৫২টি আসন[২] নিয়ে কংগ্রেস নতুন আইন সভায় ছিল একক বৃহত্তম ও প্রধান বিরোধী দল। মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি নির্বাচনে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। তাই কৃষক প্রজার অংশীদার হিসেবে হক সাহেব হয়ত কংগ্রেসকে অগ্রাধিকার দিতেন। সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা পার্টির মধ্যে একটা অনানুষ্ঠানিক

সমঝোতা হয়েছিল। এ কারণে কংগ্রেস কোনো মুসলমান আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি এবং স্থানীয় পর্যায়ে কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী প্রচারণায় কংগ্রেস সমর্থন দেয়। কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী কর্মসূচিতে রাজবন্দিদের মুক্তি দেওয়ার অঙ্গীকার কংগ্রেসের উদ্দেশে দেওয়া সমঝোতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কোয়ালিশন সরকারের কর্মসূচি নিয়ে ঐকমত্যে উপনীত হতে ব্যর্থ হওয়ায় কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা পার্টির মধ্যকার সমঝোতা ভেঙে যায়। কংগ্রেস মুখপাত্র (শরৎ বসু, বিধানচন্দ্র রায় ও কিরণ শংকর রায়সহ) চান যে রাজবন্দিদের মুক্তির বিষয়টি অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত; এই ইস্যুতে প্রয়োজন হলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অন্য দিকে, কৃষক প্রজা পার্টির নেতারা মনে করেন যে, কৃষকের কল্যাণই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা বলেন যে, রাজবন্দিদের মুক্তির প্রশ্নে পদত্যাগের অঙ্গীকার কৃষকের কল্যাণের বিষয়টিকে অনিশ্চিত করতে পারে।[৩] এর ফলে কংগ্রেস নেতারা কোয়ালিশন সরকারে আদৌ যোগদান করবে কি করবে না সে-বিষয়ে ইতস্তত করতে থাকে। ফজলুল হক সক্রিয় বা মৌন সমর্থন দেওয়ার জন্য তাদের কাছে 'বারবার অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন ... শেষে তিনি মুসলিম লীগের বাহুর মধ্যে যেতে বাধ্য হন।'[৪]

মুসলমান মন্ত্রীরা প্রথমে লীগ-প্রজা কোয়ালিশনে এবং পরে মুসলিম লীগের মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করে আইন সভার মাধ্যমে একের পর এক এমন-সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যা ভদ্রলোক সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে মুসলমান স্বার্থকে রক্ষা করার শামিল। কিন্তু আইন সভার আঘাত প্রতিহত করার ব্যাপারে বিরোধী দল কংগ্রেস ছিল ক্ষমতাহীন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে পল্লি এলাকার বিরাট সংখ্যক প্রতিনিধি আইন সভায় নির্বাচিত হন। তাঁদের মধ্যে অনেকে জমিদার ও তালুকদার থাকলেও অনেকে ছিলেন নতুন ঘরানার রাজনীতিবিদ। মফস্বল এলাকায় তাঁদের জন্ম এবং সেখানেই তাঁরা লালিত-পালিত। তাঁদের রাজনৈতিক হাতেখড়ি হয় ইউনিয়ন ও জেলা বোর্ডে, আবার অনেকে ছিলেন স্থানীয় কৃষক সমিতির সদস্য – তাঁরা কৃষক ও জোতদারের পক্ষে সরব ছিলেন।[৫] তাঁদের স্বঘোষিত নেতা ফজলুল হক প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নে বাধ্য ছিলেন। বেঙ্গল প্রজাস্বত্ব (সংশোধিত) বিল উত্থাপন করা হয় ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।[৬] ঐ বিলে জমিদারদের সালামি (জমিদারের হস্তান্তর ফি) আদায় ও অগ্রক্রয়ের অধিকার বাতিল করার প্রস্তাব করা হয়। প্রজারা তাদের জমি স্বাধীনভাবে ভাগ করা ও হস্তান্তর করার অধিকার পায়। এর ফলে ঐ বিলে জমিদারদের রায়ত পছন্দ করার অধিকার বা নিজের এস্টেটগুলোতে রায়তদের অধিক সংখ্যায় বসবাস করার প্রয়াসকে বন্ধ করার অধিকারকে অস্বীকার করা হয়। এরপর জমিদারের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ বা বাধা ছাড়াই রায়তেরা তাদের জমির পরিমাণ বাড়াবার ও যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসার অধিকারী হয় – নিজের এস্টেটে রায়তদের ওপর প্রভাব খাটাতে জমিদারের আর আইনগত অধিকার ছিল না। সার্টিফিকেট পদ্ধতির মাধ্যমে জমিদারদের খাজনা আদায়ের ক্ষমতা ঐ বিলে বাতিল করার কথা বলা হয়। বাকি খাজনার ওপর আরোপিত সুদের পরিমাণ অর্ধেক কমানো ও দশ বছরের জন্য খাজনা বৃদ্ধির সর্বোচ্চ

মাত্রা বেঁধে দেয়ার কথাও ঐ বিলে বলা হয়।[৭] প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারদের ক্ষমতাকে ঐ বিলে সম্পূর্ণরূপে বাধাগ্রস্ত করা হয়। ঐ বিলে মফস্বল এলাকায় জমিদারদের ক্ষমতা ও সমৃদ্ধিকে অবমূল্যায়ন করা হয় এবং একই সাথে ধনী কৃষকদের হাতকে শক্তিশালী করা হয়। অধিকাংশ জমিদার ছিল হিন্দু ভদ্রলোক। ফলে পল্লি এলাকায় হিন্দু কর্তৃত্বের ওপর ঐ বিলকে সুপরিকল্পিত চ্যালেঞ্জ হিসেবে গণ্য করা হয়। হিন্দু জমিদারেরা এই বিলকে সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা, বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে 'সম্পূর্ণ বিপ্লবাত্মক'[৮] আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করে। তারা ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করে যে, এই বিল দেশে 'বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি করে বিপর্যয়' ডেকে আনবে।[৯]

পরবর্তী আঘাত আসে কৃষিপণ্য ও অন্যান্য জিনিস বিক্রয়ের স্থানীয় বাজার বা জমিদারি হাটের ওপর, এগুলো ছিল জমিদারদের আয়ের একটা প্রধান উৎস। ১৯৩৯ সালে মন্ত্রিসভার আলোচনায় আসে –

> কৃষিজাত পণ্যের জন্য সরকারি হাট প্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে হাট প্রতিষ্ঠার জন্য লাইসেন্স প্রদানের প্রসঙ্গে একটি বিল। এটা একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা এবং এর পেছনে মুসলমানদের জোর সমর্থন আছে। যদিও হিন্দু জমিদার মন্ত্রীরা এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ যে, ঐ ব্যবস্থার সত্যিকার উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা অথবা পরোক্ষ উপায়ে ব্যক্তিগত জমির মালিকদের বাজারগুলো নষ্ট করা।[১০]

মন্ত্রিসভা ১৯৩৫ সালের বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ডেটরস্ এ্যাক্ট-এর (Bengal Agricultural Debtors Act of 1935) আশু বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সরকার গঠনের এক বছরের মধ্যে তারা তিন হাজার গ্রামে 'ঋণ সালিশি বোর্ড' গঠন করে।[১১] এসব বোর্ড গঠনের উদ্দেশ্য ছিল একটা ফোরাম গঠন করা, যেখানে সুদ ব্যবসায়ীরা খাতকদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে পারে। কিন্তু এই বোর্ড আসলে খাতকদের ঋণ পরিশোধ না করতে উৎসাহ যোগায়। এর ফলে ঋণ ব্যবস্থা মারাত্মক সংকটে পতিত হয় – ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নে তা কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি।[১২] ১৯৪০ সালে বেঙ্গল মানিলেন্ডার্স এ্যাক্ট (Bengal Moneylenders Act)-এ অর্থলগ্নী ব্যবসায়ে নিয়োজিত ব্যক্তিদের লাইসেন্স গ্রহণকে বাধ্যতামূলক করা হয় এবং সর্বোচ্চ সুদের হার শতকরা ৮ ভাগ নির্ধারণ করা হয়। সুদ ব্যবসার কর্তৃত্বে ছিল হিন্দু পেশাগত মহাজন, বেনিয়া, দোকানদার ও ভূমির মালিকেরা – দীর্ঘদিন ধরে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ তাদের কাছে একটা আকর্ষণীয় ব্যবসা ছিল, কিন্তু ঐ আইন তাদেরকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

এসব ব্যবস্থায় মুসলমান জমিদারদের স্বার্থও ক্ষতিগ্রস্ত হয় – ঢাকার নওয়াবদের পরিবার পরিজনদের ১১ জন জমিদার আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব করেন।[১৩] মুসলিম লীগের নাজিমুদ্দিন ও তাঁর জমিদার বন্ধুরা প্রস্তাবিত আইন থেকে তাঁদের স্বার্থবিরোধী বিষয়গুলো বাদ দেওয়ার জন্য খুবই সচেষ্ট হন এবং এ ক্ষেত্রে তাঁরা কিছুটা সফল হন। গভর্নর উল্লেখ করেন যে, ১৯৪০ সালের বেঙ্গল মানিলেন্ডার বিলের চূড়ান্ত রূপ ছিল প্রস্তাবটির প্রথম অবস্থার প্রতিচ্ছায়া। তিনি বলেন:

> সুদের টাকা খাটানোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকারি বিল উত্থাপনের মাধ্যমে এর শুরু। সেটি দলীয় চাপে পরিবর্তিত হয়ে সুদ ব্যবসায়ীদের পাওনা মারাত্মকভাবে হ্রাস করার জন্য একটি বিলে পরিণত হয়। সিলেক্ট কমিটি থেকে সেটা যে চেহারা নিয়ে বেরিয়ে আসে তাতে এর কার্যকারিতা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এ বিলের জন্য সোহরাওয়ার্দী দায়ী না থাকলেও তিনি তাঁর সহকর্মীদের সাথে একটা বিশেষ ব্যবস্থায় কর্তৃত্ব তুলে নেন এবং বিতর্ককালে ... ব্যাপকভাবে এর উন্নয়ন করতে সমর্থ হন – অংশত এই আইন যেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না সেগুলি বাড়িয়ে এবং অংশত এর বিভিন্ন ধারার সংশোধন করে।[১৪]

কিন্তু জমিদার বিরোধী আইন প্রণয়নের উচ্ছ্বাসকে বন্ধ করতে মুসলিম লীগের মন্ত্রীরা ব্যর্থ হন। 'আইনগত ও প্রশাসনিক সুবিধার বিনিময়ে তারা, সন্দেহ নেই, নিজেদের সমর্থনে জনগণকে সাথে রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।'[১৫] গভর্নরদের প্রায় হতাশ করে দিয়ে কোয়ালিশন সরকারের মুসলিম লীগ মন্ত্রীরা 'বিভিন্ন রকম আশ্বাস দিয়ে কৃষকদের কাছে জনপ্রিয় হওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁরা জানতেন, ঐসব আশ্বাস পূরণ করা অসম্ভব। তবু তাঁরা মনে করেন, এমন আশ্বাস না দিলে ভোটের প্রতিযোগিতায় তারা হেরে যাবেন।'[১৬] কৃষক প্রজা পার্টির সাথে মুসলিম লীগ এই সমঝোতায় ঐকমত্য পোষণ করে যে, জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার শর্তে তাঁরা জমিদারি পদ্ধতির বিলোপের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাকে সমর্থন করবেন।[১৭] ঢাকার নওয়াবদের মতো উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদেরকে তাদের এস্টেটের আর্থিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে পুরস্কার স্বরূপ বিভিন্ন পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু এ ধরনের রাজনৈতিক সুবিধা না থাকায় হিন্দু জমিদারেরা আরও আর্থিক ক্ষতির আশংকা করেন।

মফস্বল এলাকায়ও এই আইনগত মারাত্মক আক্রমণ বন্ধ ছিল না। মুসলিম কোয়ালিশন সরকারগুলো মধ্যবিত্ত মুসলমানদের জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদের নতুন রাজনৈতিক শক্তিকে ব্যবহার করে। মধ্যবিত্ত মুসলমানদের জন্য তারা 'প্রশাসনিক ও আইনগত সুবিধা প্রদান করে, যা প্রচ্ছন্নভাবে প্রায় ক্ষেত্রেই হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে'।[১৮] ১৯৩৮ সালে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা পুলিশ নিয়োগের আইন পরিবর্তন করে। ঐ পরিবর্তিত আইনে 'বাঙালি কনস্টেবল নিয়োগের ক্ষেত্রে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টকে নিশ্চিত করতে হয় যে, নিয়োগকৃত বাঙালি কনস্টেবলের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অবশ্যই মুসলমান।'[১৯] ঐ একই বছরে সরকার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আশা প্রকাশ করে যে, শতকরা ৬০ ভাগ সরকারি নিয়োগ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।[২০] ১৯৩৯ সালে সরকার স্থানীয় সংস্থাগুলোকে 'সরকারি নীতির সক্রিয় বিরোধী হিসেবে পরিচিত লোকদের স্থানীয় সংস্থায় নিয়োগ করার জন্য প্রস্তাব করতে নিষেধ করা হয়'; ইউনিয়ন বোর্ডের মনোনয়নের ক্ষেত্রেও তাদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ নেমে আসে – এই ইউনিয়ন বোর্ডগুলোতে মনোনীত সদস্য সংখ্যা ছিল এক-তৃতীয়াংশ।[২১] আবার, ১৯৩৯ সালের কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ভদ্রলোকদের ক্ষমতার প্রধান ঘাঁটি কোলকাতা করপোরেশনে হিন্দু কর্তৃত্বের অবসান ঘটে।[২২] কিন্তু সবচেয়ে নির্দয়

আঘাত আসে ১৯৪০ সালে – সরকার কর্তৃক মাধ্যমিক শিক্ষা বিল উত্থাপন করার মধ্য দিয়ে। ঐ বিলে প্রদেশের উচ্চ শিক্ষার কর্তৃত্ব কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে অর্পিত হয় ব্যাপকভাবে মুসলমান নিয়ন্ত্রিত সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ডের ওপর। উচ্চ শিক্ষা ভদ্রলোকদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির শুধু মূল ভিত্তি ছিল না, এটা ছিল তাদের একচেটিয়া পরিচিতির প্রতীক। তাঁদের এই অতি মূল্যবান সম্পদটির নিয়ন্ত্রণের ওপর খাঁড়া ঝুলিয়ে এই বিলে তাঁদের প্রধান অবলম্বন 'সাংস্কৃতিক প্রাধান্যকে' চ্যালেঞ্জ করা হয়, যে 'সাংস্কৃতিক প্রাধান্যটি' ছিল ভদ্রলোক সাম্প্রদায়িক আলোচনার (discourse) মূল অবলম্বন।

একের পর এক এ ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে কংগ্রেস খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। ত্রিশ দশকের প্রথম দিককার বিরোধ নির্বাচনের সময় সাময়িকভাবে কাগজে-কলমে মিটে গেলেও তা আবার ভিন্ন আঙ্গিকে দেখা দেয়। ১৯৩৬ সালের ওয়ার্কিং কমিটি ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে সমঝোতা হওয়ার পর শরৎ বসু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডা. বি. সি. রায়কে সামান্য ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ডের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[২৩] শরৎ বসু ছিলেন একজন জেদি ধরনের রাজনীতিক – তাঁর ক্ষমতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরাও অবহিত ছিলেন।[২৪] নির্বাচনে বেঙ্গল কংগ্রেসের মোটামুটি ভালো ফল নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তাঁর সহযোগিতা ছিল। তবে তিনি এ কথাও ভালো করে জানতেন যে, নির্বাচনে কংগ্রেস বিশেষ করে মফস্বল এলাকায় আরও ভালো করতে পারত। মফস্বল এলাকায় ১৭টি আসনের মধ্যে ৯টি আসনে কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং তারা পরাজিত হয় স্বতন্ত্র প্রার্থীদের কাছে।[২৫] কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা পার্টির মধ্যকার সমঝোতা ভেঙে গেলে এবং মুসলিম লীগের সাথে কৃষক প্রজা পার্টি কোয়ালিশন গঠন করলে বসু উপলব্ধি করেন যে, গ্রামাঞ্চলে কোনো মুসলিম আসনে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত ছিল নির্বুদ্ধিতা। নির্বাচনে এটা প্রমাণিত হয়েছে বলে তিনি মনে করেন যে, ভদ্রলোকদের সাথে সামান্য জোটবদ্ধ অবস্থায় থাকলেও কংগ্রেস বাঙালি রাজনীতির নেতৃত্ব কখনও ফিরে পাবে না। জনগণের রাজনীতির নতুন যুগে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে টিকে থাকতে হলে কংগ্রেসকে তার সমর্থনের ভিত্তিকে প্রসারিত করতে হবে এবং তার মরচে পড়া ধর্মনিরপেক্ষ পরিচিতিকে পুনরায় উজ্জ্বল করতে হবে।

বসুর এই অবস্থানে অবশ্য কিছুটা অসুবিধা ছিল। তিনি ছিলেন বিরোধী দলের নেতা এবং সরকার শুধু অধিকাংশ মুসলিম ভোটারের প্রতিনিধি নয়, কৃষকদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার কিছুটা দাবিও তাদের ছিল। তাছাড়া তিনি পূর্ণ মাত্রায় সচেতন ছিলেন যে, কংগ্রেসে তাঁর নিজের নেতৃত্ব ততটা সুদৃঢ় নয়; মুসলমান ও কৃষকদের সাথে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনেও তিনি ততটা সক্ষম হবেন না। এক দশক পূর্বে একই রকম সাম্প্রদায়িক অচলাবস্থা দূর করতে চিত্তরঞ্জন দাশের প্রয়াস বেঙ্গল কংগ্রেসে প্রত্যাখ্যাত হয়। হিন্দু ও মুসলমান রাজনীতিকদের মধ্যে সমঝোতার লক্ষ্যে দাশের চুক্তি দূরদর্শিতার পরিচায়ক হয়নি।[২৬] মোট কথা, শরৎ বসুর পছন্দের সুযোগও ছিল সীমিত। সাম্প্রতিককালে দলে যুবক সোসালিস্ট ও কমিউনিস্টদের অন্তর্ভুক্তির সুযোগ নিয়ে তিনি কংগ্রেসকে কিছুটা সস্তা

জনপ্রিয়তার জন্য বাম ধর্মনিরপেক্ষ ধারায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। হাউসে তাঁর কৌশল ছিল 'বাম দিক থেকে'[২৭] সরকারের বিরোধিতা করা, আর হাউসের বাইরে কংগ্রেসের পক্ষে 'জনগণে'র সমর্থন লাভের জন্য আন্দোলন পরিচালনা করা।

ত্রিশ দশকের শেষ দিকে কংগ্রেসের এই 'আমূল পরিবর্তন' সম্পর্কে পার্থ চ্যাটার্জী আলোকপাত করেছেন। এই পরিবর্তনের সাথে তিনি ব্যাপক আকারে বাঙলার আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের তুলনা করেছেন। চ্যাটার্জী বলেন যে, 'প্রদেশের ভূমি-সম্পর্কের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে, বিশেষ করে বিশ ও ত্রিশ দশকে অধিকাংশ জমিদারি ও রায়তি স্বত্বের ভূ-সম্পত্তি পুরোপুরি অলাভজনক হয়ে পড়ায় একটা বিরাট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্ভাবনার সৃষ্টি করে ... ভূ-সম্পত্তির সাথে তাদের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে। জীবনযাত্রায় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐ শ্রেণীর লোক ছিল প্রধানত শহরকেন্দ্রিক।'[২৮]

এই প্রক্রিয়া প্রথম শুরু হয় ত্রিশ দশকে। শহরের এই র‍্যাডিক্যাল বুদ্ধিজীবীরা ছিল বাঙলার জনজীবনকে জড়িয়ে থাকা বিভিন্ন উপাদানের বিভিন্ন দিকের একটি – স্বাধীনতার পর বাঙালি রাজনীতির পুনর্গঠনে এদেরকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। ভূ-সম্পত্তি থেকে শেকড় বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বেশ কিছু ভদ্রলোকের মধ্যে 'র‍্যাডিক্যাল' চিন্তা-চেতনা পরিপুষ্ট হয়; আবার তারও বেশি সংখ্যক ভদ্রলোককে প্রতিক্রিয়াশীল ও রাজনৈতিকভাবে রক্ষণশীল করে তোলে।[২৯] র‍্যাডিক্যাল ও রক্ষণশীলদের বিরোধে রক্ষণশীলদের সংখ্যা ছিল তুলনায় অনেক বেশি।

হক মন্ত্রিসভা গঠনের কয়েক মাসের মধ্যে বসু তাঁর অনুসারীদের ছোট ছোট গ্রুপকে সংঘবদ্ধ করেন। এসব অনুসারীদের মধ্যে ছিল বামপন্থী, ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এমন কংগ্রেস নেতা-কর্মী, ছাত্র ও কৃষক নেতা। তাঁর গ্রুপটি ছিল সরব কিন্তু তুলনামূলকভাবে ছোট, আর রক্ষণশীলেরা ছিলেন সংখ্যায় তাঁদের থেকে অনেক বেশি এবং তারা দলে তাদের প্রাধান্য বজায় রাখে। বাঁকুড়ার বাবু কমলকৃষ্ণ রায়কে বসু বেঙ্গল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত করেন। তিনি 'কৃষকদের স্বার্থের প্রতি সহানুভূতি'র জন্য পরিচিত ছিলেন।[৩০] বাবু কমলকৃষ্ণ রায় কুমিল্লার মুসলমান কৃষক নেতা আশরাফউদ্দিন আহমদ চৌধুরীকে তাঁর সচিব নিয়োগ করেন। জনাব আহমদকে কংগ্রেস পতাকাতলে ফিরিয়ে আনা হয়।[৩১] কয়েক বছর ধরে বেঙ্গল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নির্বাহী পদগুলো ছিল বামপন্থীদের দখলে। এতদ্‌সত্ত্বেও বেঙ্গল কংগ্রেসের সামাজিক ও সম্প্রদায়গত ভিত্তিকে আরও প্রসারিত করার জন্য তাদের প্রয়াস দলের অভ্যন্তর থেকেই বাধাপ্রাপ্ত হয়। শরৎ বসুর 'জনগণের সাথে যোগাযোগে'র আন্দোলন তাই কখনও কংগ্রেসের পুরোপুরি সমর্থন পায়নি।

তাই র‍্যাডিক্যাল কর্মসূচিতে গতানুগতিক বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী স্লোগান অন্তর্ভুক্ত করা হয় – এসব স্লোগানে সামাজিক পরিবর্তনের চেয়ে জাতীয় ঐক্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। টিপেরায় যেখানে আশরাফউদ্দিন আহমদ চৌধুরী এই আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন, জানা যায় যে, সেখানে 'স্থানীয় কৃষক আন্দোলন কংগ্রেসের সাথে মিলেমিশে যায় ... গৃহীত

প্রস্তাবসমূহে দেখা যায় যে, নির্ভেজাল কৃষি-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গির দিকে এই পরিবর্তন ঘটে।' 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' রদ করার আহ্বানও জানানোর সাথে সাথে কংগ্রেসের 'রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি'র সুবিদিত দাবি তোলা হয়।[৩২] স্থানীয় কর্মীদের ক্ষমতাশালী কংগ্রেস জমিদারদের কাজের বিরুদ্ধাচরণ থেকে দূরে রাখা হয়। মেদিনীপুরে কংগ্রেস তার কার্যকলাপ সরকারি বিভিন্ন খাসমহল এস্টেট এলাকার মধ্যে সীমিত করে।[৩৩] এ জন্য ভাইসরয় শ্লেষাত্মকভাবে মন্তব্য করেন যে, 'কংগ্রেসের কৃষি আন্দোলনের আন্তরিকতা সম্পর্কে একটা আকর্ষণীয় মন্তব্য এই যে, মেদিনীপুরের সবচেয়ে ঝঞ্ঝাটপূর্ণ এক কংগ্রেস নেতার জমিদারি এলাকা আন্দোলন থেকে প্রায় মুক্ত রাখা হয়েছে।'[৩৪]

এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, কংগ্রেসের গণসংযোগ আন্দোলনে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। ১৯৩৯ সালে রংপুরে একটা চমকপ্রদ পুস্তিকা বিলি করা হয়। কংগ্রেস পার্টি একটা হিন্দু সংগঠন – এই অভিযোগের বিরোধিতা করে ঐ পুস্তিকায় বলা হয় যে, কংগ্রেস বা হিন্দু নয়, ব্রিটিশ রাজত্ব 'মুসলমানদের ধ্বংসের একমাত্র কারণ'। কারণ 'মুসলমানদের হাত থেকে ইসলামের পতাকা ছিনিয়ে নিয়েছে' ব্রিটিশ শাসনই। 'ধর্মীয় সচেতনতা থেকে এ দেশের মুসলমানদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার মেকলে শিক্ষা পদ্ধতি প্রস্তুত করেছে।' ঐ পুস্তিকায় দীর্ঘ দিন ধরে নির্জীব মুসলমান ধর্মীয় নেতাদের কাছে আহবান জানানো হয়, তাঁরা যেন মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান করতে উৎসাহিত করেন। ঐ পুস্তিকায় বলা হয়:

> ১৮৮৮ সালে ... মুসলমানেরা ... সে-যুগের উলেমাগণের কাছে জানতে চান, মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দুদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা যথার্থ কি না ... এর জবাবে সেই ১৮৮৮ সালে শত শত উলেমা যেমন, এনামুল উলেমা কুতুবুল আহতাব, হযরত শাহ রশিদ আহমদ গাঙ্গোলি ... মওলানা মুহাম্মাদুল হাসান একে যথার্থ বলে দাবি করেন।[৩৫]

কংগ্রেসের পক্ষে কাজ করার জন্য যেসব স্থানীয় পীরের শরণাপন্ন হওয়া যায়, তাঁদের মাধ্যমে মুসলমানদের পক্ষে টানার জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। ঐ সময় শরৎ বসুর সেক্রেটারি ছিলেন নীরদ চৌধুরী; তিনি লেখেন :

> উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের ঐতিহ্যগত ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে তাদের সমর্থন লাভ করা ... এই নেতারাই ছিলেন মুসলমানদের সচেতন করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সক্রিয় সংগঠক। সুভাষ বসু তাঁদের প্রায় সকলকে শরৎ বাবুর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান। কংগ্রেস থেকে তাঁদের যাতায়াত খরচ দেওয়া হোক বা না হোক, তাঁরা এসেছিলেন। একদিন আমি দেখলাম, মুসলিম ধর্মীয় নেতারা শরৎ বাবুর বাড়িতে দলে দলে প্রবেশ করছেন।[৩৬]

কংগ্রেসের গণসংযোগ আন্দোলনের এসব বৈশিষ্ট্যে প্রতীয়মান হয় যে, এটি চলনে-বলনে জনপ্রিয়তা অর্জনের একটি চেষ্টা যা র‍্যাডিক্যাল বাম-ধারার রাজনৈতিক আন্দোলনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবে ভদ্রলোকদের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা,

যা সাম্প্রদায়িক মনোভাবে দ্রুত কঠোর অবস্থান নিচ্ছিল এবং যা কিছুতেই প্রচলিত সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করতে সম্মত ছিল না, তাদের দৃষ্টিতে গণসংযোগ আন্দোলনকারীরা ছিলেন উদার বামপন্থীদের প্রতিনিধি।[৩৭] বামপন্থীদের নেতৃত্বে বেঙ্গল কংগ্রেসের নীতিগত পরিবর্তন হচ্ছিল স্পষ্টভাবে। দলের ইতিহাসে এই প্রথম বারের মতো শোনা গেল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাতিলের কথা এবং খাজনা বন্ধের পক্ষ সমর্থন করার কথা। ১৯৩৭ সালে বর্ধমান থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে, 'দশরথী তা-এর সহায়তায় কংগ্রেস পার্টি সদস্যদের নাম তালিকাভুক্ত করছে। খাজনা আদায়ের জন্য চাকদিঘি জমিদারদের অত্যাচারের অভিযোগও একটা সভায় আলোচিত হয়।'[৩৮] আলোচিত ঐ এস্টেটগুলো ছিল স্বনামধন্য ভদ্রলোক পরিবার সিংহ রায় জমিদারদের। ঐ পরিবারের সাথে ব্রিটিশদের ভালো যোগাযোগ ছিল এবং এ কারণেই ঐ পরিবারটি কংগ্রেসের একটি লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। বাঁকুড়ায় কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি স্থানীয় কৃষক সমিতি গঠিত হয়; নদীয়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় সভা করে কংগ্রেস কর্মীরা কৃষকদেরকে দলের সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্ত হতে আহ্বান জানায়।[৩৯] ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকা বিভাগের 'চল্লিশ জনের মতো মুসলমান কৃষক'কে কংগ্রেসে যোগদান করানো হয়।[৪০] ১৯৩৮ সালে বীরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খাজনা প্রদানের বিরুদ্ধে 'কংগ্রেসের কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন অংশ'-এর সাম্প্রতিক আন্দোলনের কথা জানান। মেদিনীপুরের কর্মকর্তারাও 'খাজনা বন্ধ' আন্দোলন সম্পর্কে অভিযোগ করেন। ১৯৩৭ সাল থেকে 'কাঁথির খাস মহলগুলোতে (সরকারি এস্টেট) বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মাল যে আন্দোলন শুরু করেন, ঐ আন্দোলন ছিল তারই অংশবিশেষ।'[৪১] ঐ আন্দোলন শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। ঐ বছরের শেষ দিকে ভাইসরয়কে গভর্নর জানান:

> সকল সূত্র থেকে প্রতিনিয়ত কংগ্রেসীদের অব্যাহত কার্যকলাপের রিপোর্ট আসছে, সাবেক রাজবন্দিরা এদের জোর সমর্থন করছে। এরা কৃষক শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ ও আনুগত্যহীনতা এবং ছাত্রদের মাঝে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার মনোভাব ছড়াচ্ছে। তারা সত্যিকার অর্থে 'খাজনা বন্ধ করা'র প্রচারণা করছে না। কিন্তু একজন কমিশনার মন্তব্য করেছেন 'জনগণের মধ্যে আন্দোলনের সমর্থনে যে অনুকূল অবস্থা' বিরাজ করছে, তাতে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজন পড়ে না।[৪২]

জানা যায় যে, শরৎ বসু কোলকাতায় মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে তাঁর কিছু অনুগত লোক ঢুকান যাতে তাদের মধ্যকার র‍্যাডিক্যালরা কংগ্রেসে যোগদান করাতে উৎসাহী হয়।[৪৩] তাঁর এই উদ্যোগ কিছুটা সফলও হয়; ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে পুলিশের এক স্মারকে এই অভিযোগ করা হয়, 'মি. শরৎচন্দ্র বসু তাঁর এজেন্ট কাজী ময়জুদ্দীন আহমদ, আবদুস সাত্তার ও অন্যান্যের মাধ্যমে অল বেঙ্গল মুসলিম ছাত্র লীগের প্রধান প্রধান নেতাদের অর্থ প্রদান করেন।'[৪৪] ঐ মাসের শেষ দিকে মুসলিম ছাত্রদের ঐ গ্রুপটি কারমাইকেল হোস্টেলে এক বৈঠকে মিলিত হয়; ঐ বৈঠক থেকে 'শ্রমজীবী কৃষকদের মুক্তি ও প্রধান প্রধান শিল্পকে জাতীয়করণ' করার আহ্বান জানানো হয়।[৪৫] টিপেরা জেলার

কুমিল্লায় মহল্লা ও শহরের গণসংযোগ কমিটি এবং কোলকাতা ও বর্ধমানের একই ধরনের কমিটিগুলো জানায় যে, তারা মুসলমানদের সদস্যভুক্ত করতে কিছুটা সফল হয়েছে। ১৯৩৭ সালের মে মাস নাগাদ শুধুমাত্র কোলকাতার বিভিন্ন শহরগুলোতে এক হাজারের বেশি মুসলমান দলে যোগদান করে বলে জানা যায়।[৪৬] পরবর্তী বছরে গণসংযোগ, কৃষক ও কৃষি সম্পর্কিত কর্মসূচির জন্য পার্টি থেকে তিনটি নতুন সাব-কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস তার দলীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে।[৪৭] ঐ বছরের জুন মাসে কৃষক প্রজা পার্টির সাবেক মন্ত্রী নওশের আলী কংগ্রেসের অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করলে তা গণসংযোগ উদ্যোগের বাহ্যিক সাফল্য বলে গণ্য করা হয়।[৪৮] কিন্তু গভর্নর উল্লেখ করেন যে, এটা অবিমিশ্র বিজয় ছিল না। তিনি বলেন:

> মুসলমান সাবেক মন্ত্রী নওশের আলীর অন্তর্ভুক্তিতে বামপন্থী শক্তি জোরদার হয়েছে। তিনি কংগ্রেস অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করেছেন এবং 'উপনিবেশবাদ' ও জমিদারদের বিরুদ্ধে হঠকারী বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এতে কতটা শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। অনেক স্থানে মুসলিম অনুভূতি ব্যাপকভাবে তাঁর বিরুদ্ধে চলে গেছে। কংগ্রেসে যোগদান করার জন্য *অমৃত বাজার পত্রিকা* তাঁকে যে অভ্যর্থনা জানিয়েছে, সেটি খুবই সংগত।[৪৯]

কংগ্রেসে নওশের আলীর যোগদানে বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় এবং গণসংযোগ কর্মসূচি যেসব বাধার সম্মুখীন ছিল সে-সবের ওপর এর প্রভাব পড়ে। মুসলমান কৃষকদের ওপর বাঙলার মুসলিম রাজনীতিবিদদের যে প্রভাব ছিল তা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় নওশের আলীর কংগ্রেসে যোগদানের কারণে। মুসলিম রাজনীতিবিদেরা এ কথা অনুধাবন করতে বাধ্য হয়:

> প্রাক্তন রাজবন্দিদের উসকানির ফলে কৃষি বিষয়ক আন্দোলনের সম্ভাবনা অত্যন্ত মারাত্মক হতে পারে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, পরিষদে তাদের মুসলমান সমর্থকেরা এইসব সংঘবদ্ধ ও অতি বিপ্লবীদের সম্পর্কে সতর্ক হতে শুরু করেছে – কেননা তারা হঠকারী প্রতিজ্ঞা ও কৌশলপূর্ণভাবে স্বার্থ উদ্ধারের মাধ্যমে মুসলমান কৃষকদের ঐসব নেতাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল। এটা তাদের স্থানীয় নেতৃত্বের প্রতি হুমকি হয়ে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে, এবং সেটা প্রদেশের শান্তির জন্যও হুমকি হিসেবে কিছু কম নয়।[৫০]

এই আন্দোলন, যেমন মনে করা হয়েছিল তেমনই, স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যায় পতিত হয় এবং এ ব্যাপারে স্থানীয় মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে সন্দেহ ও শত্রুতা দেখা দেয়।[৫১] ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে মুন্সীগঞ্জে কংগ্রেসে যোগদানকারী ৪০ জন মুসলমান কৃষককে দল ত্যাগ করতে স্থানীয় মোল্লারা বাধ্য করে।[৫২] নদীয়ায় কংগ্রেস আন্দোলন স্থানীয় কৃষক প্রজা পার্টির কাছ থেকে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়। কৃষক প্রজা পার্টি সেখানে স্থানীয় হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুসলমান প্রজাদের সংঘবদ্ধ করেছিল।[৫৩] বরিশালে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি আয়োজিত প্রজা সমিতির সভায় হিন্দু ও মুসলমান সদস্যদের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়; পরিণামে সব হিন্দু কংগ্রেস নেতা-কর্মীকে এ সভা ত্যাগ করতে বাধ্য

করা হয়।[৫৪] নোয়াখালীতে লক্ষ করা যায় যে, 'নোয়াখালীর কৃষক নেতাদের আগমনে স্থানীয় মৌলভিরা অসন্তুষ্ট হয়ে পাল্টা প্রচার চালাচ্ছে।'[৫৫] ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লেখেন:

> নোয়াখালী কংগ্রেসের কর্মকর্তারা নতুন অফিস খোলার ও সদস্য তালিকাভুক্ত করার জন্য নিয়ম করে বিভিন্ন গ্রামে যাচ্ছেন। নতুন কমিটির কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রায় সবাই হিন্দু। টিপেরায় যেমনটি দেখা গেছে, তেমনভাবে এখানে মুসলমান কৃষকদের দলে টানার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। লক্ষ্মীপুর, রায়পুর ও রামগঞ্জ এলাকায় তাদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন গোলাম সরোয়ার – যিনি মনে করেন যে, পৃথিবীর ঐ অংশটি তাঁর এলাকা; তিনি চান না যে, তাঁর অনুসারীদের কেউ অন্য পক্ষে নিয়ে যাক। এখন সেখানে তিক্ত শত্রুতা বিরাজ করছে।[৫৬]

গোলাম সরোয়ার হোসেন ছিলেন নোয়াখালীর একজন প্রভাবশালী পীর। তিনি নোয়াখালী কৃষক সমিতির চরমপন্থী শাখার নেতৃত্ব দেন। এই সমিতির দাবি ছিল সব খাজনা মার্জনা করা, জমিদারি বাজার বয়কট করা এবং ঋণ সালিশি বোর্ড থেকে সুদ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করা।[৫৭] তিনি কৃষক প্রজা পার্টি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। রামগঞ্জ, রায়পুর গ্রামীণ নির্বাচনী এলাকা থেকে তিনি জয়লাভ করেন বারো হাজারের বেশি ভোটের ব্যবধানে।[৫৮] ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠন করলে তিনি (পীর সাহেব) তাঁর এলাকায় গণসংযোগ কাজে নেতৃত্ব দেওয়ার লক্ষ্যে কংগ্রেসে যোগদান করার ইচ্ছা পোষণ করেন। সরোয়ারের দাবি সম্পর্কে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করেন:

> স্থানীয় কংগ্রেস নেতারা তাঁকে নিজেদের দলে যোগদান করানোর চেষ্টা করছিল। কংগ্রেস যদি কৃষকদের স্বার্থে কাজ করত এবং বেঙ্গল প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনে সমর্থন দিত তাহলে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করতে রাজি ছিলেন। বর্তমানে কংগ্রেসের ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানদের আগ্রহ খুবই কম; ঐ জেলায় কংগ্রেস ছিল খুবই দুর্বল। তবে প্রভাবশালী নেতারা নিজেদের স্বার্থে কংগ্রেসের সাথে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হলে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হবে।[৫৯]

কিন্তু স্থানীয় জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে গোলাম সরোয়ারের লাগামহীন কথায় স্থানীয় কংগ্রেস তাঁর সাথে ঐক্যের উত্তম ফলাফল সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে। ১৯৩৭ সালের পুরো গ্রীষ্মকাল ধরে তিনি 'গোলযোগ সৃষ্টির' ও 'হিন্দু জমিদারের হাট বয়কট' করার হুমকি দেন,[৬০] জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনায় উৎসাহ দেন বলে খবর পাওয়া যায়। কংগ্রেসের নতুন 'র‍্যাডিক্যালপন্থীদের' কার্যকলাপের বিচারেও এটা ছিল খুবই বাড়াবাড়ি। নোয়াখালীর ভদ্রলোকেরা এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। জুলাই মাসের শেষ দিকে নোয়াখালীর কংগ্রেস নেতাকর্মীরা তাদের পুরানো মিত্রদের সহায়তায় এগিয়ে আসে এবং তারা সরোয়ারের বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। 'কংগ্রেসের নেতারা পুলিশের ডিআইজি'র কাছে আসে ... (কোনো কারণ ছাড়াই) তারা কৃষক সমিতির গুণ্ডাদের হাত

থেকে ঐ এলাকার হিন্দুদের রক্ষার আহবান জানায় ... (তারা) সরোয়ারের একটা বক্তৃতা দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করে – ঐ বক্তৃতায় 'মহাজন ও তালুকদারদের বিরুদ্ধে উত্তেজনাকর বক্তব্য এবং নির্দিষ্ট করে কিছু লোকের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য ছিল।'[৬১] একই সাথে সরোয়ারের নিজের এলাকায় কংগ্রেস প্রচার যুদ্ধ চালায় এবং তিনি কংগ্রেসের ক্ষমাহীন শত্রুতে পরিণত হন। মুসলিম লীগ মন্ত্রীরা এ সময় গোলাম সরোয়ারকে নিজেদের 'দলে' আনতে কয়েকবার চেষ্টা করেন; তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল 'ঐসব কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ... যারা নোয়াখালী কৃষক সমিতিগুলোর ওপর কর্তৃত্ব করতে চেষ্টা করছিল'।[৬২] মুসলিম লীগ মন্ত্রীরা দেখলেন যে, সরোয়ার তাঁদের সাথে ঐক্য করতে সম্মত হয়েছেন। সরোয়ার তাঁর কৃষক অনুসারীদের 'হিন্দু' কংগ্রেসের আওতা থেকে বের করে আনার জন্য তীব্র সাম্প্রদায়িক প্রচার শুরু করেন এবং হিন্দু মহাজন ও তালুকদারদের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণাত্মক ভূমিকা জোরদার করেন। তিনি তাঁর 'নির্বাচনী এলাকার লোকদের ওপর কংগ্রেসের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে' সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, 'কংগ্রেসের আসল উদ্দেশ্য হল মুসলমান সরকারকে উৎখাত করে তার জায়গায় হিন্দু রাজ কায়েম করা।' একবার তিনি 'রাজবন্দি দিবস' পালন উপলক্ষে আয়োজিত সভায় 'একজন মুসলমান কংগ্রেসীকে সভাপতিত্ব' করা থেকে বিরত রাখার জন্য স্থানীয় কৃষকদের উত্তেজিত করেন।[৬৩] সরোয়ার নোয়াখালীর মুসলমান কৃষকদের কংগ্রেসের পতাকাতলে নিয়ে আসার প্রয়াসকে শুধু ব্যর্থ করেই ক্ষান্ত হননি, বিশেষ করে 'হিন্দু' জমিদারদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ পরিচালনা করে তিনি নোয়াখালীর কৃষি বিষয়ক বিরোধকে হিন্দু-মুসলমান ইস্যুতে পরিণত করতে সফল হন। বাঙলার ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়, তিনি তার ভিত নির্মাণে এভাবে সহায়তা করেন।[৬৪]

একই ধরনের দৃষ্টান্ত প্রদেশের অন্যান্য এলাকাতেও দেখা যায়; ঐসব এলাকাতে মুসলমান কৃষকদের দলে আনার কংগ্রেস প্রয়াস স্থানীয় মুসলমান নেতাদের ক্রোধকে উসকিয়ে দেয় এবং তা প্রায় ক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে উত্তেজিত করে। টিপেরায় আশরাফউদ্দিন আহমদ চৌধুরীর আন্দোলনের প্রাথমিক সাফল্য[৬৫] চাঁদপুরে মুসলমানদের মধ্যে পাল্টা বিক্ষোভ কর্মসূচি ছড়িয়ে দেয়; এখানে প্রায় সকল বক্তৃতা-বিবৃতিতে জনগণকে হিন্দু মালিকের দোকান থেকে কিছু না কিনতে, হিন্দু আইনজীবীর কাছে না যেতে এবং যতদূর সম্ভব হিন্দুদের সাথে সাধারণভাবে কোনো লেনদেন না করতে আহ্বান জানানোর মাধ্যমে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি ঘটানো হয়।[৬৬] একবার আশরাফউদ্দিন 'এক মসজিদে এক ধর্মীয় সভায় যান এবং সেখানে রাজনৈতিক আলোচনা শুরু করেন। অন্য এক বক্তা তাঁর বিরোধিতা করেন এবং উপস্থিত লোকজনকে কংগ্রেসে যোগ না দেওয়ার আহ্বান জানান'।[৬৭] সুভাষ বসু – তখন তিনি সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন – ১৯৩৮ সালে ঐ জেলায় সফর করেন। তিনি আস্থার সাথে দাবি করেন যে, 'মুসলমান জনগণের কাছ থেকে আমি যে সাড়া পেয়েছি তা আমার প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি। আমি এই আস্থা ও নিশ্চয়তা নিয়ে ফিরে এসেছি যে, ... বাঙলার মুসলমানেরা

ভবিষ্যতে দীর্ঘ দিন ধরে কংগ্রেসের পতাকাতলেই থাকবে।' কিন্তু বাস্তব হচ্ছে যে, তাঁর মিছিলে 'একদল মুসলিম লীগার' ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে।[৬৮] ১৯৩৯ সালে পাবনা জেলাতেও একের পর এক কয়েকটি সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটে। গভর্নর ঐ ঘটনা সম্পর্কে মত পোষণ করে যে, এর সাথে জড়িত আছে 'জনপ্রিয়তা অনুকূলে আনার জন্য স্থানীয় মুসলিম লীগারদের প্রয়াস, গ্রহণযোগ্যতার জন্য তাদের একই সাথে কংগ্রেসের বাম শাখা ও মুসলমান কৃষকদের লাগামহীন প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে; জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি এ বিষয়ে তাদের কাছে অপর্যাপ্ত বিবেচিত হওয়ায় তারা জনগণের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টিকেও প্রয়োজনীয় বলে মনে করছে।'[৬৯]

গণসংযোগ আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেসব বাধা ছিল তার মধ্যে স্থানীয় মুসলিম নেতাদের বিরোধিতা একটি। ভারতের অন্যান্য এলাকার মতো বাঙলায় ঐ আন্দোলন বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিল জেলা ও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সহায়তার ওপর, এবং অনেক ক্ষেত্রে ঐ সহায়তা সহজলভ্য ছিল না।[৭০] বাঙলার অনেক জেলায় গণসংযোগের উদ্যোগ স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির মধ্যে গভীর ফাটল সৃষ্টি করে – প্রাদেশিক নেতৃত্বে যে বিভক্তি ছিল এটা তারই প্রতিচ্ছবি। বসু ভ্রাতৃদ্বয় কোনো কোনো বিষয়কে সমর্থন করলে বি. সি. রায়ের গ্রুপ তাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত এবং আন্দোলন থেকে দূরে অবস্থান করত। অন্যরা দলের নতুন 'র‍্যাডিক্যাল পন্থা' সম্পর্কে সতর্ক ছিল। বীরভূমে অনুষ্ঠেয় কৃষক সম্মেলন থেকে বোলপুরের বাবু ডি. চক্রবর্তী নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে কংগ্রেস কমিটি বিভক্ত হয়ে পড়ে। ঐ সম্মেলনে বাঙলার সুপরিচিত কমিউনিস্ট এম. এন. রায়ের সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। বাবু ডি. চক্রবর্তী ঐ সম্মেলন থেকে সরে আসেন এই কারণে যে, 'তিনি কমিউনিস্ট বিরোধী, এবং তিনি মনে করেন যে, কমিউনিস্ট চিন্তাধারার বিস্তার দেশের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর।'[৭১] বাঁকুড়ায় কৃষক সমিতির নেতারা অভয় আশ্রমের সব প্রতিষ্ঠান দখলে নেবার চেষ্টা করলে 'স্থানীয় কৃষক সমিতি ও অভয় আশ্রম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে' লিপ্ত হয়।[৭২]

স্থানীয় কমিটিগুলোর মধ্যে এ ধরনের বিভক্তির কারণে গণসংযোগ কর্মসূচি দুর্বল হয়ে পড়ে। দৃষ্টান্ত হিসেবে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। পত্রসরে একটা জেলা কৃষক সম্মেলন ব্যর্থ হয়, কারণ 'স্থানীয় লোকজন ও কংগ্রেস দলের সদস্যরা মিথ্যা ও গুজব রটনার মাধ্যমে ও সম্ভাব্য সব উপায়ে বাধার সৃষ্টি করে ... গোপনে গোপনে নেতা-কর্মীরা ঐ সভায় যোগদান করা থেকে জনগণকে বিরত রাখার চেষ্টা করে ... বেতুর আশ্রমের লোক ও কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের ঐ মিটিং-এ অনুপস্থিতি সবার দৃষ্টি কাড়ে'।[৭৩] অভয় ও বেতুর আশ্রম গ্রুপে সদস্য সংখ্যা ছিল কম, কিন্তু তারা ছিল উৎসর্গীকৃত গান্ধীবাদী। হুগলী ও বাঁকুড়ায় গ্রাম পুনর্গঠন ও হরিজনদের অবস্থার উন্নয়নে বছরের পর বছর অব্যাহতভাবে কাজ করে তারা স্থানীয় পর্যায়ে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছিল। পরম্পরাগত গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহী হিসেবে তারা স্থানীয় কংগ্রেস দলে বিভেদাত্মক র‍্যাডিক্যাল মতবাদের অন্তর্ভুক্তিতে অসন্তুষ্ট হয়। একইভাবে, উত্তর বাঙলায় বসু গ্রুপ তাদের সদিচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়। কারণ স্থানীয় কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা কৃষক

আন্দোলনের পক্ষে ছিল না। রাজশাহী ডিভিশনের গভর্নর মন্তব্য করেন:

> মফস্বল এলাকায় বর্তমানে প্রজা পার্টি ও কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের মধ্যে পুনর্মিলনের কোনো সম্ভাবনা নেই। প্রজা পার্টির নেতারা জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য খুবই আগ্রহী; কংগ্রেস কর্মীরা, যারা কিনা হিন্দু, এই ভূমিকা পালন করতে চায় না। কারণ জমিদার ও মহাজনদের মধ্যে, বিশেষ করে শেষোক্তরা, মূলত হিন্দু।[৭৪]

প্রাদেশিক পর্যায়েও বেঙ্গল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি অভ্যন্তরীণ দিক থেকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয় – কমিটির নীতিকে 'মুসলমানদের দালালি' করার নীতি বলে অভিহিত করে বিরোধিতা করা হয়। এ কথাও বলা হয় যে 'বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির গণসংযোগ কর্মসূচি পরিচালনা ও মুসলমানদের সমর্থন আদায়ে নিরুৎসাহ দেখে কোলকাতার বেশ কিছু মুসলমান নেতা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে বলে জানা যায়।[৭৫] বেঙ্গল কংগ্রেসের অনেকে আশংকা করেন যে, নতুন প্রাদেশিক কমিটির কার্যধারায় দল তার পুরানো সমর্থকদের হারাবে এবং মুসলমানদেরও অত্যন্ত দূরে সরিয়ে দেবে। এমনকি টিপেরা ও নোয়াখালীতে কংগ্রেসের অবস্থান সুদৃঢ় হলেও তাদের গণসংযোগ আন্দোলন শুধুমাত্র স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সার্বিক সমর্থন পায়। ডিভিশনাল কমিশনার লক্ষ করেন:

> এটা দেখা যাচ্ছে যে, এমনকি কংগ্রেসের লোকজনেরাও কমিউনিস্ট ভয়াবহতার প্রকৃতি অনুধাবন করতে শুরু করেছে। তাই একজন স্থানীয় নেতা এটা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছেন যে, ... বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বিশেষ আইন প্রণয়নে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করার তিনি ঘোর বিরোধী, কারণ এসব আইন শীঘ্রই কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রয়োজন পড়বে; কমিউনিস্টদের কর্মকাণ্ড পেশাজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেছে। কংগ্রেসের চরমপন্থী সোসালিস্ট নীতি গ্রহণ অবশ্যই এক সময় জনগণের একটা অংশকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে – যে জনগণের নৈতিক ও অর্থনৈতিক সমর্থনের ওপরই কংগ্রেস এ যাবত নির্ভর করে এসেছে।[৭৬]

যত মাস যেতে থাকল তার সাথে সাথে গণসংযোগ আন্দোলনের সাফল্য ক্রমেই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হতে থাকল। এমনকি দলের বামপন্থীরাও সাবধানে অগ্রসর হতে থাকে। বেঙ্গল প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) আইন কার্যকর হলে এবং জমিদার ও প্রজাদের মধ্যকার বিরোধ বৃদ্ধি পেলে অনেক কংগ্রেস কর্মী তাদের আন্দোলনের তীব্রতা কমিয়ে আনতে বাধ্য হয়। বিভিন্ন জেলার রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, কেবলমাত্র দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট এলাকায় এবং বীরভূম জেলায় 'কংগ্রেসের কমিউনিস্ট অংশের' লোক সক্রিয় ছিল। এ সময় কর্মকর্তারা এই মনোভাব গ্রহণ করল যে, 'প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী এটা স্পষ্ট যে, কংগ্রেস জমিদারদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন নয়।' বর্ধমান থেকে এমন খবরও আসে, 'কংগ্রেসের লোকজনেরা বলেছে যে, সরকার রায়তদের ভয় করে এবং অর্থ আদায়ে জমিদারদের সাহায্য করতেও সরকার ভয় পায়।' কাঁথিতে কংগ্রেসের ঈশ্বরচন্দ্র মাল সরকারি খাস মহাল এস্টেটে খাজনা হ্রাস করার আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। এ

আন্দোলনে কৃষকদের দাবিদাওয়া হিন্দু জমিদারদের পরিবর্তে সরকারের বিরুদ্ধে চলে আসে।[৭৭] দামোদর ক্যানাল ট্যাক্স-এর বিরুদ্ধে বর্ধমানে একই ধরনের আন্দোলন পরিচালনা করেন দশরথী তা। কিন্তু এ ধরনের কৌশল অতীতের মতো আর কার্যকর ছিল না। সরকারের বিরুদ্ধে খাজনা না দেওয়ার আন্দোলন পরিচালনা করে কংগ্রেস এখন কৃষক প্রজা-মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ প্রদান করল – তাদের ঐ চ্যালেঞ্জ আর ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে থাকল না।[৭৮] নিজ জেলায় সফর করে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বর্তমান সেক্রেটারি আশরাফউদ্দিন চৌধুরী ঐ উভয় সংকটকে তাঁর নিজের জেলাতেই ডেকে আনলেন। ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে –

> (তিনি) কুমিল্লায় বিরোধী দলের এক বৈঠকের আয়োজন করেন। ঐ বৈঠকের কারণে স্থানীয়ভাবে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়; বৈঠক আহ্বানকারী দল ও সরকারের সমর্থকদের মধ্যে শান্তি ভঙ্গের আশংকা দেখা দেয়। আশরাফউদ্দিন আহমদ ছিলেন সরকার-বিরোধী স্থানীয় প্রধান – তিনি পুরো সফরের সময় প্রকাশ্যে এবং ব্যক্তিগতভাবে মাননীয় (মুখ্য) মন্ত্রীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।[৭৯]

কংগ্রেসের গণসংযোগ আন্দোলন কোনমতে জোড়াতালি দেয়া বিচ্ছিন্ন কিছু স্থানীয় উদ্যোগের অতিরিক্ত কিছু ছিল না। অনেক এলাকায় ঐ আন্দোলন মুসলমান নেতাদের বিরোধিতায় বা কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে শুরুই হতে পারেনি। প্রাদেশিক পর্যায়ে অনেক কংগ্রেস নেতা ঐ আন্দোলনের বিরোধিতা করে। আবার নেতারা দলের দুর্বল ঐক্যের ক্ষতি করবে এই আশংকায় আন্দোলন থামিয়ে দেয়। তবুও এই আন্দোলনে মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান করাতে এবং কংগ্রেসের ঐতিহ্যগত জমিদার-সমর্থক ও রক্ষণশীল চরিত্র লাঘব করাতে কিছুটা সফল হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের আহ্বান করার সিদ্ধান্ত ছিল কংগ্রেসের দিক থেকে একটি বিরাট পরিবর্তন। গণসংযোগ আন্দোলন ছিল একটা রণকৌশল – যদি এটাকে আন্তরিকভাবে বাস্তবায়ন করা হত, তাহলে বাঙলার রাজনীতির সাম্প্রদায়িক মেরুকরণে তা চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিতে পারত।

কিন্তু ১৯৩৭ সালে বেঙ্গল প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) বিল আইন সভায় উত্থাপন করা হলে শরৎ বসু 'র‍্যাডিক্যাল' হিসেবে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্যতা অনেকখানি হারিয়ে ফেলেন। বিরোধী দলের নেতা হিসেবে বসুকে জমিদারি ক্ষমতাকে খর্ব করতে উদ্যত ঐ বিলের ব্যাপারে কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করতে হয়। তখন কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি সামনে উঠে আসে এবং বসু ও তাঁর নীতি এক দিকে কংগ্রেসের জমিদার লবি এবং অপর দিকে কৃষক নেতাদের ছিদ্রান্বেষী পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে পতিত হয়। দলকে সঙ্গে রাখতে শরৎ বসুর পক্ষে ঐ বিলের বিরোধিতা করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। তবু বাম-গণমুখী নীতির প্রতি তাঁর অঙ্গীকারের জন্য সত্য ঢাকতে বাক-চাতুরীর আশ্রয় নিতে হয়। তাঁর বক্তব্যকে নিতান্তই 'সাদামাটা' বলা যায়;[৮০] নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে বসু ঘোষণা করেন যে, জমিদারি প্রথা অনন্তকাল ধরে চলুক তা কংগ্রেস অবশ্যই সমর্থন করে না ... তবে জনগণের কোনো এক অংশ অন্য অংশকে শোষক বলুক, এটাও কংগ্রেস

উৎসাহিত করে না।'[৮১] বিলের ব্যাপারে কংগ্রেসের বিরোধিতা মানুষের দৃষ্টিকে অন্য দিকে সরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বসু তাঁর আপত্তিকে 'অতি-বামপন্থী' কথা দিয়ে শাণিত করেন – অধীনস্থ রায়তদের অধিকারকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা না থাকায় তিনি বিলের সমালোচনা করেন এবং অধীনস্থ প্রজাদের (কোর্ফা) খাজনা দেয়া বন্ধের জন্য বিলের সংশোধনী আনেন।

অধীনস্থ রায়তদের স্বার্থ রক্ষার এই বিলম্বিত প্রয়াসকে ঐতিহাসিকগণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, ত্রিশ দশকে বেঙ্গল কংগ্রেস যে একটা র‍্যাডিক্যাল দল ছিল তা ঐ প্রয়াস থেকে স্পষ্ট হয়।[৮২] অধীনস্থ প্রজাদের স্বার্থকে বিবেচনায় এনে কংগ্রেস অবশ্যই বিলের সত্যিকার বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ্যে তুলে ধরে, অর্থাৎ ঐ আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে জমিদারদের বিরুদ্ধে ধনী ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের সাহায্য করা। এ কথা সত্য যে, সামগ্রিকভাবে অধীনস্থ প্রজা ও ভাগচাষিরা নগদে ও দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে ধনী কৃষক বা স্বত্বভোগী প্রজাদের অধিক পরিমাণ খাজনা দিত, অপর দিকে ধনী কৃষক বা স্বত্বভোগী প্রজারা জমিদারদের খাজনা দিত তুলনামূলকভাবে বেশ কম। সে যা-ই হোক, একজন ঐতিহাসিক এমন মত প্রকাশ করেন যে, কংগ্রেস ঐ সংশোধনীর বিরোধিতা করে শুধমাত্র এই কারণে যে তা 'প্রকৃত কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যথেষ্ট ছিল না'।[৮৩] এর মাধ্যমে শরৎ বসুর দলীয় নীতির ওপর দুর্বল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং জমিদার স্বার্থ রক্ষায় দলের দীর্ঘ দিনের লালিত ও চলমান দৃঢ় অঙ্গীকারকে উপেক্ষা করা হয়।[৮৪] বস্তুত কোলকাতা ও স্থানীয় পর্যায়ে দলটি ছিল দ্বিধাবিভক্ত। শরৎ বসুর উদ্যোগকে সমর্থনকারী দলের 'বামপন্থী' অংশ মোটেও জমিদারি ব্যবস্থার পক্ষাবলম্বী ঐ দলের মুখ্য অংশ ছিল না। বস্তুত ১৯৩৭ সালের পরিষদ নির্বাচনের পর বেঙ্গল কংগ্রেসের মধ্যে জমিদারি স্বার্থ আগের তুলনায় আরও প্রবল হয়, কারণ ঐ নির্বাচনে পল্লি এলাকায় প্রচারণার জন্য দলকে মফস্বল ভদ্রলোকদের আর্থিক ও নৈতিক সমর্থনের ওপর আগের তুলনায় অনেক বেশি নির্ভরশীল হতে হয়। প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) বিলের ব্যাপারে শরৎ বসুর প্রতিক্রিয়া ছিল আপসমূলক – এর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর নিজ উদ্যমী বামপন্থীদের এবং আইন সভায় তাঁর প্রতি সমর্থনকারী কৃষক প্রজা পার্টির সদস্যদের শান্ত করা[৮৫] এবং একই সাথে দলের রক্ষণশীলদের অব্যাহত সমর্থন ধরে রাখা। বাঙলার জমিদারেরা তাদের অধিকারকে সীমিত করে ভোগ স্বত্বাধিকারী প্রজাদের স্বার্থকে বাড়িয়ে দেয় এমন যে কোনো রকম আইন প্রণয়নের তীব্র বিরোধিতা করে। গ্রামীণ স্তরবিন্যাস কাঠামোয় অধীনস্থ রায়তদের প্রশ্নে তাদের নিজস্ব স্বার্থের সম্পর্ক কম থাকায় এরকম একটা অবস্থান গ্রহণের সুযোগ এনে দেয় – কেননা, অধীনস্থ রায়তদের সাথে তাদের লেনদেন ছিল খুবই সামান্য।[৮৬] অসাধারণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডিয়েটমার রোদারমন্ড (Dietmar Rothermund) তাই উল্লেখ করেন:

> বর্গাদারদের স্বার্থের বিষয়টি বড় বড় জমিদারেরা সমর্থন করেছে, কারণ ভাগচাষিদের সাথে সরাসরি তাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। তাই তাদের প্রতি তারা একটা নিঃস্বার্থ মহানুভবতার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। একই সময়ে ঐ জমিদারেরা ভোগস্বত্বাধিকারী

রায়তদের সাথে দর কষাকষির ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিল, আর রাজনৈতিক খেলায় একটি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে বলে বর্গাদারদের জন্য তারা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছে।[৮৫]

বিশেষভাবে অর্থনৈতিক মন্দার পর বর্গাদার বা অধীনস্থ রায়তদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি জোতদার ও বড় বড় অধিকারভোগী রায়তদের চ্যালেঞ্জ করারই একটা ভিন্ন পদ্ধতি হয়ে দাঁড়ায়। এদের থেকেই অধিক সংখ্যায় ভাগচাষিরা জমি নিয়ে চাষ করত এবং সমসাময়িক কৃষক নেতারাও এই কৌশলের গূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করে। আবুল মনসুর আহমদ উল্লেখ করেন যে, ময়মনসিংহ জেলায়:

> ...ঐ আল্ট্রা-লেফটিযম প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে জমিদার-বিরোধী আন্দোলনের ক্ষতিসাধন করিতে পারিত। আমার ঘোরতর সন্দেহ ছিল যে জমিদার সমর্থক কোনও কোনও কংগ্রেস নেতা ঐ উদ্দেশ্যেই আল্ট্রা-লেফটিযমে উস্কানি দিতেন।... কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর জমিদারদের প্রভাব ছিল অপরিসীম ... কংগ্রেসীরা শুধু প্রজা আন্দোলনে সমর্থন দিলেন তা নয়। তাঁরা কৌশলে ইহার বিরুদ্ধতা করিতে লাগিলেন। কিছু-সংখ্যক কংগ্রেস-কর্মী দিয়া তাঁরা একটা কৃষক সমিতি খাড়া করিলেন। সেই সমিতির পক্ষ হইতে প্রচার চলিল যে, প্রজা আন্দোলন আসলে জোতদারদের আন্দোলন। ঐ আন্দোলনে কৃষকদের কোন লাভ ত হইবেই না, বরঞ্চ কৃষকদের দুর্দশা আরও বাড়িবে।[৮৮]

পরিণামে, প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইনের প্রশ্নে কংগ্রেস দলের এই অবস্থানে গণসংযোগের মাধ্যমে যা সামান্য কিছু অর্জন করেছিল তাও হারিয়ে ফেলে। এফ. ও. বেলের ডায়েরি থেকে জানা যায় যে, ১৯৩৯ সাল নাগাদ প্রজাস্বত্ব আইনের শর্তগুলো প্রদেশের প্রত্যন্ত এলাকার লোকদের কাছেও স্পষ্ট হয়ে যায়।[৮৯] মুসলিম লীগের প্রচারণায় নিশ্চিতভাবে মুসলমান চাষিরা জানতে পারে যে, কংগ্রেস ঐ আইনের বিরোধিতা করছিল। জনপ্রিয় একটি গাথায় বলা হয়:

> সব গামছা-পরা (উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু) জমিদারের জন্য
> (প্রজাস্বত্ব সংশোধনী) আইন পাস ধ্বংস ডেকে আনে।
> সব কংগ্রেস নেতা-কর্মী বলে, এটা কী রকম ধ্বংস!
> তারা কৃষক-সমর্থিত বিলকে পাস করতে রাজি হয়নি।
> ... সব জমিদার হল কংগ্রেস নেতা-কর্মীর পালক পুত্র।
> ... ওহে চাষিকূল, কংগ্রেস নেতা-কর্মীর দিকে তাকিয়ে দেখো!
> (তারা হল) নির্যাতনকারী, অন্যায়কারী, বিদ্বেষপরায়ণ ও শত্রুভাবাপন্ন।[৯০]

প্রজাস্বত্ব বিলের ব্যাপারে দলের অবস্থান গণসংযোগ আন্দোলনের বিশ্বাসযোগ্যতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। মুসলিম লীগ মনে করে, গ্রামীণ সংস্কার নিয়ে কংগ্রেস যে সত্যের অপলাপ করে, এতে তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। 'বাম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে' প্রজাস্বত্ব বিলের বিরুদ্ধে বসুর আক্রমণ নিঃসন্দেহে কৌশল হিসেবে দারুণ হলেও তা অনেক মুসলমান সদস্যকে আস্থায় আনতে ব্যর্থ হয়। মুসলিম লীগ এ সময় মুসলমান কৃষকদের মধ্যে জোরেশোরে প্রচার করতে থাকে যে, কংগ্রেস এখনও জমিদারদের দল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

বিলোপের জন্য বসুর ক্রমাগত আহ্বানে উপকার তো হল না, বরং তাঁর নিজের দলের রক্ষণশীলেরাই তাঁর ওপর বিরক্ত হল।

এছাড়াও আরও একটা বিষয় হল, মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস হওয়ায় আইন সভার রাজনীতিতে একটা সাম্প্রদায়িক মাত্রা যোগ হয় যা শরৎ বসু এড়াতে পছন্দ করেন।[৯১] সরকারের পতন ও কংগ্রেসকে বিকল্প ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি হিসেবে এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে বসু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণের ভাষা ব্যবহারে তিনি সতর্ক ছিলেন। তিনি যতদূর সম্ভব এমন সব জাতীয়তাবাদী বিষয় তুলে ধরতেন, যেগুলিতে তাঁর মতে সাম্প্রদায়িকতার কোনো গন্ধ ছিল না; যেমন তিনি দাবি করতেন 'রাজবন্দিদের' বা বিচারাধীন সন্ত্রাসীদের মুক্তি – এদের মধ্যে অনেকে তখনও দেওলি ও আন্দামানে বন্দি শিবিরে ছিল। কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত ৬টি সরকার শপথ গ্রহণের পর পরই সব রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেয়। বেঙ্গল সরকার তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় আন্দামানে থাকা বাঙালি রাজবন্দিরা অনশন ধর্মঘটের হুমকি দেয়। বিশের দশকে যুগান্তর গ্রুপ বসু গ্রুপকে সহায়তা করে। কিন্তু পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাদের সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বসু ভ্রাতৃদ্বয় এখন অনুধাবন করেন যে, গণসংযোগ কর্মসূচির ফলে কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরে তাদের বন্ধুর চেয়ে শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে তাঁরা দুই বড় সন্ত্রাসী গ্রুপ অনুশীলন ও যুগান্তর-এর সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করেন। কোলকাতার নতুন ছাত্র সংগঠনগুলোর সহায়তায় তাঁরা অনশন ধর্মঘটিদের সপক্ষে এগিয়ে আসেন এবং তাদের অনতিবিলম্বে মুক্তির দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। গভর্নরের মতে:

> ঐ অনশন ধর্মঘট যেন স্রষ্টাই পাঠিয়েছেন এবং চরমপন্থী দলগুলো তার সদ্ব্যবহার করে; তারা আন্দোলন করার অজুহাত খুঁজছিল। তারা ভিন্নমুখী ও বিচ্ছিন্ন বামপন্থী দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে কাজে লাগাবার প্রয়াসে বিভ্রান্ত বন্দিদের ও অপ্রয়োজনীয় দুঃখ-কষ্টকে বড় করে দেখাতে থাকে, ঐ বামপন্থী দলগুলো ছিল সরকারের যতটা বিরোধী, তারও বেশি কংগ্রেসের মূল অংশের বিরোধিতাকারী।[৯২]

কিন্তু তারপরও সরকারের জন্য বিশেষ করে ফজলুল হকের জন্য ঐ ধর্মঘট মারাত্মকভাবে াব তকর অবস্থার সৃষ্টি করে। কারণ ফজলুল হকের নির্বাচনী কর্মসূচিতে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির অঙ্গীকার ছিল। শেষ পর্যন্ত বন্দিরা তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে এবং অধিকাংশকেই মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ঐ ঘটনাটি বাঙলার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার সম্পর্কোন্নয়নে সামান্যই প্রভাব ফেলে। ১৯৩৮ সালে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের সাথে বসুর জড়িত থাকার বিষয়টি অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটায়। কোলকাতার মুসলমানদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া এমন মারাত্মকভাবে দেখা দেয় যে, ঐ প্রস্তাবের সাথে সংশ্লিষ্ট বিদ্রোহী মুসলমান প্রজা সদস্যরা বাধ্য হয়ে হিন্দুদের কাছে আশ্রয় নেয়।[৯৩]

মুসলমান 'জনগণকে' সন্তুষ্ট করে বাঙলার রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক অচলাবস্থা নিরসনে কংগ্রেসের বামপন্থী অংশের প্রয়াস কার্যত সফল হয়নি। আইন সভার অভ্যন্তরে

এবং বাইরে তারা বেঙ্গল কংগ্রেসের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বাধার সম্মুখীন হয়। শরৎ বসু এক সঙ্গে বিরোধী নেতা হিসেবে এবং অন্য দিকে ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদের সমর্থক হিসেবে কাজ করতে ব্যর্থ হন। তবু বসু (তাঁর পূর্বে চিত্তরঞ্জন দাশের মতো) একজন অসাম্প্রদায়িক হিন্দু হিসেবে তাঁর ব্যক্তিগত সুনামকে অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হন এবং অনেক মুসলমান নেতা তাঁর ওপর তাঁদের আস্থা অব্যাহত রাখে। এ কারণেই তিনি ১৯৪১ সালে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর হিন্দু মহাসভা, তাঁর নিজের ফরোয়ার্ড ব্লক গ্রুপ এবং বেশ কিছু কৃষক প্রজা আইন সভার সদস্য নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠনে দেনদরবারে সফল হন। এটা খুব সাধারণ অর্জন ছিল না। কিন্তু এ ধরনের জোড়াতালির সরকার টিকে থাকতে পারেনি। ঐ সরকার শপথ গ্রহণের আগেই বসু গ্রেফতার হন এবং তাঁকে আটক করে রাখা হয়। বসু এ সময় দৃশ্যের বাইরে চলে যাওয়ায় ফজলুল হকের প্রতি ঘৃণা পোষণকারী এবং 'পঞ্চম বাহিনী' ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রতি গভীরভাবে অবিশ্বাসী বাঙলার গভর্নর জন হার্বার্ট তাই অতি সহজে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে শ্যামাপ্রসাদকে কাজে লাগান এবং ফজলুল হক যাতে পদত্যাগ করেন তার পরিকল্পনা করেন।[১৪] এসব সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন কংগ্রেস নেতার মধ্যে বসু ছিলেন একজন যাঁর সঙ্গে মুসলমান নেতারা একসঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী ছিল। তবে বসু ও তাঁর বামপন্থী মিত্ররা আর কখনও বেঙ্গল কংগ্রেসে নেতৃত্বের আসন লাভ করতে পারেনি; দেশ-বিভাগের পূর্বেকার সংকটময় বছরগুলোতেও তাই তারা বাঙলার রাজনীতিতে প্রভাব রাখতে ব্যর্থ হন। যেসব কারণে তাঁরা এটা পারেননি তা নিচে আলোচনা করা হল।

কেন্দ্র ও প্রদেশ: বেঙ্গল কংগ্রেস বশীকরণ

ত্রিশ দশকের শেষ দিকে বেঙ্গল কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি নেতৃত্বের সাথে এক বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। এর ফলে সর্ব-ভারতীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে দলে আবারও বিভক্তি দেখা দেয়। ঐ ঘটনার পর নাটকীয়ভাবে সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির ত্রিপুরী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসুকে কংগ্রেস দল থেকে বহিষ্কার করা হয়, এসব বিষয়ে যথেষ্ট দলিলপত্রাদি আছে।[১৫] এখানে সেসব কথা আলোচনা করা হবে না, বরং ঐসব ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে বাঙলার রাজনীতি এবং সম্প্রদায়গত ধারায় সংশ্লিষ্ট দলীয় রাজনীতির মেরুকরণের বিষয়টি এখানে পর্যালোচনা করা হবে।

১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস হাই কমান্ডের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে তাঁর ইচ্ছার কথা ঘোষণা করে এক ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটান। কনিষ্ঠ বসু ইতিমধ্যে ১৯৩৮ সালে দলের সভাপতি হিসেবে একটা বছর সাদামাটাভাবে পার করেন। ঐ সময় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মনে করেন যে, তাঁরা দলের বামপন্থী অংশকে শান্ত করার জন্য তাঁকে যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছেন। সুভাষ বসুর আন্দোলন ও ১৯৩৯ সালে ঐ পদে তাঁর পুনর্নির্বাচনে সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেসে বামপন্থী অংশের ক্ষমতা প্রতিফলিত

হয়। ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের বিদ্রোহের মনোভাবও ঐ ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। গান্ধীর কিছুটা নৈতিক প্ররোচনায় ঐ বিদ্রোহ অবশ্য শক্ত হাতে দমন করা হয়; কংগ্রেসের কোলাহলপূর্ণ ত্রিপুরী অধিবেশনে বসু দলের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এর অল্প কিছুদিন পরই তাঁকে ও তাঁর ভাই শরৎচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়।

বাঙলায় প্রাদেশিক কংগ্রেসের মধ্যে বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুসারী একেবারে নগণ্য ছিল না। তাঁদের সমর্থকদের মধ্যে ছিল কমিউনিস্ট ও সোসালিস্টরা, সন্ত্রাসী অনুশীলন দলের পুরানো অনেক সদস্য ও যুগান্তর গ্রুপের একটা অংশ।[৯৬] এছাড়া ছিল ক্রমবর্ধমান বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, যারা ১৯৩৯ সালে আন্দামানে থাকা রাজবন্দিদের মুক্তির আন্দোলনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৯৭] তদুপরি, হাই কমান্ডের বিরুদ্ধে বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের বিদ্রোহকে বাঙলায় সাধারণভাবে প্রশংসা করা হয়। তবে তা দলের ডানপন্থীদের স্বৈরাচারীভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের প্রতি আন্তরিক ঘৃণাবশত, না কি কেবল স্থানীয় স্বদেশপ্রেম থেকে উৎসারিত ছিল সেটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।'[৯৮] বাঙলায় স্বদেশপ্রেমীদের বৃহত্তর পরিধিতে অবশ্য তা ব্যাপক সমর্থন লাভ করে।[৯৯] দল থেকে বহিষ্কারের এক বছরেরও বেশি সময় পর্যন্ত বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের সমর্থকেরা তাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে এবং তারা প্রদেশে একটা সমান্তরাল 'কংগ্রেস' গঠন করে। হাই কমান্ডের অনুমোদন ছাড়াই দলের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

বেঙ্গল কংগ্রেসের জন্য এসব কিছুই ছিল একটা সাধারণ ব্যাপার – এর দীর্ঘ ইতিহাস হল দলাদলি ও কেন্দ্রের সাথে বিরোধের ইতিহাস। তবে নতুন যে প্রয়াস দেখা দেয় তা হল বিদ্রোহী অংশকে গুঁড়িয়ে দিতে কেন্দ্রের দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতা। নেতৃত্বের প্রতি সংঘবদ্ধ চ্যালেঞ্জে বিচলিত হয়ে দলের মূল শক্তি (ওল্ড গার্ড) এখন আর প্রদেশের উচ্ছৃঙ্খলা – যা থেকেই কিনা বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়; সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না।[১০০] নতুন সভাপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের অধীন ওয়ার্কিং কমিটি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করে যে, ইস্যুটা হচ্ছে 'এক দিকে বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ও তার নির্বাহী এবং অন্য দিকে ওয়ার্কিং কমিটির মধ্যকার সম্পর্ককে নিয়ে; এই সম্পর্ক তাদের মধ্যে থাকতেই হবে। এটা বাধ্যতা ও আনুগত্যের মতো সাধারণ ইস্যুকে কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছে, অথচ ওয়ার্কিং কমিটি সেটা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কাছ থেকে পাওয়ার অধিকারী।'[১০১] এর পরপরই বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি অনুগত বেঙ্গল কংগ্রেসের সব সদস্যকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়।[১০২] যাদের হাই কমান্ডের প্রতি অনুগত থাকার প্রতিশ্রুতি ছিল তাদেরকে নিয়ে নতুন প্রাদেশিক কমিটি পুনর্গঠিত করা হল। অনিবার্যভাবে এর ফল হল বিশৃঙ্খলা। এ সম্পর্কে তদন্ত কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে:

> প্রদেশের কংগ্রেস সংগঠনটি বড় ধরনের বিশৃঙ্খলার মধ্যে আছে। প্রাদেশিক সেক্রেটারি বিদ্রূপ করে প্রাদেশিক ট্রাইব্যুনালকে, জেলা প্রেসিডেন্ট তার নিজের সেক্রেটারির নির্দেশ

> বাতিল করে দেয়, মহকুমা বিদ্রোহ করে প্রাদেশিক সেক্রেটারির বিরুদ্ধে এবং বিভিন্ন সমিতি বা গোষ্ঠী ট্রাইব্যুনালের কাজে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে ... বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটির বৈধতা নিয়ে বিরোধের শেষ নেই এবং সমান্তরাল কংগ্রেস কমিটির সংখ্যাও অনেক।[১০৩]

এ ধরনের অবস্থা সহ্য করার ইচ্ছা বল্লভ ভাই প্যাটেল ও ওয়ার্কিং কমিটির ছিল না। ১৯৩৯ সালের জুন মাসে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির এক সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবের মাধ্যমে তিনি অধীনস্থ কংগ্রেস কমিটিগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য একটা উদ্যোগ নেন। ঐ প্রস্তাব মোতাবেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অনুমতি ছাড়া কংগ্রেস নেতা-কর্মীকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করতে নিষেধ করা হয়।[১০৪] এরপর, এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে প্যাটেল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলোর সেক্রেটারিদের কাছে একটি সার্কুলার জারি করেন। ঐ সার্কুলারে বলা হয়:

> তাঁর দৃষ্টিতে এসেছে যে, বিভিন্ন এলাকার অধীনস্থ কংগ্রেস কমিটিগুলো সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে প্রস্তাব পাস করছে। অধীনস্থ সংগঠনগুলো যদি সর্বোচ্চ সংগঠনের কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে তাহলে কংগ্রেস সংগঠনে শৃঙ্খলা থাকবে না। এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত কাজের বিরুদ্ধে অধীনস্থ কংগ্রেস কমিটিগুলোকে সতর্ক করার জন্য তিনি সব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে অনুরোধ করছেন।[১০৫]

নতুন ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে ওয়ার্কিং কমিটি বেঙ্গল কংগ্রেসের অবাধ্য লোকদের শৃঙ্খলায় আনার কাজ শুরু করে। স্বনামধন্য বাঙালি গান্ধীবাদী সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে একটি 'ইলেকশন ট্রাইব্যুনাল' গঠন করা হয় এবং খাদি প্রতিষ্ঠান অঙ্গনে ঐ ট্রাইব্যুনালের কোলকাতা অফিস করা হয়। এখন থেকে ইলেকশন ট্রাইব্যুনালকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মক্কেলের মর্যাদাসম্পন্ন বলে প্রচার করা হয়। ঐ ট্রাইব্যুনালকে পরবর্তী বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নির্বাচনের জন্য নির্বাচক তালিকা প্রস্তুত করার কথা বলা হয়। ট্রাইব্যুনাল তার ক্ষমতা বলে সমান্তরাল সব কংগ্রেস কমিটি থেকে সুভাষ ও শরৎ বসুর অনুগত বলে পরিচিত সদস্যকে নির্বাচক তালিকা থেকে বাদ দেয়।[১০৬] এর ফলে এক বছরব্যাপী তিক্ত বিরোধ ও বিশৃঙ্খলার পর বিরুদ্ধ মত পোষণকারীদের দল থেকে বিতাড়িত করে কেন্দ্রীয় কমিটির আজ্ঞাবাহীরূপে বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সৃষ্টি হয়। ১৯৪০ সালের মে মাস নাগাদ বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নির্বাহী পরিষদ 'সত্যাগ্রহ কমিটি'তে রূপান্তরিত হয়।[১০৭] বাঙলায় জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে অনেক কংগ্রেস সংগঠন ছিল। বাঙালি কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের কাছে সত্যাগ্রহ কখনও বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল না। বি. সি. রায় একবার গান্ধীকে 'সত্যাগ্রহ আন্দোলন' থেকে বাঙালিদের অব্যাহতি দেওয়ার অনুরোধও করেন। দলটি এখন কেন্দ্রের শক্ত হাতের মুঠোয় আসায় প্রদেশের ওপর সত্যাগ্রহ আন্দোলন চাপিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও কোনো প্রতিবাদের কথা শোনা গেল না।[১০৮] স্থানীয় কংগ্রেস সংগঠনগুলো সত্যাগ্রহ পছন্দ করুক বা না করুক, তাদেরকে দলের নীতি

অনুসরণ করতে হল অথবা কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের মুখোমুখি হতে হল। সিলেটের একজন বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য অভিযোগ করেন:

> সিলেট জেলা কংগ্রেস কমিটি সত্যাগ্রহ কমিটিতে রূপান্তরিত হয়েছে। জেলা কংগ্রেস কমিটির কর্মকর্তারা ন্যাশনাল ফ্রন্ট গ্রুপের (এম. এন. রায়-এর নেতৃত্বাধীন) সাথে সংশ্লিষ্ট। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কৌশলের ওপর তাদের কোনো বিশ্বাস নেই, চরকার কথা তো অনেক পরে। কিন্তু কংগ্রেস সংগঠনের ওপর ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য তারা অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করে, এটা যে তাদের পালন করতে হবে সেটা তারা আগে চিন্তা করেনি।[১০৯]

এ ধরনের প্রতীকী আনুগত্যকে প্রতিরোধ করতে ওয়ার্কিং কমিটির কোনো ক্ষমতা না থাকলেও সুভাষ বসুর অনুসারীদের দলের বাইরে রাখার ক্ষমতা কমিটির ছিল। দলের শূন্য পদ পূরণ করতে আগ্রহী বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস নির্বাহী কমিটি অনুতপ্ত বিদ্রোহীদের দলে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য হাই কমান্ডের কাছে অনুরোধ করে:

> আমাদের মত হল, এখন অনুতপ্ত লোকদের দলে ফিরিয়ে আনার জন্য কিছু পন্থা উদ্ভাবন করা যুক্তিযুক্ত হবে। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বিদ্রোহের জন্য যারা ভুল করেছে এবং নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে তাদের মধ্যে অনেক ভালো লোক আছে। তাদের যদি বাঙলায় কংগ্রেস সংগঠনের পতাকাতলে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে সংগঠন শক্তিশালী হবে।[১১০]

কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ক্ষমা করার ও ভুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে-কারণে ঐ আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে বেঙ্গল কংগ্রেসের সার্বিক কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে যায়, দল থেকে বিদ্রোহের সব চিহ্ন মুছে ফেলা হয় এবং এক সময় কলহের জন্য যে দলটি কুখ্যাত ছিল সেটি বিশ্বাসজনকভাবে অনুগত হয়। চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর থেকে বাঙলার কংগ্রেস রাজনীতিতে প্রথমে বিরোধ মীমাংসার ভূমিকায় হাই কমান্ড অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে – ক্রমাগতভাবে নিজের লোকদের বিভিন্ন পদে বসাতে শুরু করে। বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে কিছু বাঙালি কংগ্রেস নেতা-কর্মী ওয়ার্কিং কমিটির এই স্বেচ্ছাচারমূলক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। বাঙলার প্রতি আচরণে অনেকের মতে হাই কমান্ড যে স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের প্রকাশ ঘটায় সুভাষ এবং শরৎ বসু সে-ব্যাপারে অধিকাংশ বাঙালির ক্রোধের প্রকাশ ঘটান বছরের পর বছর ধরে হাই কমান্ডের বিরোধিতা করার মধ্য দিয়ে, তাঁদের অনুসারীদের একত্র করে। কেন্দ্রের 'একনায়কত্বের' বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা তাদের ঐক্যবদ্ধ করে। ১৯৩০-এর দশকে বসু গ্রুপের প্রতি বামপন্থী অনেক লোক আকৃষ্ট হয়। এর ফলে সুভাষ ও শরৎ বসু মনে করতে শুরু করেন যে, বাঙালি রাজনীতির সাম্প্রদায়িক অচলাবস্থা ভাঙতে 'গণসংযোগ' হল একমাত্র উপায়।

১৯২৭ সালে বসু গ্রুপ হয়ত একটা উপদলের থেকে কিছুটা বেশি ছিল এবং যার লক্ষ্য ছিল বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ও কর্পোরেশনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু

ত্রিশ দশকের শেষ দিকে ঐ 'উপদল' একটা দলে পরিণত হয় এবং দলের সদস্য সংখ্যা ছিল সন্তোষজনক। তারা এই বিশ্বাসে একতাবদ্ধ ছিল যে, বাঙলার সমস্যার বাঙালি সমাধান খুঁজতে হবে। মুসলিম নেতাদের সাথে ঐক্যের একটা ভিত্তি রচনায় ও দলের সামাজিক ভিত্তি বিস্তৃত করার জন্য বসু ভ্রাতৃদ্বয় গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে, সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধানের চেয়ে সামাজিক সমস্যার সমাধানই হল উৎকৃষ্ট উপায়। তাই ক্রমাগতভাবে তাঁরা দলকে বামপন্থী ধারার দিকে পরিচালিত করেন। ত্রিশ দশকের শেষ দিকে বসু গ্রুপ বিভিন্ন ধরনের বামপন্থী সংগঠনকে দলের দিকে আকৃষ্ট করেন, বাঙলা প্রদেশে ঐসব বামপন্থী সংগঠন আগের দশকে গড়ে উঠেছিল। দলের এসব নতুন সদস্য দলকে প্রধানত ভদ্রলোক আবর্ত থেকে বের করে 'জনগণের' কাছে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। এ দশকের শেষ দিকে বসু গ্রুপ বাঙালি রাজনীতিতে একটা বিস্তারিত বিকল্প কৌশল তুলে ধরেন। ঐ কৌশলের বৈশিষ্ট্য ছিল – বাঙলার রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ নীতির প্রতি অঙ্গীকার। বসু গ্রুপ যদি টিকে থাকত তাহলে তারা হয়ত প্রদেশে অতি দ্রুত গড়ে ওঠা সাম্প্রদায়িক কাঠামোকে ভেঙ্গে ফেলতে পারত।

কিন্তু ১৯৩৯ সালে এই গ্রুপকে সমূলে বেঙ্গল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়। শেষে ১৯৪০-এর দশকে ঐ গ্রুপ একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে বাঙলার কংগ্রেস সংগঠন তার অধিকাংশ ধর্মনিরপেক্ষ সদস্যকে হারায়। চল্লিশ দশকের বেঙ্গল কংগ্রেস ছিল নিঃসন্দেহে একটা নিয়মানুবর্তী সংগঠন; হাই কমান্ড বেঙ্গল কংগ্রেসকে যথার্থ অনুগত দলে পরিণত করে। কিন্তু এই দল সংগঠনের দিক থেকে তখন যে কোনো সময়ের তুলনায় অধিকতর হিন্দু ও চারিত্রিক দিক থেকে রক্ষণশীল হয়ে পড়ে। ১৯৪০ সালে সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি তার বাঙলা অংশকে এই মর্মে নির্দেশ দেয় যে, তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে – 'নিষ্ক্রিয় সত্যাগ্রহী হিসেবে এই খেয়াল রাখা যে, তারা নিজেরা শ্রমিক, কিষান ও ছাত্র ধর্মঘট করছে না।'[১১১] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেও এই কড়া নিয়ন্ত্রণ বলবৎ ছিল। ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচন নিকটবর্তী হওয়ার সময়ও বেঙ্গল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কর্মকর্তারা কংগ্রেসের সদস্য পদ ও নির্বাচনে প্রার্থিতা না দিয়ে বিদ্রোহীদের থেকে দলকে মুক্ত করছিল। আইন সভার গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেস সদস্য ড. নলিনাক্ষ সান্যাল ছিলেন গণ-সংযোগ কর্মসূচির একজন স্পষ্ট সমর্থক। তিনি একাধিক জনসভায় 'কমিউনিস্টদের কংগ্রেসের পতাকাতলে কাজ করার অনুমতি দানের বিষয়টি জোরেশোরে সমর্থন করেছিলেন।'[১১২] কংগ্রেস ১৯৪৫ সালের নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী পদে মনোনয়ন দেয়নি।[১১৩] নিজেদের সদস্যদের যাতে চাঁদাপ্রদানকারী সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্ত না করতে পারে সে-জন্য চাঁদা পরিশোধকারী কংগ্রেস সদস্য হিসেবে বামপন্থীদের প্রতি সহানুভূতি আছে এমন সন্দেহজনক কোলকাতার অনেক কমিটিকে রসিদ বই দেওয়া হয়নি।[১১৪] নব যুবক সেবা সমিতির মতো অগণিত ছাত্র গ্রুপ যারা বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি অনুগত ছিল তাদের সংগঠনের বাইরে রাখা হয়।[১১৫] মুর্শিদাবাদ থেকে এ. কে. ভট্টাচার্য ওয়ার্কিং কমিটির কাছে অভিযোগ করেন:

বাঙলায় কংগ্রেসের শীর্ষ পদে যাঁরা আছেন তাঁরা দলের সদস্য বাড়াতে আগ্রহী নন বলে মনে হয় ... তথাকথিত 'খাদি-গ্রুপ' ছাড়া সদস্য অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে, বিশেষ করে ফরোয়ার্ড ব্লক সমর্থকদের, প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত করা হচ্ছে। আমার আরও বলা উচিত যে, বাঙলায় 'খাদি-গ্রুপ' আদৌ সত্যিকার খাদি নয়।'[১১৬]

কিন্তু এ জন্য তিনি হাই কমান্ডের কাছ থেকে কঠোর ব্যবহার পান। তিনটি টেলিগ্রাম ও দুটো চিঠি পাওয়া সত্ত্বেও ওয়ার্কিং কমিটি তাঁর অভিযোগের তদন্ত করতে অস্বীকার করে এবং তাঁকে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাথে যোগাযোগ করতে বলে।[১১৭] উল্লেখযোগ্য যে, কংগ্রেসে থাকা আশরাফউদ্দিনের মতো কিছু মুসলমানকে পরিণামে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৪৫ সালে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আশরাফউদ্দিন লক্ষ করেন যে, বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট ছিল তাদের সাথে শত্রুতা করার পুরানো দৃষ্টিভঙ্গি এখনও আছে। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি লেখেন:

মুক্তি পাওয়ার পর আমি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করছি যে, কর্মী ও জেলে কষ্টভোগকারীদের সঙ্গে ... বর্তমান বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কর্মকর্তাদের সহযোগিতা প্রায় নেই। এ জন্য আমার গভীর দুঃখ হয়। বর্তমান বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির হাবভাব ও আচরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমরা যারা পুরানো বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাথে এবং বিশেষ করে ফরোয়ার্ড ব্লক অনুসারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলাম তারা প্রদেশ কংগ্রেসের বর্তমান কর্তাব্যক্তিদের কাছে অসহ্য ... (ওয়ার্কিং কমিটির) নেতাদের কাছে আমি জানতে চাই, আমাদের ব্যাপারে তাঁরা কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অতীতের কাজের জন্য আমাদের কি কংগ্রেস থেকে বের করে দেওয়া হবে?[১১৮]

টিপেরা জেলার গোপীনাথপুর প্রাইমারি কংগ্রেস কমিটির মুসলমান প্রেসিডেন্ট ফজলুল করিম চৌধুরীকে প্রথমে কংগ্রেসের সদস্য পদ দিতে অস্বীকার করা হয়। টিপেরা ছিল একটা মুসলিমপ্রধান জেলা, যেখানে কংগ্রেস ত্রিশ দশকের শেষ দিকে তার ভিত্তি গড়ে তোলে। স্থানীয় মুসলমানদের আস্থাভাজন ফজলুল করিম চৌধুরীর মতো একজন মুসলমানকে তাই কংগ্রেস দলে অন্তর্ভুক্ত করে। তিনি আইন সভার নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং টিপেরা কৃষক সমিতির প্রার্থীর কাছে সামান্য ভোটের ব্যবধানে (৮৬৩ ভোটে) পরাজিত হন।[১১৯] বামপন্থীদের প্রতি সহানুভূতির কারণে তিনি দেখতে পান যে বেঙ্গল কংগ্রেসে তাঁর জন্য কোনো স্থান নেই। স্পষ্টভাবে এর কারণ তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়: 'আপনি এমন এক কর্মীদলের সাথে সংশ্লিষ্ট যারা 'জনযুদ্ধে'র পক্ষে জাতীয়তাবাদ বিরোধী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে ... ১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময় থেকে।'[১২০] অন্য একটি ঘটনায় দেখা যায়, বসু নিয়ন্ত্রিত হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটি একজন মুসলমানকে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করলেও ওয়ার্কিং কমিটি ঐ মনোনয়ন বাতিল করে দেয়।[১২১] এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু স্বার্থ রক্ষাকারী দল হিসেবে পরিচিত বাঙলায় কংগ্রেস পার্টিকে মূলত রক্ষণশীল ও হিন্দু চরিত্রের দল বলে পরিচিতি দেওয়া হয়। সুতরাং এটা মোটেও বিস্ময়কর নয় যে, ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে বেঙ্গল কংগ্রেস মাত্র

দু'জন মুসলমান প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়। এর মধ্যে একজন হলেন টি. এ. এন. নবী, তিনি প্রার্থী হন মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর থেকে। তিনি মাত্র ১৬১টি ভোট পান, অথচ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগ প্রার্থী পান ১৭ হাজার ভোট। অন্য প্রার্থী ছিলেন আইন সভার স্পিকার সৈয়দ নওশের আলী। দু'টি নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রার্থী তিনি হন – একটা যশোর সদর এবং অন্যটা যশোর পূর্ব। যশোর সদরে তিনি পান মাত্র ১৬১৬ ভোট, আর যশোর পূর্ব কেন্দ্রে পান ৫৭৪৩ ভোট। উভয় কেন্দ্রেই তিনি তাঁর মুসলিম লীগ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন। উভয় কেন্দ্রেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা ভোট পান ত্রিশ হাজারেরও বেশি করে।[১২২]

গালাঘের (Gallagher) মনে করেন যে, বেঙ্গল কংগ্রেসের পতন হয় ত্রিশের দশকে[১২৩] এবং কংগ্রেস মূল লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। অপর পক্ষে, ঐ সময়ে বসু গ্রুপ দলের ওপর শুধু তাদের শক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতেই সফল হয়নি, তারা দলকে বৃহত্তর সামাজিক ভিত্তিতে দাঁড় করিয়ে একে আরও গতিশীল করতে ও একটা নতুন রাজনৈতিক কর্মসূচি দিতে সক্ষম হয়। ত্রিশ দশকের শেষ দিকে কংগ্রেস এমন এক যোগ্য দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় যা বাঙালি রাজনীতিতে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হিসেবে উদ্যোগ নিতে ইচ্ছুক ও সক্ষম ছিল। কিন্তু ১৯৩৯ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতা লাভে সুভাষের ব্যর্থতা বাঙলার জন্য চরম বিপর্যয় ডেকে আনে; চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে বেঙ্গল কংগ্রেসের 'কর্মকর্তা' থেকে পুরো বসু গ্রুপের বহিষ্কারের অর্থ হল বাঙলার হিন্দু নেতৃত্বের মধ্য থেকে ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল নেতৃত্বকে দল থেকে বের করে দেওয়া। কংগ্রেস দল তখন থেকে ক্রমবর্ধমানভাবে হিন্দু স্বার্থ রক্ষার প্রধান দল হিসেবে গণ্য হতে থাকে।

ভদ্রলোকি সাম্প্রদায়িকতাবাদ এবং বেঙ্গল কংগ্রেস

ত্রিপুরী অধিবেশনের পর বাঙলায় কংগ্রেস অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সাম্প্রদায়িক অবস্থান গ্রহণ করে, এর জন্য মূলত দায়ী দলীয় ব্যাপারে ওয়ার্কিং কমিটির হস্তক্ষেপ। অবশ্য এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রদেশ কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ চাপের ফলে দলের নীতিতেও ঐ পরিবর্তন ঘটে। বেঙ্গল কংগ্রেস সব সময় হিন্দু ভদ্রলোক স্বার্থের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। গণসংযোগ আন্দোলনের সময় ঐ স্বার্থের বিষয়টি কিছুটা প্রাধান্য হারালেও দলের ওপর ঐ ভদ্রলোকদের প্রভাব আগের মতোই অক্ষুণ্ন ছিল। দলের সামাজিক ভিত্তি বাড়াবার জন্য শরৎচন্দ্র বসুর প্রয়াস সম্পর্কে বেঙ্গল কংগ্রেসের মধ্যে অনেক লোকই ভীত হয়ে পড়ে। ১৯৩৮ সালে প্রজাস্বত্ব আইন কার্যকর হওয়ার পর খাজনা আদায়ের পরিমাণ আরও কমে যায়।[১২৪] কৃষকদের খাজনা না দেয়ার আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য দলের মফস্বল জমিদারেরা বামপন্থী কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের ওপর ক্ষিপ্ত হয় এবং তাদের কর্মকাণ্ডে ভীত হয়। যশোর কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট স্বীকার করেন যে, তিনি উদ্বিগ্ন কারণ 'তাঁর দল বাম ধারার দিকে ঝুঁকে পড়ছে এবং এর ফলে তিনি (এবং তাঁর মতো অন্যরা) অসহায় ও নিরুপায় হয়ে পড়বেন।'[১২৫] একই ধরনের ভীতির কথা প্রকাশ পায় হুগলী জেলা ভূমি মালিক সমিতির এক সভায়। সমিতির প্রেসিডেন্ট ঐ বৈঠকে ঘোষণা করেন:

... দুঃখের সাথে আমাকে এ কথা বলতে হচ্ছে যে, আমাদের প্রজাদের মধ্যে সাম্যবাদ ও কমিউনিজমের মতবাদ প্রচার করে বাঙলায় কংগ্রেস আমাদের দুরবস্থায় ফেলার চেষ্টা করছে। এর ফলে প্রদেশের অধিকাংশ এলাকায় খাজনা না দেওয়ার মনোভাব দেখা দিয়েছে। দুঃখের বিষয় যে, কংগ্রেস নেতারা তাদের বামপন্থীদের ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।[১২৬]

স্থানীয় অনেক কংগ্রেস সংগঠনে কৃষক আন্দোলন বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, এর ফলে বহু জায়গায় কংগ্রেস কমিটিতে ভাঙ্গন দেখা দেয়। বর্ধমান জেলার বিভিন্ন এলাকায় যেখানে 'আগের মতোই কৃষক আন্দোলন অব্যাহত ছিল' সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে ১৯৩৯ সালের মে মাসে গভর্নর উল্লেখ করেন যে, '(কংগ্রেস) কৃষক আন্দোলনকারী ও মূল কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে।'[১২৭]

একইভাবে অনেকের কাছেই বিরোধী দলনেতা হিসেবে শরৎ বসুর দায়িত্ব পালন হতাশাজনক ছিল। বামপন্থী ধারায় বিরোধী দলকে পরিচালিত করে সরকারের পতন ঘটানো যায়নি। অনেকে মনে করেন, শরৎ বসুর যা করা উচিত ছিল তা তিনি ঐ বামপন্থী ধারার কারণে করতে পারেননি; হিন্দু ভদ্রলোকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে সরকারের আইন প্রণয়নের বিপক্ষে তিনি ফলপ্রসূ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। একজন পর্যবেক্ষক উল্লেখ করেন যে আইন সভায় তাঁর দল 'দুই সুরে কথা বলতে' বাধ্য হয়। 'মুসলমানদের সমর্থন লাভ করার জন্য তাদের এক সুরে কথা বলতে হয়, আবার অমুসলিমদের কায়েমি স্বার্থ রক্ষার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাদেরকে অন্য সুরে কথা বলতে হয়। মিটমাটের অযোগ্য এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সেতুবন্ধের জন্য শরৎ বসুর প্রয়াস আইন সভায় হিন্দু প্রতিনিধিত্বের কার্যকারিতাকে ব্যাপকভাবে নিষ্ফল করে দেয়।'[১২৮] এ অবস্থা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় ১৯৩৯ সালে বেঙ্গল মানিলেন্ডার্স বিল উপস্থাপনের মাধ্যমে। অনেক 'উত্তপ্ত আলোচনা'র পর কংগ্রেস পার্টি তাদের 'হঠকারী লোকদের চাপে পড়ে'[১২৯] বিলটি 'বিবেচনার জন্য বিরোধিতা না করার এবং এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যাতে ঐ প্রচেষ্টাকে মহাজনদের স্বার্থে কংগ্রেস সদস্যদের দীর্ঘসূত্রতার চেষ্টা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হতে পারে'।[১৩০] *অমৃত বাজার পত্রিকা* তার অনেক ভদ্রলোক পাঠকদের জন্য এ কথা ঘোষণা করে বলে যে, ঐ সিদ্ধান্ত 'আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে দিয়েছে':

এ বিষয়ে কংগ্রেস পার্টি তার নির্বাচকমণ্ডলীর মতামতের প্রতি সম্মান দেখিয়েছে কি না সে-কথা কি আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি? ঐ মতামত সহজে নির্ণয় করা যেত এবং আসলে তা স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কোনো জাতীয়তাবাদী পত্রিকা ঐ বিলকে সমর্থন করেনি ... কংগ্রেস পার্টির সদস্যদের যদি তাদের নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি কোনো দায়িত্ববোধ থাকত তাহলে সর্বশক্তি দিয়ে তাদের ঐ বিলের বিরোধিতা করা উচিত ছিল ... এক্ষেত্রে কংগ্রেস পার্টির কিছু মিত্র কৃষক প্রজা গ্রুপ মহাজনি বিলকে সর্বাত্মক সমর্থন দিয়েছে। তাদের শান্ত করার জন্য অথবা যে কোনো মূল্যেই হোক

তাদের সমর্থন বজায় রাখার জন্যই কংগ্রেস কি এ ধরনের কোনো অঙ্গীকার না করার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে?[১৩১]

পরিশেষে ঐ বিলের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেন দেবীপ্রসাদ খৈতান নামে একজন মাড়োয়ারি শিল্পপতি।[১৩২] মহাজনি বিলের সাধারণ ধারাগুলো[১৩৩] একটা ইস্যুতে পরিণত হয়, কেননা তা মফস্বলের ঋণ প্রদানকারী জমিদার ও পেশাগত মহাজনদের মতো বাঙলার শহর এলাকার ব্যবসায়ী ও ধনিক শ্রেণীর লোকদের ক্ষতিগ্রস্ত করে। অতীতে এই উভয় গ্রুপই কংগ্রেসকে অতি প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে সহায়তা করেছে। মহাজনি বিলকে কংগ্রেস চ্যালেঞ্জ ছাড়াই পাস হওয়ার সুযোগ দিলে শহর ও পল্লি এলাকার আর্থিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট লোকেরা মনে করতে শুরু করে যে, তাদের বিনিয়োগ থেকে যে লাভ তারা পাওয়ার অধিকারী তা শরৎ বসুর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস তাদের দেবে না। কংগ্রেস যদি আইন সভায় জমিদারি ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থের ব্যাপারে মনোযোগ না দেয় অর্থাৎ এই 'বিশেষ স্বার্থের' কোনোটির দিকেই মনোনিবেশ না করে, তাহলে আইন সভায় পৃথক ৫টি আসন নিয়েই তারা হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। তাই এতে অবাক হবার কিছু নেই যে, ১৯৩৯ সালে গভর্নর হিসেবে নিযুক্তির পর জন হার্বার্টকে 'শুধু জমিদারদের মর্যাদার বিষয়ে নয়, মূলধন ও কায়েমি স্বার্থের বিষয়ে' হিন্দুদের দুশ্চিন্তার মুখোমুখি হতে হয়।[১৩৪]

গণসংযোগ কর্মসূচির উদ্যোগে আশংকাগ্রস্ত হয়ে জমিদারি ও ব্যবসায়ী গ্রুপের লোকেরা শরৎ বসুর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস পার্টিকে সমর্থন করার বিষয়টি নতুন করে ভাবতে শুরু করে। তারা বিকল্প খুঁজতে থাকে। ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে ভারপ্রাপ্ত গভর্নর রবার্ট রিড দিল্লীকে জানান:

> কংগ্রেসের বাইরে একটা নতুন দল গঠনের কথা শোনা যাচ্ছে। ঐ দলে বসু ভ্রাতৃদ্বয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। ঐ দল ব্যবসায়ীসুলভ নীতি গ্রহণ করে হিন্দু স্বার্থের ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মনোনিবেশ করবে। সম্ভবত এ কথা সত্য যে, অনেক হিন্দু সুভাষ বসুকে ভীষণভাবে অবিশ্বাস ও অপছন্দ করে। তাঁর ভাই শরৎ বসুর প্রতি অবিশ্বাস কিছুটা কম হলেও মুসলমানদের ভাঙন ধরাতে অথবা সম্প্রদায় হিসেবে হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষার কাজটি তিনি অতি সমালোচিত হিন্দু মন্ত্রীদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন; নেতৃত্বের এই ব্যর্থতার ফলে আইন সভায় তিনি সমর্থন হারিয়েছেন।[১৩৫]

রিড-এর ধারণা 'ব্যক্তিগত কারণে বসু ভ্রাতৃদ্বয় ভারতের অন্যান্য এলাকার মতো এখানেও অজনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন'।[১৩৬] কোলকাতায় দায়িত্ব গ্রহণের পর জন হার্বার্টও একই মত পোষণ করেন। তিনি দিল্লীকে জানান, 'নাজিমুদ্দিন বিশ্বাস করেন যে, বাস্তবে প্রায় সকল শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে সুভাষের অজনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে' ... আর '*অমৃত বাজার পত্রিকা*-র সম্পাদক তুষার কান্তি ঘোষ এই ধারণাকে সমর্থন করেন'।[১৩৭]

বসুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের প্রতি মফস্বল ও কোলকাতার হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীর ব্যাপক পরিমণ্ডলে উত্তরোত্তর অসন্তোষ বৃদ্ধি স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন জেলায়, এমনকি,

আন্দামানকে নিয়ে অনশন ধর্মঘটের ঘটনায়ও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিগুলো থেকে বসু ভ্রাতৃদ্বয় যথেষ্ট উৎসাহ বা সমর্থন পাননি। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের এক সময়কার মূল কেন্দ্র মেদিনীপুরেও স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক রাজবন্দিদের ধর্মঘটের সমর্থন করাকে বাতিল করে দেয়। এখন থেকে মেদিনীপুর কংগ্রেস কমিটি 'মধ্যপন্থী শাসনতান্ত্রিক দল' হিসেবে পরিচিত হয় এবং ঐ দলের নেতৃত্ব নেয় 'ডানপন্থী' লোকেরা।[১৩৮] মেদিনীপুর দলের এই পরিবর্তন যৌক্তিকভাবে ভদ্রলোকদের রাজনৈতিক সহানুভূতির পরিবর্তনকে স্পষ্ট করে তোলে – রোমান্টিক বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের প্রতি সহানুভূতি থেকে অনেক বেশি বাস্তব ও সত্যিকার অর্থে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার দিকে এই পরিবর্তন ঘটে।[১৩৯]

নতুন আইন প্রণয়নের ফলে সব ভদ্রলোক সমানভাবে বা বস্তুতপক্ষে সরাসরিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তবে তাদের অধিকাংশই মনে করে যে, তাদের প্রভাব দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে – নতুন রাজনৈতিক ধারায় তাদের জীবন ও মূল্যবোধ হুমকির সম্মুখীন। এ যাবত অনেকে কংগ্রেসের সম্ভ্রান্ত রাজনীতিতে 'নিম্ন শ্রেণী'র লোকদের অন্তর্ভুক্তিতে হতাশ হয়ে পড়েছিল। ময়মনসিংহ যুগান্তর গ্রুপের সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ কুড়ির দশকে সুভাষ বসুর একজন গুণমুগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু ১৯৩৭ সালে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি বসুর সঙ্গ এড়িয়ে চলেন। 'কারণ আমি মনে করি যে তিনি ভুল পথে চলছেন। ... সুভাষের বাড়িতে আমি গিয়ে দেখি ইতর জন ও রাস্তার লোকে ভর্তি। তারা সেখানে ভিড় করে ছিল। আমি শরৎকে জিজ্ঞাসা করি – এরা কি আপনার অনুসারী ও সমর্থক? এরা তো রাজনৈতিক কর্মী নয়, এরা হল ইতর শ্রেণীর লোকজন।'[১৪০] অনেকে আবার কংগ্রেসের সদস্য পদ ও কর্মসূচিতে পরিবর্তনে ভীত হয়ে পড়ে। কোলকাতার বাঙালি ব্রাহ্মণ সভার সদস্যরা মনে করেন:

> কংগ্রেস তার পুরানো ধ্যান-ধারণা থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তার বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটেছে। এর রাজনৈতিক নেতারা ও তাদের অনুসারীদের অনেকেই এখন কম শিক্ষিত ও তাদের জানাশোনা কম। তারা আমদানি করা আধুনিক আইরিশ ইতিহাস, ইতালি ও অষ্ট্রিয়ার বিপ্লব, ফরাসি প্রজাতন্ত্রবাদ ও সোভিয়েত শাসন নিয়ে পড়াশোনা করে। পশ্চিমা সভ্যতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা তারা ভারতের ওপর প্রয়োগের চেষ্টায় আগ্রহী ... এটা করতে গিয়ে তারা ব্রাহ্মণ্যবাদী পুরোহিততন্ত্র ও জমিদারির মতো ভূস্বামীদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাতিল করতে চায় ... সামাজিক সংস্কারের নামে তারা হিন্দুত্ববাদের মূলে আঘাত করছে।[১৪১]

এ ধরনের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পুরানো ব্যবস্থার জন্য গভীর ও ব্যাপক দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয় – রাজনীতিতে 'অশিক্ষিত ও কম জানাশোনা ইতর শ্রেণীর লোকদের' প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় ভদ্র শ্রেণীর লোকদের ঘৃণা প্রকাশ পায়। পুরানো ধ্যান-ধারণার জগতকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার এই স্রোতকে সুভাষ ও শরৎ বসু থামিয়ে তো দেননি, উপরন্তু তাঁরা ঐ স্রোতকে আরও জোরালো করে দেন। এ জন্য অনেকে তাঁদেরকে ক্ষমা করতে পারেননি।

এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে হিন্দু সংবাদপত্রে। এ সময় অন্যান্য 'জাতীয়তাবাদী' সংবাদপত্রের সাথে সুর মিলিয়ে *অমৃত বাজার পত্রিকা* এমন অবস্থান গ্রহণ করে যা অনমনীয়ভাবে সাম্প্রদায়িক।[১৪২] 'হিন্দু স্বার্থকে উপেক্ষা' করার জন্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ঐ পত্রিকা বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে প্রচারণায় নেতৃত্ব দিতে থাকে। বসু পরিবারের পুরানো শত্রু তুষার কান্তি ঘোষ ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। বাঙলার রাজনীতিতে বসুদের প্রভাব ক্ষুণ্ন করার জন্য তিনি পর্দার আড়ালে সক্রিয় ছিলেন।[১৪৩]

এই প্রেক্ষাপটে বাঙলায় হিন্দু মহাসভা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বর ওয়েলিংটন স্কয়ারে জাফরান রঙের পতাকা উত্তোলন করে বীর সাভারকার কোলকাতায় মহাসভার উদ্বোধন করেন।[১৪৪] ভাইসরয়, যিনি ঐদিন ঘটনাক্রমে কোলকাতায় ছিলেন, তিনি লন্ডনে লেখেন যে, হিন্দু মহাসভা –

> যথেষ্ট উদ্দীপনা সহকারে আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে এবং কতকটা যেন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে এগোচ্ছে। তারা সবেমাত্র কোলকাতায় একটা বড় ধরনের মিটিং করেছে – ঐ মিটিং-এ তারা খুবই সাম্প্রদায়িক ধরনের ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নিন্দা করে একাধিক প্রস্তাব গ্রহণ করে। যেভাবে সব কিছু চলছে তাতে মহাসভা কংগ্রেসের কিছু শক্তি হরণ করতে সমর্থ হলে আমি অবাক হব না।[১৪৫]

বাঙলায় মহাসভা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। তিনি ছিলেন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ স্যার আশুতোষ মুখার্জীর পুত্র। ১৯২৯ সালে শ্যামাপ্রসাদ কাউন্সিলে যোগদান করেন একজন স্বরাজী হিসেবে। কিন্তু তিনি দু'বছর পর কংগ্রেস ত্যাগ করেন যখন তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে থাকেন যে, কংগ্রেস কার্যকরভাবে হিন্দু ভদ্রলোক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে না। ত্রিশের দশকে কর্পোরেশন ও আইন সভার স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে তিনি, তাঁর দৃষ্টিতে 'হিন্দু' স্বার্থ রক্ষার জন্য, তাঁর সর্বশক্তি নিয়োজিত করেন। কিন্তু এ কাজে তিনি নিজেকে অকার্যকর প্রমাণ করেন। ভদ্রলোক ক্ষমতার বিরুদ্ধে একটার পর একটা পরিষদীয় আঘাত প্রতিরোধ ছাড়াই অব্যাহত থাকায় মুখার্জী বাঙলায় এমন একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন যা তাঁর প্রচেষ্টাকে সহায়তা দেবে।[১৪৬] ভদ্রলোকেরা যেসব বিষয় নিয়ে চিন্তিত ছিল, ঠিক সেই বিষয়গুলো মহাসভা গ্রহণ করে – ঐ সব বিষয়ের মধ্যে অনেকগুলোর সমাধান বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিশেষভাবে ভদ্রলোকদের উদ্বেগের বিষয়গুলো সমাধানের জন্য মহাসভা তার প্রচারণা চালায়:

> হিন্দু জনগণকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে, সম্প্রদায় হিসেবে আমাদের অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের অধিকার ও স্বার্থ নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত হচ্ছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্ষতিকর সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ আমাদের অক্ষম করে দিয়েছে, আইন সভায় আমাদেরকে অসহায় অবস্থায় নিক্ষেপ করেছে, আর প্রদেশের প্রশাসন ও আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া আমাদেরকে দাসে পরিণত করেছে। সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধা ও যোগ্যতাকে উপেক্ষা করা হয়েছে

> এবং সাম্প্রদায়িক স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে হিন্দুদের জন্য সরকারি পদে নিয়োগের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রেও আমাদের অবস্থা সমানভাবে কষ্টকর হয়ে পড়েছে। হিন্দু মহিলারা নির্যাতিত হচ্ছে, হিন্দু ছেলে ও মেয়েদের অপহরণ করা হচ্ছে ... হিন্দু মন্দিরকে অপবিত্র করা হচ্ছে, হিন্দু প্রতিমা ধ্বংস করা হচ্ছে ... কংগ্রেসের মানসিকতা ও উদারতার বিভ্রান্ত প্রবণতা হিন্দু জীবন ও অগ্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করেছে – হিন্দুদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের অগ্রগতির জন্য এক দিকে ব্রিটিশ প্রশাসনের সহযোগিতা এবং অন্য দিকে কংগ্রেসের সমঝোতামূলক ও বশ্যতার মনোভাব হিন্দু জাতিকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে গলা টিপে হত্যা করছে।[১৪৭]

বাঙলায় মহাসভা কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে দেখা দেয় এবং অনেকে এ ধরনের বিকল্পের অপেক্ষায় ছিল। প্রচারণার প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে নতুন এই হিন্দু পার্টি চিরাচরিত কংগ্রেস সমর্থকদের এমন অনেকের সমর্থন লাভে সফল হয় যারা আইন সভায় তাদের স্বার্থ রক্ষায় শরৎ বসুর ব্যর্থতায় ও আইন সভার বাইরে 'প্রগতিশীলদের' সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতায় হতাশ হয়ে পড়েছিল। বড় ব্যবসায়ীরা প্রথমেই ঐ দলের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করে। কোলকাতার ধনাঢ্য মাড়োয়ারি পরিবারগুলো মহাসভার অর্থভাণ্ডারে উদারভাবে অর্থ প্রদান করে। যুগল কিশোর বিড়লার পরিবার অতীতে কংগ্রেসের অনেক উদ্যোগে গোপনে সহায়তা করেছিল।[১৪৮] যারা কোলকাতায় মহাসভার সম্মেলনে খরচ বহন করেছিল, ঐ পরিবার তাদের শীর্ষস্থানীয়। অর্থ দানকারীর তালিকায় শেঠ বংশীধর জালান, বদরিদাশ গোয়েঙ্কা ও রাধাকিশেন কনোড়িয়ার নাম দেখা যায়। খৈতান এ্যান্ড কোম্পানিও উদারভাবে অর্থ দান করে।[১৪৯] খৈতান এ্যান্ড কোম্পানির মালিক ছিল দেবীপ্রসাদ খৈতানের পরিবার। অনেক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর মতো দেবীপ্রসাদ খৈতান পাটের ফটকা ব্যবসা করে নিজের সৌভাগ্য গড়ে তুলেছিলেন।[১৫০] খৈতান অতীতে সুভাষ বসুকে সাহায্য করেন, কংগ্রেস ফান্ডে অর্থ যোগাড় করার জন্য তিনি বসুর পক্ষে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করেন।[১৫১] কিন্তু এখন তিনি বসু ও তাঁর দল সম্পর্কে স্বীয় অবস্থান পুনর্বিবেচনা করেন এবং একটা ঝুঁকি নিতে মনস্থ করেন। খৈতান ও তাঁর অনেক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী সহযোগী মনে করেন যে, মহাসভায় টাকা-পয়সা ঢাললে ভবিষ্যতে বাঙলায় অধিকতর নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে। নতুন এই হিন্দু পার্টির প্রতি অনেক ধনাঢ্য বাঙালি সমর্থন জানায় – তারা মহাসভার উদ্বোধনী সম্মেলনের জন্য দশ হাজার টাকা প্রদান করে।[১৫২]

মফস্বল এলাকার অনেক বড় বড় জমিদার বেঙ্গল কংগ্রেসের সাথে তাদের চিরাচরিত সম্পর্ক ছিন্ন করে মহাসভার পক্ষে কাজ শুরু করে। ময়মনসিংহে মহারাজা শশীকান্ত আচার্য চৌধুরীর অনেক বড় বড় এস্টেট ছিল; তিনি তাঁর জমিদারিতে মহাসভা সম্মেলনের আয়োজক হিসেবে কাজ করেন। উত্তর বাঙলার মালদা জেলায় সিংহবাদের জমিদার বাবু ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ রায়ের বাড়িতে মহাসভার এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[১৫৩] ১৯৪১ সালে ময়মনসিংহের অপর এক জমিদার বাবু হেমন্তচন্দ্র চৌধুরী, যাঁর এস্টেটগুলো কোর্ট অব

ওয়ার্ডের অধীন ছিল এবং যিনি ছিলেন একজন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি 'সাম্প্রতিককালে অনুষ্ঠিত এক মহাসভা বৈঠকে প্রধান ভূমিকা পালন করেন এবং তিনি প্রধান বক্তা ছিলেন বলে জানা যায়'।[১৫৪] আইন সভার নির্বাচনের সময় মফস্বলের যেসব জমিদার কংগ্রেসের প্রধান সমর্থক ছিল, তারা এখন অবস্থান পরিবর্তন করে নতুন হিন্দু পার্টিকে স্বাগত জানায়, কেননা ঐ দল তাদের ভূমি-সম্পর্কিত স্বার্থ রক্ষার জন্য বসুর কংগ্রেসের চেয়ে অধিকতর দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিল।

বেঙ্গল কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে অনেকে একই রকম মত পোষণ করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কোলকাতার ধনাঢ্য ব্যক্তি নলিনী রঞ্জন সরকার – ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন অর্থমন্ত্রী। বীমা ব্যবসায়ে সরকার তাঁর সৌভাগ্য গড়ে তোলেন। কুড়ি শতকের শেষ দিকে তিনি ছিলেন 'ক্ষমতাধর পাঁচ' জনের এক জন। তিনি একজন জনপ্রিয় কংগ্রেস 'নেতা' না হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস মহলে যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন। ত্রিশ দশকের প্রথম দিকে 'ক্ষমতাধর পাঁচ' নেতা যখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে পড়েন তখন তিনি সরকার দলের এমন এক অংশের সাথে যোগ দেন যাঁদের সঙ্গে কেন্দ্রের গান্ধীবাদী নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সরকার পরবর্তী সময়ে বসু পরিবারের ঘোরতর শত্রুতে পরিণত হন।[১৫৫] ১৯৩৭ সালে তিনি হাই কমান্ডের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হক মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করে তাঁর কংগ্রেস সদস্য পদ হারান, কিন্তু তিনি 'গান্ধীর ঘনিষ্ঠ অনুসারী ও ডানপন্থী এবং আগের মতোই সুভাষ বসুর কঠোর বিরোধী হিসেবে' থেকে যান।[১৫৬] মন্ত্রিত্ব থেকে তিনি 'পদত্যাগের সম্ভাবনার আগাম আভাস দিয়ে হিন্দুদের স্বার্থে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ বিশেষ সুবিধা আদায় করতেন'।[১৫৭] ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ শুরু হলে কংগ্রেসের নেতৃত্ব অনুসরণ করে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে কংগ্রেসে অন্তর্ভুক্ত করা না হলেও তিনি তখনকার 'অফিসিয়াল কংগ্রেসে'র ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। এই প্রেক্ষাপটে গভর্নর মন্তব্য করেন:

> মন্ত্রিসভায় যোগদান করার পর কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর ওপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তা এখনও প্রত্যাহার করা হয়নি। যদিও যুগান্তর নেতা সুরেন্দ্র মোহন ঘোষের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে, তাঁর ওপর তাঁর যথেষ্ট এবং সম্ভবত সুদৃঢ় প্রভাব রয়েছে। এই প্রভাবের কারণে কংগ্রেসের ঐ অংশের সাথে তাঁর সম্পর্ক অনেক বেশি রয়েছে এবং এই প্রভাবকে তিনি বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন ও কংগ্রেসের বড় অংশের ওপর কর্তৃত্ব লাভ থেকে তাঁদেরকে প্রতিহত করেন। তাঁর আগ্রহ হচ্ছে পর্দার আড়ালে থেকে কাজ করা এবং তিনি 'বাঙলার রাজনীতি'র বাইরে আছেন, কতকটা যেন গান্ধী যেমন সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেসের বাইরে রয়েছেন, ঠিক তেমনি। বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশ ছাড়া বাঙলার হিন্দু সম্প্রদায়ের আস্থা তাঁর ওপর রয়েছে। অন্য যে কোনো নেতার চেয়ে বাঙলায় হিন্দু জাতীয়তাবাদী জনমতের তিনিই হচ্ছেন সত্যিকার প্রতিনিধি এবং বাঙলায় হিন্দুদের কায়েমি স্বার্থের প্রতি তাঁর সমর্থন রয়েছে।[১৫৮]

তাঁর অনেক মাড়োয়ারি সহযোগীর মতো নলিনী রঞ্জন সরকার তাঁর পুরানো প্রতিদ্বন্দ্বী শরৎ বসু দলের নেতৃত্বে থাকা অবস্থায় 'কংগ্রেসে যথাসর্বস্ব ঢেলে দেবার ঝুঁকি' নিতে আগ্রহী ছিলেন না। সে-কারণে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করার পর তিনি মহাসভার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন – এর নেতারা কিছুদিন থেকে 'তাঁকে দলে পাওয়ার চেষ্টা করেছিল'।[১৫৯] গভর্নরের বর্ণনা অনুযায়ী নলিনী রঞ্জন সরকার 'এক দিনের জন্য (সর্ব-ভারতীয় হিন্দু মহাসভার উদ্বোধনী) সম্মেলনে যোগদান করেন, মঞ্চে বসেন এবং ভালো সম্বর্ধনা পান।' কিন্তু সরকার ছিলেন একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ। কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জকারী কোনো হিন্দু পার্টির সমস্যা কী হতে পারে সে-সম্পর্কে তিনি ভালোভাবেই অবহিত ছিলেন। ফলে তিনি 'মহাসভার সাথে নিজেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত করার' কোনো চেষ্টা করেননি। গভর্নরও নিশ্চিত ছিলেন যে মহাসভা সত্যিকারভাবে একটা কার্যকর সংগঠনে পরিণত হতে যাচ্ছে অথবা একদিন কংগ্রেসের পতাকাতলে ফিরে আসবে, 'এ বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত' তিনি তা করবেনও না।[১৬০]

এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, সভাপতি নির্বাচন নিয়ে বিরোধ এবং বসু গ্রুপের বিরুদ্ধে হাই কমান্ডের আক্রমণ বাঙলায় মোটেও সাদরে অভ্যর্থিত হয়নি। বেঙ্গল কংগ্রেসকে চিরাচরিত সমর্থনকারী অনেক জমিদার ও ব্যবসায়ী বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত দলের ওপর হতাশ হয়ে পড়ে। তাই তারা একটা বিকল্প দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে গভীরভাবে। তাদের মধ্যে অনেকে বাঙলায় হিন্দু মহাসভার গঠনকে সমর্থন করেন। কিন্তু দল থেকে বসু ভ্রাতৃদ্বয় ও বামপন্থী অনুসারীদের বহিষ্কারের পর তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, কংগ্রেসের বাইরে তাদের আর কিছু চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। এর পরিবর্তে তাঁরা আগামী দিনগুলোতে বাঙলায় কংগ্রেস সংগঠনকে পুনরায় দখলের এবং দলকে তাদের উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ারে পরিণত করার আশা করতে থাকেন। ত্রিপুরী সম্মেলনের কয়েক মাস পর গভর্নর উল্লেখ করেন যে, হিন্দুদের মধ্যে –

> অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে সাম্প্রদায়িক ধারায় শক্ত আলাপ-আলোচনা হচ্ছে ... এ অবস্থায় সার্বিক পরিবর্তন হতে পারে যদি একটা শক্তিশালী হিন্দু সংগঠনের উদ্ভব হয়, যার ওপর আইন সভার হিন্দু সদস্যরা কার্যকর ও অবিচলিতভাবে আস্থা রাখতে পারে ... আমি বিশ্বাস করি যে, (নলিনী রঞ্জন) সরকারের মতো অনেক হিন্দু আছেন ... তাঁরা এমন একটা সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তবে তাঁরা সম্ভবত শেষ পর্যন্ত বেঙ্গল কংগ্রেসের কর্তৃত্ব পাওয়ার আশা করছেন। কারণ তাঁরা বাঙলায় কংগ্রেসকেই একমাত্র সম্ভাব্য হিন্দু সংগঠন হিসেবে গণ্য করেন। তাই যদি হয় তাহলে সুভাষ বসু ও ডা. বি. সি. রায়ের 'ডানপন্থী' গ্রুপের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল প্রদেশের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।[১৬১]

ক্রমে ক্রমে বেঙ্গল কংগ্রেসের ওপর আস্থা ফিরে আসে এবং এক সময় এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বসু ভ্রাতৃদ্বয় ও তাঁদের অনুসারীদের দল থেকে শক্ত হাতে বহিষ্কার করা হবে।

বেঙ্গল কংগ্রেস থেকে তাঁদের বহিষ্কার করার জন্য হাই কমান্ডের উদ্যোগ 'আনুষ্ঠানিক' বেঙ্গল কমিটির দৃঢ় সমর্থন লাভ করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও চাচ্ছিল যে, এ কাজ অতি ব্যাপকভাবে এবং দ্রুততার সাথে করা হোক। পটুয়াখালী সত্যাগ্রহের বীর[১৬২] সতীন সেন অবিলম্বে বসু গ্রুপকে 'নিষিদ্ধ' করার আহ্বান জানিয়ে রাজেন্দ্রপ্রসাদকে লেখেন:

> বাঙলায় সুভাষ বাবু কমিউনিস্ট পার্টি, কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি, কিষান ও ছাত্র ফেডারেশন ইত্যাদি সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়েছেন। এমনকি সুভাষ বাবুর সর্বশেষ বেপরোয়া ও উন্মত্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আগেই ঐ প্রতিষ্ঠানগুলো কংগ্রেসকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য 'সংস্কারবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের দল' ইত্যাদি ইত্যাদি বলে এর নেতৃত্বকে সমালোচনা করেছে। সুভাষ বাবুর বিদ্রোহের পর থেকে এসব সংগঠনগুলো প্রকাশ্যে কংগ্রেস-বিরোধী, গান্ধী-বিরোধী কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে; তারা প্রকাশ্যে শ্রেণী সংগ্রামের কথা প্রচার করে। সম্প্রতি কমিউনিস্টরা অহিংস আইন অমান্য, সত্যাগ্রহ ইত্যাদিকে উপহাস করছে এবং সহিংস বিপ্লবের সমর্থনে পুস্তিকা বিলি করছে। এসব কাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের এখনই উপযুক্ত সময়। সুভাষ বাবু এসব সংগঠনকে ব্যবহার করছেন, আর ঐসব সংগঠনও নিজেদের স্বার্থে সুভাষ বাবুকে কাজে লাগাচ্ছে। কংগ্রেসের মর্যাদা, সম্মান ও ক্ষমতার প্রেক্ষাপটে এসবই খুব দুঃখজনক।[১৬৩]

সুভাষ ও তাঁর মিত্রদের দল থেকে একের পর এক বহিষ্কারের পর বেঙ্গল কংগ্রেস কোনরকম বিব্রত বোধ না করেই দলকে হিন্দু ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে সক্ষম হয়, কর্তৃপক্ষ যেটাকে 'কায়েমি স্বার্থ' হিসেবে উল্লেখ করে।[১৬৪] ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে সেকেন্ডারি এডুকেশন বিলের ধারার প্রতিবাদে –

> কিরণ শংকর রায় সতর্কভাবে লিখিত একটা বিবৃতি পাঠ করার পর ... অফিসিয়াল কংগ্রেস পার্টি আইন সভা থেকে ওয়াক-আউট করে ... এরপর সেকেন্ডারি এডুকেশন বিল ও কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল সংশোধনী বিলের মতো যে কোনো বিরোধপূর্ণ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার দরজা তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায় ... এতে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কংগ্রেস হিন্দু স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে।[১৬৫]

পরবর্তী মাসে নলিনী রঞ্জন সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়া হয়। যুগান্তর পার্টি ও ময়মনসিংহের অফিসিয়াল কংগ্রেস পার্টির সদস্যরা এ পদক্ষেপকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে গ্রহণ করে।[১৬৬] সরকার এর আগে সেকেন্ডারি এডুকেশন বিল নিয়ে 'জনসমক্ষে' যে বক্তব্য রাখেন তা গভর্নরের বিবেচনায় ছিল 'বাড়াবাড়ি'।[১৬৭] এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নতুন 'অফিসিয়াল' কংগ্রেস আইন সভায় হিন্দু ভদ্রলোক স্বার্থের সাথে নিজেদেরকে প্রকাশ্যে সম্পর্ক রাখতে ভয় পাচ্ছে না অথবা আইন সভার বাইরে একটা ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষা করার ব্যাপারে এর নতুন নেতারা আর আগ্রহী নয়। নলিনী রঞ্জন সরকারের প্রত্যাবর্তনে বেঙ্গল কংগ্রেসে এই আস্থা ফিরে আসে যে, দল এখন থেকে সত্যিকার কাজ করতে পারবে। তাই মহাসভার অনুকূলে যেসব কংগ্রেস সমর্থক দল ত্যাগ করেছিল, তারা আবার ধীরে-ধীরে কংগ্রেস পতাকাতলে ফিরে আসে।

কিন্তু হিন্দু মহাসভা কোনরকম সংগ্রাম ছাড়াই মাঠ ছাড়তে তৈরি ছিল না। তারা অতি আক্রমণাত্মক সাম্প্রদায়িক প্রচারণা শুরু করে, যার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়। 'মুসলমানদের খুশি করার' তথাকথিত অভিযোগে কংগ্রেসকে দোষারোপ করে হিন্দু ভদ্রলোকদের সমর্থন পাওয়ার জন্য মহাসভার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে এমন লক্ষণ দেখা যায় যে, তাদের প্রচারণায় কিছুটা ফল ফলতে শুরু করেছে। সেকেন্ডারি এডুকেশন বিল প্রশ্নে মহাসভার কয়েক মাসের ক্রমাগত প্রচারের ফলে ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমান যুবকেরা হিন্দু মহিলাদের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে,[১৬৮] এ ধরনের অতিরঞ্জিত খবরে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। ঢাকা শহর এবং তার পার্শ্ববর্তী পল্লি এলাকায় হিংসাত্মক ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে। দাঙ্গার অব্যবহিত পরে যখন বিদ্বেষপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছিল তখন লক্ষ করা যায় যে, কংগ্রেসের ক্ষতির বিনিময়ে মহাসভা কিছুটা হলেও ভিত্তি অর্জন করেছে। ঘটনাস্থলের মূল্যায়নে দেখা যায় –

> ঢাকার দুর্ভাগ্যজনক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও কয়েকটি জেলায় তীব্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ফলে হিন্দু মহাসভা শক্তি সঞ্চয় করেছে, আর বেঙ্গল কংগ্রেসের অবস্থা আরও দুর্বল হয়েছে। কংগ্রেসের খোলা 'ত্রাণ তহবিলে' অর্থ প্রদান করতে প্রায় সবাই অনাগ্রহী, অপর দিকে হিন্দু মহাসভার তহবিলে সবাই স্বেচ্ছায় অর্থ দিচ্ছে ... ত্রাণ তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য (কোলকাতা কর্পোরেশনের) প্রতিটি বিভাগের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা খুবই সহানুভূতিশীল, কিন্তু সাধারণ কর্মচারীদের কাছে অনুরোধ করা হলে তারা কংগ্রেসের ত্রাণ তহবিলে এক কপর্দকও দিতে অস্বীকার করে; কারণ কংগ্রেস অসাম্প্রদায়িক সংগঠন এবং তারা হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে ত্রাণ সামগ্রী দেবে। এটা তারা সহ্য করতে রাজি নয়।[১৬৯]

মুসলমানদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণে আগ্রহী অনেক হিন্দু ভদ্রলোকের সমর্থন ধরে রাখতে বেঙ্গল কংগ্রেসও হিন্দু মহাসভার সাথে সাম্প্রদায়িক মঞ্চে প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য হয়ে প্রচার করে যে, দাঙ্গার পরের এই ত্রাণ কর্মসূচি শুধুমাত্র হিন্দুদের জন্য। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, কংগ্রেস ত্রাণ তহবিলে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ দাঙ্গার সময় ঢাকা থেকে পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয়গ্রহণকারী হিন্দু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে ব্যয় করা হবে। দাঙ্গা বিষয়ে কংগ্রেস তদন্ত কমিটির সভাপতি ছিলেন ঢাকার প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা কামিনী দত্ত। তিনি উল্লেখ করেন –

> ত্রিপুরার মহারাজা ... হিন্দু উদ্বাস্তুদের ত্রিপুরা রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য সব রকম সুযোগ-সুবিধা দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু বাঙলার হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য এর পরিণাম হবে ভয়াবহ। কারণ এ ধরনের উদ্যোগ বাঙলা থেকে হিন্দুদের বিতাড়নে নির্যাতন প্রচেষ্টাকে আরও উৎসাহিত করবে ... কংগ্রেস কর্মীরা ... উদ্বাস্তুদের ফিরে আসার জন্য রাজি করানোর চেষ্টা করছে। এসব উদ্বাস্তুদের অনেকেরই পুনর্বাসনের জন্য আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হবে ... এটাই হচ্ছে সেই ত্রাণ সাহায্য।[১৭০]

ঢাকার কংগ্রেস নেতারা 'সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ত্রাণ সাহায্য' দেওয়ার যে নীতি গ্রহণ করে তা কংগ্রেস হাই কমান্ড অনুমোদন করে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ এর যে যৌক্তিকতা দেখান তা হল –

হিন্দু মহাসভার লোকেরা মুসলমানদের সাহায্য করছে না, আর সে-জন্য হিন্দুরা কংগ্রেস কর্মীদের অর্থ দিচ্ছে না। তাদের আশংকা যে, কংগ্রেস কর্মীরা মুসলমানদেরও সাহায্য করতে পারে। তারা শুধু হিন্দুদের সাহায্য দিয়েছে। এই দুঃসময়ে কংগ্রেস যদি জনগণের কোনো কাজে না আসে, তাহলে কংগ্রেস জনগণের আস্থা ধরে রাখতে পারবে না।[১৭১]

ঢাকার দাঙ্গা তদন্ত কমিটির সামনে হিন্দু 'সম্প্রদায়'কে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে বেঙ্গল কংগ্রেসকে একই ধরনের চাপের সম্মুখীন হতে হয়। নলিনী রঞ্জন সরকারের কাছে কামিনী দত্ত যখন বলেন:

এই তদন্তে প্রতিনিধিত্ব না থাকায় বাঙলায় বেঙ্গল কংগ্রেস জনজীবন থেকে দূরে সরে গিয়েছে। কিন্তু সেখানে আমাদের অবস্থাটা খুবই জটিল। আমাদেরকে কংগ্রেসের আদর্শ অনুসরণ করতে হয় এবং একই সাথে সাধারণ লোকের সামনে কংগ্রেসের অবস্থানকে জোরালোভাবে সমর্থন করতে হয় ... তদন্ত কমিটির সামনে বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে কোনো বিবরণ লিখিতভাবে প্রদান করা অনেকটা প্রতারণামূলক। বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি লিখিতভাবে এই অঙ্গীকার করতে পারে না যে, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে এক পক্ষের অনুকূলে আছে। আবার, একই সাথে কোনো বিবৃতির মাধ্যমে আমরা হিন্দু সম্প্রদায়ের বা অন্য কোনো হিন্দু সংগঠনের অবস্থানকে বিপন্ন করে তুলতে পারি না।[১৭২]

'অন্য হিন্দু সংগঠন' বলতে কামিনী দত্ত অবশ্যই হিন্দু মহাসভার কথা বলেন। শেষ পর্যন্ত ঢাকা দাঙ্গা তদন্ত কমিটির সম্মুখে 'হিন্দু সম্প্রদায়ের' জন্য উভয় দলই একসাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। কামিনী দত্ত এবং নলিনী রঞ্জন সরকার কংগ্রেসের জন্য উত্তম পন্থা উদ্ভাবনে আরও একবার মত বিনিময় করেন। দত্ত উল্লেখ করেন যে –

পল্লি এলাকার ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পরিচালনায় কংগ্রেস উত্তম অবস্থানে আছে। কিন্তু এ জন্য দায়িত্ব নিতে পরামর্শ দেওয়াটা ঠিক হবে না। এটা খুব বড় ধরনের দায়িত্ব এবং এ জন্য যথেষ্ট অর্থ খরচ হবে। এ ব্যাপারে কংগ্রেস যৌথভাবে হিন্দু সভার সাথে মিলিতভাবে এই কাজ করতে পারে। হিন্দু সভা এ জন্য কংগ্রেসকে অর্থ যোগাবে, আমাদের সাহায্য তাদের জন্য খুবই মূল্যবান। কংগ্রেসের সহযোগিতা ছাড়া পল্লি এলাকা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা তাদের জন্য খুবই কষ্টকর ... পল্লি এলাকার ঘটনা হিন্দুদের জন্য সবচেয়ে উত্তম। ঢাকা শহরে উভয় সম্প্রদায়ের অপরাধ প্রায় সমান সমান এবং রায়ও প্রায় একই রকম হবে।[১৭৩]

দুই সংগঠনের মধ্যে বোঝাপড়ার শর্তগুলো বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করে। দত্তের কাছে এটা স্পষ্টভাবে বোধগম্য ছিল যে, একটা অভিযোগ একই সাথে দায়ের করার যে খরচ তা কংগ্রেসের পক্ষে বহন করা খুব কষ্টকর হবে। তবে তিনি এ ব্যাপারে অনেকটা আস্থাশীল ছিলেন যে, হিন্দু মহাসভা এক সঙ্গে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করতে ইচ্ছুক এবং

তারা খরচ বহন করারও ক্ষমতা রাখে। এতে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, শরৎ বসুর নেতৃত্বের সময় বেঙ্গল কংগ্রেস থেকে আর্থিক সাহায্য ব্যাপক হারে কমে গিয়েছিল। বসু গ্রুপের বহিষ্কারের পর 'অফিসিয়াল' কংগ্রেস পুনরায় সংগঠনের দখল নেওয়ার পর দেখতে পায় যে, এর অর্থের ভাণ্ডার শূন্য।[১৭৪] নতুন নেতাদের জন্য ঐ ভাণ্ডার পূর্ণ করা সহজ ছিল না। একটা গোপন রিপোর্ট থেকে জানা যায় –

> নতুন বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির আর্থিক সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য অনেক সদস্য মাসিক চাঁদা দেবার অঙ্গীকার করে, কিন্তু তারা নিয়মিতভাবে চাঁদা দেয়নি। কমিটির মাসিক নির্বাহী খরচ ছিল প্রায় দু'হাজার পাঁচশ' টাকা, তাই কমিটির আর্থিক অবস্থাটিকে শক্ত ভিত্তিতে দাঁড় করাতে ক্রমাগতভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন। প্রাদেশিক কমিটির নিজস্ব কোনো সম্পত্তি নেই।[১৭৫]

অপর দিকে মাত্র অল্প কয়েক বছরের মধ্যে মহাসভা একটা সম্পদশালী সংগঠনে পরিণত হয়। অর্থ যোগাড় করতে সফল হলেও এবং প্রদেশে চৌদ্দশ' শাখা[১৭৬] আছে বলে গর্ব করলেও মহাসভা কংগ্রেসের মতো ভিত্তি, বিশেষ করে পল্লি এলাকায়, গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে দাঙ্গার সময় পল্লি এলাকায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের সম্পর্কে সাক্ষ্য ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার জন্য মহাসভাকে কংগ্রেস অবকাঠামোর ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হতে হয়। এভাবে উভয় সংগঠনের মধ্যে এক ধরনের সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় যা ঢাকা দাঙ্গা তদন্ত কমিটি গঠন হবার পরও অব্যাহত থাকে। 'হিন্দু' স্বার্থ রক্ষার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনের সময় উভয় দলই একসাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করে। কোথাও 'হিন্দু' স্বার্থ সংকটাপন্ন হলে উভয় দলের রাজনীতি ও আদর্শের মধ্যে প্রায় কোনো পার্থক্য থাকত না। গভর্নর তাই এটা লক্ষ করেন যে, প্রায় সব ক্ষেত্রেই মহাসভা বিতর্কের সূত্রপাত ঘটায়: 'কংগ্রেস পার্টি ক্রমান্বয়ে অধিক হারে মহাসভার নেতৃত্বকে অনুসরণ করছে। নির্বাচন সামনে থাকলে তাদের মধ্যে বিরোধিতা থাকত; এখন যে অবস্থা তাতে তারা পরস্পরের কাছাকাছি আসতে আগ্রহী এবং এর ফলে একটা অনাকাঙ্ক্ষিত জোট গড়ে উঠতে পারে।'[১৭৭]

যাহোক, হার্বার্টের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। এ সময় ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনে দুই দলের মধ্যে যে রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা তিনি আশা করেছিলেন তা কার্যকর হয়নি। মধ্যবর্তী সময়ে, বিশেষ করে ১৯৪২ সালে কংগ্রেস নিষিদ্ধ হওয়ার পর উভয় দলের সদস্য ক্রমাগতভাবে একে অপরের সঙ্গে মিশে যেতে থাকে, তখন অনেক কংগ্রেস নেতা গ্রেফতার এড়াতে মহাসভায় যোগদান করে।[১৭৮] এ সময় দুটো দলই সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিকভাবে পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসে। একটা সরকারি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, তাদের এটা স্বীকার করতে ইচ্ছুক বলে মনে হয় যে – 'কর্মক্ষেত্রে কংগ্রেসের অনুপস্থিতিতে নিজেদের সন্দেহাতীতভাবে এই হিন্দু সংগঠনের খুব কাছের প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করতে হিন্দু মহাসভার কোনো ইতস্ততবোধ ছিল না। বস্তুত যেমনটি আশা করা হয়েছিল, তেমনি ড. এস. পি. মুখার্জী ব্যক্তিগতভাবে কতটা কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ ছিলেন

তা তিনি স্পষ্ট করে দেন।'[১৭৯] ঐ বছরের পর ঐ দুটো দল মিত্র হিসেবে কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। 'হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে' ১৬ই মার্চ অনুষ্ঠিত এক নির্বাচনী মিটিং-এ মহাসভার মিস্টার এন. সি. চট্টোপাধ্যায় ঘোষণা করেন যে, তাঁর দল 'কংগ্রেসের সাথে যোগ দিয়েছে ইউনাইটেড মুসলিম লীগ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার জন্য' এবং তাঁর দলের 'বস্তুত একটা জাতীয় কোয়ালিশন পার্টি গঠনের আগ্রহ থেকে এটা করা হয়েছে'।[১৮০]

যুদ্ধের সময় কংগ্রেস পার্টির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং এর সদস্যদের মহাসভায় যোগদানের ফলে এমন একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় যে, জোটে বেঙ্গল কংগ্রেসের চেয়ে মহাসভা অধিকতর ভালো করেছে। কিন্তু যুদ্ধ সমাপ্তির পর মহাসভার এই অর্জন মোটামুটি ভুয়া বলে প্রমাণিত হয়। আসলে মহাসভার সঙ্গে সম্পর্ক এবং 'হিন্দু স্বার্থে'র জন্য বরং কংগ্রেসের অর্জনের পাল্লাই ভারি হয়েছে, এই সুযোগে কংগ্রেস তার ভদ্রলোক নির্বাচকমণ্ডলীর ওপর আস্থা আরো মজবুত করতে পেরেছে। যখন কংগ্রেসের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল তখন মহাসভার বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মী হ্রাস পায় – ঐ দলে যারা সদস্যভুক্ত হয়েছিল তাদের প্রায় সবাই কংগ্রেসে ফিরে যায়। অন্যরা মহাসভার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখলেও নির্বাচনের সময় কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করে। এ ধরনের ঘটনা এমন ব্যাপকভাবে ঘটে যে, বেঙ্গল মহাসভার জেনারেল সেক্রেটারি জেলা শাখাগুলোর কাছে 'যেসব সদস্য হিন্দু মহাসভা ত্যাগ করেছে বা কেন্দ্রীয় আইন সভা নির্বাচনে যারা হিন্দু মহাসভার সাথে সম্পর্ক না রেখে মহাসভা প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট' পাঠাবার জন্য অনুরোধ করে।[১৮১]

১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কিছুদিন আগে কমিউনিস্ট পার্টি ও ফরোয়ার্ড ব্লক থেকে পুরোপুরি দূরত্ব বজায় রেখে বেঙ্গল কংগ্রেস 'হিন্দু' ভদ্রলোক ও ব্যবসায়িক স্বার্থের প্রতি তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে। ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট মওলানা আজাদ '১৯৪২ সালের বিক্ষোভ ও তার পরবর্তী সময়ে (কমিউনিস্টদের) বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের আহ্বান জানান – ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় যুদ্ধ প্রচেষ্টায় অংশ নেবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে 'জাতি বিরোধী' হিসেবে দোষারোপ করে কংগ্রেস প্রচারণা শুরু করে।[১৮২] কিন্তু লক্ষ করার বিষয় যে, ১৯৩৯ সাল থেকে ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সমর্থন দানের জন্য হিন্দু মহাসভার বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতৃত্ব অনুরূপ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বাঙলায় প্রাপ্ত বিভিন্ন রিপোর্টে দেখা যায় যে, 'সাবেক সদস্যদের প্রত্যাবর্তনের কারণে কংগ্রেস নিজেকে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী বলে মনে করছে ... এখন কমিউনিস্টদের আক্রমণ করতে শুরু করেছে।'[১৮৩] মহাসভার মূলমন্ত্রকে ব্যবহার করে 'হিন্দু ঐক্যে'র নামে কংগ্রেস বিভিন্ন জেলায় আন্দোলনও শুরু করে।[১৮৪] ভদ্রলোক ও অন্যান্য শক্তিশালী হিন্দু স্বার্থকে কার্যকরভাবে রক্ষা করতে সক্ষম পার্টি হিসেবে কংগ্রেস নিজেকে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে দেখা যায় যে, সারা প্রদেশে 'মহাসভার

বিনিময়ে কংগ্রেস শক্তি অর্জন করছে'।[১৮৫] পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে যেখানে মহাসভার অবস্থান ছিল সবচেয়ে সুদৃঢ় – ঐসব জেলা থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টে দেখা যায় যে, 'প্রধানত কংগ্রেসের পক্ষেই হিন্দু সমর্থন জোরদার হচ্ছে'। বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রাপ্ত সংবাদে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, কংগ্রেস সার্বিকভাবে সাম্প্রদায়িক প্রচার শুরু করেছে এবং ঐ প্রচারণায় প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃত্বের সমর্থন আছে। ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উল্লেখ করেন যে, 'প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির চেয়ারম্যান হিন্দু ঐক্যকে তুলে ধরে জেলায় ফলপ্রসূভাবে প্রচারণা চালিয়েছেন।'[১৮৬]

কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনের সময় মহাসভা নিজেকে কংগ্রেসের সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে তুলে ধরে একটা পাল্টা লড়াই দেয়ার চেষ্টা করে।[১৮৭] কিন্তু কংগ্রেস হিন্দু স্বার্থের শক্তিশালী মুখপাত্র হিসেবে বাবু শশাঙ্ক শেখর সান্যালকে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করে মহাসভাকে হতাশ করে দেয়। নিজের জেলা মুর্শিদাবাদে স্থানীয় এক সাম্প্রদায়িক বিরোধে সান্যাল হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করেন। একবার এক ঘটনায় তিনি মুসলমানদের 'তাজিয়া' অতিক্রম করার সুবিধার্থে 'পবিত্র' গাছের ডাল কাটতে অস্বীকার করেন,[১৮৮] অন্য আর এক ঘটনায় তিনি হিন্দু মন্দিরের একশ' গজের মধ্যে কোনো মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না বলে জোরাজুরি করেন।[১৮৯] 'হিন্দু ঐক্যে'র জন্য বিপুল উদ্যমে প্রচারণা চালিয়ে এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রার্থী বাছাই করে কংগ্রেস মহাসভাকে ভালোমতো শিক্ষা দেয় এবং ছ'টি হিন্দু আসনের সব ক'টিতে বিপুলভাবে বিজয়ী হয়।[১৯০] বস্তুত মহাসভার সব কিছু অর্জন এবং ঐ দল যেসব লক্ষ্যকে সামনে তুলে ধরেছিল, তার সবটুকু ছিনিয়ে নিয়ে কংগ্রেস এক দর্শনীয় বিজয় অর্জন করে। কংগ্রেস এমনভাবে মহাসভার সদস্য, স্লোগান ও কর্মসূচি ছিনিয়ে নেয় যে, মহাসভার সদস্যরাও মনে করে যে পৃথক একটা সংগঠন হিসেবে এর আর অস্তিত্বের প্রয়োজন নেই। কোলকাতার হিন্দুদের একটা গ্রুপ শ্যামাপ্রসাদকে এই বলে পরামর্শ দেয় যে,

> কংগ্রেস কর্তৃক মুসলিম লীগকে জোরালো চ্যালেঞ্জ দেওয়ার পর পৃথক একটা রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে হিন্দু মহাসভার অস্তিত্বের আর কোনো প্রয়োজন নেই ... জনগণ ... আপনাকে বর্তমান নির্বাচনে অতি সাম্প্রদায়িক নয় এমন একটা সংগঠন থেকে প্রার্থী হিসেবে দেখতে চায় ... মহান লক্ষ্য অর্জনে কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দেবার জন্য আপনি হলেন বাঙলার সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি ... আমরা আপনাকে কংগ্রেসে যোগদান করার আহ্বান জানাচ্ছি।[১৯১]

হিন্দু স্বার্থের রক্ষক হিসেবে সে আর বেঙ্গল কংগ্রেসের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারবে না, এই সত্যটি স্বীকার করে মহাসভা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ায় – অন্যথায় প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে তাদের প্রায় নিশ্চিতভাবে অবমাননাকর পরাজয় বরণ করতে হত। পরিবর্তে মহাসভা 'জাতীয় ফ্রন্টকে শক্তিশালী' করার লক্ষ্যে কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করার নীতি গ্রহণ করে। একজন গোয়েন্দা পুলিশ তাই কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে রিপোর্ট করে যে:

দেখে-শুনে মনে হচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় আইন সভা নিবার্চনের মতো আসন্ন প্রাদেশিক নির্বাচনে হিন্দু মহাসভা উৎসাহ দেখাচ্ছে না। যেসব সাধারণ নির্বাচনী এলাকায় কংগ্রেস প্রার্থী তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও সামাজিক মর্যাদায় গৌণ কেবল সেখানেই তারা নামকরা ও প্রভাবশালী প্রার্থী দিয়েছে। ... তাই মাত্র কয়েকটি নির্বাচনী এলাকায় মহাসভা ও কংগ্রেস প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ... ড. এস. পি. মুখার্জীর মতে মহাসভার কাজের লক্ষ্য শুধু একটি এবং তা হল জাতীয় ফ্রন্টকে শক্তিশালী করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চূড়ান্ত আঘাত হানা। ... মহাসভাকে অবশ্যই উৎসাহের সাথে কাজ করতে হবে এবং তাকে একটা স্বতন্ত্র অবস্থান অর্জন করতে হবে। ... কিন্তু সেই সঙ্গে কংগ্রেসের সাথে তাকে সংঘর্ষ অবশ্যই এড়াতে হবে।[১৯২]

শেষ পর্যন্ত মহাসভা ছাব্বিশটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু একটা ছাড়া সব ক'টি আসনে সে কংগ্রেসের কাছে পরাজিত হয়। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন। 'সাধারণ' নির্বাচনী এলাকায় মহাসভা শতকরা মাত্র ২.৭ ভাগ ভোট পায়, অথচ কংগ্রেস পায় শতকরা ৭৭ ভাগ।[১৯৩] ব্যবসায়ী ও জমিদারদের স্বার্থে সংরক্ষিত বিশেষ নির্বাচনী এলাকায় কংগ্রেস অত্যন্ত সফল হয় – হিন্দু জমিদারদের জন্য নির্দিষ্ট পাঁচটি আসনের মধ্যে চারটি এবং হিন্দু ব্যবসায়ীদের জন্য চারটি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে সব ক'টিতে কংগ্রেস জয়লাভ করে (সারণি ৪)। ১৯৩৬-৩৭

সারণি ৪ : বাণিজ্য ও জমির মালিক। 'বিশেষ স্বার্থ' ও কংগ্রেস ১৯৩৬-৩৭ এবং ১৯৪৫-৪৬

নির্বাচনী এলাকা	বিজয়ী প্রার্থী এবং দল	
	১৯৩৬-৩৭	১৯৪৫-৪৬
বাণিজ্য ও শিল্প		
ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স	ডি.পি. খৈতান/স্বতন্ত্র	ডি.পি. খৈতান/কংগ্রেস
বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স	এইচ.এস. পাল/স্বতন্ত্র	বি.সি. ঘোষ/কংগ্রেস
	এন.আর. সরকার/স্বতন্ত্র	এ.কে. ঘোষ/কংগ্রেস
মাড়োয়ারি এসোসিয়েশন	আর তাপুরিয়া/স্বতন্ত্র	এ.এল. পোদ্দার/কংগ্রেস
জমিদার		
বর্ধমান	বি.পি. সিংহ রায়/স্বতন্ত্র	বর্ধমানের মহারাজা/স্বতন্ত্র
প্রেসিডেন্সি	মহারাজা এস.সি. নন্দী/স্বতন্ত্র	মহারাজা এস.সি. নন্দী/কংগ্রেস
রাজশাহী	মহারাজা এস.কে. চৌধুরী/স্বতন্ত্র	এন.এস. সিংগী/কংগ্রেস
চট্টগ্রাম	কে. সি. রায়/স্বতন্ত্র	এ. সি. সিনহা/কংগ্রেস
ঢাকা	এস কে. আচার্য চৌধুরী/ হিন্দু ন্যাশনালিস্ট	এস. কে. আচার্য চৌধুরী/ কংগ্রেস

সূত্র : ফ্রাঙ্গাইজ ফাইল থেকে সংকলিত– আইওএলআর এল/পি এবং জে/৭/১১৪২ এবং এল/পি এবং জে/৮/৪'৭৫ যথাক্রমে ১৯৩৬-৩৭ এবং ১৯৪৫-৪৬ বৎসরের জন্য।

সালের নির্বাচনে অর্জিত ফলাফলের তুলনায় এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাঙলার ব্যবসায়ী ও জমিদারেরা পুনরায় তাদের পুরানো ক্লায়েন্টদের সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে – কংগ্রেস যে একটি বিরাট বাহিনীর নেতৃত্ব পুনর্দখল করেছে এটা তারই এক নিশ্চিত লক্ষণ।

হিন্দু নির্বাচনী এলাকায় এবং বিশেষভাবে ব্যবসায়ী ও জমিদারদের আসনে বেঙ্গল কংগ্রেসের সম্পূর্ণ বিজয়ে প্রতিফলিত হয় যে, চল্লিশের দশকে পার্টি কতটা পরিবর্তিত হয়েছে। বসু গ্রুপের বহিষ্কারের পর বেঙ্গল কংগ্রেস নিজেদেরকে অতি 'হিন্দু' ও অতি রক্ষণশীল রূপে উপস্থাপিত করে। এটা করতে গিয়ে কংগ্রেস অত্যন্ত সার্থকভাবে হিন্দু মহাসভার বিষয়-আশয়গুলোকে কাজে লাগায়। পরিণামে কংগ্রেস পুনরায় সেই সব কায়েমি স্বার্থ গ্রুপের অনুগ্রহ লাভ করে যারা সাময়িকভাবে মহাসভাকে সমর্থন দিয়েছিল। নতুন কংগ্রেসের নেতৃত্বে নলিনী রঞ্জন সরকারের মতো ধনাঢ্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো আশ্বস্ত হয় এবং তারা দলের ওপর তাদের নতুন আস্থা প্রকাশ করে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে কংগ্রেস টিকিটে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন দেবীপ্রসাদ খৈতান যিনি ১৯৩৯ সালে মহাসভার অর্থ ভাণ্ডারে উদারভাবে অর্থ জুগিয়েছিলেন।[১৯৪]

একইভাবে, মহাসভার রাজনীতির প্রথম পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী অনেক বড় জমিদার ১৯৪৫ সালের দিকে কংগ্রেস পতাকাতলে ফিরে আসে। ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর জেলায় জমিদারদের রাজনৈতিক সহানুভূতি সম্পর্কে এক কৌতূহলজনক মন্তব্য করেন:

> সুসঙ্গের মহারাজা, ময়মনসিংহের বড় মহারাজ কুমার, মুক্তাগাছার আচার্য চৌধুরীরা এবং বস্তুত সব হিন্দু জমিদার হল হিন্দু মহাসভার লোক। ময়মনসিংহের দ্বিতীয় মহারাজ কুমার নিজেকে কংগ্রেসী বলে দাবি করলেও তিনি মনে-প্রাণে ছিলেন হিন্দু মহাসভার লোক। জেলার অধিকাংশ হিন্দুর রাজনৈতিক বিশ্বাস হচ্ছে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার একটি মিশ্রণ ... যাতে কিনা কংগ্রেসের থেকেও মহাসভার অংশই বেশি। মনে-প্রাণে যারা প্রচণ্ডভাবে মহাসভার সমর্থক তারা প্রার্থী হিসেবে কংগ্রেসের মনোনয়ন পেলে তাদের জেতার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। ময়মনসিংহ জেলার কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা প্রার্থীদের মধ্যে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা আমি দেখতে পাচ্ছি না – বস্তুত বাঙলার অনেক জেলাতেও এমন সম্ভাবনা নেই।[১৯৫]

তাঁর ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। ১৯৪৬ সালে জমিদারদের পাঁচটি আসনের মধ্যে চারটি আসনে কংগ্রেস জয়লাভ করে। অধুনালুপ্ত হিন্দু ন্যাশনালিস্টের সদস্য ও হিন্দু মহাসভার সক্রিয় সদস্য[১৯৬] জমিদার এস. কে. আচার্য চৌধুরী তাঁর নিজের বিভাগে কংগ্রেস টিকিটে জয়লাভ করেন। বাঙলায় হিন্দু ভূ-সম্পত্তির স্বার্থের ব্যাপারে মধ্য চল্লিশের দশকের কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার মধ্যে যে কোন একটা বেছে নেওয়ার মতো প্রায় কিছু ছিল না। সে সময় মহাসভার মতো কংগ্রেস যে দৃঢ়তার সাথে হিন্দু স্বার্থকে রক্ষা করবে তা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। পুরানো এই সংগঠনটিকে প্রাদেশিক ও জাতীয় বিষয়ে বেশি ভার বহনে সক্ষম মনে করে বাঙলার জমিদারেরা যখন কংগ্রেসকেই নিজেদের অবস্থান হিসেবে বেছে, তখন আর অবাক হবার কিছু থাকল না।

টীকা

১. দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখুন বি. আর. টমলিনসন, *দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এন্ড দি রাজ, ১৯২৯-১৯৪২*। সর্ব-ভারতীয় পর্যায়ে 'মিনিস্ট্রি পিরিয়ড'-এর বিবরণের জন্য দেখুন *দি পিনালটিমেট ফেজ*, লন্ডন, ১৯৭৬। প্রদেশের রাজনীতি নিয়ে কংগ্রেস নীতির প্রভাব সম্পর্কে বিশ্লেষণের জন্য দেখুন মুকুল কেশবন, '১৯৩৭ এ্যাজ এ ল্যান্ডমার্ক ইন দি কোর্স অব কমিউনাল পলিটিকস্ ইন দি ইউ পি', অকেশনাল পেপার্স ইন হিস্ট্রি এ্যান্ড সোসাইটি, সেকেন্ড সিরিজ, নং ১১, নেহেরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম এ্যান্ড লাইব্রেরি, নিউ দিল্লী, ১৯৮৮।

২. এর মধ্যে আছে মহিলাদের জন্য দুটো এবং শ্রমিকদের জন্য চারটি সংরক্ষিত আসন।

৩. দেখুন আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ. ১৩৪-১৩৯। কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা পার্টির মধ্যে আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে একাধিক বক্তব্য আছে। যেমন প্রায়ই বলা হয় যে, গান্ধী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কোয়ালিশন সরকারে যোগদান করতে বেঙ্গল কংগ্রেসকে অনুমতি না দেওয়ায় আলোচনা ভেঙ্গে যায়। অমিয় বসুর সাথে লেখকের সাক্ষাৎকার, কোলকাতা, ৪ঠা মার্চ ১৯৯০। যাহোক, কোনো একটি মতের পক্ষে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নেই।

৪. হুমায়ুন কবির, *মুসলিম পলিটিক্স ১৯০৬-৪৭ এ্যান্ড আদার এসেজ*, কোলকাতা, ১৯৬৯, পৃ.২৭। কবির নিজেই ত্রিশ দশকে কৃষক প্রজা পার্টির সদস্য ছিলেন। আবুল মনসুর আহমদের মতে, যে বৈঠকে কৃষক প্রজা পার্টি ও কংগ্রেসের আলোচনা ভেঙ্গে যায় সেই বৈঠকে কবির উপস্থিত ছিলেন। কবির অবশ্য ঐ বৈঠক সম্পর্কে উল্লেখ করেননি।

৫. আইন সভায় 'কৃষক' রাজনীতিকদের উপস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গভর্নর বলেন যে, নির্বাচনে 'কৃষক সমিতিগুলো' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং জমিদারি পদ্ধতির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক সমালোচনা করে। তিনি উল্লেখ করেন যে, নোয়াখালী জেলার 'সকল প্রার্থীর মধ্যে এক জন ছাড়া আর কেউ, এমনকি ম্যাট্রিক পাশও ছিল না'। গভর্নরস্ ফোর্টনাইটলি রিপোর্ট (এফ আর), দ্বিতীয় পক্ষ, জানুয়ারি ১৯৩৭, জিবি এইচসিপি ফাইল নং ১০/৩৭। আরও দেখুন জিওআই, হোম পল, ফাইল নং ১৩২/৩৮।

৬. কোয়ালিশন সরকারে হক সাহেবের অংশীদার মুসলিম লীগ প্রজাস্বত্ব আইনের সংস্কার নিয়ে খুব কম আগ্রহী ছিল এবং লীগ আইন সভায় প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) বিল উত্থাপন বিলম্বিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু হক সাহেবের পার্টি ক্রমেই অধৈর্য হয়ে ওঠে এবং ১৯৩৭ সালের বর্ষা মৌসুমের অধিবেশনে প্রজাস্বত্ব সংশোধনী বিল উত্থাপনে তাঁকে বাধ্য করে। কিভাবে এই 'দুর্জ্ঞেয়' নেতার ওপর কৃষক প্রজা পার্টি সদস্যরা চাপ প্রয়োগ করে সেই বিবরণের জন্য দেখুন আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ. ১৫১।

৭. বিল পাস হয় ১৯৩৮ সালে – পক্ষে ৮০ এবং বিপক্ষে ৭২ ভোট পড়ে; কংগ্রেস ব্লক নিরপেক্ষ থাকে। দেখুন *বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলি প্রসিডিংস*, দ্বিতীয় অধিবেশন (১৯৩৭), খণ্ড ৫১, ৩-৪। আইন সভায় বিলের ওপর ভোট প্রদানের ধরন সম্পর্কিত বিবরণের জন্য দেখুন পার্থ চ্যাটার্জী, *বেঙ্গল ১৯২০-১৯৪৭*, পৃ. ১৭২-১৮২।

৮. বিলের বিরুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল ল্যান্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশনের সেক্রেটারির কাছ থেকে প্রাপ্ত স্মারকলিপি সম্পর্কে লিনলিথগো-র বিবরণ দেখুন – লিনলিথগো থেকে জেটল্যান্ডের কাছে

প্রেরিত, ৭ই অক্টোবর ১৯৩৭। জেটল্যান্ড কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর ডি/৬০৯/১৪।

৯. ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইস্ট বেঙ্গল ল্যান্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশনের মিটিং-এর বিবরণ, *অমৃত বাজার পত্রিকা*, ১২ই এপ্রিল ১৯৩৯।

১০. ব্রাবোর্ন থেকে লিনলিথগো-র কাছে প্রেরিত, ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৩৯, এফআর, লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৩৮।

১১. আজিজুল হক, *দি ম্যান বিহাইন্ড দি প্লাউ*, কোলকাতা, ১৯৩৯, পৃ. ১৬৯।

১২. ১৯৩৮ সালে অনুষ্ঠিত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও ডিভিশনাল কমিশনারদের মিটিং-এ উপস্থাপিত একাধিক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ঐ আইনটিকে 'আর্থিক দাবির বিরুদ্ধে সুরক্ষা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে' এবং বলা হয়েছে যে, এই আইন গ্রামের ঋণ গ্রহণকারীদের 'আর্থিক দায়িত্ব পালনের অনিচ্ছাকে' উৎসাহিত করেছে। জিবি এইচসিপিই ফাইল নং ২৮৩/৩৮।

১৩. নবাবি এস্টেটের প্রাক্তন ম্যানেজার পি. ডি. মার্টিন বলেন যে, 'নবাব এবং স্যার নাজিমুদ্দিন ছিলেন মন্ত্রী, শাহাবুদ্দীন (নাজিমুদ্দিনের ছোট ভাই) ছিলেন চিফ হুইপ এবং অনেক অপেক্ষাকৃত তরুণ সদস্য পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। শাহাবুদ্দীনের স্ত্রীও আইন সভায় ছিলেন ...' পি. ডি. মার্টিন মেমোয়ার্স, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১৮০/১৩, পৃ. ৯।

১৪. হার্বার্ট থেকে লিনলিথগো-র কাছে প্রেরিত, ১০ই মে ১৯৪০, এফআর, লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৪০।

১৫. ব্রাবোর্ন থেকে লিনলিথগো-র কাছে প্রেরিত, ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯, এফআর, লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৩৯।

১৬. রিড-এর থেকে লিনলিথগো-র কাছে প্রেরিত, ১৯শে এপ্রিল, ১৯৩৯, এফ আর। লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৩৯।

১৭. আবুল মনুসর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ. ১৪৮।

১৮. ব্রাবোর্ন থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯, এফআর, লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৩৯।

১৯. গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল, হোম পুলিশ ফাইল পৃ. ৩-১-১৯, প্রসিডিংস এ ৭৯-৮১, ডিসেম্বর ১৯৩৮। উদ্ধৃতি শীলা সেন, *মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল*, পৃ. ১১৩।

২০. এন. এন. মিত্র (সম্পাদিত), *ইন্ডিয়ান এ্যানুয়াল রেজিস্টার*, ১৯৩৮, খন্ড-২, জুলাই-ডিসেম্বর, পৃ. ২৩।

২১. গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল, লোকাল সেল্‌ফ গভর্নমেন্ট সার্কুলার নং ৪২৮(৫)-এলএসজি, তারিখ ১৯শে এপ্রিল ১৯৩৯, ফাইল নং ২০-৩, ১৯৩৮; উদ্ধৃত শীলা সেন, *মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল*, পৃ. ১০৯।

২২. মোট ৯৮টি আসনের মধ্যে ৪৭টি আসন সংরক্ষিত ছিল হিন্দুদের জন্য এবং তার মধ্যে ৪টি আসন ছিল তফশিলি সম্প্রদায়ের জন্য, ফলে পুরোপুরি সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া থেকে হিন্দুরা ৩টি আসন কম পায়। বাকি ৫১টি আসন ভাগ করা হয় নির্বাচিত পৌরসভা (৫), মুসলমান (২২), বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স, পোর্ট কমিশনার্স ইত্যাদিসহ বিশেষ নির্বাচনী এলাকা (১২), শ্রমিক

(২), এ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান (২) এবং ৮ জন মনোনীত সদস্য যার মধ্যে ৩ জন হবে তফশিলি সম্প্রদায় থেকে মনোনীত সদস্য। ঐ আইনের পক্ষে ১২৮ এবং বিপক্ষে ৬৫টি ভোট পড়ে; তাই আইনের বিরোধিতা করে কংগ্রেস, ইন্ডিপেনডেন্ট, সিডিউল কাস্ট পার্টির সকল বর্ণ হিন্দু সদস্য – কৃষক প্রজা পার্টি নিরপেক্ষ থাকে। এন. এন. মিত্র (সম্পাদিত) *ইন্ডিয়ান এ্যানুয়াল রেজিস্টার*, ১৯৩৯, খণ্ড ২, জুলাই-ডিসেম্বর, পৃ. ১৬০-১৬১।

২৩. পার্লামেন্টারি বোর্ড ও বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নির্বাহী পদে শরৎ বসু কিভাবে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন তার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি পেপার্স, ফাইল নং পি-৬ (পার্ট ১) এবং পি-৬ (পার্ট ২)/১৯৩৬।

২৪. দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ্য যে, পুলিশ তাঁকে গণ্য করত তাঁর ভাই-এর প্রধান শক্তি হিসেবে তো বটেই, উপরন্তু কোনপ্রকার রাখঢাক না রেখে 'আসল বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি' বলে উল্লেখ করত। বাঙলার ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'সরকারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে তাঁকে প্রদেশের অধিকাংশ কংগ্রেস নেতাদের থেকে অনেক উপরের স্তরের মানুষ বলে গণ্য করে ... তিনি ছিলেন সংগঠনের একজন প্রভাবশালী ও অত্যন্ত ক্ষমতাধর ব্যক্তি'। চার্লস টেগার্ট-এর স্মারকলিপি, জিওআই হোম পল ফাইল নং ৩১/২৭/৩২।

২৫. মুর্শিদাবাদ সাধারণ পল্লি নির্বাচনী এলাকায় হিন্দু সভা মনোনীত প্রার্থীর কাছে কংগ্রেস প্রার্থী পরাজিত হয়। তফশিলি শ্রেণীর জন্য নির্বাচনী এলাকায় কংগ্রেস যেসব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল সেখানে ৬টি আসন ছাড়া সব ক'টি আসনে কংগ্রেস স্বতন্ত্র প্রার্থীদের কাছে পরাজিত হয়। কংগ্রেস প্রার্থী দিতে সমর্থ হয়নি এমন ১৩টি তফশিলি শ্রেণীর জন্য নির্বাচনী এলাকায়ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়লাভ করে। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলি, ইলেকশন রেজাল্টস্। আইওএলআর এল/পি এবং জে/৭/১১৪২।

২৬. চিত্তরঞ্জন দাশের দুর্ভাগাগ্রস্ত হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন উজ্জ্বল কান্তি দাশ, 'দি বেঙ্গল প্যাক্ট অব ১৯২৩ এ্যান্ড ইটস্ রিএ্যাকশনস্' বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট', খণ্ড ৩৪, অংশ ১, ১৮৮, জানুয়ারি-জুন, ১৯৮০।

২৭. পার্থ চ্যাটার্জী, *বেঙ্গল ১৯২০-১৯৪৭*, পৃ. ১৭২।

২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭।

২৯. এটা একটা সম্ভাবনা হতে পারে যা বাঙালি রাজনীতির আলোচনায় উপেক্ষা করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখুন পার্থ চ্যাটার্জী, *প্রাগুক্ত* এবং সুগত বসু, *এ্যাগ্রেরিয়ান বেঙ্গল*, পৃ. ১৯০-২১৪। সত্যটি বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর সাম্প্রতিক বিস্তারিত গবেষণার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাঁর ঐ গবেষণার ভিত্তি হল চ্যাটার্জীর থিসিস, যাতে তিনি, 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীর র‍্যাডিক্যালিজম'-এর সাথে 'একটা সামাজিক শ্রেণীর গঠনকে যুক্ত করেছেন, যারা ভূ-সম্পত্তির খাজনা থেকে অর্জিত আয়ের ওপর কম নির্ভরশীল ছিল'। *সুভাষচন্দ্র বোস, বেঙ্গল এ্যান্ড মিডল ক্লাস র‍্যাডিক্যালিজম*, পৃ. ৫।

৩০. বর্ধমান ডিভিশন থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, জুলাই, ১৯৩৭, জিবি এইচসিপিবি, ফাইল নং ১০/৩৭।

৩১. টিপেরা কৃষক সমিতির নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর ১৯৩৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে আশরাফউদ্দিন কৃষক প্রজা পার্টির সাথে হাত মেলান। তখন তাঁকে বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস

কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং বাঙলায় 'গণসংযোগ' পরিচালনার নেতৃত্ব দেওয়া হয়। আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ. ১৩৫।

৩২. চট্টগ্রাম ডিভিশন কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, জুন ১৯৩৭, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ১০/৫৭।

৩৩. কাঁথির খাস মহালগুলিতে 'খাজনা বন্ধের' আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কংগ্রেস নেতা বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মাল, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ২৮৩/৩৮।

৩৪. দেবেন্দ্রলাল খানের জমিদারি সম্পর্কে বলা হয়েছে: তিনি ছিলেন নারাজোলের রাজা, কংগ্রেস নেতা ও শরৎ বসুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী। ব্রাবোর্ন থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ৬ই জানুয়ারি, ১৯৩৯,এফ আর। লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৩৯।

৩৫. মোহাম্মদ এহসানুল হক এফেন্দী, *বর্তমান রাজনীতিক সংকট ও মুসলমানদের কর্তব্য*, ডোমার, রংপুর, ১৯৩৯, জিওআই হোম পলিটিক্যাল ফাইল নং ৩৭/৩০/৩৯।

৩৬. নীরদ সি. চৌধুরী, *দাই হ্যান্ড গ্রেট এ্যানার্ক! ইন্ডিয়া ১৯২১-১৯৫২*, লন্ডন, ১৯৮৭, পৃ. ৪৬৯।

৩৭. ঐ প্রচারণায় সাধারণভাবে এই যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে, 'সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান নিহিত আছে মূলত সামাজিক ন্যায়বিচারের ওপর।' ১৯৪৭ সালের ১৫ই মার্চ কোলকাতায় শরৎচন্দ্র বসুর সংবাদ মাধ্যমে দেয়া বিবৃতির অংশ, *আই ওয়ার্নড মাই কান্ট্রিমেন। বিইং দি কালেকটেড ওয়ার্কস ১৯৪৫-৫০ অব শরৎচন্দ্র বোস*, কোলকাতা, ১৯৬৮, পৃ. ১৮২।

৩৮. বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, ডিসেম্বর ১৯৩৭, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ১০/৩৭।

৩৯. প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, জুলাই ১৯৩৭, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ১০/৩৭।

৪০. ঢাকা ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, প্রথম পক্ষ, নভেম্বর ১৯৩৭, *প্রাগুক্ত*।

৪১. জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ২৮৩/৩৮।

৪২. ব্রাবোর্ন থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৩৮, এফআর। লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৩৮।

৪৩. ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে গোয়েন্দা শাখার একজন চর রিপোর্ট করে যে, 'অল বেঙ্গল স্টুডেন্ট ফেডারেশনের চেয়ারম্যান নাজিমুদ্দিন আহমদ এবং ঐ সংগঠনের সদস্য আবদুস সাত্তার কোলকাতার মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে প্রচারণা চালাচ্ছে এবং কংগ্রেস সমর্থক অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস্ ফেডারেশনে যোগদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। এই সংগঠনে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা খুবই কম ... যে কোনো মূল্যে কোলকাতার মুসলমান ছাত্রদের সমর্থন পাওয়ার জন্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কাজী ময়জুদ্দীন আহমাদকে দায়িত্ব দিয়েছেন।' মেমো, তারিখ ২রা এপ্রিল ১৯৩৮, জিবি 'এসবি পিএম সিরিজ', ফাইল নং ১৩৯৫১/৩৮।

৪৪. মেমো, তারিখ ১৬ই মার্চ ১৯৩৮, *প্রাগুক্ত*।

৪৫. মেমো, তারিখ ২৪শে মার্চ ১৯৩৮, *প্রাগুক্ত*।

৪৬. *বোম্বে ক্রোনিকল*, ১৮ই মে ১৯৩৮, এবং মনজুর আহমদের কাছ থেকে আশরাফউদ্দিন চৌধুরী, ১৩ই জুলাই ১৯৩৮ (উর্দুতে), এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং ৪২/১৯৩৭ (১), উদ্ধৃত মনিরুল হাসান, 'দি মুসলিম মাস কনট্যাক্টস্ ক্যাম্পেইন: এনালিসিস অব এ স্ট্রাটেজি অব পলিটিক্যাল মবিলাইজেশন', পৃ. ১১৭-১১৮।

৪৭. অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি পেপার্স, ফাইল নং পি-২৪ (পার্ট ২)/১৯৩৮-৩৯-তে অন্তর্ভুক্ত বেঙ্গল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এ্যানুয়াল রিপোর্ট, ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯।

৪৮. যশোরের নওশের আলী ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভায় জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ছিলেন, ১৯৩৮ সালের জুন মাসে পুরো মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করার পর তাঁকে ছাড়াই মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত হলে মন্ত্রিসভা থেকে তিনি বাদ পড়েন। এর ফলে সরকারে কৃষক প্রজা পার্টির একমাত্র সদস্য থাকেন ফজলুল হক। দেখুন ফ্রানসাইজ, মিনিস্ট্রিজ ১৯৩৭-৪৬। অন্তর্ভুক্ত আইওএলআর/ এল/পি এবং জে/৮/৪৭৫ এবং শীলা সেন, *মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল*, পৃ. ১১৯।

৪৯. ব্রাবোর্ন থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ৬ই জানুয়ারি ১৯৩৯, এফ আর। লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৩৯।

৫০. রিড থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ৫ই এপ্রিল ১৯৩৯, এফআর, *প্রাগুক্ত*।

৫১. যুক্ত প্রদেশে গণসংযোগ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া একই রকম দেখা যায়। এক পণ্ডিত ব্যক্তির ভাষায়: 'এতে দেবার প্রস্তাব ছিল খুবই সামান্য এবং প্রস্তাব এসেছিলও খুবই দেরিতে। এর ফলে ইউপি-তে এক দিকে দেখা গেল মুসলমান রাজনীতিবিদেরা এর সাথে যোগাযোগ আরও কমিয়ে ফেলে এবং অপর দিকে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে।' জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, *দি এ্যাচসেন্ডেন্সি অব দ্য কংগ্রেস ইন উত্তর প্রদেশ ১৯২৬-৩৪। এ স্টাডি ইন ইমপারফেক্ট মবিলাইজেশন*, নিউ দিল্লী, ১৯৭৮, পৃ. ১৫১।

৫২. ঢাকা ডিভিশন কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, নভেম্বর ১৯৩৭। জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ১০/৩৭।

৫৩. প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, জুলাই ১৯৩৭, *প্রাগুক্ত*।

৫৪. ঢাকা ডিভিশন কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, সেপ্টেম্বর ১৯৩৭, *প্রাগুক্ত*।

৫৫. চট্টগ্রাম ডিভিশন কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, জুন ১৯৩৭, *প্রাগুক্ত*।

৫৬. চট্টগ্রাম ডিভিশন কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, জুলাই ১৯৩৭, *প্রাগুক্ত*।

৫৭. চট্টগ্রাম ডিভিশন কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, আগস্ট ১৯৩৬, জিবি এইসিপিবি ফাইল নং ৫৬/৩৬।

৫৮. 'ফ্রানসাইজ, বেঙ্গল লেজিসলেটিভ, এ্যাসেম্বলি রেজাল্টস্, ১৯৩৬', আইওএলআর এল/পি এবং জে/৭/১১৪২।

৫৯. চট্টগ্রাম ডিভিশন কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, জুন ১৯৩৭, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ১০/৩৭।

৬০. *প্রাগুক্ত*।

৬১. চট্টগ্রাম ডিভিশন কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, জুলাই ১৯৩৭, *প্রাগুক্ত*।

৬২. নাজিমুদ্দীন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন 'গোলাম সরোয়ার, মৌলভি আবদুর রশিদ, মৌলভি ইব্রাহিম ও মৌলভি আবদুর রাজ্জাকের মধ্যে একটা মীমাংসা করার চেষ্টা করেন। এই চার জন যদি একসাথে কাজ করতে পারে তাহলে কংগ্রেসকে পরাজিত করতে কৃষক সমিতিগুলোর ভয়ের কোনো কারণ নেই।' নাজিমুদ্দীনের নোট, ১৬ই মে ১৯৩৭। জিবি *এইচসিপিবি* ফাইল নং ৩০৭/৩৭।

৬৩. চট্টগ্রাম ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, আগস্ট ১৯৩৭, জিবি এইচসি পিবি ফাইল নয় ১০/৩৭।

৬৪. পুলিশের বিশ্বাস যে, ১৯৪৬ সালে কোলকাতায় মুসলমান নিধনের প্রতিশোধ নোয়াখালীর মুসলমানদের ইন্ধন যোগাতে গোলাম সরোয়ার অন্যান্য নেতাদের চেয়ে বেশি তৎপর ছিলেন। জিবি এসবি, 'পিএম সিরিজ, ফাইল নং ৯৩৭/৪৬।

৬৫. চট্টগ্রাম ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, জুলাই ১৯৩৭, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ১০/৩৭।

৬৬. চট্টগ্রাম ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, নভেম্বর ১৯৩৭, *প্রাগুক্ত*।

৬৭. চট্টগ্রাম ডিভিশন কমিশনারের রিপোর্ট, প্রথম পক্ষ, সেপ্টেম্বর ১৯৩৭। *প্রাগুক্ত*।

৬৮. অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি পেপার্স, ফাইল নং ৩৯/১৯৩৮।

৬৯. রিড থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ২২শে মে ১৯৩৯, এফ আর। লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৩৯।

৭০. মুশিরুল হাসান, *দি মুসলিম মাস কন্টাক্টস্ ক্যাম্পেইন*, পৃ, ২১৪।

৭১. বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, জুলাই ১৯৩৭, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ১০/৩৭।

৭২. বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, জুলাই ১৯৩৭, *প্রাগুক্ত*।

৭৩. বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, এপ্রিল ১৯৩৭, *প্রাগুক্ত*।

৭৪. রাজশাহী ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, জুলাই ১৯৩৭, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ১০/৩৭।

৭৫. এস. এম. আহমদ থেকে আশরাফউদ্দিন আহমদ চৌধুরীর কাছে, ১৯শে আগস্ট ১৯৩৭ (উর্দু ভাষায়), এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং ৪৭/১৯৩৭। উদ্ধৃত মুশিরুল হাসান, *দি মুসলিম মাস কন্টাক্টস্ ক্যাম্পেইন*, পৃ. ২১৪।

৭৬. চট্টগ্রাম ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, এপ্রিল ১৯৩৭, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ১০/৩৭।

৭৭. জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ২৮৩/৩৮।

৭৮. *প্রাগুক্ত*। সুগত বসু আন্দোলন নিয়ে আলোচনার সময় এই বিষয়টি উপেক্ষা করেন। দেখুন সুগত বসু, *এ্যাগ্রেরিয়ান বেঙ্গল*, পৃ. ২৪৩-২৪৪।

৭৯. চট্টগ্রাম ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, এপ্রিল ১৯৩৭, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ১০/৩৭।

৮০. গৌতম চট্টোপাধ্যায়, *বেঙ্গল ইলেক্টোরাল পলিটিক্স এন্ড ফ্রিডম স্ট্রাগল*, পৃ. ১৫৬।

৮১. *প্রসিডিংস, বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলি*, ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৭, পৃ. ২০৯৩। আরো উদ্ধৃত হয়েছে গৌতম চট্টোপাধ্যায়, *বেঙ্গল ইলেক্টোরাল পলিটিক্স এ্যান্ড ফ্রিডম স্ট্রাগল*, পৃ. ১৫১।

৮২. সুগত বসু, *এ্যাগ্রেরিয়ান বেঙ্গল*, পৃ. ২১০-২১৪; পার্থ চ্যাটার্জী, *বেঙ্গল ১৯২০-১৯৪৭*, পৃ. ১৭২-৮০।

৮৩. সুগত বসু, *এ্যাগ্রেরিয়ান বেঙ্গল*, পৃ. ২১০।

৮৪. কংগ্রেসের অবস্থানের সাথে জড়িত 'কৌশলগত পরিচালনার উৎসাহী উপাদান'-এর ব্যাপারে চ্যাটার্জী অধিক অনুভূতিপ্রবণ। তবে তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, 'ত্রিশের দশকে বাঙলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আদর্শের ও সংস্কৃতিতে' এই আমূল সংস্কারের প্রবণতার ফলে ভদ্রলোক (এবং বিস্তারিতভাবে বললে, কংগ্রেসের প্রসার) রাজনীতির ক্ষেত্রে নাটকীয় পরিবর্তন সূচিত করে। তিনি যুক্তি দেখান যে, 'বাম' দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিলের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের আক্রমণ ঐ পরিবর্তনের স্পষ্ট প্রকাশ। পার্থ চ্যাটার্জী, *বেঙ্গল ১৯২০-১৯৪৭*, পৃ. ১৭২-১৭৭।

৮৫. কৃষকদের স্বার্থকে যথাযথ দৃঢ়তার সাথে গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য হক সাহেবের ব্যাপারে ধৈর্যচ্যুত আইন সভার সতেরো জন বিদ্রোহী সদস্যের একটি দলকে নেতৃত্ব দেন তমিজউদ্দিন খান এবং শামসুদ্দীন আহমদ। তাঁরা একটা 'স্বতন্ত্র প্রজা পার্টি' গঠন করেন এবং বিরোধী দলের শরৎ বসুর পক্ষে যোগ দেন। যাহোক, এক বছর পর কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার স্বতন্ত্র প্রজা পার্টিকে কো-অপ্ট করা হয় এবং ফজলুল হকের মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী হিসেবে তমিজউদ্দিন ও শামসুদ্দীন যোগদান করেন। ব্রাবোর্ন থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ১৮ই নভেম্বর ১৯৩৮, এফ আর। লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৩৮, এবং পিনেল থেকে লেথওয়েট, ৭ই জানুয়ারি ১৯৩৯, সংযুক্তি ১, *প্রাগুক্ত*, এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৩৯।

৮৬. ১৯২৮ সালের বেঙ্গল প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইনের ভোটের ধরন থেকে দেখা যায় যে, অনেক বড় বড় জমিদার অধীনস্থ রায়তদের সুবিধা দেবার পক্ষে ভোট দেয়, অন্য দিকে কংগ্রেস-স্বরাজ্য দল এটার বিপক্ষে ভোট দেয়। পার্থ চ্যাটার্জী, *বেঙ্গল ১৯২০-১৯৪৭*, পৃ. ৮৭।

৮৭. ডায়েটমার রদারমন্ড, *গভর্নমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড এ্যান্ড পিজান্ট ইন ইন্ডিয়া এ্যাগ্রেরিয়ান রিলেশনস্ আন্ডার ব্রিটিশ রুল*, ওয়েজবাডেন, ১৯৭৮, পৃ. ১০৯।

৮৮. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ. ৬৭-৭১।

৮৯. উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর জেলায় জরিপ ও সেটেলমেন্ট কাজের সময় বেল বিভিন্ন থানা ও গ্রামের কৃষক ও জোতদারদের সাথে কথা বলেন। ঐসব কথাবার্তার রেকর্ড থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই জেলায় কৃষকদের অনেকে নেতাদের মধ্যে শুধু গান্ধী ও ফজলুল হকের নাম শুনলেও ১৯৩৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের শর্তাবলি সম্পর্কে খুব ভালভাবেই অবহিত ছিল। রাজনৈতিক দিক থেকে তাই বলা যায়, প্রজাস্বত্ব বিল প্রথম হক মন্ত্রিসভার অত্যন্ত দক্ষতাপূর্ণ একটি কাজ ছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এফ. ও. বেল পেপার্স, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর ডি/৭৩৩/২।

৯০. *বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব নতুন আইন ও লীগের বাণী*, ঢাকা, ১৯৩৯, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৪৬৩/৩৯।

৯১. লেখকের সাথে সাক্ষাৎকারের সময় নিখিল চক্রবর্তী এই বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। নিউ দিল্লী, ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯।

৯২. গভর্নরের এফআর, প্রথম পক্ষ, জুলাই ১৯৩৯। রবার্ট রিড পেপার্স, এমএসএস ইইউআর এফ/২৭৮/৫(১)।

৯৩. দশ জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বসু গ্রুপ অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে এবং বিদ্রোহী স্বতন্ত্র প্রজা পার্টি তা সমর্থন করে। যদিও শরৎ বসু শ্রীশচন্দ্র নন্দী নামে একজন হিন্দু মন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রথম অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে মুসলিম জনমতকে শান্ত করার চেষ্টা করেন, তবু তাঁর ঐ উদ্যোগে মুসলমানদের মধ্যে অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি হয়। যেসব মুসলমান এমএলএ বসুকে সমর্থন করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন তমিজউদ্দিন খান, শামসুদ্দীন আহমদ ও ড. সানাউল্লাহ – তাঁরা তাঁদেরই সম্প্রদায়ের লোকদের কাছ থেকে জীবন নাশের হুমকি পান। তমিজউদ্দিন তাঁর নিজের বাড়ি ছেড়ে হিন্দু এলাকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। জিবি এসবি 'পিএম সিরিজ', ফাইল নং ১৩৯৫১/৩৮, মেমো তারিখ ২১শে মার্চ ১৯৩৮ এবং ১লা মে ১৯৩৮।

৯৪. দেখুন হার্বার্ট থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ৫ই ডিসেম্বর ১৯৪১, এফ আর, লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৪১, এবং হার্বার্ট থেকে লিনলিথগো, ৮ই মে ১৯৪২, এফআর, *প্রাগুক্ত*।

৯৫. দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখুন, লিওনার্ড গর্ডন, *বেঙ্গল: দি ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট ১৮৭৬-১৯৪০*, নিউ দিল্লী, ১৯৭৯; গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, *কনস্ট্রেইন্টস্ ইন বেঙ্গল পলিটিক্স*।

৯৬. গভর্নর উল্লেখ করেন যে, 'সভাপতি নির্বাচনের জন্য যেসব প্রতিনিধি নিয়ে ইলেক্টোরাল কলেজ গঠন করা হয়েছে তাঁদের সংখ্যা ৫৪৪ জন। এর মধ্যে ৮০ জনের বেশি সাবেক রাজবন্দি এবং ১৪ জন ভূতপূর্ব রাজবন্দি। ৫৪৪ জন সদস্যের মধ্যে সম্ভবত ৩০০ জন সুভাষ বসুর প্রাদেশিক উপদলের সমর্থক।' ব্রাবোর্ন থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯, এফআর। লিনলিথগো কালেকশন, এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৩৯।

৯৭. বাঙলার ছাত্র রাজনীতির ইতিহাস সম্পর্কিত বিবরণের জন্য দেখুন বজলুর রহমান খান, *পলিটিক্স ইন বেঙ্গল ১৯২৭-১৯৩৬*, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৯২-১২৭। আন্দামান আন্দোলনের সময় ছাত্রদের সক্রিয় ভূমিকার বিবরণ দেন নিখিল চক্রবর্তী, লেখকের সাথে সাক্ষাৎকারের সময়, নিউ দিল্লী, ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯।

৯৮. ই. এন. ব্লানডি, 'কনফিডেনসিয়াল রিপোর্ট অন দি পলিটিক্যাল সিচুয়েশন ফর দি ফার্স্ট হাফ অব জুলাই, ১৯৩৯', রবার্ট রিড কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর ই/২৭৮/৫।

৯৯. বস্তুত এই অনুভূতির জন্য যেসব মহল থেকে সমর্থনের সম্ভাবনা ছিল না তারা বসুকে সমর্থন করে। গভর্নর উল্লেখ করেন যে, 'সম্ভবত স্থানীয় স্বদেশ প্রেমই এর কারণ হবে। সত্য এই যে, ডা. বিধান্ রায় গ্রুপের লোকজন যারা তাঁর ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ, তারাও শেষ মুহূর্তে তাঁকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেয়।' ব্রাবোর্ন থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯। লিনলিথগো কালেকশন, এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৩৯। এটা বলা নিষ্প্রয়োজন, ডা. রায়ের এই সংহতি ছিল ক্ষণস্থায়ী।

১০০. 'মি. গান্ধী সাহস হারিয়ে ফেলেছেন এবং এখন এমনকি তিনি একথা বলতেও সাহস করেন না যে, কোনো একজন বসুর কাছে যাও' – এ ধরনের জল্পনা-কল্পনা বন্ধ করতে হাই কমান্ড স্পষ্টত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। লিনলিথগো থেকে জেটল্যান্ডের কাছে প্রেরিত, ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯, জেটল্যান্ড কালেকশন, এমএসএস ইইউআর ডি/৬০৯/১৭।

১০১. রাজেন্দ্রপ্রসাদ থেকে শরৎ বসু, ৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪০, এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং পি-৫ (পার্ট ২)/১৯৩৯-৪০।

১০২. বি. এন. পালিত থেকে এআইসিসি সেক্রেটারি, এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং পি-৫ (পার্ট ২)/১৯৪০।

১০৩. এআইসিসি প্রেসিডেন্টের কাছে প্রেরিত কংগ্রেস ইলেকশন ট্রাইব্যুনালের রিপোর্ট, ৫ই অক্টোবর ১৯৩৯, এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং জি-৫৬/১৯৩৯।

১০৪. এন. এন. মিত্র (সম্পাদিত), *ইন্ডিয়ান এ্যানুয়াল রেজিস্টার ১৯৩৯*, খণ্ড ১, জানুয়ারি-জুন, পৃ. ৩২ (এইচ)।

১০৫. *প্রাগুক্ত*, খণ্ড ২, জুলাই-ডিসেম্বর, পৃ. ২।

১০৬. দেখুন এআইসিসি পেপার্স ফাইল নং পি-৫ (পার্ট ১)/১৯৩৬-৩৭ এবং পি-৫ (পার্ট ১)/১৯৩৯/৪০।

১০৭. বিপিসিসি সেক্রেটারির কাছ থেকে এআইসিসি জেনারেল সেক্রেটারি, ১৩ই মে ১৯৪০, এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং পি-৫ (পার্ট ২)/১৯৪০।

১০৮. এআইসিসি ফাইলে এ ব্যাপারে মাত্র সাত জন কংগ্রেস নেতার ব্যক্তিগত পত্র আছে, তাঁরা তাঁদের ঐসব পত্রের মাধ্যমে সত্যাগ্রহ অঙ্গীকার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন (মেদিনীপুর থেকে পাঁচ জন এবং বর্ধমান থেকে দু'জন)। এমনকি এসব ক্ষেত্রেও কোনো আদর্শগত কারণ দেখানো হয়নি – অসুস্থতা ও পারিবারিক প্রয়োজনকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং পি-৫ (পার্ট ২)/১৯৪১।

১০৯. শৈলজা মোহন দাশের কাছ থেকে বিপিসিসি সেক্রেটারি, ১৩ই মে ১৯৪০, এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং পি-৫ (পার্ট ২)/১৯৪০।

১১০. বিপিসিসি সেক্রেটারি থেকে কৃপালনী, ১০ই জুন ১৯৪০, এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং পি-৫ (পার্ট ২)/১৯৪০।

১১১. এআইসিসি জেনারেল সেক্রেটারি থেকে বিপিসিসি সেক্রেটারি, ১৬ই মে ১৯৪০, এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং পি-৫ (পার্ট ২)/১৯৪০।

১১২. ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে সান্যাল কুষ্টিয়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুরে যৌথভাবে মিটিং করেন এবং কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের এক সাথে কাজ করার আহ্বান জানান। প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, ফেব্রুয়ারি এবং প্রথম পক্ষ, মার্চ ১৯৪৫। জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৩৭/৪৫। আরও দেখুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট, প্রথম পক্ষ, ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫, *প্রাগুক্ত*।

১১৩. ডা. নলিনাক্ষ্য সান্যালের কাছ থেকে এআইসিসি সেক্রেটারি, ২৩শে মার্চ ১৯৪৬, এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং পি-৫ (পার্ট ১)/১৯৪৫/৪৬।

১১৪. আইন সভা নির্বাচনের সময় প্রার্থী মনোনয়নে বিপিসিসি-র অনিয়ম সম্পর্কে অনেক অভিযোগ পত্র পাওয়া যায়। এই সব পত্র এআইসিসি পেপার্স-এ রক্ষিত আছে, ফাইল নং পি-৫ (পার্ট ১)/১৯৪৫/৪৬।

১১৫. নব যুবক সেবা সমিতির সেক্রেটারি উল্লেখ করেন যে, কোলকাতা ১৩ নম্বর ওয়ার্ড কংগ্রেস কমিটি সমিতি কর্তৃক পেশকৃত কমপক্ষে ৩৭৮টি রসিদ গ্রহণে অস্বীকার করে। *প্রাগুক্ত*।

১১৬. এ. কে. ভট্টাচার্য থেকে এআইসিসি সেক্রেটারি, ২২শে অক্টোবর ১৯৪৫; এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং পি-৫ (পার্ট ১)/১৯৪৫-৪৬।

১১৭. এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং পি-৫ (পার্ট ১)/ ১৯৪৫-৪৬।

১১৮. আশরাফউদ্দিন চৌধুরী থেকে কৃপালনী, ৯ই ডিসেম্বর ১৯৪৫; জামালউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, *রাজবিরোধী আশরাফউদ্দিন আহমদ চৌধুরী*, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ১৬৩।

১১৯. বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলি, ইলেকশন রেজাল্টস, ১৯৩৬। আইওএলআর *এল/পি* এবং জে/৭/১১৪২।

১২০. কালিপদ মুখার্জীর কাছ থেকে ফজলুল করিম চৌধুরী, ২৮শে নভেম্বর ১৯৪৫, এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং পি-৫ (পার্ট ১) ১৯৪৫-৪৬।

১২১. এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং পি-৫ (পার্ট ১) ১৯৪৫-৪৬।

১২২. 'ফ্রানসাইজ, ইলেকশনস্ ইন বেঙ্গল ১৯৪৬', আইওএলআর *এল/পি* এবং জে/৮/৪৭৫।

১২৩. জে এ গালাঘের, 'কংগ্রেস ইন ডিক্লাইন'।

১২৪. 'খাজনা না দেওয়ার আন্দোলন সম্পর্কে জেলা কর্মকর্তাগণ ১৯৩৮ সালে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে উল্লেখ করেন যে, খাজনা না দেওয়ার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে – অনেক ক্ষেত্রে 'আইন পাস সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির কারণে'। বর্ধমানের মহারাজার একটা এস্টেটের খাজনা আদায়ের পরিমাণ 'আগের বছরের তুলনায় শতকরা ৪২ ভাগ থেকে ২৪ ভাগে কমে এসেছে'। জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ২৮৩/৩৮। বালুরঘাটে 'খাজনা না দেওয়ার' আন্দোলন ছিল খুবই জোরালো। এখানকার বিস্তারিত এক বিবরণে কমিশনার উল্লেখ করেন যে, 'ভালো ফসল ও ভালো দাম থাকা সত্ত্বেও এ বছর খাজনা আদায় হ্রাস পেয়েছে। সাব-ডিভিশনাল অফিসার বলেছেন যে, এ সময় পর্যন্ত সাধারণত শতকরা ৮০ ভাগ খাজনা আদায় হয়, কিন্তু এবার শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ আদায় হয়েছে। একজন জমিদার আমাকে বলেছেন যে, এ পর্যন্ত মাত্র ১২ হাজার টাকা আদায় হয়েছে, অথচ হওয়া উচিত ছিল ৪১ হাজার টাকা। আর একজন আমাকে বলেন যে, ৩৫ হাজার টাকা দাবির প্রেক্ষিতে আদায় হয়েছে মাত্র ৩ হাজার টাকা। দিনাজপুরের রাজা সংগৃহীত অর্থের মাত্র শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ দিয়েছে।' এ. জে. দাশ, 'এ্যাগ্রেরিয়ান সিচুয়েশন ইন বালুরঘাট সাব-ডিভিশন', জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ১৯১/৩৯।

১২৫. পি. ডি. মার্টিন মেমোয়ার্স, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৩৯।

১২৬. *অমৃত বাজার পত্রিকা*, ২রা মে ১৯৩৯ সংখ্যায় প্রকাশিত বর্ধমান মহারাজার সভাপতির ভাষণ।

১২৭. রিড থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ৫ই মে ১৯৩৯, লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৩৯।

১২৮. উডহেড থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ১৯/২০ জুন, ১৯৩৯, এফআর, *প্রাগুক্ত*।

১২৯. রিড লক্ষ করেন যে, বিলের বিরোধিতা না করার সিদ্ধান্তের জন্য কংগ্রেস তাদের নিজেদের পত্রিকার ও বসুর সংবাদপত্রের সমালোচনার সম্মুখীন হয় – তাঁর ঐ পত্রিকা সরকার বা 'সাম্রাজ্যবাদে'র বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচারে নিয়োজিত ছিল ... কংগ্রেস মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুদের স্বার্থে বিলের ধারাগুলোর সমতার ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন ছিল।' রিড থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ১৯শে এপ্রিল ১৯৩৯, এফআর, *প্রাগুক্ত*।

১৩০. *অমৃত বাজার পত্রিকা*, ৫ই এপ্রিল ১৯৩৯।

১৩১. *প্রাগুক্ত*, ৬ই এপ্রিল ১৯৩৯।

১৩২. *প্রাগুক্ত*, ৫ই এপ্রিল ১৯৩৯।

১৩৩. অর্থলগ্নী ব্যবসায়ের সাথে জড়িত সবার জন্য ঐ আইনে সরকারের কাছ থেকে ট্রেড লাইসেন্স নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়, আর ঐ সরকার এখন প্রজা-লীগের নিয়ন্ত্রণে। সরকার নিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ ঋণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সুদের হার যথাক্রমে শতকরা ৬ ভাগ ও ৮ ভাগ নির্ধারণ করে দেয়। ঐ আইনে আরও শর্ত আরোপ করা হয় যে, 'কোনো অবস্থাতেই ঋণ পরিশোধের সময় সুদের পরিমাণ মূল অর্থের পরিমাণের চেয়ে অধিক হবে না' এবং এই শর্ত 'অনির্দিষ্ট অতীত সময়ের ক্ষেত্রেও' কার্যকর হবে। হার্বার্ট থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ১০ই মে ১৯৮০ এফ আর। লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৪০।

১৩৪. হার্বার্ট থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯, এফ আর। লিনলিথগো, ১০ই মে ১৯৪০, এফআর, লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৩৯।

১৩৫. রিড থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ৬ই জুলাই ১৯৩৯, এফআর। রবার্ট রিড পেপার্স, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর ই/২৭৮/৫(এ)।

১৩৬. পরিস্থিতি সম্পর্কে রিড-এর মূল্যায়ন নিয়ে জেটল্যান্ড এক পত্রে ভাইসরয়কে জানান। দেখুন, জেটল্যান্ড থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ২৭শে জুন ১৯৪০, এফআর। লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৪০।

১৩৭. হার্বার্ট থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ৭ই জুন ১৯৪০, এফআর। লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৪০।

১৩৮. মেদিনীপুর থেকে প্রাপ্ত এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, জুলাই ১৯৩৯, রবার্ট রিড পেপার্স, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর ই/২৭৮/৫(এ)। প্রদেশের অন্যান্য এলাকার মতো মেদিনীপুর কংগ্রেস অভ্যন্তরীণভাবে ১৯৩৩ সাল থেকেই বিভক্ত হয়ে পড়ে – ঐ বিভক্তি হয় কংগ্রেসের পুরানো গ্রুপ ও 'নতুন র‍্যাডিক্যাল গ্রুপের মধ্যে – গান্ধীর কাজ-কর্ম নিয়ে তারা প্রকাশ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করে'। ১৯৩৯ সালের মধ্য ভাগে এই 'কিষান গ্রুপ কংগ্রেস থেকে' ধীরে ধীরে নিজেদের ছিন্ন করে ফেলে। এফআর, দ্বিতীয় পক্ষ, এপ্রিল ১৯৩৯, আইওএলআর এল/পি এবং জে/১২/১৪৪।

১৩৯. তামলুক ও কাঁথি সাব-ডিভিশনে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের অসামান্য সাফল্য এই চিত্রের ঠিক বিপরীত। সার্বিকভাবে এই আন্দোলন তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় নেতাদের নেতৃত্বে

সংগঠিত হয় এবং এদের সাথে জাতীয়, প্রাদেশিক, এমনকি জেলা পর্যায়ের কংগ্রেস নেতাদের সম্পর্ক ছিল খুবই সামান্য। দেখুন বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, 'পলিটিক্যাল মবিলাইজেশন ইন দি লোকালিটিজ: দি ১৯৪২ কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট ইন মেদিনীপুর', *মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ*, খণ্ড ২৬, ৪, ১৯৯২।

১৪০. সুরেন্দ্র মোহন ঘোষের সাথে সাক্ষাৎকারের ভাষ্য, এনএমএমএল ওটি নং ৩০১, পৃ ২৩৫।

১৪১. কোলকাতায় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার স্মারকলিপি, জেটল্যান্ড কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর ডি/৬০৯/২১(এইচ)/এ।

১৪২. বাঙালি সংবাদপত্র সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণায় ভোলা চ্যাটার্জী 'সাম্প্রদায়িক সচেতনতার' ওপর যে মন্তব্য করেন তা সব হিন্দু সংবাদপত্রেই স্পষ্ট ছিল: 'ধর্ম নিয়ে কোনো কিছু আলোচনার সময় 'অগ্রগতি' ও 'মুক্তি'র বিষয়টিকে সর্বজনীনভাবে যুক্তি হিসেবে দেখানো হয়। বিপ্লব ও জ্ঞানালোক থেকে প্রাপ্ত ও কুসংস্কারাদি থেকে মুক্ত হবার মতো আকর্ষণীয় সকল উক্তি হিন্দু ধর্ম ও তার সামাজিক পদ্ধতির 'শাশ্বত মূল্যবোধের জন্য সম্ভ্রম উদ্রেককারি উক্তিসমূহের সাথে তুলনীয় ছিল না।' ভোলা চ্যাটার্জী, *আসপেক্টস্ অব বেঙ্গল পলিটিকস্ ইন দি আর্লি নাইনটিন-থার্টিজ*, কোলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ১৮-২০।

১৪৩. দেখুন, রিড থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ২০শে আগস্ট, ১৯৩৯, এফআর। রবার্ট রিড পেপার্স, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর ই/২১৮/৫, এবং হার্বার্ট থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ৭ই জুন ১৯৪০, এফআর। লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৪০।

১৪৪. এন. এন. মিত্র (সম্পাদিত), *ইন্ডিয়ান এ্যানুয়াল রেজিস্টার*, ১৯৩৯. খণ্ড ২, জুলাই-ডিসেম্বর, পৃ. ৫২।

১৪৫. লিনলিথগো থেকে জেটল্যান্ডের কাছে প্রেরিত, ২৩ই জানুয়ারি ১৯৪০, জেটল্যান্ড কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর ডি/৬০৯/১৯।

১৪৬. জীবন বৃত্তান্তের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বলরাজ মোদক, ড. *শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, এ বায়োগ্রাফি*, দিল্লী, ১৯৫৪। আরও দেখুন, জে. এইচ. ক্রমফিল্ড, *এলিট কনফ্লিক্ট ইন এ প্লুরাল সোসাইটি*, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ২৮২-২৮৪।

১৪৭. *হিন্দুর সংকটময় পরিস্থিতি: নেতৃত্বের আহ্বান*, কোলকাতা, ১৯৩৯; মহাসভা প্রকাশিত একটি পুস্তিকা, জিবি এসবি 'পিএইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫০১/৩৯-এর সংযুক্তি।

১৪৮. বিড়লা ও কংগ্রেসের মধ্যকার সম্পর্কের বিবরণের জন্য দেখুন, জিডি বিড়লা, *ইন দ্য শ্যাডো অব দি মহাত্মা – এ পারসোনাল মেমোয়ার*, কোলকাতা, ১৯৫৩।

১৪৯. মেমো, তারিখ ৩রা ডিসেম্বর ১৯৩৯, জিবি এসবি 'পিএইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫০১/৩৯(৩)।

১৫০. কোলকাতায় মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের উত্থান সম্পর্কে বিবরণের জন্য দেখুন, ওমকার গোস্বামী, '*সাহিবস্, বাবুজ* এন্ড *বেনিয়াজ*: চেঞ্জেস ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোল ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ১৯১৮-৫০', *জার্নাল অব এশিয়ান স্টাডিজ*, খণ্ড ৪৮, ২রা মে ১৯৮৯, পৃ. ২৮৯-৩০৯।

১৫১. জিওআই হোম পল ফাইল নং ৪/১৪-এ/৪০

১৫২. মেমো, তারিখ ৩রা ডিসেম্বর ১৯৩৯। জিবি এসবি 'পিএইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫০১/৩৯(৩)।

১৫৩. জিবি এসবি 'পিএইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫০১/৩৯।

১৫৪. ময়মনসিংহ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থেকে ঢাকা ডিভিশনের কমিশনার, ১৯শে মার্চ ১৯৪১। জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ১৩/৪১।

১৫৫. গুজব আছে যে, নলিনী সরকারের প্রশ্নে কোয়ালিশন সরকার গঠন নিয়ে শরৎ বসু ও ফজলুল হকের মধ্যে আলোচনা ভেঙ্গে যায়। হক সাহেব তাঁকে অর্থমন্ত্রী হিসেবে পেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, আর শরৎ বসু এমন কোনো কোয়ালিশনে যোগ দিতে অস্বীকার করেন যেখানে সরকার এক জন সদস্য। শীলা সেন, *মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল*, পৃ. ৯৩। ঐ ভাঙ্গনের ব্যাপারে সরকারের বক্তব্যের জন্য দেখুন, *হোয়াই মিস্টার নলিনী রঞ্জন সরকার লেফট্ দি কংগ্রেস*, কোলকাতা, ১৯৩৭, পৃ. ৫, নলিনী রঞ্জন সরকার পেপার্স, সিরিয়াল নং ১৫, এন এম এম এল।

১৫৬. হার্বার্ট থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ৬ই জানুয়ারি ১৯৪০, এফআর। লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৪০।

১৫৭. *প্রাগুক্ত*।

১৫৮. হার্বার্ট থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ১৩ই আগস্ট ১৯৪০, এফআর। *প্রাগুক্ত*।

১৫৯. মেমো, তারিখ ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৩৯। জিবি এসবি 'পিএইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫০১/৩৯ (৫)।

১৬০. হার্বার্ট থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ৬ই জানুয়ারি ১৯৪০, এফআর। লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৪০।

১৬১. রিড থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ২০শে আগস্ট ১৯৩৯, এফ আর। রবার্ট রিড পেপার্স, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর ই/২৭৮/৫।

১৬২. প্রাক্তন যুগান্তর কর্মী সতীন্দ্রনাথ সেন ১৯২৭ সালে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের একটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বরিশালে 'সত্যাগ্রহ' পরিচালনা করেন। সিদ্ধান্তটি ছিল – পটুয়াখালীতে একটা নব নির্মিত মসজিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় গান-বাদ্য বাজিয়ে মিছিল করা যাবে না – এটা ছিল স্থানীয়ভাবে স্বীকৃত একটা প্রথা। হিন্দু সভার সমর্থনে সেন (স্থানীয় খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা) নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রতিদিন সংকীর্তন মিছিল নিয়ে মসজিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন এবং এ জন্য গ্রেফতার বরণ করেন। এ ঘটনায় নিকটবর্তী পোনাবালিয়ায় মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, পার্থ চ্যাটার্জী, *বেঙ্গল ১৯২০-১৯৪৭*, পৃ. ৭৭-৭৮, তনিকা সরকার, *বেঙ্গল ১৯২৮-১৯৩৪*, পৃ. ২৫-২৬ এবং সুরঞ্জন দাশ, 'কমিউনাল রায়টস ইন বেঙ্গল, ১৯০৫-১৯০৭', পৃ. ১৮১-১৮৭।

১৬৩. সতীন্দ্রনাথ সেনের কাছ থেকে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪০। এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং পি-৫ (পার্ট ২)/১৯৪০।

১৬৪. দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখুন, উডহেড থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ১৯/২০শে জুন ১৯৩৯, এফআর। লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৩৯।

১৬৫. হার্বার্ট থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ৭ই মার্চ ১৯৪১, এফআর। লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৪১।

১৬৬. ঢাকা ডিভিশন কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, এপ্রিল ১৯৪১। জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ১৩/৪১।

১৬৭. হার্বার্ট থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৪০, এফআর। লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৪০।

১৬৮. পুলিশি তদন্তে দেখা যায়, হোলির দিনে হিন্দু মহিলাকে নাজেহাল করা নিয়ে *অমৃত বাজার পত্রিকায়* প্রকাশিত রিপোর্ট ছিল মিথ্যা। সুরঞ্জন দাশ, 'কমিউনাল রায়টস ইন বেঙ্গল, ১৯০৫-১৯৪৭', পৃ. ২৬৯। আরও দেখুন, *দি স্টেটমেন্ট সাবমিটেড অন বিহাফ অব দি বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল হিন্দু মহাসভা বিফোর দি ঢাকা রায়টস্ এনকোয়ারি কমিটি*, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পেপার্স, এনএমএমএল ফাইল নং ৫৭/১৯৪২-৪৩।

১৬৯. মেমো, তারিখ ৭ই এপ্রিল ১৯৪১। জিবি এসবি 'পি এম সিরিজ', ফাইল নং ৭৩৪/৪১।

১৭০. আটককৃত পত্র, কামিনী দত্তের থেকে নলিনী রঞ্জন সরকারের কাছে লেখা, ১৪ই এপ্রিল ১৯৪১। *প্রাগুক্ত*।

১৭১. আটককৃত পত্র, রাজেন্দ্র প্রসাদের থেকে গান্ধীর কাছে লেখা, ১৬ই এপ্রিল ১৯৪১। *প্রাগুক্ত*।

১৭২. আটককৃত পত্র, কামিনী কুমার দত্তের থেকে নলিনী রঞ্জন সরকারের কাছে লেখা, ৮ই মে ১৯৪১। জিবি এসবি 'পিএম সিরিজ', ফাইল নং ৭৩৪/৪১(২)।

১৭৩. দত্ত উল্লেখ করেন যে, আশেপাশের পল্লি এলাকায় হতাহত হিন্দুরা সংখ্যায় বেশি হলেও ঢাকা শহরে হতাহত মুসলমানদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। *প্রাগুক্ত*।

১৭৪. অভিযোগ আছে যে, গ্রেফতারের পূর্বে সুভাষ বসু বেঙ্গল কংগ্রেসের তহবিল পৃথক করে রাখেন এবং দলের অর্থ ও সম্পত্তি তাঁর নামে থাকার বিষয়টি তিনি নিশ্চিত করেন। দেখুন মেমো, তারিখ ৯ই মার্চ ১৯৩৯, শিরোনাম, 'ফান্ডস এভেইলেবল এক্সক্লুসিভলি টু বোস এন্ড হিজ লেফ্‌ট উইং এ্যালিজ', জিওআই হোম পল ফাইল নং ৪/১৪–এ/৪০ (এনএআই)।

১৭৫. *প্রাগুক্ত*।

১৭৬. আশুতোষ লাহিড়ীর থেকে রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ভাইয়া (রাজশাহী জেলা হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্ট), ১৪ই আগস্ট ১৯৪৫। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পেপার্স, ২–৫ ইন্সটলমেন্ট, ফাইল নং ৯০/১৯৪৪-৪৫।

১৭৭. হার্বার্টের কাছ থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ২২শে মার্চ ১৯৪২, এফআর। লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৪২।

১৭৮. কংগ্রেসে হিন্দু মহাসভার সদস্যদের অন্তর্ভুক্তিতে ত্রিশ দশকের শেষ দিকে বসু কংগ্রেস চিন্তিত হয়, আর আশরাফউদ্দিন চৌধুরী একই ব্যক্তিকে উভয় দলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির অনুমতি না দেওয়ার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির কাছে অনুরোধ করেন। কিন্তু হাই কমান্ড এই দৃষ্টিভঙ্গি নেয় যে, 'এ ধরনের কোনো কিছু কংগ্রেস গঠনতন্ত্রে নেই যে ... ঐ ধরনের সংগঠনের কোনো প্রাথমিক সদস্যকে কংগ্রেস সংগঠনের পদ দেয়া যাবে না।' ফলে চল্লিশের দশকে এ ধরনের প্রবণতা রোধের কোনো ব্যবস্থা করা যায়নি। দেখুন, আশরাফউদ্দিন চৌধুরী ও রাজেন্দ্র প্রসাদের মধ্যে পত্র যোগাযোগ, এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং পি-৫/১৯৩৮।

১৭৯. জিওআই হোম পলিটিক্যাল, ফাইল নং ৯/১/৪৪।

১৮০. মেমো, তারিখ ১৮ই মার্চ ১৯৪৪। জিবি এসবি 'পিএইচ' সিরিজ ফাইল নং ৫০১/৪৪(১)।

১৮১. জেলা শাখার কাছে প্রেরিত বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল হিন্দু মহাসভার সার্কুলার। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল হিন্দু মহাসভার জেনারেল সেক্রেটারির কাছ থেকে এম. সি. ধীমানের কাছে লিখিত আটককৃত পত্রে সংযুক্ত ছিল, তারিখ ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪৫। জিবি এসবি 'পিএইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫০১/৪৫ (৫)।

১৮২. রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর পাক্ষিক গোপন রিপোর্ট, দ্বিতীয় পক্ষ, জুলাই ১৯৪৫। জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৩৭/৪৫।

১৮৩. *প্রাগুক্ত*।

১৮৪. ঢাকা ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, নভেম্বর ১৯৪৫। জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৩৭/৪৫।

১৮৫. এফএমআর, প্রথম পক্ষ, নভেম্বর ১৯৪৫। জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৩৭/৪৫।

১৮৬. ঢাকা ডিভিশন কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, নভেম্বর ১৯৪৫, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৩৭/৪৫।

১৮৭. এভাবে মহাসভার এন. সি. চ্যাটার্জী স্বীকার করেন যে, 'বাঙলার পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন ... কংগ্রেস ... আমাদের প্রার্থীদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া রেহাই দেবে না। বাঙলার ৬টি আসনের মধ্যে আমরা যদি দুটো আসনও পাই তাহলে তা হবে বিরাট বিজয়।' আটককৃত পত্র, এন. সি. চ্যাটার্জীর থেকে রাজা মহেশ্বর দয়াল শেখ-এর নিকট প্রেরিত ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৪৫। জিবি এবি 'পিএইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫১০/৪৫ (৫)।

১৮৮. প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, আগস্ট ১৯৪৫, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৩৭/৪৫।

১৮৯. প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, সেপ্টেম্বর ১৯৪৫, *প্রাগুক্ত*।

১৯০. 'ফ্রানসাইজ, ইলেকশনস ইন বেঙ্গল, ১৯৪৫-৪৬', আইওএলআর এল/পি এবং জে/৮/৪৭৫।

১৯১. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর কাছে লিখিত কোলকাতার একাধিক হিন্দুর স্বাক্ষরিত পত্র, ডিসেম্বর ১৯৪৫। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পেপার্স, ২-৫ ইন্সটলমেন্ট, ফাইল নং ৭৫/১৯৪৫-৪৬।

১৯২. মেমো, তারিখ ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬, জিবি এসবি 'পিএম' সিরিজ, ফাইল নং ৮২৯/৪৫।

১৯৩. 'ফ্রানসাইজ, ইলেকশনস্ ইন বেঙ্গল, ১৯৪৬', আইওএলআর এল/পি এবং জে/৮/৪৭৫।

১৯৪. *প্রাগুক্ত*।

১৯৫. জেলায় নির্বাচনী প্রচারণা সম্পর্কে ময়মনসিংহ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নোট। জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৩১৪ এ/৪৫।

১৯৬. দেখুন জিবি এসবি 'পিএইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫০১/৩৯।

চতুর্থ অধ্যায়

ভদ্রলোক সম্প্রদায়গত পরিচিতির ব্যাখ্যা: বাঙলায় সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িকতা

ইতিহাসবিদগণ পরিচিতি সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে সচরাচর খুব বেশি মাথা ঘামাননি। তাঁরা চিরাচরিত ঐতিহাসিক পদ্ধতির আলোচনা-পর্যালোচনার জন্য অত্যন্ত দূরবর্তী অস্পষ্ট বিষয় হিসেবে এগুলিকে বিবেচনা করেছেন। সমসাময়িক ধারা বিশেষ করে অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। এই তত্ত্বের সমালোচনা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পারস্পরিক ব্যবহার ও ব্যাখ্যামূলক পন্থার অধিকতর গ্রহণযোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসবিদগণ এ বিষয়ে গবেষণায় সাহসী হয়েছেন। সামাজিক নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, বিশেষ করে সাহিত্য বিষয়ক মতবাদ, এক্ষেত্রে ধারণাগত কিছু হাতিয়ার এনে দিয়েছে, যা দিয়ে তাঁরা সম্প্রদায়গত পরিচিতির বিকাশের সাথে সম্পৃক্ত অলঙ্ঘনীয় ও প্রতীকী বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করেছেন।[১]

এসব তথ্যের সাহায্যে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে বাঙলায় ভদ্রলোক হিন্দু সম্প্রদায়গত পরিচিতির উন্মেষ সম্পর্কে রূপরেখা দেয়া সম্ভব। এ ব্যাপারে আগে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এর কারণ এই নয় যে, এই পরিচিতি ঐতিহাসিকদের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে দৃষ্টিগোচর হয়নি। এর কারণ কমপক্ষে দুটো – প্রথম কারণ হল, ভারতে সাম্প্রদায়িকতার গবেষণা শেষ পর্যন্ত দেশবিভাগের দিকে পরিচালিত হয়। কারণ ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের ফল হল দেশবিভাগ – এ ধরনের গবেষণায় প্রাথমিকভাবে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং মুসলিম সাম্প্রদায়িক পরিচিতিকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে।[২] বাঙলার ক্ষেত্রে সবাই এ ধারণাকে একটা সাধারণ সত্য বলে গ্রহণ করেন যে, বাঙলার মুসলমানেরা সহজাতভাবে সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং তাদের 'উচ্চ শ্রেণী'র নেতারা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাদের সম্প্রদায়িক অনুভূতিকে সহজে সংগঠিত করতে পারে।[৩] অনেক ঐতিহাসিক বাঙলায় 'শ্রেণী' ও 'সম্প্রদায়ের' ঘনিষ্ঠ সমান্তরাল অবস্থার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যার অর্থ এই যে, সামাজিক বিরোধ, সেটা শহর বা পল্লি এলাকা যেখানেই হোক না কেন, অতি দ্রুত সাম্প্রদায়িক মাত্রা পরিগ্রহ করতে পারে। কিন্তু তবু সাম্প্রদায়িকতার এই প্রক্রিয়ার শেকড় মুসলিম সমাজের মধ্যে নিহিত আছে বলে ধরে নেয়া হয়; মুসলমান কৃষকদের এভাবে দেখা হয় যে, ত্রিশের দশকে প্রাদেশিক মুসলিম নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর প্রয়োজন অনুযায়ী কাজে লাগার মতো তাদের মধ্যে 'কৃষক-সাম্প্রদায়িক' আদর্শিক চেতনা তৈরি অবস্থায় বিদ্যমান।[৪] অনেকে

আবার 'পূর্ব বাঙলায় জমিদার ও জোতদারদের মধ্যকার বিরোধকে বাঙলায় সাম্প্রদায়িকতার দ্রুত বৃদ্ধির অপর এক কারণ বলে মনে করেন। শুধু তাই নয়, এটাও বিশ্বাস করা হয় যে এই বিরোধ, বিশেষভাবে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা, এতটাই ব্যাপকভাবে জন্ম দেয় যা এই 'প্রদেশে সামগ্রিকভাবে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে ক্রমাগতভাবে উৎসাহিত' করে।[৫] ভূ-সম্পত্তি বিষয়ক কাঠামোর জটিলতা এবং বিরোধের ধরন এককভাবেই উত্তপ্ত বিতর্কের বিষয়; তারপরও সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, 'মুসলিম পরিচিতির অসঙ্গত শক্তি পল্লি বাঙলার বিরোধকে পাকিস্তান আন্দোলনের দিকে পরিচালিত করতে সফল হয়'।[৬]

এসব যুক্তির যথার্থতা থাকুক বা না থাকুক, তা এমন ধারণা প্রদান করে (সম্ভবত অজ্ঞানতাবশত) যে, বাঙলায় সাম্প্রদায়িকতা হল মুসলমানদের একটা বিষয়। এর ফলে ঐতিহাসিকেরা এই ধারণা করেন যে, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার সমান্তরালভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ ঘটেনি বা ঘটলেও তা এমন সীমিত ও ছোট গণ্ডির মধ্যে ছিল যে, পাকিস্তান সৃষ্টির প্রয়াসে বিরোধ সৃষ্টিতে তা কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি।[৭] এই ধারণার ফলে ভয়ঙ্করভাবে ত্রুটিপূর্ণ সেই ধারণাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয় যে, অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের চেয়ে মুসলমানেরা সহজাতভাবে 'সাম্প্রদায়িক'।[৮]

ভদ্রলোক সাম্প্রদায়িকতা ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে দ্বিতীয় কারণের জন্য। এটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধারণা করা হয় যে, সাম্প্রদায়িক পরিচিতি গঠনের সাথে আবশ্যিকভাবে বিশেষ ধর্মীয় (বা 'পবিত্র') প্রতীক জড়িত,[৯] যেমন, মসজিদের সামনে গান-বাজনার,[১০] কোরবানি করা বা গো-রক্ষা,[১১] মূর্তি অপবিত্র করা, ধর্মীয় উৎসব পালনের সময় সংঘর্ষ,[১২] 'পবিত্র স্থান' ও 'পবিত্র সময়' সম্পর্কিত বিষয়।[১৩] এসব বিষয় নিয়ে প্রায়ই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে এবং সে-কারণে ঐসব বিষয়কে সাম্প্রদায়িক পরিচিতির প্রভাবশালী প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যেমন ফ্রাইটাগ বলেছেন, সাম্প্রদায়িক পরিচিতির কাঠামো তৈরি হয় এমন এক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেখানে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীরা ধর্মীয় আচার থেকে কিছু কিছু বিশেষ প্রতীককে ঘিরে একটি বাগধারা বা বিশেষ শব্দগুচ্ছ প্রস্তুত করে তার মাধ্যমে তাদের সম্প্রদায়গত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে।[১৪] ঐসব প্রতীকের প্রতি গুরুত্ব আরোপের ফলে সাম্প্রদায়িকতার গবেষণায় আবশ্যিকভাবে 'দাঙ্গাভিত্তিক' বা 'দাঙ্গাকেন্দ্রিক' পদ্ধতি অনুসৃত হয় যেখানে দাঙ্গাকে ব্যবহার করা হয় সামাজিক ইতিহাসের জানালা (যদিও কিছুটা অস্পষ্ট) হিসেবে।[১৫] সম্মিলিত ও হিংসাত্মক ঘটনার গবেষণা থেকে অনেক কিছু জানা গেলেও এ ধরনের 'দাঙ্গা-কেন্দ্রিক' দৃষ্টিভঙ্গি সাম্প্রদায়িক পরিচিতির গবেষণায় সমস্যা সৃষ্টি করে। গবেষণায় এই দৃষ্টিভঙ্গি ঔপনিবেশিকদের 'কল্পিত' ভারত সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার সন্ধিক্ষণে নিয়ে যায় এবং এর ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তা একেবারে কম নয়। ঐ ধ্যান-ধারণায় 'দাঙ্গা' হল একটা আবর্তক বিষয় এবং তাকে ভারতীয় মানসিকতারই একটি রূপ বলে ধরে নেয়া হয়, যার আড়ালে হিংসা ও 'ধর্মোন্মত্ততা' ওত পেতে থাকে।[১৬]

হিংসাত্মক বিরোধের তাৎক্ষণিক ও নির্দিষ্ট কারণগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হলে তা ঐ ঘটনার অব্যবহিত আগে ও পিছের ইস্যু, যা থেকে বিরোধের উৎপত্তি, সে-সবের ওপর অযৌক্তিক জোর দেয়া হয় এবং প্রায় ক্ষেত্রে ইস্যুটি যখন 'পবিত্র প্রতীক'-এর অবমাননা হয়, তখন ঐ প্রতীকের আবেগময় শক্তিকে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের পরিচিতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণরূপে ধরে নেয়া হয়। এই ধারণা ভারত সম্পর্কে ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যে দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রচলিত ধর্মকে 'আবেগময়' ও 'জড়োপাসক' বলে বিবেচনা করা হয়েছে[১৭] এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগণের ওপর 'ধর্মীয় প্রতীকের ক্ষমতা' ও ঐসব 'আদি সত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতায় অযৌক্তিক শক্তির' ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে।[১৮] তদুপরি ঐ দৃষ্টিভঙ্গি 'পবিত্র প্রতীক' সম্পর্কে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে উপেক্ষা করার জন্য ঐতিহাসিকদের উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রথমত, এসব বিষয়গুলি সাম্প্রতিককালে উঠে এসেছে সে-জন্য এর নিজের কিছু গুরুত্ব আছে।[১৯] দ্বিতীয়ত, এগুলি মুখ্যত নিশ্চিতভাবে বিভেদকে চিহ্নিত করে, যা খোলাখুলিভাবে একটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিজের সীমানা নির্দিষ্ট করে নেয়। প্রতীকের ক্ষমতা উপলব্ধি করতে হলে প্রতীক থেকে সৃষ্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বিরোধ এবং এর বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করতে হবে। তাছাড়া, 'বিভেদ' নিয়ে ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন আছে, কারণ এর থেকেই সাধারণভাবে শত্রুতার প্রকাশ ঘটে। এই সব আলোচনায় কোনো সম্প্রদায় কিভাবে গঠিত হয়েছে সে-সম্পর্কে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান প্রধান বিষয়গুলি উঠে আসে। এসব বর্ণনায় একটা সম্প্রদায়ের ওপর সমপ্রকৃতি ('আমাদের') আরোপ করা হয় এবং একই সাথে সমানভাবে সমপ্রকৃতির বিপরীত এক প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করা হয় যা কিনা 'তাদের'।[২০] বিস্তৃত এই সব পার্থক্যগত আলোচনায়, বিশেষ করে ধর্মীয় বা পবিত্র পার্থক্যগুলি প্রায় ক্ষেত্রে গণ্ডির বাইরে থেকে যায়।

সম্প্রদায়গত পরিচিতির গূঢ় অর্থ আলোচনার অভ্যন্তরীণ কাঠামোর দিকে শুধুমাত্র দৃষ্টিপাত করে অনুধাবন করা যায় না, বরং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করেই তা অনুধাবন করতে হয়, কারণ এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তার নির্মাণ হয়েছে।[২১] এ ধরনের প্রয়াস সাম্প্রদায়িকতার 'গোপন রহস্যের উদঘাটন' করতে এবং ধর্মীয় বা পবিত্র প্রতীক খুব সামান্য ধরনের ভূমিকা পালন করে এমন আলোচনার সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য উন্মোচনে সহায়ক হয় (যাকে অনেক সময় ভুল করে 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলে ধারণা করা হয়)। ভদ্রলোক হিন্দু সাম্প্রদায়িক আলোচনায় এসব বৈশিষ্ট্য আছে। অতিরঞ্জিত ঐ আলোচনায় গরু, কালী ও দুর্গার প্রতীক হল বহিরাবরণ মাত্র।[২২] তবু এর আবেদন কম শক্তিশালী নয়, এবং তা অন্যান্য অনেক সুস্পষ্ট ধর্মীয় বর্ণনার চেয়ে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যের দিক থেকেও কম শক্তিশালী নয়।

সংস্কৃতি ও পরিচিতি

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভদ্রলোক পরিচিতির একমাত্র একক নিদর্শন যদি কিছু থেকে থাকে তা নিঃসন্দেহে তাদের 'সংস্কৃতি'। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ভদ্রলোকেরা নিজেদেরকে সংস্কৃতিবান একটি গ্রুপের লোক বলে গণ্য করতে থাকেন।[২৩] বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে তারা নিজেদেরকে একটা বিশেষ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তথা 'বাঙলার নবজাগরণে'র উত্তরাধিকারী হিসেবে দেখতে শুরু করেন।[২৪] নিজের সংস্কৃতির সাথে ভদ্রলোক বাঙালির সংশ্লিষ্টতার এই বিশেষ ধরনের অনুভূতি প্রায়ই পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখায় প্রকাশ পেতে থাকে।[২৫] সাধারণ গতানুগতিক ও সাহিত্যিক বিদ্রূপে বাঙালিকে প্রায়ই এমন হাস্যকর চরিত্র হিসেবে ব্যঙ্গ করা হত যে কিনা রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়; যে নিজের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধে প্রকৃত বা কাল্পনিক যে কোনো ধরনের নিন্দাকে বিনা বাক্য ব্যয়ে অপরাধ বলে গণ্য করে।[২৬] কিন্তু যখন নবজাগরণকে নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হল, তখন দেখা গেল যে, ভদ্রলোক বাঙালি এবং নবজাগরণের মধ্যকার সম্পর্ক গবেষকদের চুলচেরা বিচার থেকে বাদ পড়ে গেছে। এই অধ্যায়ে ১৯৩০ এবং ১৯৪০ দশকের বাঙালি ভদ্রলোকদের সম্পর্কে আলোচনাকালে যেসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংস্কৃতি হিন্দু পরিচিতির মূল প্রতীকে পরিণত হয়েছে সেটি বিবৃত করার উচ্চাভিলাষী চেষ্টা থেকে বিরত থাকা হয়েছে।

পরিচিতির প্রশ্ন, যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলায় উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল তা নিয়ে যুক্তিযুক্তভাবেই ব্যাপক বুদ্ধিবৃত্তিক সমালোচনা হয়েছে। অধিকাংশ নবজাগরণ চিন্তার মূল লক্ষ্য ছিল পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী[২৭] এবং ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরোধিতার লক্ষ্যে হিন্দু সমাজকে মূল্যায়ন করা। এ ব্যাপারে বাঙালিদের পাশে ছিল ডেরোজিয়ান পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুরাগ থেকে শুরু করে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির মতো উচ্চকণ্ঠ দেশভক্ত লোকেরা – তর্কচূড়ামণি হিন্দু ধর্মের ভিত্তিকে 'বৈজ্ঞানিক' বলে দাবি করতেন। অবশ্য এই বিষয়ে বৃহত্তর পরিসরে তুলনামূলকভাবে সংযত বুদ্ধিবৃত্তিক আরও অনেক মতবাদ বিদ্যমান ছিল। যেমন, রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মবাদ এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের দৃঢ়তাসূচক হিন্দুবাদ। সংস্কার ও পুনর্জাগরণের বড় বড় ইস্যুতে তাঁদের প্রতিক্রিয়া ছিল জটিল ও মিশ্র,[২৮] কিন্তু বৃহত্তর পরিসরে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের অতি সূক্ষ্ম পার্থক্যের প্রায় সব কিছুই হারিয়ে যায়।[২৯] যাকে অস্পষ্টভাবে 'হিন্দু জাগরণবাদ' বলা হয়ে আসছিল তা শতাব্দী শেষে এই পর্যায়ে ব্যাপকতা লাভ করে। ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন সহানুভূতি পাওয়ার চেয়ে বেশি বেশি সমালোচিত হয়; ভদ্রলোক সমাজে তাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। ব্রাহ্ম আন্দোলনের অভ্যন্তরে ১৮৬০ সাল থেকেই একটা মতবিরোধ ছিল। এ আন্দোলন তাই ক্রমাগতভাবে 'উচ্চ শ্রেণী'র বুদ্ধিজীবী সমাজ ও সস্তা সংবাদপত্রের উপহাসের লক্ষ্যে পরিণত হয়। জনপ্রিয় উপন্যাসে ব্রাহ্ম মূল্যবোধকে ব্যঙ্গ করা হয়[৩০] এবং ইংরেজি ভাবাপন্ন বাঙালি বাবুদের উপহাসের লক্ষ্যবিন্দুতে পরিণত করা হয়। ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে চাকুরি করা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'আধুনিক বাঙালি'কে

কৌতুকের পাত্র হিসেবে দেখতে পান:

> জগদীশ্বর কৃপায়, উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙ্গালী নামে এক অদ্ভুত জন্তু এই জগতে দেখা দিয়াছে। পশুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এই জন্তু বাহ্যতঃ মনুষ্য-লক্ষণাক্রান্ত; হস্তে পদে পাঁচ-পাঁচ অঙ্গুলি, লাঙ্গুল নাই এবং অস্থি ও মস্তিষ্ক 'বাইমেনা' জাতির সদৃশ বটে। তবে অন্তঃস্বভাব সম্বন্ধে সেরূপ নিশ্চয়তা এখনও হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহারা অন্তঃসম্বন্ধেও মনুষ্য বটে, কেহ কেহ বলেন, তাহারা বাহিরে মনুষ্য, এবং অন্তরে পশু (কতিপয় লাল দাড়িবিশিষ্ট ঋষির মতো)। বিধাতা ত্রিলোকের সুন্দরীগণের সৌন্দর্য তিল তিল সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমার সৃজন করিয়াছিলেন; সেইরূপ পশুবৃত্তির তিল তিল করিয়া সংগ্রহ পূর্বক এই অপূর্ব নব্য বাঙালি চরিত্র সৃজন করিয়াছেন। শৃগাল হইতে শঠতা, কুক্কুর হইতে তোষামোদ ও ভিক্ষানুরাগ, মেষ হইতে ভীরুতা, বানর হইতে অনুকরণপটুতা, এবং গর্দভ হইতে গর্জন – এই সকল একত্র করিয়া দিঙ্মণ্ডল উজ্জ্বলকারী, ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভূত, এবং ভট্ট মক্ষমূলরের আদরের স্থল, নব্য বাঙালিকে সমাজাকাশে উদিত করিয়াছেন।[৩১]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙলায় হিন্দু জাতীয়তাবাদের ঢেউ ছড়িয়ে পড়লে 'পুনরুজ্জীবনবাদ'-এর জনপ্রিয় আবেদন 'সংস্কার'কে অতিক্রম করে যায়। ইংরেজ ভাবাপন্ন ভারতীয়দের বিরুদ্ধে কৌতুক করা ছিল বটতলা সাহিত্যের বাজারের নিয়মিত কাজ। বটতলা সাহিত্যে জনপ্রিয় প্রহসন ও নাটক প্রকাশিত হত; সুমিত সরকার এসব সাহিত্যের বর্ণনা করেছেন ভদ্রলোকদের অসফল জগত হিসেবে। অখ্যাত ভাড়াটিয়া লেখক, কেরানি ও পণ্ডিতেরা এগুলো লিখতেন, কিন্তু তাঁরা তাদের পৃষ্ঠপোষকদের সমর্থন হারাচ্ছিলেন।[৩২] মেজাজের দিক থেকে এতে নাগরিক নয়, প্রজা হওয়ার অপমানের বিরুদ্ধে ক্রমাগতভাবে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন ছিল। কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমানী সাহিত্যের প্রায় সমান সমান নিন্দুক পত্র-পত্রিকা এবং কালিঘাটের বাজারি ছবি পুরানো সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষয় ও ঐতিহ্যগত যাজকীয় ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়া সম্পর্কে অস্বস্তি সৃষ্টি করে। কদর্য কৌতুকের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে 'আধুনিক মহিলা' ও আত্মম্ভরী ব্রাহ্মবাবুকে একাসনে বসানো হত।[৩৩] ঐতিহ্যগত বন্ধন এবং কর্তব্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়ে অন্ধকার ও বিশৃঙ্খলায় গ্রাস করে ফেলা বাঙলার ঐ সময়কে কলিযুগ হিসেবে বর্ণনা করত। সস্তা উপন্যাস ও প্রহসনের পাতায় কলিযুগের প্রসঙ্গ বারবার আসতে থাকে – অধস্তন নিম্ন বর্ণের লোক, অবাধ্য মহিলা এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ও অধঃপতিত ব্রাহ্মণদের দুর্দশার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, আর চিরাচরিত বর্ণ প্রথা মহিলাদের ওপরে পুরুষদের অবস্থান, আদর্শ স্থানীয় আচরণ অনুসরণের আহ্বান জানানো হত।[৩৪] সরকার অবশ্য উল্লেখ করেছেন যে, 'ভদ্রলোকদের সুউচ্চ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল কলিযুগ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাত না।'[৩৫] তবে তারা যে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করত সেই সমাজের ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের অবক্ষয় ও সামাজিক শৃঙ্খলার প্রতি হুমকির ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিল এবং তা সমসাময়িক আধুনিক সাহিত্যে প্রতিফলিত হত। উদাহরণ হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি সমতাপূর্ণ ও পরিপূর্ণ ব্যবস্থা হিসেবে বর্ণ প্রথাকে সমর্থন করেন এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের উপদেশ দেন।

তিনি যুক্তি দেখান যে, মহিলারা তাদের চিরাচরিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হলে সমাজের মূল ভিত্তি ধ্বংস হয়ে যাবে।[৩৬] সমাজ ও সম্প্রদায়ের বিষয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ করে মহিলাদের সামাজিক অবস্থানের ব্যাপারে, অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিল। সে-কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্ট আমূল পরিবর্তনবাদী হিন্দু জাতীয়তাবাদী নায়ক চরিত্র 'গোরা' অত্যন্ত গোঁড়ামির সঙ্গে শ্রেণীভিত্তিক বিধানকে পর্যবেক্ষণ করে এবং যুক্তি দেখায় যে, 'সমাজের প্রতি আমি যেহেতু অনুগত, সেহেতু জাতিভেদকে আমাকে সম্মান করতে হবে।'[৩৭] মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে গোরা মনে করেন যে –

> দিন আর রাত্রি, সময়ের এই যেমন দুটো ভাগ – পুরুষ এবং মেয়েও তেমনি সমাজের দুই অংশ। সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় স্ত্রীলোক রাত্রির মতোই প্রচ্ছন্ন – তার সমস্ত কাজ নিগূঢ় এবং নিভৃত। আমাদের কর্মের হিসাব থেকে আমরা রাতকে বাদ দিই। কিন্তু বাদ দিই বলে এর যে গভীর কর্ম তার কিছুই বাদ পড়ে না। সে গোপন বিশ্রামের অন্তরালে আমাদের ক্ষতিপূরণ করে, আমাদের পোষণের সহায়তা করে। যেখানে সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা সেখানে রাতকে জোর করে দিন করে তোলে – সেখানে গ্যাস জ্বালিয়ে কল চালানো হয়, বাতি জ্বালিয়ে সমস্ত রাত নাচ-গান হয় – তাতে ফল কি হয়! ফল এই হয় যে, রাত্রির যে স্বাভাবিক নিভৃত কাজ তা নষ্ট হয়ে যায়, ক্লান্তি বাড়তে থাকে, ক্ষতিপূরণ হয় না, মানুষ উন্মত্ত হয়ে ওঠে।[৩৮]

গোরা পৌরাণিক কাহিনীর কোনো কিছু উল্লেখ করেনি – তার ভাষা কলিযুগের স্মৃতিচারণে খুবই বলিষ্ঠ। গোঁড়া ও ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ রক্ষায় তার আবেগের মধ্য দিয়ে সংগ্রামরত হিন্দু জাতীয়তাবাদের চেতনা প্রতিবিম্বিত হয়; এর মধ্যে বাঙলার ভদ্রলোকদের মেজাজ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভদ্রলোক সমাজ সম্পর্কে বর্ণনায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী লেখেন যে, 'আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এখন যা আছে এবং যুগ যুগ ধরে যা চলে আসছে সেখানে প্রতিটি হিন্দুর মধ্যে আছে শক্তিশালী রক্ষণশীলতার প্রতি আসক্তি ... কোনো হিন্দুর গায়ে আঁচড় দিয়ে দেখুন, তাকে আপনি রক্ষণশীল হিসেবেই দেখতে পাবেন।'[৩৯]

বাঙলার বিগত নবজাগরণের বিতর্ক ঐতিহ্যগত হিন্দুত্ববাদের ইতিবাচক দিককে উৎসাহিত করে এবং ঐ ধর্মকে রক্ষার জন্য তাকে বর্ণনা করার, যুক্তিগ্রাহ্যভাবে তুলে ধরার এবং ব্যাখ্যা করার জন্য লেখকদেরকে অনুপ্রাণিত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় হিন্দু ধর্মকে নতুনভাবে 'উপস্থাপন' করা হয় অভ্যন্তরীণ দিক থেকে সুসমঞ্জস, একক ও একেশ্বরবাদী ধর্ম হিসেবে, যাতে পৃথিবীর অন্য যে কোনো ধর্মের সাথে তুলনা করা সহজ হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলা যায়। তিনি বলেন যে, 'বেদ হল আমাদের সামগ্রিক ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি।'[৪০] তাঁর এই যুক্তি বাইবেল বা কুরআনের মতো বেদকে প্রত্যাদেশ বাণীর মর্যাদা দেয়।[৪১] বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য স্বীকার করেন যে, হিন্দুদের অনেক ভিন্ন বিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতি আছে। তবে তিনি মনে করেন যে, 'শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হিন্দু ধর্মে যেসব 'ময়লা' জমা হয়েছে তা পরিষ্কার করা সম্ভব' এবং 'সর্ব যুগে ও সব

মানুষের জন্য কল্যাণকর হিন্দু ধর্মের মহান আদর্শ'কে প্রকাশ করা যায়।[৪২] এর মূল কথা হল বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, হিন্দু ধর্ম হচ্ছে 'non-possessive' এবং আধ্যাত্মিক দিক থেকে যৌক্তিক এবং তাই হিন্দু ধর্ম হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে হিন্দু ধর্মকে বেদের উচ্চমার্গীয় দর্শনে স্থাপিত করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের গর্বকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং বর্ণবিদ্বেষী মিশনারি ও অন্যান্য সাদা লোকেরা যাকে 'হিন্দু' বর্বরতা বলে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে আক্রমণ করছে, তাদের প্রতিহত করা। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে ভদ্রলোক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেল – যা ছিল জনপ্রিয় ধর্মীয় আচার-আচরণের প্রতি অবজ্ঞা (পুরানো জঞ্জাল) এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৈদিক দর্শনকে মর্যাদার স্থানে স্থাপন করা।[৪৩] একইভাবে, 'অনুশীলনের' মাধ্যমে জাতীয় পুনর্জাগরণ লাভের তাঁর ব্যবস্থাপত্র ছিল ভদ্রলোকদের জন্য একটা করণীয় কাজ। কারণ, সমাজের বিদ্বান ও নৈতিক নেতা হিসেবে ভদ্রলোকেরা জনগণকে অনুপ্রাণিত করবে এবং তাদের মধ্যে স্বাধীনতার জন্য ভালবাসা জাগিয়ে তুলবে।[৪৪] সেই হিসেবে বাঙালি ভদ্রলোকদের কাছে 'হিন্দু হওয়ার' অর্থ কী, সেই বিতর্ক নিয়ে বাঙলার নবজাগরণের যাত্রা শুরু হয়।

জাতীয় পুনরুজ্জীবনের চিন্তা যা অনেক নবজাগরণমূলক লেখাকে উৎসাহ জাগিয়ে ছিল, সেটি জাতির (হিন্দু) গৌরবান্বিত অতীত অনুসন্ধানেও উৎসাহিত করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লিখিত নতুন ইতিহাসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালিদের মধ্যে জাতীয় গৌরবের ও সাংস্কৃতিক আস্থার চেতনা প্রতিষ্ঠা করা। ফলে ঐসব ইতিহাস হয়ে ওঠে বর্ণনার দিক থেকে রাজনৈতিক, বিষয় নির্ধারণ করা হয় অত্যন্ত বেছে বেছে এমন সচেতনভাবে, যেখানে হিন্দু বাঙলাকে (এবং ভারতের ইতিহাসকে প্রসারিত করে) চিত্রিত করা হয় বীরের ইতিহাস হিসেবে। মীনাক্ষী মুখার্জী উল্লেখ করেন যে, বঙ্কিমের 'সত্যিকার ভাবনা ছিল বাঙালি জনগণের পরিচিতি নিয়ে, এবং তাদেরকে জাগ্রত করার জন্য তিনি ঔপনিবেশিক অতীতের কল্পকথাকে পুনরায় তুলে ধরতেও ইতস্তত করেননি':

> বাস্তবিক একদিন বাঙ্গালীরা আর কিছুতেই হউক না হউক, ঔপনিবেশিকতায় এথিনীয়দিগের তুল্য ছিল। সিংহল বাঙ্গালী কর্তৃক পরাজিত এবং পুরুষানুক্রমে অধিকৃত ছিল। যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপ বাঙ্গালীর উপনিবেশ, ইহাও অনেকে অনুমিত করেন। তাম্রলিপ্তি ভারতবর্ষীয়ের সমুদ্র যাত্রার স্থান ছিল। ভারতবর্ষীয় আর কোন জাতি এইরূপ ঔপনিবেশিকতা দেখান নাই।[৪৫]

প্রায়শই 'জাতির' অতীত দিনের স্বদেশপ্রেম ও প্রতিরোধাত্মক ঐতিহ্য বিনির্মাণের প্রয়াস চালানো হয়। এগুলোই ছিল মূলত হিন্দুদের ইতিহাস; তাদের বীরেরা ছিল হিন্দু রাজা ও গোত্রপতিরা এবং তারা 'মুসলিম ক্ষমতা'র বিরুদ্ধে সাহসের সাথে যুদ্ধ করে।[৪৬] রানা প্রতাপ ও শিবাজী থেকে সরাসরি আধুনিক বাঙলার উৎপত্তির যোগসূত্র টেনে তারা বাঙলার হিন্দু ভদ্রলোকদের অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত রাজপুত ও মারাঠা গোত্রপতিদের পূর্বপুরুষ হিসেবে স্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ, তারা মোগলদের 'প্রতিরোধ' করেছিল।[৪৭]

এসব কল্পনা-প্রিয় ঐতিহাসিকদের অনুভূতির পেছনে সক্রিয় ছিল স্বদেশপ্রেম; 'বহিরাগত' শাসকদের বিরুদ্ধে অতীত বীরত্বকে স্মরণ করা অথবা সমকালীন হিন্দু 'জাতি'কে বিদেশী প্রভুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। তারা নিঃসন্দেহে গতানুগতিক সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টিতে ও তাকে জনপ্রিয় করে তুলতে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে – 'মুসলিম শাসন'কে তারা 'স্বেচ্ছাচার' ও মুসলমান শাসকদের নিষ্ঠুর, উৎপীড়ক, ধর্মোন্মত্ত ও অনিয়ন্ত্রিত কামুক বলে চিত্রিত করে। এসব উপন্যাসের পাতায় দেখা যায়, মুসলমান রাজারা আবশ্যিকভাবে মন্দির ধ্বংস করেছে, শহর লুণ্ঠন করেছে এবং হিন্দু নারীদের সম্ভ্রমহানি করেছে। 'সংসার' উপন্যাসে, যাকে সমসাময়িক ধারার অন্যান্য উপন্যাসের চেয়ে সুস্পষ্টভাবে কম মুসলিম বিদ্বেষী মনে করা হয় – রমেশচন্দ্র দত্ত উপস্থিত মতো মুসলিম উৎপীড়নের বিষয়টি তুলে ধরেছেন এভাবে: 'ছয় শতাব্দী ধরে মুসলমান শাসকেরা হয়ত প্রাচীন শহরকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছে এবং তার মিনার ও মন্দিরকে ধ্বংস করেছে – কিন্তু প্রতিমা ধ্বংসকারীর দুই হাতের মধ্যখানে একটা জাতির ধর্ম থাকে না।'[৪৮] একই সাথে নবীনচন্দ্র সেন তাঁর মহাকাব্য 'পলাশীর যুদ্ধ' কবিতায় সিরাজউদ্দৌলাকে চিহ্নিত করেছেন একজন লম্পট, ভীরু ও অমিতাচারী যুবক হিসেবে, যার চারপাশে ভীত ও কামাসক্তে জর্জরিত হারেমের পেশাদার নর্তকীরা পরিবেষ্টিত থাকত।[৪৯] এসব বর্ণনা ছিল দুইভাবে আহৃত – ইসলাম সম্পর্কে ইউরোপীয় সম্রাটদের পর্যালোচনার ভিত্তিতে,[৫০] এবং একই সঙ্গে ঔপনিবেশিক ও ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য প্রভৃতি বিদ্যায় উপস্থাপিত ভারতীয় ইতিহাস থেকে উদাহরণ আহরণ করে।[৫১]

নব জাগরণমূলক লেখা থেকে 'হিন্দু' সম্পর্কে যে ভাবমূর্তি প্রকাশিত হয় তা বিস্ময়কর না হলেও অতি জটিল, অতি দ্ব্যর্থক এবং নানান সূক্ষ্ম তারতম্যে ভরা। অন্য দিকে, আদর্শ হিন্দু চরিত্রকে চিত্রিত করা হয় সাহসী ও শক্তিশালী হিসেবে, যারা স্বাধীনতার জন্য আমরণ যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক, যারা পরাজয়ের অপমানের চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করে।[৫২] কিন্তু অন্য দিকে জাতি (বা সম্প্রদায়) হিসেবে হিন্দুদের উপস্থাপন করা হয়েছে অসাড়, রাজনৈতিক ক্ষমতার বা স্বাধীনতার জন্য যাদের মাথাব্যথা যাদের নেই।[৫৩] বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সাংখ্য (Sankhya) দর্শন হিন্দু চরিত্রের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে এবং এর ফলে তারা অতি মাত্রায় অতি জাগতিক ও অদৃষ্টবাদী হয়ে ওঠে।[৫৪] আবার পরলোকের সাথে সংশ্লিষ্টতা হিন্দু ধর্মের অন্তর্নিহিত সহজাত গুণেরই প্রতিফলন। তিনি যুক্তি দেখান যে, 'একটা জনগোষ্ঠীর চরিত্র গঠিত হয় তাদের ধর্মের দ্বারা' এবং হিন্দু ধর্মের অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মবাদ হিন্দু জাতির মধ্যে যে একটি পরম সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করে, সেটা হল 'মানুষের জন্য ভালবাসা':

> হিন্দু রাজা ছিল, তারপর মুসলমান হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না, হিন্দুর কাছে হিন্দু মুসলমান সমান। মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ইংরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল ... কেন না, হিন্দুর ইংরেজের উপর ভিন্ন জাতীয় বলিয়া কোন দ্বেষ নাই।[৫৫]

নবজাগরণমূলক উপন্যাসে এমন আদর্শ বাঙালি হিন্দুর ভাবমূর্তি সৃষ্টি করা হয় যা ভদ্রতা, সহিষ্ণুতা ও অধ্যাত্মবাদের মতো জাতিগত হিন্দু গুণাবলী উদাহরণ সৃষ্টি করে।[৫৬] তাকে এমনভাবে চিত্রিত করা হয় যে, ঈশ্বর তাকে বিশেষভাবে (হিন্দু) উচ্চ বোধশক্তি দান করে পাঠিয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসের নায়ক অমরনাথ হল 'একজন মার্জিত রুচিসম্পন্ন সদালাপী ব্যক্তি। তার মন পরিশীলিত, উপযুক্তরূপে সে শিক্ষিত, এবং তার চিন্তাধারা সুদূরপ্রসারী।' সে শেক্সপিয়ারের নায়িকাদের সম্পর্কে অনর্গল কথা বলে, তাদের সাথে সে ভারতীয় মহাকাব্যের নায়িকাদের তুলনা করে; তার আলোচনার পরিসর যুসিডাইডেস (Thucidydes), প্লুটার্ক (Plutarch) ও ট্যাসিটাসের (Tacitus) প্রাচীন ইতিহাস; কোঁতের (Comte) দৃষ্টবাদ (Positivism); মিল, হাক্সলি, ডারউইন ও সোপেনহাওয়ার-এর দর্শন – তার আলোচনায় সাবলীল স্বচ্ছন্দ পাণ্ডিত্যই প্রকাশ পায়।[৫৭] কিন্তু তার বিপরীতে বাঙালি হিন্দুকে 'বাবু' হিসেবেও চিত্রিত করা হয় যে 'বাবু' হল ভীরু, নীচ ও অনুকরণপ্রবণ প্রাণী – যাদের উপর বঙ্কিম তাঁর সব ঘৃণা এক সঙ্গে উপুড় করে দেন:

> যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত এবং কলহে সহস্র, তিনিই বাবু। যাঁহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ এবং কার্য্যকালে অদৃশ্য, তিনিই বাবু। যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তকমধ্যে, যৌবনে বোতলমধ্যে, বার্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু। যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রাহ্মধর্ম্মবেত্তা, বেদ দেশী সম্বাদপত্র এবং তীর্থ "ন্যাশনাল থিয়েটার", তিনিই বাবু। যিনি মিসনরির নিকট খ্রীষ্টিয়ান, কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু, এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক, তিনিই বাবু। যিনি নিজ গৃহে জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান, এবং মুনিব সাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান, তিনিই বাবু। যাঁহার স্নানকালে তৈলে ঘৃণা, আহারকালে আপন অঙ্গুলিকে ঘৃণা এবং কথোপকথনকালে মাতৃভাষায় ঘৃণা, তিনিই বাবু। যাঁহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারিতে, ভক্তি কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিণীতে, এবং রাগ কেবল সদ্‌গ্রন্থের উপর, নিঃসন্দেহে তিনিই বাবু।[৫৮]

এখানে বাবুর প্রতিমূর্তি হল 'ভদ্রলোক' অমরনাথ তার আলাপপটুতার ঔজ্জ্বল্য বাবুগিরির আড়ম্বরী শব্দের বাহুল্যে পরিণত হয়; বাবুর মধ্যে পাশ্চাত্যের সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্য সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান বিকৃত অনুকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়, তার ইংরেজি ভাষার দক্ষতা দাসোচিত ভাঁড়ামি – সব কিছু মিলিয়ে, বাবু হল তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে অভিযুক্ত মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্রিটিশ বাঙলার বুদ্ধিজীবী। নবজাগরণমূলক সাহিত্যের ফলে সৃষ্ট বাঙালি হিন্দু ব্যক্তিত্বের পরস্পর-বিরোধী উপাদান পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান – তার মধ্যে আছে সাহসিকতা ও ভীরুতা, উৎসাহ ও জড়তা, পরলোকের প্রতি আগ্রহ এবং অর্থের বিনিময়ে যে কোনো অন্যায় কাজের ইচ্ছা, আধ্যাত্মিকতা ও কপটাচারিতা, নিজস্ব রুচি ও অনুকরণপ্রবণতা।

ভদ্রলোক জাতীয়তাবাদের মধ্যে আছে এই দ্বৈত পরিচিতি – এই পরিচিতিই তাকে গতিশীল করেছে এবং তার জন্য কতকগুলি বিশেষ বাগধারা সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে

প্রথমেই এবং প্রধানতম হিসেবে যাকে উল্লেখ করা হয়েছে সেটা হল দৈহিক সংস্কৃতি। বিশ্বাস করা হয় যে, ঐতিহ্যগত ব্যায়াম তথা তলোয়ার খেলা, লাঠিখেলা ও মল্লযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত দৈহিক ক্ষমতা ও প্রাণশক্তি দুর্বল ও ভিতু বাবুদের ইংরেজ প্রীতির ভূত ছাড়িয়ে দেবে এবং তাদের মধ্যে বাঙালি জাতির সুপ্ত ক্ষমতা ও প্রাণশক্তিকে জাগ্রত করবে। সে-কারণে বাঙলার জাতীয়তাবাদীদের সংগঠিত করার প্রাথমিক পদ্ধতি ছিল ব্যায়াম সমিতি বা শরীর-চর্চা সমিতি গঠন করা। নবগোপাল ন্যাশনাল মিত্র'স জিমনাস্টিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৬ সালে এবং তা শতাব্দীর শেষ দিকে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য আখড়া ও তরুণ সমিতির জন্য মডেল হিসেবে কাজ করে। এসব আখড়া ও সমিতি পরবর্তীকালের গোপন সন্ত্রাসী সমিতিগুলোর সদস্য সংগ্রহের সামনের সারির স্থান হিসেবে পরিণত হয়।[৫৯] স্বদেশী যুগে সংস্কৃতিবান অথচ ক্ষয়িষ্ণু ভদ্রলোক বাঙালিদের আত্মপ্রতিকৃতি পল্লি সমিতিগুলির গঠনে প্রতিফলিত হয়।[৬০] জাতীয়তাবাদীদের কর্মসূচিতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার বিষয় ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে কৃষকদের সংগঠিত করাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয়নি, বরং বিবেচিত হয় ভদ্রলোকদের মাটির সাথে সংযোগ স্থাপন করার বিষয়টিও। কেননা ভদ্রলোকদের যেসব গুণের অভাব ছিল সেসব গুণ অর্থাৎ তাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও সাহসিকতা প্রতিষ্ঠিত করাও ছিল প্রধান লক্ষ্য। কারণ ধারণা করা হয়েছিল যে, কেবলমাত্র মাটির সাথে সম্পৃক্ত সংগঠন থেকেই এসব গুণ উৎসারিত হতে পারে। 'বন্দে মাতরম'-এ অরবিন্দ ঘোষ অত্যন্ত আক্ষেপ করে এই ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, 'হিন্দু সম্প্রদায় মাটির অধিকার হারিয়ে ফেলেছে এবং সেই সাথে হারিয়ে ফেলেছে জীবনের উৎস ও স্থায়িত্ব':

> বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাধান্য বৃদ্ধির সাথে সাথে তা প্রায় ক্ষেত্রেই অবনতির দিকে ধাবিত হয়। গ্রিক ও অন্যান্য প্রাচীন মহান জাতির ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রসারিত ও সুসজ্জিত এসবের ঔজ্জ্বল্যে যে জাতি তার গ্রামীণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনকে বিসর্জন দেয় না সে-জাতিই খাঁটি ও নিশ্চিতভাবে স্থায়িত্ব লাভ করেছে। ... মাঠে ফিরে যাওয়ার জন্য আমরা যদি যুবকদের প্রশিক্ষণ দিতে পারি তাহলে আমরা বাঙলায় হিন্দুদের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে পারব, যা এখন প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।[৬১]

একই রকম দ্বৈতনীতি দেখতে পাওয়া যায় পরবর্তী পর্যায়ের জাতীয়তাবাদী সাহিত্যের নির্মাণ কাঠামোতে।[৬২] শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *পথের দাবী* উপন্যাস এই ধারার সাহিত্য কর্মের মধ্যে অন্যতম। এই উপন্যাসটি *বঙ্গবাণী* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৯২২ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যে। ১৯২৬ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার পরপরই *পথের দাবী* উপন্যাসটি নিষিদ্ধ করা হয়। ঐ উপন্যাসে বার্মায় স্থাপিত *পথের দাবী* নামে একটা সংগ্রামী জাতীয় গোপন সমিতির কার্যকলাপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।[৬৩] ঐ সমিতির নেতা এবং উপন্যাসের নায়ক সব্যসাচী একজন 'রাজদ্রোহী' (রাষ্ট্রের শত্রু), সে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন রহস্যময় পদ্ধতিতে অক্লান্তভাবে কাজ করে। সব্যসাচী একটা পর্যায়ে ভদ্রলোক আদর্শের প্রতীক হয়ে ওঠে:

সে জার্মানিতে ডাক্তার, ফ্রান্সে ইঞ্জিনিয়ার ও ইংল্যান্ডে আইনজীবী হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। আমেরিকায় সে একাধিক স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অল্পবিস্তর শিক্ষাগত যোগ্যতা লাভ করেছে। পাশ্চাত্য জ্ঞানের ওপর তার দক্ষতা ঈর্ষণীয়। কিন্তু বঙ্কিমের সৃষ্ট চরিত্র অমরনাথের মতো সে তার অর্জিত বিদ্যাকে হালকাভাবে দেখে; পাঠককে বলা হয় যে, 'এসব কিছুই তার কাছে ছিল ক্রীড়া-কৌতুকের মতো'।[৬৪] কিন্তু দৈহিক শক্তি ও সাহসে সে ছিল ব্যতিক্রম। তার দৈহিক গঠন কিছুটা হালকা-পাতলা হলেও ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশের কাছে গ্রেফতার এড়ানোর জন্য সে প্রবল স্রোতের মধ্যে সাঁতার দিয়ে পদ্মা নদী পাড়ি দিতে বা পায়ে হেঁটে হিমালয় পর্বতের পূর্বাংশ অতিক্রম করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল না। তনিকা সরকার মন্তব্য করেন যে, গুরুত্বপূর্ণ বাঙলা উপন্যাসের প্রথম নায়ক সব্যসাচীকে রূপায়িত করা হয়েছে একজন অতিমানব হিসেবে।[৬৫]

অন্য দিকে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অপূর্ব নিন্দার্থে অভ্রান্তভাবে একজন বাবু। ব্রাহ্মণের ঘরে তার জন্ম, তার পিতা একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সে একটা ওলন্দাজ ফার্মে কেরানির কাজ করে। সে হল আদর্শবাদী ভদ্রলোক চরিত্রের প্রতিভূ। উপন্যাসটির কাহিনীর এক পর্যায়ে দেখা যায়, একটা রেল স্টেশনে সে একদল সাদা যুবকের হাতে প্রকাশ্যভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে। ব্রিটিশ কোর্টে ন্যায়বিচার পেতে ব্যর্থ হয়ে সে রেঙ্গুনে সুমিত্রা নামের এক সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী মহিলার নেতৃত্বাধীন ক্ষুদ্র এক জাতীয়তাবাদী কর্মী দলে যোগ দেয়। তার স্বভাব চরিত্র ভালো, দেখতেও আকর্ষণীয়; কিন্তু সে ছিল খুবই আবেগপ্রবণ। মাতৃভূমির পরাধীনতার কথা চিন্তা করে সে প্রায়ই চোখের পানি ফেলত। সে ছিল আবার দুর্বল, অস্থিরসঙ্কল্প ও ভিতু। *পথের দাবীর* উচ্চ প্রত্যাশা ও আদর্শ প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়ে সে পরিশেষে একজন পুলিশ ইনফর্মার হয়। তার ভালবাসা, তার উৎসাহ এবং তার ইতস্তত ভাব – এটাই অপূর্ব-এর মূল বর্ণনা। অপর দিকে সব্যসাচী এই আসে এই যায় এবং যেখানে সেখানে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে আবার অন্তর্হিত হয়ে যায়, তার আর খোঁজ থাকে না। উপন্যাসের মূল কাঠামোয় দেখা যায়, সব্যসাচীর তুলনায় অপূর্ব চরিত্র একেবারে ব্যর্থ। মূলত লেখকের মূল চিন্তা ছিল বাবু চরিত্র নিয়ে। অপূর্বের ব্যর্থতার কারণ ছিল তার ভীরুতা, কাপুরুষতা ও সে ছিল ক্রয়সাধ্য। জাতীয় অধীনতার জন্য এটাকেই কারণ বলে শরৎচন্দ্র মনে করেন। এসব ব্যর্থতাকে জয় করতে পারলে বাবু হয়ে উঠবে অতিমানব এবং সে জাতিকে মুক্ত করবে।

শরৎচন্দ্র তার পূর্বসূরি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মনে করেন যে, জাতীয় মুক্তি হল আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত লোকের কাজ – সব্যসাচী হল তাদের প্রতিনিধি।[৬৬] বঙ্কিমচন্দ্রের মতে অনুশীলনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আদর্শ সৃষ্টি করা ও সেই শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়া হল এলিট শ্রেণীর কাজ। কিন্তু শরৎচন্দ্রের নায়কের আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে চিন্তা ছিল খুবই সামান্য। সব্যসাচী ছিল কর্মবীর; এমনকি তার অস্বাভাবিক বিস্তৃত পরিসরের শিক্ষাটি ছিল কারিগরি ও বাস্তব বিষয় নিয়ে, দার্শনিক বিষয় নিয়ে নয়। বস্তুত শরৎচন্দ্র মনে করেন যে, জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপ চালানোর পথের প্রতিবন্ধকতা হল ঐতিহ্যগত হিন্দু সংস্কৃতি। ফলে *পথের দাবী* সম্পর্কে

অপূর্বের সন্দেহ হল তার নিয়মিতভাবে ঐতিহ্যগত হিন্দু প্রথা থেকে বিচ্যুতিকে নিয়ে এবং জাতপাত নিয়ে দুশ্চিন্তা। এমনকি অসুস্থতা ও বিপদের সময় জাতপাতের পরিশুদ্ধতা নিয়ে তার বদ্ধ-সংস্কার যেমন দুঃখজনক, তেমনি তা এক ধরনের পাগলামি। এর বিপরীতে, কাজে সংকল্পবদ্ধ এই উপন্যাসের পুরুষ ও মহিলারা নিজেদেরকে হিন্দু ধর্মোন্মত্ততা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে; সব্যসাচী জাত মানে না এবং উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে সে 'ধর্ম, সমাজ ও ঐতিহ্যে' 'যা কিছু সনাতন', 'প্রাচীন ও ক্ষয়িষ্ণু' তা ধ্বংস করার জন্য আবেগপূর্ণ আহ্বান জানায়। কারণ, এসব হল, 'জাতির বড় শত্রু'।[৬৭] সুমিত্রা ও ভারতী হিন্দু পরিবেশে লালিত-পালিত হলেও তারা পুরুষের পাশাপাশি কাজ করে, তাদের সাথে বসবাস করে – সেই সময়কার সামাজিক প্রথা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। এমনকি, পোর্শিয়ার মতো অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে মহিলাদের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে প্রেমহীন বিয়ে পরিত্যাগ করার পক্ষে যুক্তি দেখায়।[৬৮]

বাঙালি হিন্দু চরিত্রের উভয় সংকটের জন্য *পথের দাবী* এক পর্যায়ে প্রগতিশীল সমাধানের কথা বলে। পূর্বের নব জাগরণের চিন্তাবিদদের মতো শরৎচন্দ্র বাবুদের ভীরুতার সাথে জাতীয় গোলামির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট করেন। কিন্তু তিনি জাতীয় মুক্তির সাথে ধর্মোন্মত্ততা থেকে মুক্তির বিষয়টি সম্পৃক্ত করেন; তিনি মনে করেন যে, ঐতিহ্য ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সংগ্রামের মাধ্যমে ভদ্রলোকেরা তাদের অভ্যন্তরের দুর্বল বাবুকে পরাভূত করবে এবং ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নৈতিক শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করবে। অবশ্য অন্য এক পর্যায়ে তিনি ভদ্রলোকদের অন্তর্নিহিত জাতীয়তাবাদের মতামতকে চ্যালেঞ্জ করতে ব্যর্থ হন। বস্তুত তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে পুনরায় এভাবে জোরদার করেন যে, জাতীয় মুক্তির জন্য ভদ্রলোকদের নির্বাচিত করা হয়েছে এবং বুদ্ধিমত্তা ও সংস্কৃতির জন্য তাদেরকে পছন্দ করা হয়েছে। উপন্যাসের শেষ দিকে সব্যসাচী কবি শশীকে কৃষকদের কথা ভুলে যাওয়ার কথা বলে, পরিবর্তে তাকে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান সম্প্রদায়ের (শিক্ষিত ভদ্র জাতি) মহান বিপ্লবের গান গাইতে বলে। ভারতী এ কথার চ্যালেঞ্জ করলে সে উত্তরে বলে যে সে জাত মানে না, কিন্তু সে না মানলেও শিক্ষিত ও নিরক্ষর লোকদের মধ্যে জাতের পার্থক্য রয়েছে। সে যুক্তি দেখায় যে, এগুলো হল 'সত্যিকার জাত এবং ভগবানই তা তৈরি করে দিয়েছেন'।[৬৯] এভাবেই সে হিন্দু ভদ্রলোকদের পৃকক ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরে এবং নব জাগরণ থেকে পাওয়া নিজ ভাবমূর্তিকে শক্তিশালী করে – শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান, দুর্বল সত্ত্বেও শক্তিশালী, কিন্তু তাকে জাতীয়তাবাদী ধারণায় বীরত্ব যুক্ত করে মহিমান্বিত করা হয়।

সংস্কৃতি ও পরিচিতি: জাতীয়বাদ থেকে বিচ্যুতি

ভদ্রলোক চিন্তাধারায় সংস্কৃতি, ধর্ম ও পরিচিতির প্রশ্ন তাই জাতিসত্তার (nationhood) সাথে ব্যাপকভাবে পূর্ব সংশ্লিষ্টতার একটা অংশ। নব জাগরণের লেখকদের অনুসন্ধানের মূল প্রশ্ন ছিল – ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দু ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন কী ছিল যার জন্য

ভারতকে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করা খুব সহজ হয়; একই সাথে তাদের উদ্দেশ্য ছিল (হিন্দু) ভারতের জন্য একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নির্মাণ করা যা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তুলনায় শ্রেষ্ঠ না হলেও যেন সমান সমান হয়। পরবর্তী পর্যায়ে *পথের দাবীর* মতো সকল জাতীয়তাবাদী উপন্যাসে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ঘৃণা প্রকাশ করা হয়, আবার একই সাথে হিন্দু গোঁড়ামির সমালোচনা করা হয় কঠোরভাবে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী ভদ্রলোকদের ভাবমূর্তিতে শিক্ষা ও ভদ্রতার অর্থে 'সংস্কৃতি' একটা সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় থাকে; এটাকে এখন থেকে এই শ্রেণীর মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা হয় যারা জাতিকে মুক্ত করতে পারে। এই নতুন পরিচয়ের সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ভূমিকা ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভদ্রলোকদের একটি শ্রেণী গঠনের[৭০] জন্য তাদের তীব্র আত্ম-সচেতনতা প্রতিফলিত হয়। উভয় ক্ষেত্রে 'সংস্কৃতি'র বিষয়টি নিয়ে তীব্র তর্ক-বিতর্ক হয়; স্বীকার করা হয় যে, সংস্কৃতি এমন কোনো বিষয় নয় যা শুধু উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায় – একে সৃষ্টি করতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে অনুশীলন হল অতীত ও বর্তমান বিশ্ব-সংস্কৃতির যা কিছু ভালো সে-সবের সমন্বিত একটি মিলিত রূপ এবং তা অগ্রগণ্য সংস্কৃতিসম্পন্ন লোকদের ভবিষ্যৎ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টায় কেবল অর্জন করা যেতে পারে। অথচ শরৎচন্দ্রের সব্যসাচীর মতে, অতীতের নীতিহীনতা ও অবক্ষয়ের ধ্বংসাবশেষের ওপর স্বদেশ-প্রেমের নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।[৭১]

১৯২০ ও ১৯৩০ দশকে বাঙলার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন আত্ম-সচেতনতার এই রাজনৈতিক-সাহিত্যিক ঐতিহ্যের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে। অতীতে ভদ্রলোকদের প্রশ্নাতীত ও সামাজিক আধিপত্যের ক্রমাগত ভাঙ্গন এবং গণরাজনীতির নতুন যুগে নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান দুশ্চিন্তা ভদ্রলোক রাজনীতিকে যে অবস্থায় নিয়ে যায় সে-সম্পর্কে পূর্বের অধ্যায়গুলোতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঐ পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত সুযোগ-সুবিধা রক্ষায় এই রাজনীতি আরো অন্তর্মুখী, আরো সীমাবদ্ধ ও আরো সংকীর্ণ হয়ে ওঠে। এ সময়ে প্রকাশিত কিছু সাহিত্য, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিবরণে এই মেজাজ প্রতিফলিত হয়। এ ধরনের কিছু রচনা গভীরভাবে পাঠ করলে ভদ্রলোকদের সঙ্কটাবস্থা সম্পর্কে তাদের নিজস্ব উপলব্ধির বিভিন্ন দিক এবং এ ব্যাপারে তাদের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার যৌক্তিকতার মর্ম জানা সম্ভব হবে।[৭২]

এসব লেখায় সংস্কৃতি আগের মতোই প্রধান উদ্বেগের বিষয় হিসেবে অব্যাহত থাকে। কিন্তু যে পদ্ধতিতে সংস্কৃতির প্রশ্নটি বিবেচনায় আনা হয় তাতে সূক্ষ্ম অথচ ভুলভাবে বিচ্যুতি দেখা যায়। জাতিসত্তা ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন জিজ্ঞাসা একটা বিষয়ের কাঠামো সৃষ্টি করে, যার মধ্যে সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনার সুযোগ ছিল – কিন্তু তা এখন আর মূল বিষয় রইল না, তার অবস্থান হয়ে পড়ল ভিন্ন। এই পরিবর্তন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে: দৃষ্টান্ত হিসেবে, তাঁর পরবর্তীকালের উপন্যাস *বিপ্রদাশ* (১৯৩৩) এবং তাঁর জাতীয়তাবাদী শ্রেষ্ঠ উপন্যাস *পথের দাবীর* কথা উল্লেখ করা যায়। তার আগে প্রকাশিত উপন্যাস থেকে পরের এই উপন্যাসে চমকপ্রদভাবে বিষয় ও

বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। *বিপ্রদাশ* শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ উপন্যাস নয়, এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিরও একটি নয়। কিন্তু ঐতিহাসিকদের কাছে এর একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। বিশ্বজগৎ সম্পর্কে এতে একটা সুচিন্তিত ও পরিশীলিত স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে, যে দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ক্রমবর্ধিতভাবে ভদ্রলোক হিন্দু সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। উপন্যাসের নায়ক বিপ্রদাশ একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার। সে তার পৈত্রিক গ্রামে বাস করে, নিজের একাধিক এস্টেট দেখাশোনা করে এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সে একজন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতা। তার দুটো সংসার – একটা মফস্বলে এবং অপরটি কোলকাতায়। উভয় সংসার ও বিভিন্ন *এস্টেট* সে পরিচালনা করে শক্ত হাতে। তবে সে সতর্কভাবে ন্যায়বান ব্যক্তি; কুলপতি হিসেবে পরিবারের সদস্যরাই কেবল তাকে সম্মান করে না, প্রজারাও তাকে সম্মান করে।[৭৩] উপন্যাসের শুরু হয় একটা কৃষক সভার বর্ণনা দিয়ে, কোলকাতা থেকে আগত বিপ্লবীদের সহায়তায় ঐ সভার আয়োজন করা হয়। কিন্তু তাদের বিপ্লবী স্লোগান হাস্যকরভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ 'বিপ্রদাশ বাবু'র প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন ছাড়া তার প্রজারা আর কিছুই করার কথা চিন্তা করেনি।[৭৪] দৃঢ় অথচ দয়াবান জমিদারদের নেতৃত্বের অধীন একটা সুশৃঙ্খল সুসমঞ্জস গ্রামীণ সমাজের চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে। শরৎচন্দ্রের প্রথম দিককার অত্যন্ত প্রসিদ্ধ *পল্লী সমাজ* উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের যে চিত্র উপস্থাপিত হয় তার সাথে এর প্রায় তুলনা করা যায় না। ঐ *পল্লী সমাজ* উপন্যাসে দেখানো হয়েছে যে, দুর্নীতি, লোভ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞতা হল জমিদারি ব্যবস্থার মূল চাবিকাঠি।[৭৫]

নায়ক বিপ্রদাশের চরিত্রটি সব্যসাচী চরিত্রের তুলনায় ভিন্ন ছাঁচে গড়ে তোলা হয়েছে ও রমেশের চেয়েও সেটি অন্য রকম। সে বিদ্রোহী নয়, বিপ্লবীও নয়; বরং সে রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ড এড়িয়ে চলে। এই উপন্যাসে লেখক রাজনৈতিক কার্যকলাপকে (বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের কৃষক সমিতির কাজ) অপরিণত ও নিষ্ফল যুবকদের বিনোদন (সদর্থে নয়) হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেন। এই উপন্যাসে রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত চরিত্র হল বিপ্রদাশের ছোট ভাই দ্বিজু। সে হল স্বদেশী মতাদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী। সে কৃষক আন্দোলনেরও একজন নেতা। তাকে একজন অতি সদাপ্রফুল্ল যুবক হিসেবেও চিত্রিত করা হয়েছে, তবে সে যে নায়ক নয় তা স্পষ্ট। সে একজন নাস্তিক, পাশ্চাত্য শিক্ষায় সে অতিমাত্রায় প্রভাবিত (কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে এম এ পাস করেছে)। তার সময়ের অভাব নেই এবং জীবিকা নির্বাহের জন্যেও তার দুশ্চিন্তা নেই।[৭৬] পরিবারের একজন দায়িত্বশীল সদস্য হওয়ার পথে জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপ দ্বিজুর জন্য বাধাস্বরূপ। এ কারণে সে পুত্র হিসেবেও কর্তব্য পালন করতে পারে না।[৭৭] অন্য দিকে রাজনীতিতে বিপ্রদাশের আগ্রহ প্রায় নেই। তার বীরত্ব, তার ব্যক্তিগত গুণাবলীর মধ্যে, তার আধ্যাত্মিক অন্বেষণের মধ্যেই নিহিত। সে একজন আদর্শবান গৃহস্থ; একজন কর্তব্যপরায়ণ পুত্র, নিবেদিতপ্রাণ স্বামী, একজন পিতা এবং পুরো জমিদারি প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক ও ভরণপোষণকারী। কিন্তু সে একই সাথে একজন বিচ্ছিন্ন ও অন্য জগতের

লোক – ধ্যানের মাধ্যমে উচ্চতর সত্যোপলব্ধি ও আত্ম-অনুসন্ধানে ব্যাপৃত।[৭৮] আধুনিক ও পাশ্চাত্য রীতিনীতির ওপর বৈরাগ্যবাদী 'ঐতিহ্যগত' হিন্দু ধার্মিকতা প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা (এবং বস্তুত, শ্রেষ্ঠত্ব) হল এই উপন্যাসের মূল আবেদন। এ থেকে স্পষ্টভাবে যে বাণী বেরিয়ে আসে তা হল – কোলাহলময়, গোলযোগপূর্ণ জাতীয়তাবাদ এবং কৃষকদের অধিকার সম্পর্কে বাগাড়ম্বর তুচ্ছ কাজের চেয়ে বেশি কিছু নয়।[৭৯] আইন অমান্য আন্দোলন[৮০] ব্যর্থ হওয়ার পর বিবদমান জাতীয়তাবাদের সাথে ক্রমবর্ধমান ব্যাপক মোহমুক্তির ভাব এবং অর্থনৈতিক মন্দার শুরুতে জমিদারি ব্যবস্থায় ভাঙন নিয়ে ভদ্রলোকদের ক্রমাগত উদ্বিগ্নতা *বিপ্রদাশ* অত্যন্ত গভীরভাবে তুলে ধরেছে।

হিন্দু ধর্মের সাথে পাশ্চাত্য মতবাদের তুলনা করার পর উপন্যাসের কাহিনী ফিরে আসে নব জাগরণে। আগের যুগের লেখায় যেমন এসব প্রশ্ন নিয়ে ভয়ানক বিতর্ক হত, এতে তেমন চেষ্টা প্রায় নেই। পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন তরুণী বন্দনার আচরণের মাধ্যমে এ উপন্যাসে আধুনিকতাকে নিয়ে আসা হয়েছে। উপন্যাসের ধারাবাহিকতায় বিপ্রদাশের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বন্দনা তার জীবনধারার নির্বুদ্ধিতা অনুধাবনে সক্ষম হয় এবং সে গোঁড়া হিন্দু মূল্যবোধ গ্রহণে অনুপ্রাণিত হয়। বন্দনাকে চিত্রিত করা হয়েছে একজন বুদ্ধিমতী অথচ চপলা যুবতী হিসেবে: উপন্যাসের অন্যসব 'পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন' চরিত্রকে উপস্থাপন করা হয়েছে ব্যঙ্গচিত্র হিসেবে – তারা সবাই অগভীর ও নীতিহীন চরিত্রের লোক।[৮১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গোরা চরিত্রের মতো বিপ্রদাশের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তবু তার প্রাধান্যের ও সিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য একেবারে ভিন্ন রকম। উভয় উপন্যাসের নায়ক হল গোঁড়া ব্রাহ্মণ এবং তারা মুখোমুখি হয় আকর্ষণীয়া ও পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন যুবতী নারীর সাথে। গোরা ও সুচরিতা সব সময় বুদ্ধিমত্তার সাথে যথাক্রমে হিন্দু ধর্ম ও ব্রাহ্ম ধর্মের যৌক্তিকতা তুলে ধরলেও বিপ্রদাশের যুক্তির বিপরীতে বন্দনা প্রায় কোনো যুক্তি দিতে পারত না (একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল অস্পৃশ্যতার প্রশ্নে)। উপন্যাসের শেষে গোরা রবীন্দ্রনাথের উদার মানবতাবাদ গ্রহণ করে, আর সন্ন্যাস ব্রতের মাধ্যমে বিপ্রদাশ অর্জন করে ধার্মিকতা। নবজাগরণ সম্পর্কে উত্তেজনাপূর্ণ এবং প্রায় ক্ষেত্রে তিক্ত বিতর্ক ঠাকুরের উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে, কিন্তু তা বিপ্রদাশে আশ্চর্যজনকভাবে নীরস ও প্রাণহীন। আরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয় এই যে, গোরার অনমনীয় গোঁড়ামি উৎসাহিত হয় আবেগপূর্ণ জাতীয়তাবাদ থেকে; হিন্দু ধর্মের প্রতি বিপ্রদাশের দৃঢ়চিত্ততা আসে তার সাংস্কৃতিক পরিচিতির সুদৃঢ় অনুভূতি থেকে। তার জাতীয়তাবাদ স্বতঃপ্রবৃত্ত – সজ্ঞান রাজনৈতিক পছন্দের পরিবর্তে একটা স্বভাবজাত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সাদা বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে স্বভাবজাত মর্যাদায়, সাহসের সাথে: সেই কারণে সে তার রেলের আসন জোরপূর্বক দখলকারী মদ্যপ ও গুণ্ডা সাদা লোকগুলোর বিরুদ্ধে একাই মোকাবেলা করে, অথচ সে-সময় অন্যান্য পাশ্চাত্য শিক্ষিত ও 'আধুনিক' ভদ্রলোক যাত্রীরা পেছন দিকে ভয়ে ভয়ে ছিল।[৮২] উপন্যাসের ধারাবাহিকতায় বিপ্রদাশ কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের কথা স্পষ্টভাবে একবারও উচ্চারণ করেনি।

সম্ভবত উপন্যাসের বড় কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হল বিপ্রদাশের চরিত্র চিত্রণ। একজন আদর্শ হিন্দু ব্যক্তিত্বের আদলে শরৎচন্দ্র তাকে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন, এটা স্পষ্ট। সে ছিল ব্যতিক্রমিভাবে লম্বা ও দৈহিকভাবে শক্তিশালী। তলোয়ার ও লাঠিখেলায় তার দক্ষতার প্রসিদ্ধি ছিল। নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে সে নিশ্চিতভাবে রাইফেলের গুলি বিদ্ধ করতে পারত। দৃষ্টিনন্দনভাবে সে ছিল সুন্দর ও আকর্ষণীয়, তার মধ্যে মেয়েলি ভাবের কোনো লক্ষণ ছিল না।[৮৩] সে ছিল একজন গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ, সে অত্যন্ত অবিচলভাবে জাতের নিয়মকানুন, উঁচু জাত, নীচু জাত, পবিত্রতা ও অশুচিতা ইত্যাদি মেনে চলত। তবে একই সাথে সে এতটাই সহিষ্ণু ছিল যে, নিজের জমিদারি এলাকায় তার ছোট ভাইকে জমিদার-বিরোধী মিটিং অনুষ্ঠানের অনুমতি দিত। তার এ সহিষ্ণুতা দুর্বলতার লক্ষণ ছিল না; সে তার পরিবারের এবং অধীনস্থদের কাছ থেকে শ্রদ্ধাভক্তি, ভীতি ও প্রশ্নহীন আনুগত্য লাভ করত।[৮৪] মদ্যপ গুণ্ডা প্রকৃতির লোকদের সাথে তার বাক-বিতণ্ডায় প্রমাণিত হয় যে, সে নিষ্ক্রিয়ভাবে অপমান সহ্য করা লোক নয়, প্রয়োজন হলে সে অতি দ্রুত আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা নিতে পারে। জাতীয়তাবাদ তার কাছে ততটাই স্বাভাবিক সহজাত বিষয়, যতটা তার কাছে ধর্ম, যা তার ব্যক্তিত্বেরই একটা অংশ। সে একজন ধনী লোক এবং দায়িত্বশীল গৃহস্থ, তবে সম্পত্তি বা জাগতিক সম্পদের প্রতি তার আগ্রহ ছিল না। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে সে জগৎ-সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করে। সব শেষে বলা যায়, সে ছিল অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি, ইউরোপীয় দর্শন ও সাহিত্যে সুশিক্ষিত। কিন্তু একই সাথে সে ছিল গভীরভাবে আধ্যাত্মিক এবং হিন্দু ধর্মে আস্থাবান। সে জানত সে কে, এবং সে এ কথাও জানত যে, সে তার নিজের 'সংস্কৃতি'তে দৃঢ়তার সাথে ও সজ্ঞানে প্রোথিত।

এভাবে শরৎচন্দ্র গণজাগরণমূলক রচনা থেকে উৎসারিত বিপ্রদাশের মধ্যে দৃশ্যমান 'হিন্দুত্বে'র পরস্পরবিরোধী উপাদানের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করেন। এ উপন্যাসে 'বাবু'র কোনো ভূমিকা ছিল না এবং এই চরিত্রের মধ্যে জাতীয়তাবাদী উত্তেজনা অনুপস্থিত ছিল। অথচ *পথের দাবী*তে জাতীয়তাবাদ ছিল সক্রিয়ভাবে পছন্দনীয় পথ এবং এ পছন্দের পথই তাদেরকে 'বাবুদের' থেকে পৃথক করে দেয়, অথচ বিপ্রদাশের কাছে জাতীয়তাবাদ ছিল সাধারণ একটা উপাদান, যা আদর্শ হিন্দু ব্যক্তিত্বের সহজাত গুণ। 'হিন্দুত্বে'র মধ্যকার বিভিন্ন বিপরীতধর্মী উপাদানের মধ্যেও সমঝোতা করা হয়। বিপ্রদাশের মধ্যে একই সাথে প্রকাশ পায় সাহসিকতা, নিষ্ক্রিয়তা, গোঁড়ামি ও সহিষ্ণুতা, অধ্যাত্মবাদ ও স্বাধীনতার প্রতি ভালবাসা, পরজগত ও ইহজগতের দায়িত্ব-কর্তব্য, আনুষ্ঠানিক পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও সত্যিকার আত্মজ্ঞান। এ সব বৈপরীত্যের সমাধানে লেখক যে পন্থা অবলম্বন করেন, তা হল 'সংস্কৃতি'। এটা তাঁর হিন্দু 'সংস্কৃতি' সম্পর্কে সজ্ঞান আনুগত্য – ভালো হোক বা মন্দ হোক, সঠিক হোক বা ভুল হোক – এটাই বিপ্রদাশকে ক্ষমতাবান করে।[৮৫] এর জন্য সে গর্বিত, মর্যাদাবান ও সাহসী হয়; চেতনায় সে জাতীয়তাবাদী, যদিও সে জাতীয়তাবাদী কাজ পরিহার করে; এটা তার সহিষ্ণুতা, আধ্যাত্মিকতা ও পারলৌকিকতাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে।.একই সাথে 'সংস্কৃতি' সম্পর্কে বিতর্কেরও অবসান হয়। নব জাগরণ

এখানে কাঙ্ক্ষিত এবং হিন্দু মূল্যবোধকে দেখানো হয় পাশ্চাত্যের সংকীর্ণ কৃত্রিম মূল্যবোধের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত হিসেবে। তবে গঠন কাঠামো বা বর্ণনার উদ্দেশ্যের দিক থেকে এটাই চূড়ান্তভাবে প্রাসঙ্গিক ছিল না। *বিপ্রদাশের* মধ্যে শরৎচন্দ্র এই যুক্তি তুলে ধরতে চেয়েছেন যে, হিন্দু/ভারতীয় 'সংস্কৃতি' হল প্রদত্ত; এক ও সম্মিলিত উত্তরাধিকার, একে একটি উপহার হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এটাকে বিনা সমালোচনায় ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করে গ্রহণ করে হিন্দুরা অন্তর্নিহিত শক্তি লাভ করতে পারবে; কারণ তারা জানে যে, ঐসব বিষয় কী – তারা কে, ভবিষ্যতে তারাই হবে অজেয়।

একটা বিষয় অবশ্য লেখক সফলভাবে সমাধান করতে পারেননি, তা হল জাত-পাতের সমস্যা। কৌতূহলের বিষয় এই যে, এই উপন্যাসে নিম্ন বর্ণের কোনো চরিত্র নেই। বর্ণভেদের বিষয়টা উত্থাপন করা হয় বন্দনা চরিত্রের মাধ্যমে – বন্দনা হল সম্পদশালী ও শিক্ষিত এক ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। কিন্তু বন্দনার পিতা-মাতা বিদেশে গিয়ে জাত হারিয়েছে, তারা এখন গোঁড়া ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিতে 'ম্লেচ্ছ' (অস্পৃশ্য)। উপন্যাসের শুরুতে বিপ্রদাশের গোঁড়া ধর্মানুসারী মা বন্দনার প্রণিপাত (অভিবাদন) গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, সে পেছনে সরে যায় – তা না হলে মেয়েটির ছায়া তাকে অপবিত্র করে দিত।[৮৬] বন্দনা এ জন্য মনে আঘাত পায় এবং সে ক্রুদ্ধ হয়। এ অপমানের জন্য সে তৎক্ষণাৎ দয়াময়ীর গৃহ ত্যাগ করে কোনো কিছু না বলেই, ঐ গৃহে সে অতিথি হিসেবে ছিল। বেশ কিছু দিন ধরে আত্মপরীক্ষার পর এবং বিপ্রদাশের মধ্যস্থতায় উভয়ে পরিশেষে একে অপরকে ভালবাসে ও গ্রহণ করে। ক্রমান্বয়ে বন্দনা ঐ গৃহের সব কিছু নিজের হাতে গ্রহণ করে[৮৭] (এবং বিশেষভাবে রান্নাঘর), আর উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে সে ঐ পরিবারে প্রবেশ করে দ্বিজুর স্ত্রী হিসেবে। তবে বিপ্রদাশের প্রভাবে বন্দনা প্রথমে ব্রাহ্মণী হয়; সে জুতা পরা ছেড়ে দেয়, রান্নাঘরে ঢোকার আগে স্নান করে,[৮৮] খাদ্য তৈরি করার জন্য 'শুচি' কাপড় পরিধান করে[৮৯] এবং পরিশেষে সন্ধ্যা প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করে।[৯০] তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, সে সেই উচ্চতর মূল্যবোধকে গ্রহণ করে যা তার গুরু বিপ্রদাশের মতে, সব আনুষ্ঠানিকতার পেছনে থাকে; কর্তব্যের পবিত্র অনুভূতি, হিন্দু মহিলার আত্মোৎসর্গ ও একাগ্রতা।[৯১] দয়াময়ী অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে নেয় বন্দনাকে, তাকে সে তার নিজের মেয়ের মতো করেই গ্রহণ করে নেয়। তবে বন্দনাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে একটা বিষয় তাকে প্রভাবিত করে – পতিত হলেও বন্দনা হল জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ।

উপন্যাসে এভাবে অস্পৃশ্যতাকে এমন একটা সমস্যা হিসেবে উপস্থাপন করা হয় – যে সমস্যাকে অবশ্য হিন্দু ধর্মের কাঠামোর মধ্যেই সমাধান করা যায়। তবে শর্ত হল, উভয় পক্ষেরই সদিচ্ছা থাকতে হবে। তবে সুপারিশ করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণদের আচার-আচরণ অনুসরণ করলেই 'পবিত্র' বলে ম্লেচ্ছদের গ্রহণ করা যাবে না, তাদেরকে উচ্চতর হিন্দু সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে গ্রহণ করতে হবে। অন্য দিকে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের তাদেরকে গ্রহণ করে নিতে বলা হয়েছে; ঐ গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি ধর্মীয় শাস্ত্রের অনুমোদন নয়, তার ভিত্তি হতে হবে মানবিক উদারতা, সহিষ্ণুতা ও ভালবাসার 'হিন্দু' চেতনা। একটা পারিবারিক

দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে বর্ণ সমস্যার সমাধান করা হয়েছে – দ্বিজু ও বন্দনার বিয়েকে দেখানো হয়েছে বৃহত্তর হিন্দু 'পরিবারের' পুনর্মিলনের ক্ষেত্রে একটা আদর্শ স্থানীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে।[৯২]

প্রথম যুগের উপন্যাস ও প্রবন্ধে বর্ণপ্রথা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। কিন্তু *বিপ্রদাশ* উপন্যাসে বিতর্কমূলক ও বিভাজন প্রশ্নে 'জাতিভেদ প্রথার' দর্শনের ন্যায্যতা নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি।[৯৩] এ উপন্যাসের প্রকাশভঙ্গি সঙ্গতিপূর্ণ। এ উপন্যাসে যে কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে হিন্দু ধর্মের পরস্পরবিরোধী 'উপাদানে'র সমন্বয় এবং অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে পরামর্শ রাখা হয়েছে তাতে একটি সঙ্গতিপূর্ণ 'হিন্দুত্বের' চিত্র ফুটে উঠেছে যা কিনা উদ্ধারের অপেক্ষায় রয়েছে। এই 'হিন্দু ধর্ম' হল একটা সুনিয়ন্ত্রিত সমাজের সাংস্কৃতিক উপাদান – এখানে মানুষ বিদ্রোহমূলক কাজের মাধ্যমে মহত্ত্ব অর্জন করতে পারে না, পূর্ব-নির্ধারিত সামাজিক দায়িত্ব পালন করেই তা অর্জন করা যায়। এভাবে 'ধর্মীয় মূল্যবোধ' ভদ্রলোক-জমিদারি ব্যবস্থায় সামাজিক মূল্যবোধের সাথে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। উপন্যাসের প্রাচীন প্রথার ওপর হুমকিতে ব্যাপক সামাজিক অশান্তির অনুভূতি ব্যক্ত করা হয়েছে – ঐ হুমকি আসতে পারে ভেতর থেকে ও বাইরে থেকে, নিম্ন বর্ণের বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে, ভদ্রলোকদের সংস্কারকামী মতবাদ, কৃত্রিম জাতীয়তাবাদ, শ্রদ্ধাহীন আধুনিকতা ও বিভক্ত কৃষক রাজনীতি থেকে। ধর্মের এই অশান্ত পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে উপন্যাসে ঐ হুমকিকে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি হুমকি বলে চিত্রিত করা হয়েছে। এভাবে উপন্যাসে 'হিন্দুত্ব' সম্পর্কে এমন এক অর্থ দাঁড় করানো হয়েছে যার ভিত্তি ভদ্রলোক জগতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে গভীরভাবে প্রোথিত এবং আপাত দৃষ্টিতে এর সাথে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু দেখা যাবে যে, 'মুসলমানিত্ব' সম্পর্কে একটি বিপরীত সংজ্ঞা ও তার বিরোধিতা এই হিন্দুত্বের চেতনারই একটি অন্তর্গত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হিন্দুত্ব ও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা

বিপ্রদাশ-এ 'হিন্দুত্বে'র যে আদর্শ উপস্থাপন করা হয়েছে সামাজিক বিচারে তা গভীরভাবে রক্ষণশীল এবং কর্তৃত্বপূর্ণ। তবে প্রথম দৃষ্টিতে একে স্পষ্টত 'সাম্প্রদায়িক' বলে মনে হয় না। নব জাগরণ যুগের উপন্যাস ও মহাকাব্যে মুসলিম নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের কথা পরোক্ষভাবে অনেক উল্লেখ করা হয়। *বিপ্রদাশ* উপন্যাসে কিন্তু মুসলমান চরিত্রের অনুপস্থিতি নজর কাড়ার মতো।[৯৪] কিন্তু আসলে সুনির্দিষ্ট মুসলিম-বিরোধী সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে এখানে হিন্দুত্বকে নির্মাণ করা হয়েছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ ধরনের বিতর্কমূলক প্রবন্ধ *বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা*[৯৫] পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ঐ প্রবন্ধে ভদ্রলোক সমাজের ক্রমবর্ধমান সামাজিক রক্ষণশীলতা, এবং পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও জটিল সম্পর্ক এবং ঐ সমাজের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ হিন্দু সাম্প্রদায়িক আদর্শের উদ্ভবের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রথমে ভাষণ হিসেবে *বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা* ১৯২৬ সালে হিন্দুসভা সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয়। এতে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে যুক্তি দেখানো হয় যে, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জাতীয় প্রত্যাশা একটা অলস ও অকার্যকর স্বপ্ন। ১৯২৬ সালের কোলকাতার দাঙ্গার পর লিখিত[৯৬] এবং অসহযোগ, খেলাফত আন্দোলন ও দাশ চুক্তির ব্যর্থতায় স্পষ্টভাবে প্রভাবিত ঐ প্রবন্ধে সাহসের সাথে ঘোষণা করা হয় যে, হিন্দু ও মুসলমানেরা শুধু পৃথক নয়, মৌলিকভাবে তারা অসমান, আর 'মিলন হয় সমানে সমানে'।[৯৭] তিনি এখানে সংমিশ্র জাতীয়তাবাদ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে নেন যা ছিল '*পথের দাবী*'তে সব্যসাচীর আদর্শ, যেখানে দেশের মধ্যে ধর্মীয় বিভিন্নতা বিলীন হয়ে গিয়েছিল।[৯৮] কিন্তু *বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা* প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র এ কথা গ্রহণ করার আন্তরিক আহ্বান জানান যে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা পুনর্মিলনের অযোগ্য। তিনি বলেন, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার পার্থক্যের মূল বিষয় হল 'সংস্কৃতি'। সংস্কৃতির ব্যাখ্যা এখানে হালকাভাবে দেওয়া হয়েছে – এখানে সংস্কৃতি হল মন ও অন্তরের বৈশিষ্ট্য যা স্বভাবগতভাবে সব হিন্দুর আছে, কিন্তু মুসলমানদের তা নেই এবং তারা তা অর্জন করবে এমন আশা খুব কম:

> শিক্ষা মানে যদি লেখাপড়া জানা হয় তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমানে বেশী তারতম্য নাই ... কিন্তু শিক্ষার তাৎপর্য যদি অন্তরের প্রসার ও হৃদয়ের কালচার হয়, তাহা হইলে বলিতেই হইবে উভয় সম্প্রদায়ের তুলনাই হয় না ... শিক্ষা সমান করিয়া লইবার আশা আর যেই করুক আমি তো করি না। হাজার বৎসরে কুলায় নাই, আরও হাজার বৎসরে কুলাইবে না।[৯৯]

শরৎচন্দ্র যুক্তি দেখান যে, মূলত এই 'সংস্কৃতি'র অভাবই মুসলমানদের নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা ও ধর্মোন্মত্ততার কারণ। এটা হল মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রাচীন, সর্বব্যাপী ও অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য এবং তা প্রথম যুগের গজনবী বিজেতাদের মধ্যে স্পষ্টভাবে দেখা যায় – 'তারা কেবল লুট করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে',[১০০] ঠিক যেন বর্তমান কালের বাঙালি মুসলমানের মতো যারা 'পাবনার বীভৎস ঘটনার'[১০১] জন্য দায়ী। তাছাড়া, এই প্রেক্ষিতে 'আদি মুসলমান' ও সাম্প্রতিককালের ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে কাউকে গ্রহণ করার প্রায় কিছু নেই। যারা খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয় তারা তাদের মূল (হিন্দু) 'সংস্কৃতি' অক্ষুণ্ন রাখে, কিন্তু ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর তারা তাদের হিন্দু উৎপত্তিকে পরিত্যাগ করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে ও অপরিবর্তনীয়ভাবে মুসলমান হয়ে যায়। এই দাবির সপক্ষে শরৎচন্দ্র বিশেষ ঘটনার প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন:

> আমাদের একজন পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। সে মুসলমানীর প্রেমে মজিয়া ধর্মত্যাগ করে। এক বৎসর পরে দেখা যায় তাহার নাম বদলাইয়াছে, পোশাক বদলাইয়াছে, প্রকৃতি বদলাইয়াছে, ভগবানের দেওয়া যে আকৃতি, সে পর্যন্ত এমনি বদলাইয়া গিয়াছে যে আর চিনিবার জো নাই। এবং এইটিই একমাত্র উদাহরণ নয়। বস্তির সহিত যাহারই

> অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠতা আছে, এ কাজ যেখানে প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে, তাহারই অপরিজ্ঞাত নয় যে এমনিই ঘটে! উগ্রতায় পর্যন্ত ইহারা বোধ হয় কোহাটের মুসলমানকে লজ্জা দিতে পারে।[১০২]

এই ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে, এমনকি অতি সম্প্রতি ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের দৈহিক ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে দ্রুত পরিবর্তনের একটি অদ্ভুত শক্তি ইসলামের আছে; ফলে তাদেরকে অন্যান্য মুসলমান জনগণের কাছ থেকে পৃথক করে চিহ্নিত করা যায় না। ঐ রচনায় বলা হয়েছে যে, ইসলামের অমার্জিত ও বর্বরোচিত উপাদান শুধু দূরত্ব, সময় ও ভৌগোলিক বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম নয়, তা স্থানীয় আশরাফ-আতরাফ বিভেদকেও অতিক্রম করতে পারে। ফলে এসব বৈশিষ্ট্য ধর্মান্তরিত বাঙালি কৃষক ও প্রাচীন মুসলমান অভিজাত লোকদের ক্ষেত্রে সমানভাবে সত্য। কৌতূহলের বিষয় হল, এই যুক্তিতে দেখা যায় যে, সম্প্রদায়ের পক্ষে কথা বলার দাবিদার বলে যারা সম্প্রদায়গত আলোচনায় শুধু 'সম্প্রদায়ের' তথাকথিত নিজ মিলনকেই নিশ্চিত করে না, অভিন্ন সত্তার অংশীদার করে তারা তাদের ঐ 'বিপরীত' পক্ষের হয়েও কথা বলে। তারা একই প্রকৃতির ও জঘন্য চরিত্রের লোক হিসেবে খুবই সংঘবদ্ধ।

হিন্দুত্ব নির্মাণের জন্য যেসব বৈশিষ্ট্যকে বেছে নেয়া হয়, সেগুলি সব সময়ই মুসলমানদের বৈশিষ্ট্যের ঠিক উল্টো। ফলে হিন্দুরা, বিপ্রদাশের মতো গোঁড়া হতে পারে, কিন্তু তারা সব সময় সহিষ্ণু হয়; অথচ মুসলমানেরা হয় নিশ্চিতভাবে 'ধর্মোন্মত্ত'। হিন্দুদের মধ্যে গোঁড়া ধর্মের প্রতি স্থির আনুগত্য হল সংস্কৃতি ও ধার্মিকতার বিষয় (যেমন বিপ্রদাশ, দয়াময়ী ও পরিবর্তিত বন্দনার মধ্যে দেখা যায়), কিন্তু মুসলমানদের 'ধর্মের প্রতি আবিষ্টতা'কে গণ্য করা হয় তাদের সংস্কৃতির অভাব, সহজাত বর্বরতা হিসেবে। *বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা* প্রবন্ধে এই যুক্তি তুলে ধরা হয়: 'ভারতের মুক্তিতে ভারতীয় মুসলমানদেরও মুক্তি মিলিতে পারে, এ সত্য তাহারা কোনদিনই অকপটে বিশ্বাস করিতে পারিবে না। পারিবে শুধু তখন যখন ধর্মের প্রতি মোহ তাহাদের কমিবে, যখন বুঝিবে যে-কোনো ধর্মই হউক তাহার গোঁড়ামি লইয়া গর্ব করার মতো এমন লজ্জাকর ব্যাপার, এত বড় বর্বরতা মানুষের আর দ্বিতীয় নাই।'[১০৩]

এমনকি হিন্দুদের 'উদাসীনতা'র সঙ্গে মুসলমানদের 'আগ্রাসন প্রবণতা'র বৈষম্যমূলক তুলনা করার সময় অন্য পক্ষের ধর্মের বৈশিষ্ট্যকে কোনো অবস্থাতেই ধার্মিকতা বলে গণ্য করা হয় না। এটির প্রকাশ ঘটেছে পুনঃপুন হিংসাত্মক কাজ, নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের মধ্য দিয়ে:

> অত্যাচার ও অনাচারের বিবরণ সকল স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া এই কথাটাই কেবল বলিতেছি – তুমি এই আমাকে মারিলে, এই আমার দেবতার হাত-পা ভাঙ্গিলে, এই আমার মন্দির ধ্বংস করিলে, এই আমার মহিলাকে হরণ করিলে – এবং এই সকল তোমার ভারী অন্যায়, ও ইহাতে আমরা যারপরনাই ব্যথিত হইয়া হাহাকার করিতেছি। এ সকল তুমি না থামাইলে আমরা আর তিষ্ঠিতে পারি না। বাস্তবিক ইহার অধিক আমরা কি কিছু বলি, না করি ?[১০৪]

একইভাবে মুসলমানদের শক্তিকে বর্ণনা করা হয়েছে নেতিবাচক অর্থে 'পুরুষত্ব' হিসেবে, যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কাম, লালসা, লাম্পট্য ও মাত্রাতিরিক্ত যৌনতা। শরৎচন্দ্র বারবার হিন্দু মহিলাদের 'ধর্ষণ', 'বলপূর্বক আটক' ও 'অপহরণ' করার কথা উল্লেখ করেছেন।[১০৫] মুসলমানদের কাম প্রবৃত্তির কথা আগেও আমরা শুনেছি, এর ইতিহাস দীর্ঘ – এর সম্পর্ক আছে আরবদের সম্পর্কে ইউরোপীয়দের গৎবাঁধা বর্ণনার সঙ্গে। শরৎচন্দ্রের রচনায় এই হীন কাজের বিষয়টির প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হিন্দুদের 'নিষ্ক্রিয়তা'কে শুধু লজ্জা জানানো হয়নি, বরং এ কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, উচ্চ বা নীচ সব মুসলমানের কাছ থেকে হিন্দু মহিলাদের সতীত্ব হারানোর হুমকি আছে:

> হিন্দু নারীহরণ ব্যাপারে সংবাদপত্রওয়ালারা প্রায়ই দেখি প্রশ্ন করেন, মুসলমান নেতারা নীরব কেন? তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যে পুনঃপুনঃ এতবড় অপরাধ করিতেছে, তথাপি প্রতিবাদ করিতেছে না কিসের জন্য? মুখ বুজিয়া নিঃশব্দে থাকার অর্থ কী? কিন্তু আমার তো মনে হয় অর্থ অতিশয় প্রাঞ্জল। তাহারা শুধু অতি বিনয়বশতঃই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না, বাপু, আপত্তি করব কি, সময় এবং সুযোগ পেলে ও-কাজে আমরাও লেগে যেতে পারি।[১০৬]

এর ভাবার্থ এই যে, এসব অপরাধমূলক কাম প্রবৃত্তির কাজে স্পষ্টভাবে সহজাত 'মুসলমানিত্ব' শ্রেণীগত সীমা অতিক্রম করেছে। একই সাথে তিনি বলেন যে, 'হিন্দুত্ব' বা 'হৃদয়ের কালচার' – সব হিন্দুর মধ্যে আছে – এমনকি সেটা সবচেয়ে গরিব ও সবচেয়ে অশিক্ষিত লোকের মধ্যে। যারা এই কৈফিয়ত দেয় যে, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার কারণে মুসলমান কৃষকেরা এই আক্রমণ চালিয়েছে, শরৎচন্দ্র তাদের এই যুক্তি খারিজ করে দেন। তিনি বলেন, এটা 'মুসলমানিত্বের' একটি প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়:

> পাবনার বীভৎস ব্যাপারে অনেককেই বলিতে শুনি, পশ্চিম হইতে মুসলমান মোল্লারা আসিয়া নিরীহ ও অশিক্ষিত মুসলমান প্রজাদের উত্তেজিত করিয়া এই দুষ্কার্য করিয়াছে। কিন্তু এমনই যদি পশ্চিম হইতে হিন্দু পুরোহিতদের দল আসিয়া, কোনো হিন্দু-প্রধান স্থানে এমনি নিরীহ ও নিরক্ষর চাষাভুষাদের এই বলিয়া উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করেন যে, নিরপরাধ নিরীহ প্রতিবেশীদের ঘরদোরে আগুন ধরাইয়া সম্পত্তি লুট করিয়া মেয়েদের অপমান অমর্যাদা করিতে হইবে, তাহা হইলে সেই সব নিরক্ষর হিন্দু কৃষকের দল উহাদের পাগল বলিয়া গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিতে একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করিবে না।[১০৭]

হিন্দু ও মুসলমান কৃষকদের মধ্যকার শিক্ষার স্তরের পার্থক্য নগণ্য বলে তিনি মনে করেন। দুই কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে আচরণগত পার্থক্যের কারণ হল সেই ছলনাময় বিষয় – 'সংস্কৃতি'। এক্ষেত্রে 'দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো তুলনা করা যায় না'।[১০৮]

এভাবে 'সংস্কৃতি'র প্রতীক, যার উদ্ভব হয় বিশেষ এক রাজনৈতিক লক্ষ্যে ভদ্রলোকদের নিজস্ব ঐতিহাসিক উপলব্ধি থেকে, হয়ে ওঠে সকল হিন্দুর সম্প্রদায়গত পরিচিতির প্রতীক। এই প্রথম বার 'হিন্দু' কৃষক ও শ্রমিকদের (আলংকারিকভাবে) সাধারণ

'ছোটলোক'দের থেকে পৃথক করে নেওয়া হয় এবং তাদেরকে প্রসারিত হিন্দু 'সম্প্রদায়ের' সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত 'শ্রেণী'র মধ্যকার শিক্ষিত ভদ্র জাতি এবং অশিক্ষিত চাষাভুষা কুলি-মজুরদের মধ্যকার দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান কমিয়ে আনা হয়; যে ব্যবধানকে *পথের দাবী*তে সব্যসাচী দাবি করেছিল 'বিধাতার হাতের কাজ' বলে।[১০৯] শরৎচন্দ্রের কাছে এই সেতুবন্ধ হল 'সংস্কৃতি'র নতুন ব্যাখ্যা, যার সাথে বই পড়া বিদ্যা ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সম্পর্ক প্রায় নেই। 'সংস্কৃতি' এখন একটা আরোপিত বৈশিষ্ট্য। এটা এমন একটা বৈশিষ্ট্য যার সাথে উচ্চ বা নীচ সব হিন্দুই জন্ম থেকেই জড়িত; কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বা যত চেষ্টাই করুক না কেন মুসলমানেরা তা কখনও অর্জন করতে পারবে না। হিন্দু সমাজের শ্রেণী বিভাগের সমস্যা এভাবে একটা চমৎকার উদ্ভাবনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে; সকল হিন্দুর ওপর একটা গুণ আরোপ করা হয়েছে, যা কিনা ভদ্রলোকদের বিশেষ পরিচিতি, আর সেটা হল ভদ্রতা অর্থাৎ সুরুচিসম্পন্নতা বা শিষ্টতা। ভদ্রলোক ও ছোটলোকদের শ্রেণীগত পুরাতন পার্থক্যটি এখন 'সম্প্রদায়গত' পার্থক্যের আবরণে তথা ভদ্র হিন্দু ও অভদ্র বা ইতর মুসলমানদের মধ্যকার পার্থক্য হিসেবে পুনঃপ্রকাশিত হয়।[১১০]

কিন্তু বর্ণ প্রথার সমস্যার সমাধান একইভাবে হল না, শরৎচন্দ্রও বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। *বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা* প্রবন্ধে তিনি মত পোষণ করেন যে, কয়েকটি 'আচার-বিধি'র কারণে নিম্ন বর্ণের লোকেরা হল হিন্দু মিলনের পথে প্রধান অন্তরায়। তাঁর মতে এসব আচার-বিধি হল মূর্খতা – ভুল বা বিকৃতি – অনতিবিলম্বে এর সমাধান করতে হবে। হিন্দুদের জন্য এটাই হল প্রথম কাজ:

> হিন্দুর সমস্যা এ নয় যে, কি করিয়া এই অস্বাভাবিক মিলন সংঘটিত হইবে; হিন্দুর সমস্যা এই যে, কি করিয়া তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিবেন এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বী যে কোন ব্যক্তিকেই ছোট জাতি বলিয়া অপমান করিবার দুর্মতি তাহাদের কেমন করিয়া এবং কবে যাইবে। আর সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা – হিন্দুর অন্তরের সত্য কেমন করিয়া তাহার প্রতিদিনের প্রকাশ্য আচরণে পুষ্পের মতো বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে। যাহা ভাবি তাহা বলি না, যাহা বলি তাহা করি না, যাহা করি তাহা স্বীকার পাই না – আত্মার এত বড় দুর্গতি অব্যাহত থাকিতে সমাজগাত্রের অসংখ্য ছিদ্রপথ ভগবান স্বয়ং আসিয়াও রুদ্ধ করিতে পারিবেন না। ইহাই সমস্যা এবং ইহাই কর্তব্য।[১১১]

বিপ্রদাশ-এ যেভাবে বর্ণ সমস্যাটিকে দেখা হয়েছে, এই প্রবন্ধেও তাই অনুসৃত হয়েছে। এটাকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ধর্মাবলম্বন ও চরিত্র বা আচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়; এখানে সামগ্রিকভাবে বর্ণপ্রথা বা বর্ণভেদের দার্শনিক বৈধতা নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। সগোত্রীয় হিন্দুদের নীচু জাত বলে অপমান করা নির্বুদ্ধিতাজনিত ভুল – যেমনটি বন্দনার প্রণামকে প্রত্যাখ্যান করে দয়াময়ী ভুল করেছিল। *বিপ্রদাশ*-এ এই উত্তর দেয়া হয়েছিল। বলা হয়েছে মানুষের মন ও আত্মা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে হিন্দু ধর্মের উচ্চতর সত্য প্রকাশ পাবে, ভালবাসা ও পারস্পরিক সহিষ্ণুতা 'ফুলের মতো প্রস্ফুটিত' হবে এবং হিন্দু পরিবারের মিলন ঘটবে। এ বক্তব্যে প্রকাশ পায় যে, অস্পৃশ্যতা বা নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের প্রতি খারাপ আচরণ

হিন্দু ধর্মের চেতনাবিরুদ্ধ, তার সহিষ্ণু বৈশিষ্ট্যের বিপরীত। কিন্তু বর্ণ প্রথার বিতর্কিত বিষয়ে আধ্যাত্মিক চেতনা ও হিন্দু ধর্মের শিক্ষার মধ্যকার সম্পর্ক ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্ট করে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে অতি গভীরে অনুসন্ধান করতে গেলে সম্ভবত অনেক অস্বস্তিকর প্রশ্নের উদ্ভব হবে – লেখকের 'হিন্দুত্বে'র ব্যাখ্যাকে অবমূল্যায়ন না করে তার উত্তর দেওয়া কষ্টকর হবে এই মনে করে। এই প্রবন্ধের আর একটা আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, এটি সম্পূর্ণরূপে উচ্চবর্ণের লোকদের উদ্দেশ্য করে রচিত হয়।

শরৎচন্দ্রের মতে, হিন্দুদের মিলন ঘটানো হল হিন্দুদের জন্য প্রথম কাজ এবং এটা অর্জন করা গেলে আপনা হতেই স্বাধীনতা আসবে। জাতিকে মুক্ত করার জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ শক্তিই যথেষ্ট। এ কাজে মুসলমানদের সমর্থনের যেমন সম্ভাবনা নেই, তেমনি প্রয়োজনও নেই, কারণ –

> হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এদেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব হিন্দুরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে, এদেশে চিত্ত তাহার নাই ... আজ এই কথাটাই একান্ত করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে যে, এ কাজ শুধু হিন্দুর, – আর কাহারও নয়। মুসলমানের সংখ্যা গণনা করিয়া চঞ্চল হইবারও আবশ্যকতা নাই। সংখ্যাটাই সংসারে পরম সত্য নয় ... মুক্তি অর্জনের ব্রতে হিন্দু যখন আপনাকে প্রস্তুত করিতে পারিবে, তখন লক্ষ্য করিবারও প্রয়োজন হইবে না, গোটা কয়েক মুসলমান ইহাতে যোগ দিল কি না।[১১২]

উপরোদ্ধৃত 'দেশ' কথাটির ব্যবহার হয়েছে বিশেষভাবে অতীতের স্মৃতিকে নাড়া দিতে। কারণ এর মধ্য দিয়ে আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের কথাই শুধু প্রকাশ করা হয়নি, এর মধ্য দিয়ে দেশি ভাষায় স্থানীয়ভাবে 'স্বদেশ-ভূমি', 'জন্মভূমি'-এর প্রকাশ ঘটেছে। এর সঙ্গে আবেগের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। যার ফলে লেখক এক কথা বলতে পারেন যে, 'দেশ' বা জন্মস্থানের সাথে হিন্দুদের 'সহজাত' অনুভূতির সংশ্লিষ্টতা 'স্বাভাবিকভাবে' বৃহত্তর দেশব্যাপী বিস্তৃত, যার বিমূর্ত সত্তা হল 'হিন্দুস্থান'। অপর দিকে মুসলমানেরা কখনও এই আবেগের বন্ধনে অংশ নিতে পারবে না। তারা চিরস্থায়ীভাবে 'বিদেশী', কারণ তাদের আত্মিক আবাসস্থল হল তুরস্ক ও আরবের ইসলামি কেন্দ্রস্থল, এ কারণে শরৎচন্দ্র চাতুর্যের সাথে খেলাফত আন্দোলনকে একটি প্রতারণামূলক কাজ হিসেবে গণ্য করেছেন – তিনি এটাকে মুসলমান সম্প্রদায়ের দেশের বাইরে অন্য দেশের প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ হিসেবে হাজির করেন। যে শক্তিশালী একটি ব্রিটিশ-বিরোধী ও ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী অনুভূতি খেলাফত আন্দোলনকে পরিচালিত করেছিল বলে দাবি করা হয়, শরৎচন্দ্র সেই দাবিকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন।

মুসলমানেরা জাতীয়তাবাদী নয়, এ কথা প্রতিষ্ঠিত করার পর শরৎচন্দ্র যুক্তি উত্থাপন করে বলেন যে, তারা কখনও জাতীয়তাবাদী হতে পারবে না। তার আলোচনা পুনরায় ঐ সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়:

> তাঁহারা ইহাই ভাবিতেন – দুঃখ-দুর্দশার মতো শিক্ষকও আর নাই, বিদেশী বুরোক্রেসির কাছে নিরন্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া হয়ত তাহাদের চৈতন্য হইবে, হয়ত হিন্দুর সহিত

> কাঁধ মিলাইয়া স্বরাজরথে ঠেলা দিতে সম্মত হইবে। ভাবা অন্যায় নয়, শুধু ইহাই তাঁহারা ভাবিলেন না যে, লাঞ্ছনাবোধও শিক্ষাসাপেক্ষ ... তাহার চেয়েও বড় কথা এই যে, দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে যাহাদের বাধে না, সবলের পদলেহন করিতেও তাহাদের ঠিক তখনই বাধে না।[১১৩]

লেখকের মতে, ঐ সমস্যা মুসলিম ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিহিত। জাতীয়তাবাদী সচেতনতা ও দেশপ্রেমের অনুভূতি উচ্চতর বোধশক্তি, উন্নত সংস্কৃতি থেকে সৃষ্টি হয়। সব হিন্দুই স্বভাবগতভাবে সংস্কৃতিবান, এবং সেহেতু তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাব প্রকাশের প্রগাঢ়তা আছে। তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের 'বৈশিষ্ট্য' আছে, সমস্যা হল তা শুধু জাগ্রত করার। অপর দিকে মুসলমানেরা কখনই জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় জাগ্রত হবে না। কারণ, উচ্চতর বোধশক্তি থেকে সৃষ্ট জাতীয়তাবোধ তাদের মূল প্রকৃতির কাছে অপরিচিত।

এভাবেই জাতীয়তাবাদকে হিন্দু সম্প্রদায়গত আলোচনায় বিশেষভাবে হিন্দুদের অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ঐসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জাতীয়তাবোধের বৈশিষ্ট্য হল একটি এবং তা হিন্দু চরিত্র ও হিন্দু সংস্কৃতিকে গঠন করে; এর মধ্যে আছে সহিষ্ণুতা, ভদ্রতা ও আধ্যাত্মিকতা।[১১৪] এ গুণ মুসলমানেরা কখনও অর্জন করতে পারবে না। এ ধরনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় মানবিক কর্তৃত্ব ও সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া যথাযথ স্থানে স্থিত থাকে না।[১১৫] জাতীয়তাবাদ হল ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে উৎসর্গীকৃতভাবে নেওয়া সুচিন্তিত রাজনৈতিক একটি কর্মসূচি, কিন্তু এখানে যেভাবে জাতীয়তাবাদকে নির্মাণ করা হয়েছে তাতে পছন্দের সুযোগ রাখা হয়নি।

জাতীয়তাবাদের এই নতুন সংজ্ঞাটিই জাতীয়তাবাদী ও হিন্দু সম্প্রদায়গত আদর্শের পার্থক্যের মধ্যে যুক্তিসঙ্গতভাবে সবচেয়ে জটিল বিষয়। একজন লেখক সম্প্রতি জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে সহজাত পার্থক্যের দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। তাঁর যুক্তি হল – উভয় বিষয় 'একই আলোচনার অংশ'। আরও সংক্ষেপে বললে বলতে হয় যে, 'জাতীয়তাবাদ ধর্মনিরপেক্ষ ধারার মধ্য দিয়ে পরিচালিত সাম্প্রদায়িকতার অতিরিক্ত কিছু নয়।'[১১৬] স্বীকার্য যে, উভয় আদর্শ এই মত পোষণ করে যে ভারতীয় সমাজের মূল রাজনৈতিক ইউনিট হল ধর্মীয় সম্প্রদায়। জাতীয় ও সম্প্রদায়গত পরিচিতি তৈরি করতে বিশেষ করে 'ভারতীয়তা' (এবং মুসলমানিত্ব)-এর বেলায় উভয় আদর্শই সৃষ্টিশীলভাবে একই বিষয়বস্তুর বিভিন্ন উপাদানকে ব্যবহার করেছে। কিন্তু একটা তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য সাম্প্রদায়িক আলোচনা থেকে জাতীয়তাবাদীদের আলাদা করেছে, সেটি হল রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে যে পার্থক্য। হিন্দু জাতীয়তাবাদী ও সম্প্রদায়গত আলোচনার উদ্দেশ্য হল, জাতীয় স্বাধীনতার ধারায় মুসলমানের অংশগ্রহণের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা; এ যুক্তিকেই পরে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই কথা প্রমাণ করতে যে, মুসলমানেরা কখনই সত্যিকার জাতীয় নাগরিক হতে পারবে না।[১১৭] তদুপরি জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা থেকে উপনিবেশ-বিরোধী কাজকে দূরে সরিয়ে রেখে 'জাতীয়তাবাদী' অভিহিত করে যাকে রাজনৈতিক কর্মসূচি বলে গ্রহণ করা হয় – তাতে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতার কোনো ভূমিকাই ছিল না।[১১৮]

সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তাবাদ ও উপনিবেশবাদ: অতীত ব্যাখ্যার পুনর্মূল্যায়ন

পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক বর্ণনার এই জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদের নতুন সংজ্ঞাটিকে পুরাতন সব ব্যাখ্যার স্থলে ব্যবহার করা হয়। 'মুসলমান অত্যাচারের' যুগকে নব জাগরণের বিভিন্ন ইতিহাস থেকে আলাদাভাবে দেখানো হয়। আগেকার বিভিন্ন রচনার সচেতন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমের অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলা। এখন 'মুসলমান অত্যাচারের' ঐতিহাসিক অশরীরী মূর্তিকে জাগিয়ে তোলা হল আধুনিক কালের 'মুসলমান অত্যাচারের' বিরুদ্ধে হিন্দুদের সংগ্রামে উৎসাহিত করার জন্য; অন্য কথায় বলা যায়, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারগুলোর বিরুদ্ধে। সমসাময়িককালে পরিবর্তিত রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা ইতিহাসকে নতুনভাবে পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ করল। এর ফলে নতুন প্রতীক আবিষ্কার করা হল এবং পুরনো প্রতীকের নতুনভাবে অর্থ করা হল। 'জাতীয়তাবাদী' থেকে 'সাম্প্রদায়িক' দৃষ্টিভঙ্গিতে এই যে পরিবর্তন তা পলাশী যুদ্ধের প্রতীকী নির্মাণের চেয়ে আর কোথাও এত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়নি।

সাহিত্যে ঐতিহাসিক বিষয় হিসেবে পলাশীর ঘটনাকে নেয়া হল বাঙলায় এবং ভারতে ব্রিটিশ বিজয়ের অর্থাৎ ঘটনার এক শতাব্দীর বেশি সময়েরও পরে – নবীনচন্দ্র সেনের মহাকাব্য *পলাশীর যুদ্ধে*; যেটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে। সমসাময়িক অনেকের মতো নবীনচন্দ্র ঐ সময়টি, যা জেমস্ মিলের ভাষায় ইতিহাসের 'মুসলমান যুগ', কিভাবে উপস্থাপন করবেন সে-ব্যাপারে বেশ দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন। *পলাশীর যুদ্ধ* কাব্যে মুসলমান বাদশাহদের নিষ্ঠুরতার, মূর্তি ভাঙ্গার, লুট করার, ধর্ষণ করার অনেক ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; এটাকেই মুসলিম শাসনের বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।[১১৯] নীতিভ্রষ্ট লম্পট ব্যক্তি হিসেবে সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রকে চিরস্থায়ী রূপ দিতে সম্ভবত অন্য কোনো রচনা এই কাব্যের মতো সফল হয়নি। ক্লাইভকে মোকাবেলা করার সময়, ঐ বিখ্যাত যুদ্ধ শুরুর ঠিক আগে সিরাজউদ্দৌলা ভীত-সন্ত্রস্ত, মদের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়েছেন এবং ক্লাইভের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতেও ব্যর্থ হয়েছেন।[১২০]

এতদ্‌সত্ত্বেও, কাব্যটি একটি ট্রাজেডি রূপেই রচিত হয়। একটা কুখ্যাত যুদ্ধের, যা সত্যিকার অর্থে যুদ্ধই নয়, অব্যবহিত পূর্বের বিষণ্ণ ও গুমোট রাতের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে কবিতার শুরু হয় এবং পূর্বাভাস দেওয়া হয় একটা আসন্ন বিপর্যয়ের। কবিতার শুরুতে এটা স্পষ্ট হয় যে, 'মুসলিম শাসনের' সমাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ করা কবির লক্ষ্য ছিল না। প্রথমেই রাণী ভবানী ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে বলেন যে, তারা ক্লাইভের পক্ষে সিরাজউদ্দৌলাকে প্রতারিত করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। তিনি এ কথা উল্লেখ করেন যে, মুসলমান ও ব্রিটিশদের মধ্যে পার্থক্য আছে অনেক। মুসলমানেরা (সারা কবিতায় মুসলমানদের ঘৃণাসূচক শব্দ 'যবন' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে) ব্রিটিশদের মতো এক সময় বিদেশী ছিল। রাণী ভবানী যুক্তি দিয়ে বলেন, ভারতে সাত শতাব্দীকাল থাকার পর তারা এ দেশের লোকের মতোই হয়ে গিয়েছে। ঘৃণা ও অবিশ্বাসের জায়গায় এখন তাদের প্রতি ভালবাসা ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়েছে। ষড়যন্ত্রকারীরা ব্রিটিশদের শাসনভার গ্রহণের

আহ্বান জানিয়ে নিজেদেরকে এবং বাঙলা ও ভারতকে এমন দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করবে যা তারা কখনো প্রত্যক্ষ করেনি।[১২১] তাঁর (রাণী ভবানী) অমঙ্গলের ভবিষ্যদ্বাণী যথার্থই প্রমাণিত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে সিরাজকে প্রতারিত করা হয়, তাঁকে বন্দি করা হয় এবং তড়িঘড়ি করে হত্যা করা হয়। লম্পট যুবক নওয়াব আবির্ভূত হয় একজন ট্রাজিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে। পলাশীর আম্রকাননের ষড়যন্ত্র ভারতের দাসত্বের প্রথম পদক্ষেপ, আর ভারতকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন অজানা ও দূরবর্তী দ্বীপের অপরিচিতি এক সম্রাজ্ঞী।[১২২]

পরবর্তীকালে অত্যন্ত সচেতনভাবে জাতীয়তাবাদী লেখকেরা এই বিষয়টিকে গড়ে তোলেন। ১৮৯১ সালে 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় এমন এক প্রয়াসের সূচনা করেন যেখানে সিরাজউদ্দৌলাকে একজন জাতীয় বীর হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়।[১২৩] বস্তুত নওয়াব চরিত্রকে 'মিথ্যা' ও 'নিন্দার্হ' ভাবে চিত্রিত করায় মৈত্রেয় বিষয়টি নিয়ে নবীনচন্দ্র সেনের বিরোধিতা করেন।[১২৪] স্বদেশী আন্দোলনের বিস্তৃতির সময় ১৯০৫ সালে খ্যাতনামা নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক কোলকাতা মিনার্ভা থিয়েটার মঞ্চে মঞ্চায়ন করা হয়। এই নাটকে নওয়াবকে চিত্রিত করা হয় বীর হিসেবে, ষড়যন্ত্রকারীদের বলা হয় স্বদেশদ্রোহী, আর ক্লাইভ ও তার দলের লোকদের নিশ্চিত শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।[১২৫] জওহরলাল নেহেরু ১৯৪৪ সালে তাঁর 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া' লেখেন। এতে তিনি পলাশীকে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করেন এভাবে যে, এই ঘটনার পর থেকে বাঙলাকে অবমূল্যায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ফলে 'এক সময় খুবই সম্পদশালী ও বর্ধিষ্ণু' বাঙলা দারিদ্র্যপীড়িত, ক্ষুধার্ত ও মুমূর্ষুপ্রায় ক্লিষ্ট জনঅধ্যুষিত এলাকায় পরিণত হয়েছে।[১২৬]

১৯৩০ এবং ১৯৪০ দশকে বাঙলায় জাতীয়তাবাদী বক্তব্যের সমর্থনে চর্চা অব্যাহত থাকে। ১৯৩৭ সালে অস্ট্রিয়ায় থাকা অবস্থায় লিখিত আত্মজীবনীমূলক *এ্যান ইন্ডিয়ান পিলগ্রিম*-এ সুভাষ বসু ভারতীয় ইতিহাসের 'মুসলমান যুগ'-এর ধারণাটিকে চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি পলাশীর যুদ্ধকে একটি গণশত্রুর বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের সহযোগিতার একটা দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করেন:

> ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনাকালে মুসলিম যুগের কথা বলাকে মারাত্মক ভ্রান্তি বলে অভিহিত করি, ইতিহাস আমার কথার সাক্ষ্য দেবে। যখন দিল্লীর মোগল সম্রাটদের কথা বলি বা বাঙলার মুসলমান রাজাদের কথা বলি, আমরা দেখতে পাই যে উভয় ক্ষেত্রেই হিন্দু ও মুসলমান এক সাথে প্রশাসন পরিচালনা করেছে – অনেকে বিখ্যাত পারিষদ মন্ত্রী ও জেনারেল হিন্দু ছিল। তদুপরি ভারতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় অনেক হিন্দু প্রধান সেনাপতির সহযোগিতায়। নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি, যার বিরুদ্ধে ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশরা পলাশীতে যুদ্ধ এবং পরাজিত করে – তিনিও হিন্দু ছিলেন।[১২৭]

ইতিহাসের এই ব্যাখ্যা বসুকে ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে হলওয়েল মনুমেন্ট সরিয়ে ফেলার দাবি তুলতে উৎসাহিত করে। বিখ্যাত 'ব্লাক হোল' (Black Hole) ঘটনায়

নবাবের তথাকথিত নিষ্ঠুরতায় নিহত ব্রিটিশদের স্মরণে ঐ মনুমেন্ট তৈরি করা হয়েছিল। বসুর জন্য হলওয়েল মনুমেন্ট ছিল এমন একটা ইস্যু যা থেকে তিনি আশা করেছিলেন যে, ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে তাঁকে সমর্থন করবে এবং বাঙালি রাজনীতির একটি নতুন অসাম্প্রদায়িক ভিত্তি তৈরিতে তার বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রয়াস এতে বেগবান হবে।[১২৮] 'নবাবের স্মৃতির ওপর অনাকাঙ্ক্ষিত কলঙ্ক' এবং 'আমাদের দাসত্ব ও অপমানের প্রতীক'-এর বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান জাতীয়তাবাদী মতকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে তাঁর সাফল্য ছিল একটা বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। সিরাজউদ্দৌলার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং 'বিদেশী ঐতিহাসিকদের মিথ্যা উক্তি'র প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতে টাউন হলে আয়োজিত মিটিং-এ সুভাষের অনুসারী শুধু বামপন্থী মুসলমান ও হিন্দুরাই যোগদান করেনি, ঐ মিটিং-এ মুসলিম লীগ ছাত্র সংসদের সদস্যরাও যোগদান করে। বসুর ঘোর বিরোধী *অমৃত বাজার পত্রিকা*ও এই উদ্যোগকে সমর্থন করে।[১২৯] উদ্বিগ্ন গভর্নর সুপারিশ করেন যে, এই 'আন্দোলনকে বন্ধ করতে হবে' এবং 'বিরোধের তাৎক্ষণিক কারণের সর্বশেষ কারণটিকে অপসারণ করতে হবে' যাতে হিন্দু ও মুসলমান বিপ্লবীরা 'ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে একত্রিত হতে না পারে'। হলওয়েল সত্যাগ্রহের দিন সকালে বসুকে গ্রেফতার করা হয় এবং নাজিমুদ্দিন ও হক সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত জেলে রাখা হয়।[১৩০]

কিন্তু এ ধরনের রাজনৈতিক উদ্যোগ ক্রমশ বিরল হয়ে পড়ে। তদুপরি যে আদর্শ ঐসব রাজনৈতিক কাজকে উৎসাহিত করে, তা-ও ক্রমবর্ধমানভাবে বিতর্কিত হয়ে পড়ে। ১৯৩২ সালে বি. সি. চট্টোপাধ্যায় তাঁর *বিট্রেয়াল অব ব্রিটেন এ্যান্ড বেঙ্গল* গ্রন্থে পলাশীকে বর্ণনা করেন এমন একটা মুহূর্ত হিসেবে, যখন থেকে বাঙলা মুসলমান অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ করে – ঐ সময় থেকে 'পল্লবিত বাঙালি হিন্দু মেধা ও সংস্কৃতি থেকে' এক নতুন যুগের উন্মেষ ঘটে।[১৩১] মুসলমান নিয়ন্ত্রিত এক যুগের কোয়ালিশন প্রাদেশিক সরকার মুসলিম অত্যাচারের ধারণায় নতুন অর্থ যোগ করে; চল্লিশ দশকের মধ্যভাগে তাঁর ব্যাখ্যা আনুষ্ঠানিক ইতিহাসের বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। স্যার যদুনাথ সরকার তাঁর মূল্যবান *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল* গ্রন্থের 'সমাপ্তি মন্তব্যে' বৈশিষ্ট্যগত অতিরঞ্জিকতায় এই বাগাড়ম্বর প্রশ্ন রাখেন: 'জুন মাসের ঐ নিয়তি নির্ধারিত সন্ধ্যায় পলাশীর রক্তরঞ্জিত ভূমির পেছনে গঙ্গায় সূর্য যখন অস্তমিত হচ্ছিল, তা কি কোনো বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যে যবনিকা পতনের মতো প্রতীকী হয়ে উঠেছিল? পলাশীর কবি যেভাবে কল্পনা করেছেন সেরকমই কি ঐ দিবাবসানে 'একটি অনন্ত আঁধার' নেমে এসেছিল?'

মাত্রাতিরিক্ত আলঙ্কারিক একটি স্তবকে তিনি নিজেই এর উত্তর দেন, যা ভদ্রলোক সম্প্রদায়গত আলোচনার বৈশিষ্ট্য বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

> অতিক্রান্ত দুই শতাব্দীর দিকে তাকিয়ে বর্তমান কালের ইতিহাসবিদ জানে যে, ধীরে ও অলক্ষ্যে একটা গৌরবময় প্রত্যুষের শুরু হয়েছে, যা বিশ্বের ইতিহাস অন্য কোথাও প্রত্যক্ষ করেনি। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন ভারতের মধ্য যুগের শেষ, আর তার

> আধুনিক যুগের শুরু। ক্লাইভ যখন নবাবকে আক্রমণ করেন তখন মোগল সভ্যতা একটা নষ্ট হওয়া বুলেটের মতো, তার প্রাণশক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে। দেশের প্রশাসন হতাশাজনকভাবে অসৎ ও অযোগ্য। একটা ক্ষুদ্র, স্বার্থপর, গর্বিত ও অনুপযুক্ত শাসক শ্রেণীর অধীন সাধারণ জনগণ চরম দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও নৈতিক অধঃপতনে পতিত হয়। দুর্বল লম্পটেরা সিংহাসন অধিকার করে ছিল ... পুরুষদের চেয়ে মহিলারা ছিল আরও খারাপ। সিরাজ ও মিরনের মতো ধর্ষকামীরা সম্ভ্রান্ত প্রজাদেরও নিত্য ভীতির মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য করে। সৈন্যবাহিনী নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং মধুচক্রের মতো তারা বিশ্বাসঘাতকতার সাথে জড়িত ছিল। দরবার ও অভিজাত লোকদের লাম্পট্য ও ভোগবিলাস পারিবারিক জীবনের পবিত্রতাকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। এসব লোকের পৃষ্ঠপোষকতায় যৌন কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য গড়ে ওঠে। ধর্ম হয়ে ওঠে পাপ ও মূর্খতার দাসী। হতাশাজনক ক্ষয়িষ্ণু সমাজের এই অবস্থায় ইউরোপের যৌক্তিক ও প্রগতিশীল চেতনা অপ্রতিহত শক্তি দিয়ে আঘাত হানে। এক প্রজন্মেরও কম সময়ের মধ্যে, পলাশী থেকে ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ের কুড়ি বছরের মধ্যে ... মধ্য যুগীয় পুরোহিত শাসনের ধ্বংস থেকে দেশটি পুনরায় উদ্ধার লাভ করে। শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, মানুষের তৈরি হস্তশিল্প ও রাজনৈতিক জীবন – সব কিছুই পাশ্চাত্যের যাদু স্পর্শে নতুন শক্তি সঞ্চয় করে। প্রাচ্য সমাজে গেড়ে বসা নির্জীব হাড়গোড়গুলো নড়াচড়া করতে শুরু করে – প্রথমে দুর্বলভাবে – স্বর্গ থেকে প্রেরিত জাদুকরের জাদুদণ্ডের প্রভাবে।[১৩২]

এখানে সম্ভবত সরকারের অত্যুক্তির ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, তিনি এখানে ভারত সম্পর্কে বিভিন্ন ইউরোপীয় মতামতকে নির্বিচারে অনুসরণ করে 'মুসলিম যুগ'কে প্রতিকারহীন অত্যাচারের 'অন্ধকার যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। মিল-এর কাছ থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন 'মুসলিম যুগ'-এর ধারণা, মিশনারিদের কাছ থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন দরবারের ভোগ-লালসার কারণে নৈতিক অবক্ষয় ও পারিবারিক জীবনের 'মর্যাদাহানি' এবং মন্টেস্কুর কাছ থেকে তিনি নিয়েছেন রাষ্ট্র পরিচালিত প্রাচ্য দেশীয় স্বেচ্ছাচার সম্পর্কিত মতবাদ। সিরাজউদ্দৌলার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কবি নবীনচন্দ্র সেন চিত্রিত করেন তা তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী যথেষ্ট 'রূঢ়' ছিল না।[১৩৩] তাঁর মতে, একজন ধর্ষকামীর চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না সিরাজ – সে ছিল একজন দানব, উচ্চ শ্রেণীর প্রজাদের মনেও সে ভীতির সঞ্চার করত। নিজের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি দৃষ্টান্ত হিসেবে অতীতের ইউরোপীয় সূত্রগুলোর ওপর নির্ভর করেন; তিনি জিন ল (Jean Law)-এর মূল্যায়ন উদ্ধৃত করেন: 'সিরাজউদ্দৌলার মতো অসৎ চরিত্রের কুখ্যাতি আর কারও আছে বলে জানা যায় না ... এই চরিত্রটিকে এভাবে আখ্যা দেয়া যায় ... সব ধরনের লাম্পট্য তো আছেই, সেই সঙ্গে যুক্ত ছিল অদৃশ্য নিষ্ঠুরতা।'[১৩৪] নবাবের বিরুদ্ধে ক্লাইভের ষড়যন্ত্রে সহযোগিতা করাকে (এ কাজে উচ্চ শ্রেণীর অসন্তুষ্ট হিন্দুরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে) তাই সন্দেহাতীতভাবে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

এতটা বিদ্বেষের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনাকে পরিত্যাগ করার কথা প্রায় ভাবা যায় না। 'মুসলিম যুগ' সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বানানো যুগ বিভাগ বলে

সুভাষ বসুর প্রত্যাখ্যানকে অগ্রাহ্য করা হয়। ১৮৯১ সালে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় কর্তৃক নওয়াবের জীবনী প্রকাশ ও ১৯৪০ সালের হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলনের মাধ্যমে সিরাজ চরিত্রকে জাতীয় বীরের মর্যাদায় অভিষিক্ত করার মধ্য দিয়ে অন্যায্য ও রূঢ়ভাবে সিরাজউদ্দৌলার চরিত্র চিত্রণের ৫০ বছরের পুরনো ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ করা হল। ব্রিটিশ শাসন তাৎক্ষণিকভাবে বাঙলার সমৃদ্ধি নিয়ে আসে – এই তত্ত্বটি সম্ভবত জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে মারাত্মক ভাঙন ধরায়। নেহেরুর মতে, ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসের মধ্যকার সময়ে রাজস্ব আদায়ের বছরগুলো ছিল 'নির্ভেজাল চুরি' ও 'জবরদস্তি লুণ্ঠনে'র কাল। এর ফলে ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ হয়, এতে 'বাঙলা ও বিহারের এক-তৃতীয়াংশের অধিক লোক মারা যায়'।[১৩৫] কিন্তু বিশ বছর সময়কে যদুনাথ সরকার দেখেন মধ্যযুগীয় পুরোহিত শাসনের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে দেশের মুক্তি হিসেবে। তাঁর বক্তব্যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও অর্থনৈতিক শোষণের সংশ্লিষ্টতাকে অস্বীকার করা হয়েছে – অথচ ঐ বিষয়টিই ছিল জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার একটা প্রধান স্তম্ভ।[১৩৬] তিনি সেটা না করেই উপনিবেশবাদকে সাংস্কৃতিক উপযোগ হিসেবে উপস্থাপন করেন আধুনিকতার 'যাদুদণ্ড' হিসেবে, যা সাত শতাব্দীর মধ্যযুগীয় শাসনে সৃষ্ট সাংস্কৃতিক জড়তা থেকে বাঙলাকে জাগিয়ে তোলে।[১৩৭]

'সংস্কৃতি' এখন থেকে অভিনব পন্থায় বর্ণিত হতে থাকে। এটাকে এখন ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করা হয়, এটাই এখন থেকে ঐতিহাসিক কালকে এভাবে আখ্যায়িত করতে শুরু করে – 'মুসলিম যুগ' হল অন্ধকার যুগ, বর্বর যুগ; অপর দিকে ব্রিটিশ শাসন হল একটি নতুন ও আলোকিত সাংস্কৃতিক বিধিব্যবস্থার অগ্রদূত:

> এটা সত্যি এক নব জাগরণ – ব্যাপকতর ও গভীরতর, এমনকি কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের পর ইউরোপে যে নব জাগরণ সূচিত হয়েছিল তার চেয়েও অধিক যুগান্তকারী ... ব্রিটিশ সভ্যতার প্রভাবে [বাঙলা] সারা ভারতের পথ প্রদর্শক ও আলোকবর্তিকায় পরিণত হয়। পেরিক্লিনের এথেন্স হেলাসের আদর্শ হয়, 'গ্রিসের নয়ন, বিদ্যা ও বাগ্মিতার জননী', তেমনি বাঙলা ব্রিটিশ শাসনাধীন সারা ভারতের কাছে; তবে এ দীপ্তি অন্যের কাছ থেকে নেওয়া এবং একটা বিস্ময়কর কৌশলে তা আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। নতুন বাঙলায় সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি উত্তম ও মহৎ জিনিস এবং তা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বাঙলা থেকে ইংরেজি শিক্ষিত শিক্ষক ও ইউরোপীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ লোক গিয়ে বিহার, উড়িষ্যা, হিন্দুস্তান ও দাক্ষিণাত্যকে আধুনিক করে তুলতে সাহায্য করে। নতুন ধরনের সাহিত্য, ভাষার সংস্কার, সামাজিক পুনর্গঠন, রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা, ধর্মীয় আন্দোলন, এমনকি আচরণগত পরিবর্তনের যে সূচনা বাঙলায় হয় তা যেন ঘূর্ণিবায়ুতে তরঙ্গায়িত হয়ে প্রাদেশিক বাধাকে অতিক্রম করে ভারতের দূরবর্তী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।[১৩৮]

এখানে নব জাগরণকে অত্যন্ত বিশদভাবে নেয়া হয়েছে যাতে রাজনৈতিকভাবে দু'শ বছরের অধিক সময়ে ভদ্রলোকদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাসকে তার ভেতর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী উভয় বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যকে একত্রে ধারণ করা হয়। রামমোহন রায় ও ব্রাহ্ম সমাজের

'সার্বজনীনবাদ',[১৩৯] মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও ডেরোজিয়ানদের ইংরেজ ভাবধারার প্রতি আসক্তি, বিদ্যাসাগরের সংস্কার চেতনা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদার মানবিকতাবাদ, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বিবেকানন্দের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ, রমেশচন্দ্র দত্তের হিন্দু ইতিহাস এবং অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়-এর জাতীয়তাবাদী ইতিহাস, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক, শরৎচন্দ্রের প্রথম দিককার জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী উপন্যাস এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিপ্লব-বিরোধী উপন্যাস – এই সবকিছু এবং অন্যান্য আরও অনেক বিষয় একটা ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হিসেবে একমাত্র মহান ঐতিহ্যরূপে পরিগণিত হয়। জাতীয় সংস্কৃতি ও পরিচিতির প্রশ্নে তুমুল এবং প্রায় ক্ষেত্রে যে তিক্ত তর্ক-বিতর্ক নব জাগরণকে ইন্ধন যুগিয়েছিল, ৪০-এর দশকে এসে সেগুলি নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে অতি উদ্যোগী 'পুনরুজ্জীবনবাদী' লেখকেরা ব্রাহ্মবাদী ও ডেরোজিয়ানদের অসম্মান ও বিদ্রূপ করে, এবং ভদ্রলোক সমাজে তাদেরকে একঘরে করে দেয়, কিন্তু এখন আবার সেই ব্রাহ্মবাদী ও ডেরোজিয়ানদেরই উদ্ধার করে বাঙালি হিন্দু 'সংস্কৃতি'র প্রতিষ্ঠাতা জনক হিসেবে পুনর্বহাল করা হয়। এই নতুন ব্যাখ্যায় 'নব জাগরণে'র জন্মদাতা হল রামমোহন রায় এবং তারই একক ও অব্যাহত ধারাবাহিকতায় প্রবাহিত উত্তরাধিকার হন ডেরোজিও, মধুসূদন দত্ত, বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শান্তিনিকেতনের 'ঋষি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত।[১৪০] এই ব্যাখ্যায় জাতীয়তাবাদের ইতিহাস 'সংস্কৃতি'র ইতিহাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। 'রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা' বলে যদুনাথ সরকার সে-সম্পর্কে যে বর্ণনা দেন সেটা হল নতুন সংস্কৃতির 'মহান প্রত্যুষে'র একটা দিক মাত্র; জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যকার বিরোধকে গুরুত্বহীনভাবে বর্ণনা করা হল। যেসব বিতর্ক উচ্চ শ্রেণীর রাজনীতিকে বিভক্ত করে দিয়েছিল – রাজভক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে জাতীয়তাবাদীদের, চরমপন্থীদের কাছ থেকে উদারবাদীদের, অহিংসবাদীদের থেকে সন্ত্রাসীদের, ডানপন্থীদের থেকে বামপন্থীদের – এসব বিষয়কে উপেক্ষা করা হল। ভদ্রলোক 'রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা'র বাইরে সংগঠিত বা অসংগঠিত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ তথা গণপ্রতিবাদ, যেমন কৃষক বিদ্রোহ, নাগরিক আন্দোলন, ধর্মঘট, দাঙ্গা ও বিক্ষোভের কথা এই ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা হল।

নব জাগরণের কথা এভাবে লিখতে গিয়ে যদুনাথ সরকার শুধু ব্রিটিশ শাসনেরই প্রশংসা করেননি, বা জটিল ইতিহাসকে সহজ করেননি – আধুনিক বাঙলার ইতিহাসে মুসলমানদের অবস্থানকেও তিনি অস্বীকার করেন। তাঁর গ্রন্থের উপসংহারে বলেন যে, মুসলমানদের 'যুগ' (১২০০ থেকে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)-এ তারা বাঙলাকে রক্তাক্ত এবং নিরবচ্ছিন্ন বর্বরতা ও অত্যাচার ছাড়া আর কিছুই দেয়নি। সংস্কৃতি ও আলোকিত আধুনিক যুগে তাদের কোনো স্থান নেই। আধুনিক বাঙলা হল হিন্দু ভদ্রলোকের সৃষ্টি। ব্রিটিশদের কাছ থেকে 'আহৃত' 'দীপ্তি'র সাহায্যে তারা বাঙলাকে পুনরায় ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে। অধিকার বলেই বাঙলা তাই তাদেরই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নব জাগরণই হল শুধু ভদ্রলোকের সংস্কৃতির প্রতীক নয়, সেই সঙ্গে একটি হিন্দু বাঙলার,

যেখানে মুসলমানের ঠাঁই নেই। এই চিন্তাধারায় মুসলমানদের বাঙালি জাতীয়তা অস্বীকার করা হয়। 'মুসলিম শাসন' ছিল অবৈধ, ঐ শাসন তাদের বঞ্চিত করে জন্মগত অধিকার কেড়ে নিয়েছে এবং তাদের 'নিজ প্রদেশেই ভূমিদাস'-এ পরিণত করেছে।[১৪১]

'হিন্দুত্ব'র বৈশিষ্ট্য হিসেবে নব জাগরণ এবং সাধারণভাবে 'সংস্কৃতি'কে গ্রহণ করা হয়। এটি একই সঙ্গে হিন্দুরা যে শ্রেষ্ঠ সেই সাম্প্রদায়িক যুক্তিকে জোরালো অথচ প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। বাঙালি সমাজে ভদ্রলোক বা 'হিন্দু' কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখা এবং একই সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য মুসলমানদের অধিকারকে অস্বীকার করতে ত্রিশ দশকের শেষ দিকে এবং চল্লিশ দশকে দাবি ক্রমেই বাড়তে থাকে। ১৯২৬ সালেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর *বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা* প্রবন্ধে হিন্দু 'সাংস্কৃতিক' শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরেন। একই সাথে তিনি 'সংখ্যাগরিষ্ঠের মতেই শাসন কার্য পরিচালিত হবার' ধারণাকেও বারবার চ্যালেঞ্জ করেন যে, এ কথা বলে তিনি তাঁর প্রবন্ধ শুরু করেন যে, 'কোন একটা কথা বহু লোক মিলিয়া বহু আন্দোলন করিয়া বলিতে থাকিলেই কেবল বলার জোরেই তাহা সত্য হইয়া উঠে না। অথচ সম্মিলিত প্রবল কণ্ঠস্বরের একটা শক্তি আছে এবং মোহও কম নাই।'[১৪২] ১৯৩২ সালে যখন এটা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় যে, মুসলমানেরা নতুন আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে, তখন 'দি বেঙ্গল হিন্দু মেনিফেস্টো' নামক একটা বহুল প্রচারিত পুস্তিকায় স্পষ্টভাবে বলা হয়:

> বাঙালি মুসলমানদের দাবি (আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার) জাতীয়তা-বিরোধী ও স্বার্থপর এবং সমতা বা ন্যায়বিচারের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় ... তাদের দাবি মেনে নেওয়া হলে তা হিন্দুদের স্থায়ীভাবে অধীন ও অক্ষম করে দেবে। আমরা বলতে চাই বাঙলার মুসলমানেরা কোনো বিশেষ গুরুত্ব দাবি করতে পারবে না, কারণ ... তারা কখনও সৈনিক হিসেবে কাজ করেনি বা সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষার জন্য কোনো কিছু করেনি। অপর দিকে শিক্ষাগত যোগ্যতায় ও রাজনৈতিক কর্মক্ষমতায় হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব, বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের অগ্রগতিতে তাদের অবদান এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের প্রতিটি শাখায় তাদের অতীত সেবার রেকর্ড এতই সুবিদিত যে পুনরায় উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতে হিন্দু বাঙালির সাফল্য সবার চেয়ে বেশি; অথচ বাঙলার মুসলমানেরা এসব ক্ষেত্রে সর্ব-ভারতীয় পর্যায়ে সুনামের অধিকারী একটি ব্যক্তিকেও সৃষ্টি করতে পারেনি। রাজনৈতিক যোগ্যতাকে কোনো জাতির বৃহত্তর বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, আর রাজনৈতিক যোগ্যতার ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানেরা হিন্দুদের চেয়ে অনেক নিম্নস্তরের ... সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব অর্জনে সক্ষম না হওয়ার আশংকা সত্যিকারভাবে তাদের রাজনৈতিক অযোগ্যতা স্বীকার করে নেওয়ার শামিল, আর বর্তমান রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতার কারণে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের ওপর রাজনৈতিকভাবে কর্তৃত্ব করার দাবি করাটা অযৌক্তিক ও হাস্যকর।[১৪৩]

এই যুক্তি উত্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল সেই ব্রিটিশদের কাছে আবেদন জানানো, যারা বহুদিন থেকে এই যুক্তি ব্যবহার করে ভারতে তাদের অবস্থানের যৌক্তিকতা তুলে ধরে

আসছিল যে, তারা বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে শ্রেষ্ঠ এবং ভারতীয়রা নিজের দেশ শাসনের 'অযোগ্য'।[১৪৪] এই যুক্তির মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে আনুগত্য প্রকাশ করা হয়েছে, যেমন জোরেসোরে তোলা এই দাবি 'বাঙলার মুসলমানেরা সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষার জন্য কোনো কিছুই করেনি', এবং স্মরণ করিয়ে দেয়া যে, হিন্দুরা অতীতে যে উত্তম সেবা দান করেছে তার কথা, যা 'এমন সুবিদিত যে পুনরায় উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই', এই বক্তব্যের অনুকূলে বর্তমানে অনুগ্রহ দাবি করা হয়েছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্য থেকে মারাত্মক বিচ্যুতিটি হল, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছার ওপর ভিত্তিশীল গণতান্ত্রিক শাসনের নীতিকে সরাসরি অস্বীকার করা – অস্বীকৃতির ভিত্তি ছিল যে, সংখ্যাগরিষ্ঠরা সাংস্কৃতিক দিক থেকে নিচু স্তরের। এই দৃষ্টিভঙ্গি ভদ্রলোক পরিমণ্ডলে খুবই গ্রহণযোগ্য হয় এবং তা শুধু 'জাতীয়তাবাদী' হিন্দু সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তেই বারবার উল্লেখ করা হয়নি, গবেষণামূলক জার্নাল ও সাহিত্য পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়। *মডার্ন রিভিউ* পত্রিকায় প্রকাশিত 'পাবলিক স্পিরিট ইন বেঙ্গল'-এর উপর একটা তথাকথিত গবেষণামূলক প্রবন্ধে হাস্যকর সমাপ্তি টানা হয় এই বলে:

> বাঙলার মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দম্ভোক্তি হাস্যকর কেননা ... জনহিতকর কাজে তাদের সাফল্য খুবই সামান্য। যে-সম্প্রদায় দেশের সরকারি ক্ষমতায় বেশি অংশ দাবি করে আমরা তাদের কাছে দেশের কল্যাণে আরও বেশি ও উত্তম কাজ আশা করতে পারি ... কিন্তু তার পরিবর্তে তারা হিন্দু জমিদার ও অর্থলগ্নীকারীদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক আন্দোলন পরিচালনার কাজে এবং নিরাপত্তাহীন হিন্দু মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধে দোষী মুসলমানদের রক্ষায় শক্তি ক্ষয় করছে ... জনগণের সত্যিকার প্রয়োজনীয় কাজে মুসলমানেরা আত্মনিয়োগ করুক, যেন ... তারা নিজেরাই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসেবে যথার্থ মর্যাদা লাভ করতে পারে।[১৪৫]

অন্য একটা প্রবন্ধে একইভাবে মুসলিম সম্প্রদায়কে দোষী সাব্যস্ত করা হয় যে, তারা সাক্ষরতার যোগ্যতা অর্জন না করা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃত [মিথ্যাভাবে] সাক্ষরতার দাবী করেছে।[১৪৬] অপর এক প্রবন্ধে জনকল্যাণমূলক উদ্যোগে হিন্দুদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করা হয়।[১৪৭] চতুর্থ এক প্রবন্ধে রাজস্ব খাতে হিন্দুদের বেশি অবদানের কথা বলা হয়।[১৪৮] প্রতিটি ক্ষেত্রেই যুক্তির ধারা একই রকম: মুসলমানেরা স্পষ্টতই হিন্দুদের চেয়ে নিকৃষ্ট এবং শ্রেষ্ঠদের 'শাসন' করা তাদের কাজ নয়।

ভদ্রলোক সম্প্রদায়গত আলোচনা কখনই উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টা থেকে মুক্ত হতে পারেনি, শুরুটাও হয়েছিল সেভাবে। এর প্রধান প্রতীক ছিল – 'সংস্কৃতি', 'বিদ্যা', 'নব জাগরণ'। হিন্দু ভদ্রলোকদের অভিজ্ঞতা ও আত্মকল্পনায় সূচিত সামাজিক জগৎ থেকে এই সব প্রতীক সৃষ্টি হয়। 'শ্রেষ্ঠত্বে'র ধারণাটি আসে এই আত্মকল্পনা থেকে, ভদ্রলোক সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এর আবেদন ছিল খুবই শক্তিশালী। কিন্তু অন্যান্য কম সুবিধাভোগীদের মধ্য থেকে ভাবী সমর্থকদের ব্যাপকভাবে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠত্বের এই ধারণা সহজে গ্রহণযোগ্য ছিল না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হয়ত যুক্তি দেখাতে

পারেন যে, উচ্চ-নীচ সব হিন্দুই সংস্কৃতিবান জনগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ অনুভূতির অংশীদার। কিন্তু অনেক ভদ্রলোক হিন্দু এ কথা বিশ্বাস করত কি না সন্দেহ আছে। তেমনি সন্দেহ আছে যে, তারা নিকৃষ্ট মুসলমান সম্প্রদায়ের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'হিন্দু' ছোটলোক, চাষাভুষা, কুলি-মজুর, নীচ শ্রেণীর লোক ও উপজাতিদের সাংস্কৃতিক দিক থেকে নিজেদের সমকক্ষ ও সহযোদ্ধা ভাই হিসেবে মেনে নিয়েছিল। বস্তুত মুসলমানদের ব্যাপারে অনেক ভদ্রলোক হিন্দুর (শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীসহ) নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে, বাঙলার মুসলমানেরা কম-বেশি হিন্দু সমাজের নীচু শ্রেণীর লোকদের থেকে ধর্মান্তরিত।[১৪৯] যেমন, *মডার্ন রিভিউ* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে এই বিশ্বাসকে সমর্থন করে পাণ্ডিত্যপূর্ণ নৃতাত্ত্বিক 'সাক্ষ্য' উপস্থাপন করা হয়। ভারতে ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায়ের গবেষণার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত একটি নৃতাত্ত্বিক ধারণাকে উদ্ধৃতি দিয়ে ঐ প্রবন্ধে 'কোচ ও উত্তর বাঙলার মুসলমানদের স্পষ্ট দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যের' এবং অন্য দিকে পূর্ব বাঙলার মুসলমানদের সাথে 'পোদ ও চণ্ডালদের সামাঞ্জস্যপূর্ণ আকৃতি'র কথা বলা হয়।[১৫০] এখানে বাঙালি মুসলমানদের প্রতি অকপট ঘৃণা অনুরূপ 'হিন্দু' ছোটজাতগুলির প্রতিও বিস্তৃত হয়েছে, কারণ সেই 'হিন্দু' থেকেই মুসলমানেরা ধর্মান্তরিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। ভদ্রলোকদের হিন্দু সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবি এবং কল্পিত 'সম্প্রদায়ে'র সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নীচু জাতের হিন্দু ও উপজাতীয়দের প্রতি ঘৃণা – তাদের সহজাত এই অসঙ্গতি খোলাখুলি প্রকাশ পায় যখন তারা তাদেরকে নিজেদের অনুসারী হওয়ার জন্য সংগঠিত করতে চেষ্টা করে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাদেরকে ব্যবহার করে।

টীকা

১. ভারতে সম্প্রদায়গত পরিচিতির গবেষণা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে মিশেল ফুকো (Michael Foucault)-এর 'ডিসকার্সিভ ফরমেশন্স' (discursive formations)-এর ইতিহাস এবং এডওয়ার্ড সায়িদ (Edward Said)-এর 'আদারনেস' (otherness) এবং 'দি সেলফ' (the self) সম্পর্কে ঔপনিবেশক ব্যাখ্যার সমালোচনা থেকে। মিশেল ফুকো *দি আরকিওলজি অব নলেজ* (এ. এম. শেরিডান অনূদিত), নিউ ইয়র্ক, ১৯৭২; এডওয়ার্ড সায়িদ, *ওরিয়েন্টালিজম*, লন্ডন, ১৯৮৭। প্রভাব বিস্তার করেছে এমন অন্যান্য পুস্তক হল – এরিক হব্‌সবম (Eric Hobsbawm) এবং টেরেন্স রেঞ্জার (সম্পাদিত), *দি ইনভেনশন অব ট্রাডিশন*, কেমব্রিজ, ১৯৮৩; বেনেডিক্ট এ্যান্ডারসন, *ইমাজিন্ড কমিউনিটিজ, রিফ্লেকশনস্ অন দি অরিজিন এ্যান্ড স্প্রেড অব ন্যাশনালিজম*, লন্ডন, ১৯৮৩; ভিক্টর টার্নার, *ড্রামাস, ফিল্ডস এ্যান্ড মেটাফোরস্: সিম্বলিক এ্যাকশন ইন হিউমান সোসাইটি*, ইথাকা (Ithaca), ১৯৭৪; ক্লিফোর্ড গীর্তজ, *দি ইন্টারপ্রেটেশন অব কালচারস্*, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৩। ভারতে সম্প্রদায়গত পরিচিতি সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিনিধিত্বমূলক গবেষণার মধ্যে আছে – জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে, *দি কনস্ট্রাকশন অব কমিউনালিজম ইন কলোনিয়াল নর্থ ইন্ডিয়া*, দিল্লী, ১৯৯০; 'র‍্যালিয়িং রাউন্ড দি কাউ। সেকটেরিয়ান স্ট্রাইফ ইন দি ভোজপুরী রিজিওন; সি ১৮৮৮-১৯১৭', রনজিত গুহ (সম্পাদিত), *সাবলটার্ন স্টাডিজ* ২, দিল্লী, ১৯৮৬; 'ইন ডিফেন্স অব দি ফ্রাগমেন্ট: রাইটিং এবাউট হিন্দু-মুসলিম রায়টস ইন ইন্ডিয়া টুডে', *ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, খণ্ড ২৬, ১১-১২, এ্যানুয়াল নাম্বার, ১৯৯২; সান্দ্রিয়া

ফ্রাইটাগ (Sandria Freitag), 'রিলিজিয়াস রাইটস এ্যান্ড রায়টস্: ফ্রম কমিউনিটি আইডেন্টিটি টু কমিউনালিজম ইন নর্থ ইন্ডিয়া', ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে, পিএইচ ডিসারটেশন, ১৯৮০; 'সেকরেড সিম্বল এ্যাজ মবিলাইজিং আইডিওলজি, দি নর্থ ইন্ডিয়ান সার্চ ফর এ 'হিন্দু' কমিউনিটি', *কমপ্যারেটিভ স্টাডিজ ইন সোসাইটি এ্যান্ড হিস্ট্রি,* খণ্ড ২২, ১৯৮১; আনন্দ ইয়াঙ্গ, 'সেকরেড সিম্বল এ্যান্ড সেকরেড স্পেস ইন রুরাল ইন্ডিয়া; ডেভিড গিলমার্টিন, *এম্পায়ার এ্যান্ড ইসলাম, পাঞ্জাব এ্যান্ড দি মেকিং অব পাকিস্তান,* অক্সফোর্ড, ১৯৮৮।

২. দেখুন ডেভিড পেজ (David Page), *প্রিলিউড টু পার্টিশন – দি ইন্ডিয়ান মুসলিমস্ এ্যান্ড দি ইম্পিরিয়াল সিস্টেম অব কন্ট্রোল;* এফ. সি. আর. রবিনসন, *সেপারিটিজিম এ্যামাঙ্গ ইন্ডিয়ান মুসলিমস। দি পলিটিকস অব দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস্ ১৮৬০-১৯২৩;* ফারজানা শেখ, *কমিউনিটি এ্যান্ড কনসেনসাস ইন ইসলাম: মুসলিম রিপ্রেজেনটেশন ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া,* ১৮১০-১৯৪৭, কেম্ব্রিজ, ১৯৮৯; শীলা সেন, *মুসলিম পলিটিকস্ ইন বেঙ্গল, ১৯৩৭-১৯৪৭,* নিউ দিল্লী, ১৯৭৬; রফিউদ্দিন আহমদ, *বেঙ্গল মুসলিমস্ ১৮৭১–১৯০৬, এ কোয়েস্ট ফর আইডেন্টিটি,* নিউ দিল্লী, ১৯৮১।

৩. যেমন ব্রুমফিল্ড বলেন যে, মধ্য-বিশের দশকে 'হিন্দু মুসলমান জাতীয়তাবাদী ঐক্যে'র পতনের কারণ 'বাঙলায় প্রভাবশালী মুসলমান নেতৃত্ব ... তারা তাদের সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল'। জে. এইচ. ব্রুমফিল্ড, *এলিট কনফ্লিক্ট ইন প্লুরাল সোসাইটি,* পৃ. ৩১৭। গুরুত্ব আরোপিত।

৪. পার্থ চ্যাটার্জী, 'এ্যাগ্রেরিয়ান রিলেশনস্ এ্যান্ড কমিউনালিজম ইন বেঙ্গল, ১৯২৬-৩৫', পৃ. ৩৮। একই সুরে সুরঞ্জন দাস যুক্তি দেখান যে, 'মুসলমান জনগণের একটি সহজে চেনার মতো সম্প্রদায়গত ও ধর্মীয় পরচিতি ছিল' এবং 'এই সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাকে সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক মুনাফা অর্জনে রূপান্তরিত করতে মুসলমান রাজনীতিকেরা উলেমাদের কাছ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা লাভ করেন'। সুরঞ্জন দাশ, *কমিউনাল রায়টস ইন বেঙ্গল, ১৯০৫-১৯৪৭,* পৃ. ৫১। এই বিষয়ের ওপর তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত পুস্তকে দাশ আগের ঐ গবেষণা কর্মে 'একটা বিশেষ দৃষ্টি বিভ্রাট ঘটেছিল' বলে স্বীকার করে বলেছেন যে, 'ঐ পুস্তকে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হলেও হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক বিষয় নিয়ে খুব কম আলোচনা করা হয়েছে'। তবে তিনি এর কারণ বলে উল্লেখ করেছেন যে, হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার যথেষ্ট মাল-মশলা তাঁর কাছে ছিল না। সুরঞ্জন দাশ, *কমিউনাল রায়টস্ ইন বেঙ্গল, ১৯০৫-১৯৪৭,* দিল্লী, ১৯৯১, পৃ. ১৪-১৫।

৫. রজত ও রত্না রায়, 'জমিদারস্ এ্যান্ড জোতদারস্', পৃ. ১০১।

৬. সুগত বসু, 'দি কিশোরগঞ্জ রায়টস্', পৃ. ৪৯১। এই ধরনের মতবাদ, বিশেষ করে সুরঞ্জন দাশের মতবাদ রফিউদ্দিন আহমদের কাজের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। রফিউদ্দিন যুক্তি দেখান যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাঙলার মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রদায়গত পরিচিতির গভীর অনুভূতির উন্মেষ ঘটে। রফিউদ্দিন আহমদ, *বেঙ্গল মুসলিমস্।* তাঁরা অসীম রায়ের মতকে উপেক্ষা করেন, কারণ তাঁর কাছে বিষয়টি ছিল ঠিক বিপরীত। রায় মনে করেন যে, বাঙালি ইসলামের যে সমঝোতার ঐতিহ্য আছে এই সময়ে তাতে বেশ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়, এবং ঐ সময়ে তিনি তাদের মধ্যে একটা 'বাঙালি' পরিচিতির বিকল্প ধারা লক্ষ করেন। দেখুন অসীম রায়, 'দি সোসাল ফ্যাক্টরস্ ইন দি মেকিং অব বেঙ্গলি ইসলাম।' *সাউথ এশিয়া,* খণ্ড ৩, ১৯৭৩, পৃ. ২৩-৩৫; 'বেঙ্গলি মুসলিম এ্যান্ড দি প্রোব্লেম অব আইডেন্টিটি', *জার্নাল অব দি এশিয়াটিক*

সোসাইটি অব বাঙলাদেশ, খণ্ড ২২-৩, ডিসেম্বর ১৯৭৭, পৃ. ১৯২-৭ এবং 'বেঙ্গলি মুসলিম কালচারাল মেডিয়েটরস্ এ্যান্ড বেঙ্গলি মুসলিম আইডেন্টিটি ইন দি নাইনটিনথ্ এ্যান্ড আর্লি টুয়েন্টিথ্ সেঞ্চুরিজ', *সাউথ এশিয়া,* খণ্ড ১০, ১, জুন ১৯৮৭।

৭. দৃষ্টান্ত হিসেবে শীলা সেনের যুক্তির কথা বলা যায়। তিনি বলেন, হিন্দুরা 'যে কোনো রকম দেশ বিভাগের বিরোধিতা করে'। *মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল,* পৃ. ২২৭। আরও দেখুন সুরঞ্জন দাশের ১৯২৭ সালের পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ এবং পুনাবালিয়া দাঙ্গা সম্পর্কে বিশ্লেষণ। ঐ বিশ্লেষণে তিনি যুক্তি দেখান যে, পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ হিন্দু সম্প্রদায়গত বিবেচনা থেকে 'শুরু' করা হয়নি, এগুলি তার অনভিপ্রেত ফল হতে পারে। 'কমিউনাল রায়টস্ ইন বেঙ্গল', পৃ. ১৮১-১৮২।

৮. মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের উৎপত্তি নিয়ে পল ব্রাসের সাথে বিতর্কে ফ্রান্সিস রবিনসন এই মত পোষণ করেন। তাঁর প্রবন্ধ দেখুন, 'নেশান ফরমেশন: দি ব্রাস থিসিস এ্যান্ড মুসলিম সেপারিটিজম', *জার্নাল অব কমপ্যারেটিভ এ্যান্ড কমনওয়েলথ পলিটিক্স,* খণ্ড, ১৫.৩, নভেম্বর ১৯৭৭, পৃ. ২১৫-২৩৪ এবং 'ইসলাম এ্যান্ড মুসলিম সেপারিটিজম', ডেভিড টেইলর ও ম্যালকম ইয়াপ (সম্পাদিত) *পলিটিক্যাল আইডেন্টিটি ইন সাউথ এশিয়া,* লন্ডন, ১৯৭৯। অতি সম্প্রতি 'সম্প্রদায়ের ধারণা'কে (সাম্প্রদায়িক নয়) ইসলামের ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরেছেন ফারজানা শাইখ, *কমিউনিটি এ্যান্ড কনসেন্সাস ইন ইসলাম*। তাঁর এ যুক্তি আলোচনার বিশৃঙ্খল অবস্থাকে আরও ঘোলাটে করে দিয়েছে।

৯. প্রতীকী নৃতত্ত্ব বিষয়ে ইতিহাসমূলক রচনায় 'পবিত্র প্রতীক'-এর ধারণার প্রভাব পড়েছে। ক্লিফোর্ড গীর্তজ (Clifford Geertz)-এর কাজ এখানে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করেছে। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা হল এটা হচ্ছে প্রতীকসমূহের সাংস্কৃতিক পদ্ধতির মতো। এ বিষয়ে ভিক্টর টার্নার এবং তাঁর 'সিম্বলিক এ্যাকশন' এবং 'কমিউনিটাস' সম্পর্কিত ধারণারও বেশ প্রভাব সৃষ্টি করেছে। *ক্লিফোর্ড* গীর্তজ, *দি ইনটারপ্রিটেশন অব কালচারস্;* ভিক্টর টার্নার, *ড্রামাস, ফিল্ডস এ্যান্ড মেটাফোর্স*। প্রতীকী ধারার সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন ডান স্পারবার (Dan Sparber), *রিথিংকিং সিম্বলিজম,* কেম্ব্রিজ, ১৯৭৫; পিয়েরে বরদিউ (Pierre Bourdieu), 'দি প্রোডাকশন অব বিলিফ: কন্ট্রিবিউশন টু এ্যান ইকনমি অব সিম্বলিক গুডস', রিচার্ড কলিনস্ (সম্পাদিত), *মিডিয়া, কালচার এ্যান্ড সোসাইটি,* লন্ডন, ১৯৮৬। গীর্তজ-এর সিম্বলিক মতবাদের কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন তালাল আসাদ, 'এ্যানথ্রোপলজিক্যাল কনসেপশনস্ অব রিলিজিওন: রিফ্লেকশনস্ অন গীর্তজ', *ম্যান* (এনএস), খণ্ড ১৮, ১৯৮৩; পিটার ব্যান ডের ভিয়ার (Peter Van der Veer), 'গড মাস্ট বি লিবারেটেড!' এ হিন্দু লিবারেশন মুভমেন্ট ইন অযোধ্যা', *মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ,* খণ্ড ২১.১, ১৯৮৭, পৃ. ২৮৩-২৮৪; আরও বিস্তারিতভাবে জানা যায় তাঁর, *গডস্ অন আর্থ, দি ম্যানেজমেন্ট অব রিলিজিয়াস এক্সপিরিয়েন্স এ্যান্ড আইডেন্টিটি ইন এ নর্থ ইন্ডিয়ান পিলগ্রিমেজ সেন্টার,* দিল্লী, ১৯৮৯, পৃ. ৪৪-৫২ পুস্তকে। ইতিহাসের ওপর প্রতীক, চিহ্ন-প্রতীক ও তাদের অর্থ ও ব্যবহার নিয়ে আলোচনা এবং সাহিত্য ও দর্শনের বৈপরীত্য নিয়ে আলোচনার ধারার প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন রাফায়েল স্যামুয়েল, 'রিডিং দি সাইনস্', *হিস্ট্রি ওয়ার্কশপ জার্নাল,* ৩২, অটাম, ১৯৯১।

১০. পি. কে. দত্ত উল্লেখ করেন যে, 'মসজিদের সামনে গান-বাজনা আসলে সকল পক্ষের বোঝাপড়ায় সংঘটিত নিয়ম-পদ্ধতিতে হয়, এবং এর মাধ্যমে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের কাছে তাদের পারস্পরিক বিরোধিতা নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করত। পি. কে. দত্ত, 'ওয়ার

ওভার মিউজিক: দি রায়টস্ অব ১৯২৬ ইন বেঙ্গল', *সোসাল সায়েন্টিস্ট*, খণ্ড ১৮, ৬-৭ জুন-জুলাই, ১৯৯০, পৃ. ৪১-৪২।

১১. আনন্দ ইয়াঙ্গ তার ১৮৯৩ সালের বসন্তপুর দাঙ্গার ওপর আলোচনায় মন্তব্য করেন যে, 'ঐ বছরের বোম্বাই ও রেঙ্গুনের মতো বড়-ছোট শহরে এবং উত্তর ভারতের শহর ও গ্রামে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। বসন্তপুরের বিরোধের সাথে ধর্মীয় বিষয় জড়িত ছিল, বিশেষ করে জড়িত ছিল গরুর প্রতীকী তাৎপর্য।' ইয়াঙ্গ, 'সেকরেড সিম্বল এ্যান্ড সেকরেড স্পেস', পৃ. ৫৭৮। ফ্রাইটাগ (Freitag) মনে করেন যে, 'গো-রক্ষার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে ... সম্প্রদায়ের হিন্দু সংজ্ঞার ধারার ক্ষেত্রে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত।' ফ্রাইটাগ (Freitag), 'সেকরেড সিম্বল এ্যাজ মবিলাইজিং আইডিওলজি', পৃ. ৬২৪। গো-রক্ষার দাঙ্গা নিয়ে আলোচনার সময় পান্ডে 'প্রতীক' নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন ভিন্নভাবে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত ভিন্ন রকম। দেখুন জ্ঞান পাণ্ডে, 'র‍্যালিইং রাউন্ড দি কাউ'। আরও দেখুন, পিটার রব (Peter Robb), 'দি চ্যালেঞ্জ অব গো মাতা, ব্রিটিশ পলিসি এ্যান্ড রিলিজিয়াস চেঞ্জেস ইন ইন্ডিয়া, ১৮৮০-১৯০৬', *মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ*, খণ্ড ২০, ২, ১৯৮৬।

১২. নীতা কুমারের আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে বারানসীতে শ্রেণী, পেশা, সম্প্রদায়ের পরিচিতির ক্ষেত্রে উৎসব ও মিছিলের ভূমিকা। নীতা কুমার, *আর্টিজানস্ অব বানারস, পপুলার কালচার এ্যান্ড আইডেন্টিটি, ১৮৮০-১৯৮৬*, প্রিন্সটন, ১৯৮৮, পৃ. ২০১-২২৭। ফ্রাইটাগ উৎসবকে 'সম্প্রদায়ের পরিচিতির রূপক' হিসেবেই দেখতে পান, 'রিলিজিয়াস রাইটস্ এ্যান্ড রায়টস্', পৃ. ৮৯।

১৩. ইয়াঙ্গ, 'সেকরেড সিম্বল এ্যান্ড সেকরেড স্পেস', পৃ. ৫৮০; কুমার, 'আর্টিজানস্ অব বানারস', পৃ. ২২২।

১৪. স্যান্ড্রিয়া ফ্রাইটাগ, রিলিজিয়াস রাইটস্ এ্যান্ড রায়টস', পৃ. ৩৬।

১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬।

১৬. ঔপনিবেশিক আলোচনায় দাঙ্গার স্থান সম্পর্কে জ্ঞানেন্দ্র পান্ডের আলোচনা দেখুন। জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, *কনস্ট্রাকশন অব কমিউনালিজমস্*, পৃ. ১৭-৬৫।

১৭. প্রচলিত হিন্দু ধর্মকে 'আবেগসঞ্জাত ধর্মাচার' বলে জনগণের সাধারণ ধারণা এবং লোক-ধর্মকে 'অপরিবর্তনীয় জড়োপাসনা' হিসেবে দেখার ভারততাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ইন্ডেনের আলোচনা দেখুন। রোনাল্ড ইন্ডেন, *ইমাজিনিং ইন্ডিয়া*, কেম্ব্রিজ, মাস, ১৯৯০, পৃ. ৮৬।

১৮. জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, *কলোনিয়াল কনস্ট্রাকশনস্ অব কমিউনালিজম*, পৃ. ৩৭; পিটার ভ্যান ডের ভিয়ার, গড মাস্ট বি লিবারেটেড!, পৃ. ২৮৪। আরও দেখুন, টেরেন্স রেঞ্জার (Terence Renger), 'পাওয়ার রিলিজিয়ন এ্যান্ড কমিউনিটি: দি মাটাবো কেস', চ্যাটার্জী ও পাণ্ডে (সম্পাদিত), *সাবলটার্ন স্টাডিজ*, ৭, পৃ. ২২১-২২৭। ঔপনিবেশিক সাহিত্যে জাতিগত কৌলিন্যের ধারণা দাঙ্গা-কেন্দ্রিক আলোচনায় প্রতিফলিত হয়নি। ঐ আলোচনায় হয় সাংস্কৃতিক সম্বন্ধবাদকে ভিত্তি হিসেবে নেওয়া হয়েছে, আর না হয় স্বদেশজাত অথবা 'প্রচলিত'কে 'পশ্চিমী' অথবা 'বুদ্ধিবৃত্তি'র ওপর স্থান দেয়া হয়েছে। কিন্তু এসব আলোচনায় ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী বর্ণনার 'প্রয়োজনীয়তাবাদ'কে যেমন তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে, তেমনি ইতিহাসকে ও তাদের বর্ণিত জনগণের প্রতিনিধিত্বকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করা

হয়েছে। এসব বিষয়ে আরও আলোচনার জন্য দেখুন, এডওয়ার্ড সায়িদ, *ওরিয়েন্টালিজম,* রোনাল্ড ইনডেন, *ইমাজিনিং ইন্ডিয়া।*

১৯. মসজিদের সামনে গান-বাজনা বিষয়টি প্রায় অনাদিকাল থেকে ঘটে এলেও বাঙলায় এ বিষয়টি প্রথম দৃষ্টিতে আনা হয় ১৯২০ সালের মধ্যভাগে। পি. কে. দত্ত, 'ওয়ার ওভার মিউজিক', পৃ. ৪০। দত্তের গবেষণায় দেখা যায়, মসজিদের সামনে গান-বাজনার বিষয়টির 'তাৎক্ষণিক কোন অতীত নেই' বলে মনে হয়; আর সামগ্রিকভাবে উপমহাদেশে ১৮৯৩ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত এ নিয়ে বিরোধের ঘটনার কোনো লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। সুরঞ্জন দাশও ১৯২৬ সালকে ঐ ধরনের ঘটনার উন্মেষকাল বলে মনে করেন। ঐ সময়ের পূর্বে এ রকম ঘটনা 'হিন্দু বা মুসলমানদের জন্য মোটেও কোনো চিন্তার কারণ ছিল না' বলে তিনি মনে করেন। তিনি এই প্রতীকের আকস্মিক উদ্ভবকে 'মুসলমানদের অনমনীয়তার' অভিব্যক্তি বলে যুক্তি দেখান। *কমিউনাল রায়টস্ ইন বেঙ্গল,* পৃ. ২৮।

২০. সম্প্রদায়ের পরিচিতির ক্ষেত্রে 'সীমা'র গুরুত্ব তুলে ধরেন এ্যান্থনি পি কোহেন, তাঁর *দি সিম্বলিক কনস্ট্রাকশন অব কমিউনিটি*, লণ্ডন, ১৯৮৫, পুস্তকে। সমসাময়িক ভারতের সম্প্রদায়গত আলোচনার বিশেষ প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যাবে সুধীর কাকার-এর 'হিন্দুত্ব হ্যার‍্যাংগ'-এ, *সানডে টাইমস্ অব ইন্ডিয়া,* ১৯শে জুলাই ১৯৯২; জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে, 'হিন্দুজ এ্যান্ড আদারস্: দি মিলিট্যান্ট হিন্দু কনস্ট্রাকশন', *ইকনমিক ও পলিটিক্যাল উইকলি,* খণ্ড ২৬, ৫২, ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৩০০৮; প্রদীপ কে. দত্ত, 'ভি এইচ পি'জ রাম এ্যাট অযোধ্যা, রি-ইনকারনেশন গ্রু আইডিওলজি এ্যান্ড অর্গানাইজেশন, *ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি,* খণ্ড ২৬, ৪৪, ২রা নভেম্বর ১৯৯১, পৃ. ২৫১৭; তনিকা সরকার, 'ওম্যান এ্যাজ এ কমিউনাল সাবজেক্ট; রাষ্ট্রসেবিকা সমিতি এ্যান্ড রাম জন্মভূমি মুভমেন্ট', *ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি,* খণ্ড ২৬, ৩৫, ৩১শে আগস্ট ১৯৯১; নীলাদ্রী ভট্টাচার্য, 'মিথ, হিস্ট্রি এ্যান্ড দি পলিটিক্স অব রাম জন্মভূমি', সর্বপল্লী গোপাল (সম্পাদিত), *দি এনাটমি অব এ কনফ্রন্টেশন, দি বাবরী মসজিদ – রাম জন্মভূমি ইস্যু,* নিউ দিল্লী, ১৯৯১।

২১. বিভিন্ন স্তরে আদর্শের ব্যাখ্যার জন্য দেখুন জন বি. থম্পসন, *স্টাডিজ ইন দি থিয়োরি অব আইডিওলজি, কেম্ব্রিজ,* ১৯৮৭; পল রিকোয়ার (Paul Ricoeur), *দি রুল অব মেটাফোর: মাল্টি ডিসিপ্লিনারি স্টাডিজ অব দি ক্রিয়েশন অব মিনিং ইন ল্যাংগুয়েজ* [রবার্ট জেরনী (Robert Czerony) অনূদিত], লন্ডন, ১৯৭৮; পল রিকোয়ার, *হারমেনেইউটিকস্ এ্যান্ড দি হিউম্যান সাইন্সেস, এসেজ অন ল্যাংগুয়েজ, এ্যাকশন এ্যান্ড ইন্টারপ্রেটেশন* (জন বি থম্পসন অনূদিত), কেম্ব্রিজ, ১৯৮৮; জন বি. থম্পসন, *ক্রিটিক্যাল হারমেনেইউটিক্স– এ স্টাডি ইন দি থট অব পল রিকোয়ার এ্যান্ড জারগেন হ্যাবেরমাস,* কেম্ব্রিজ, ১৯৮৩।

২২. সম্ভবত এ জন্য সুরঞ্জন দাশ 'এমন তথ্যের জন্য অনুসন্ধানের দুষ্প্রাপ্যতা না থাকা' সত্ত্বেও বাঙলায় হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার ওপর খুব কম তথ্য পেয়েছেন। *কমিউনাল রায়টস্ ইন বেঙ্গল,* পৃ. ১৫।

২৩. উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভদ্রলোকেরা ক্রমাগতভাবে নিজেদেরকে 'শিক্ষিত সম্প্রদায়' হিসেবে আখ্যায়িত করতে থাকেন। দেখুন, এস. এন. মুখার্জী, *ভদ্রলোক ইন বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ এ্যান্ড লিটারেচার,* পৃ. ২৩৩।

২৪. দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখুন, নীরদ চৌধুরীর তাঁর বাল্যকালের পারিপার্শ্বিক সাংস্কৃতিক অবস্থার বর্ণনা এবং 'ভারতীয় নবজাগরণের আলোকবর্তিকা সম্প্রদায়' সম্পর্কে আলোচনা। *অটোবায়োগ্রাফি অব এ্যান আননোন ইন্ডিয়ান,* পৃ. ১৭৯-২১৭।

২৫. ব্রুমফিল্ড, *এলিট কনফ্লিক্ট ইন এ প্লুরাল সোসাইটি*, পৃ. ১৩; রবীন্দ্র রায়, *দি নক্সলাইটস্ এ্যান্ড দেয়ার আইডিওলজি*, নিউ দিল্লী, ১৯৮৮, পৃ. ৬২-৬৪।

২৬. দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, এ কারণে রবীন্দ্র রায় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যের 'সামাজিক বিষয়গুলো' আলোচনা করেন। কারণ 'রবীন্দ্রনাথের শিল্প সম্পর্কে কোনো কিছু বলা বিপজ্জনক কাজ'। *প্রাগুক্ত* পৃ. ৬৩। তনিকা সরকারও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গে 'এগুলি মূল্যবান আত্মরক্ষামূলক বক্তব্য' উল্লেখ করে আলোচনা শুরু করেন। 'বেঙ্গলি মিডল-ক্লাস ন্যাশনালিজম এ্যান্ড লিটারেচার: এ স্টাডি অব শরৎচন্দ্র'জ 'পথের দাবী' এ্যান্ড রবীন্দ্রনাথ'স 'চার অধ্যায়', ডি এন পানিগ্রাহী (সম্পাদিত), *ইকনমি, সোসাইটি এ্যান্ড পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়া*, নিউ দিল্লী, ১৯৮৫, পৃ. ৪৪৯।

২৭. রায়চৌধুরী উল্লেখ করেন যে, এটা ছিল সেই যুক্তিগ্রাহ্য আলোকিত ঐতিহ্য যা পাশ্চাত্য সভ্যতার বিপরীতে পশ্চিমা শিক্ষিত বাঙালিদের প্রথম প্রজন্মের লোকদেরকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে। তপন রায়চৌধুরী, *ইউরোপ রিকনসিডার্ড*, পৃ. ৪।

২৮. দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, সুমিত সরকার রামমোহন রায়ের সংস্কারমূলক দর্শনের গভীর বিরোধিতামূলক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন – রামমোহনের ঐ দর্শনে ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, অপর দিকে ডেরোজিয়ানরাও অনেক 'ঐতিহ্যগত' ধারণাকে গ্রহণ করেন। সুমিত সরকার, *এ ক্রিটিক অব কলোনিয়াল ইন্ডিয়া*। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ওপর আলোচনায় অশোক সেন বলেন যে, মহান এই 'উদার' শিক্ষাবিদ তাঁর সংস্কারবাদী কর্মসূচির জন্য ধর্মীয় নির্দেশের অনুমোদন খুঁজতেন। অশোক সেন, *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এ্যান্ড হিজ ইলিউসিভ মাইলস্টোনস্*, কোলকাতা, ১৯৭৭। ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন ১৮৭২ সালের বিতর্কিত বিবাহ আইনের প্রণেতা – ঐ আইনে মেয়েদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ছিল ১৪ বছর। কিন্তু তিনি তাঁর অপরিণত বয়স্ক কন্যাকে কুচবিহারের মহারাজার সাথে বিয়ে দেন। মেরেডিথ বোর্থউইক (Meredith Borthwick), *দি কুচবিহার ম্যারেজ: ব্রিটিশ ইন্টারেস্টস্ এ্যান্ড ব্রাহ্ম ইনটিগ্রিটি*, *বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট*, খণ্ড ৯৫, অংশ ২, ১৮১, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৬। অন্য দিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা ছিল হিন্দুবাদকে 'পবিত্রতম আকারে' পুনরায় আবিষ্কার করা এবং তা ছিল পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদিতার ট্রাডিশনের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই কাজে তিনি জবানের বিভিন্ন শাখা যথা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, পৌরাণিক বিষয়ে গবেষণা, খ্রিষ্টীয় উচ্চমার্গীয় সমালোচনা, এবং বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তপন রায়চৌধুরী, *ইউরোপ রিকনসিডার্ড*, পৃ. ১৪৮। আরও দেখুন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *দি ফ্রুটস্ অব মেকলে'জ পয়জন ট্রি*, অশোক মিত্র (সম্পাদিত), *দি ট্রুথ ইউনাইটস: এসেজ ইন ট্রিবিউট টু সমর সেন*, কোলকাতা, ১৯৮৫; এবং তাঁর *ন্যাশনালিস্ট থট এ্যান্ড দি কলোনিয়াল ওয়ার্ল্ড*, পৃ. ৫৪-৮৪।

২৯. রবীন্দ্র রচনায় 'মিসট্রেস বরোদা' ও 'হারান বাবু'র পাশাপাশি গোরার শিষ্য অবিনাশ চরিত্রে প্রচলিত ব্রাহ্মবাদ ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের অমার্জিত রূপটি চিত্রিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ টেগোর, *গোরা*, লন্ডন, ১৯২৪।

৩০. দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখুন, যোগীন্দ্রচন্দ্র বসুর *মডেল ভগিনী*, কোলকাতা, ১৮৮৬-৮৭। এ পুস্তকে ব্রাহ্ম মূল্যবোধকে, বিশেষ করে সমাজে নারীদের ভূমিকা নিয়ে ব্রাহ্মদের দৃষ্টিভঙ্গিকে উপহাস করা হয়েছে।

৩১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *'সেকাল আর একাল', বঙ্গদর্শন, পৌষ*, ১২৮১ বাঙলা সাল (১৮৭৪)। উদ্ধৃত, রাসেল আর ভ্যান মিটার (Rachel R Van Meter), 'বঙ্কিমচন্দ্র'স ভিউ অব দি রোল অব বেঙ্গল ইন ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন'– ডেভিড কফ (David Copf) সম্পাদিত, *বেঙ্গল রিজিওনাল আইডেন্টিটি, ইস্ট ল্যানসিং, মিচিগান*, ১৯৬৯। 'বাবু' চরিত্রের আর একটা চমৎকার প্রকাশ হল প্যারীচাঁদ মিত্রের *আলালের ঘরের দুলাল*, কোলকাতা, ১৯৩৭।

৩২. সুমিত সরকার, 'দি কল্কি অবতার অব বিক্রমপুর', পৃ. ৩৭।

৩৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯-৪২। উনবিংশ শতাব্দীর কোলকাতায় 'নিম্নশ্রেণী'র লোকও 'আধুনিক মহিলাদের' উপহাস করত – কালিঘাট পটচিত্রের খুব জনপ্রিয় বিষয় ছিল আধুনিক স্ত্রী তার বাবু স্বামীকে পিটাচ্ছে। দেখুন সুমন্ত ব্যানার্জী, *দি পারলার এ্যান্ড দি স্ট্রিটস্*, পৃ. ৮৯।

৩৪. এ সময়ে ত্রিশটির বেশি জনপ্রিয় প্রহসনের শিরোনাম ছিল কলি; এর থেকে অনেক বেশি রচনায় 'কলিযুগ' সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। সুমিত সরকার, 'দি কল্কি অবতার', পৃ. ৩৭।

৩৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬।

৩৬. তপন রায়চৌধুরী, *ইউরোপ রিকনসিডার্ড*, পৃ. ১৫২।

৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গোরা*, পৃ. ৪২।

৩৮. *প্রাগুক্ত*।

৩৯. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, *এ নেশান ইন দি মেকিং, বিইং দি রেমিনিসেন্সেস অব কোলকাতা*, ১৯৬৩, পৃ. ৬৬৭।

৪০. পার্থ চ্যাটার্জী, *ন্যাশনালিস্ট থট ইন দি কলোনিয়াল ওয়ার্ল্ড*, পৃ. ৫১।

৪১. এ প্রক্রিয়ার ঐতিহাসিক বিবরণের জন্যে দেখুন, সুবিরা জয়সোয়াল, 'সেমিটাইজং হিন্দুইজম: চেঞ্জিং প্যারাডিমস্ অব ব্রাহ্মনিক্যাল ইন্টিগ্রেশন', *সোসাল সায়েন্টিস্ট*, খণ্ড ১৯, ১২, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ২০-৩২।

৪২. পার্থ চ্যাটার্জী, *ন্যাশনালিস্ট থট ইন দি কলোনিয়াল ওয়ার্ল্ড*, পৃ. ৭৪, ৭৭।

৪৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭।

৪৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯।

৪৫. মীনাক্ষী মুখার্জী, *রিয়ালিজম এ্যান্ড রিয়ালিটি*, দি নভেল এ্যান্ড সোসাইটি ইন ইন্ডিয়া, নিউ দিল্লী, ১৯৮৫, *১৮৭৩-৭৪*, পৃ. ৮৬। *বঙ্গদর্শন* (১৮৭৩-৭৪) থেকে উদ্ধৃতি।

৪৬. এভাবে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের *অঙ্গুরীয় বিনিময়*-গ্রন্থে শিবাজীকে আদর্শ হিন্দু বীর হিসেবে দেখানো হয়েছে। তাঁর 'স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাস'-এ 'তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধে মারাঠাদের বাস্তবতা বিরোধী বিজয়কে মেনে নেয়া হয়েছে। তপন রায়চৌধুরী, *ইউরোপ রিকনসিডার্ড*, পৃ. ৩৯। *রাজসিংহ* (১৮৯২)-তে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজপুত বীর মেবারকে রক্ষায় আওরঙ্গজেবের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আরও দেখুন, এ ধরনের অন্যান্য রচনা যেমন, রমেশ সি. দত্তের উপন্যাস *মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত* (১৮৭৮), *রাজপুত জীবনসন্ধ্যা* (১৮৭৯) এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একাধিক নাটক; এসব নাটকে রাজপুত ও মারাঠা রাজাদের শৌর্যের প্রশংসা করা হয়েছে।

৪৭. এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন সুদীপ্ত কবিরাজের মিমিওগ্রাফ, 'ইমাজিনারি হিস্ট্রি', অকেশনাল পেপারস্ ইন হিস্ট্রি এ্যান্ড সোসাইটি দ্বিতীয় সিরিজ, নং ৭, নেহেরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম এ্যান্ড লাইব্রেরি, ১৯৮৮, পৃ. ১৬-১৭। আরও দেখুন পার্থ চ্যাটার্জী,

'এ রিলিজিওন অব আরবান ডমেস্টিসিটি: শ্রী রামকৃষ্ণ এ্যান্ড দি ক্যালকাটা মিডল ক্লাস,' পার্থ চ্যাটার্জী এবং জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে (সম্পাদিত), *সাবলটার্ন স্টাডিজ*, ৮, দিল্লী ১৯৯২।

৪৮. রমেশচন্দ্র দত্ত, *দি লেক অব পামস্: এ স্টোরি অব ইন্ডিয়ান ডমিস্টিক লাইফ*, লন্ডন, ১৯০৪, পৃ. ৫৭। উদ্ধৃত, সুধীরচন্দ্র, 'দি কালচারাল কম্পোনেন্ট অব ইকনোমিক ন্যাশনালিজম: আর. সি. দত্ত'স *দি লেক অব পামস্*', *ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল রিভিউ*, খণ্ড ১২, ১-২ জুলাই ১৯৮৫ – জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ১১৩।

৪৯. নবীনচন্দ্র সেন, *পলাশীর যুদ্ধ*, (১৮৭৬), কোলকাতা, ১৯৮৪। বিশেষভাবে দেখুন পৃ. ৫৩, ৫৫-৫৯। মুসলিম শাসনের স্বেচ্ছাচার সম্পর্কে দেখুন পৃ. ১৪ এবং মন্দির ভাঙ্গা সম্পর্কে দেখুন পৃ. ৬৩।

৫০. আরবদের 'শক্তিশালী যৌনকার্যকলাপ' হল প্রাচ্যবিদদের মুসলমানদের চরিত্র চিত্রণের কেন্দ্রীয় বিষয়। এ ধরনের গৎবাঁধা ধারণার মূল উৎস হল নবী মুহাম্মদ সম্পর্কে খ্রিষ্টানদের বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি। এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন এডওয়ার্ড সায়িদ, *ওরিয়েন্টালিজম*, পৃ. ৬২, ৩১১।

৫১. দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, রমেশচন্দ্র দত্তের ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তারকারী ইতিহাস যেমন, *মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত* ও *রাজপুত জীবনসন্ধ্যা*-য় উদারভাবে তথ্য নেওয়া হয়েছে টড-এর *এ্যানালস্ এ্যান্ড এ্যান্টিকুইটিজ অব রাজস্থান* (১৮২১) এবং জেমস্ কানিংহাম গ্রান্ট ডাফ (James Cunningham Grant Duff)-এর *হিস্ট্রি অব দি মারাঠা'স* (১৮২৬) পুস্তক থেকে। উপমহাদেশের অতীত কালপঞ্জীকে 'হিন্দু যুগ' ও 'মুসলিম যুগ' হিসেবে ভাগ করা জেমস্ মিল-এর অবদান। দেখুন তাঁর পুস্তক *হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া*, ৬ খণ্ড, লন্ডন, ১৮৫৮। এটাকে নবজাগরণের লেখকেরা যখন গ্রহণ করলেন তখন মিল-এর 'অনগ্রসর' ও 'অযৌক্তিক' 'হিন্দু যুগ'কেই ভারতের গৌরবময় অতীত হিসেবে দেখানো হয়। রোমিলা থাপার, হার্বান্স মুখিয়া এবং বিপানচন্দ্র, *কমিউনালিজম এ্যান্ড দি রাইটিং অব ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি*, নিউ দিল্লী, ১৯৮৭, পৃ. ৪।

৫২. দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখুন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের *রানা প্রতাপ সিংহ*-এ (১৯০৫) রানা প্রতাপের চরিত্র; আরও দেখুন বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস *রাজসিংহ* (১৮৯৩)-এ রাজসিংহের চরিত্র চিত্রণ। প্রফুল্লকুমার পত্র (সম্পাদিত), *বঙ্কিম রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, কোলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৫০৩-৫৯৭।

৫৩. বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন যে, স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্ক্ষার এই অনুপস্থিতি হল ভারতের অধীনতার কারণ। পার্থ চ্যাটার্জী, *ন্যাশনালিস্ট থট এ্যান্ড দি কলোনিয়াল ওয়ার্ল্ড*, পৃ. ৫৪-৮৪।

৫৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।

৫৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'ধর্মতত্ত্ব', (১৮৯৪), সংকলন গ্রন্থ: *সোসিওলজিক্যাল এসেজ – ইউটিলিটারিয়ানিজম এ্যান্ড পজিটিভিজম ইন বেঙ্গল* (অনুবাদ ও সম্পাদনা – এস. এন. মুখার্জী এবং মারিয়ান ম্যাডার্ন), কোলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ১৮৮।

৫৬. উপন্যাস, জাতীয়তাবাদ ও কল্পিত সম্প্রদায়ের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনার জন্য দেখুন, বেনেডিক্ট এ্যান্ডারসন, *ইমাজিনড্ কমিউনিটিজ*, পৃ. ৩০-৩৭। আরও দেখুন, ক্লেয়ার উইলস্, 'ল্যাংগুয়েজ পলিটিকস্, ন্যারেটিভ, পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স', *দি অক্সফোর্ড লিটারারি রিভিউ*, খণ্ড ১৩, ১৯৯১, পৃ. ৩৪-৩৬।

৫৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *রজনী* (১৮৮০), *বঙ্কিম রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৮-৪১৯।

৫৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাবু', *লোকরহস্য* (১৮৭৪), *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১। উদ্ধৃত পার্থ চ্যাটার্জী, 'এ রিলিজিওন অব আরবান ডমিসটিসিটি', পৃ. ৬২-৬৩। ঔপনিবেশিক এবং প্রাচ্য চিন্তাধারা থেকে 'মুসলিম' কথাটির মতো 'বাবু' কথাটির উৎপত্তি। দৃষ্টান্ত হিসেবে মেকলে লেখেন যে, 'বাঙালির দৈহিক কাঠামো, মহিলাদের শরীরের থেকে দুর্বল। তারা সব সময় গরম পানিতে গোসল করে। তারা বসে থাকতে বেশি পছন্দ করে, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল, সে নির্জীবের মতো চলাফেরা করে। কয়েক যুগ ধরে তারা তাদের থেকে আরও সাহসী ও কর্মঠ গোত্রের লোকদের কাছে পদদলিত হয়েছে। সাহস, স্বাধীনতা, সত্যবাদিতা – এসব গুণ তার গঠন ও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খায় না। টি. বি. মেকলে, 'ওয়ারেন হেস্টিংস', '*ক্রিটিক্যাল এ্যান্ড হিস্টরিক্যাল এসেজ*', ৩ খণ্ড, লন্ডন, ১৮৪৩, ৩, পৃ. ৩৪৫। উদ্ধৃত, জন রোজিলি, 'দি সেলফ ইমেজ অব এফেক্টনেস: ফিজিক্যাল এডুকেশন এ্যান্ড ন্যাশনালিজম ইন নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি বেঙ্গল', *পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট*, ৮৬, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০, পৃ. ১২২। অথচ কাজ করতে উপদেশ দেবার ভিত্তি হিসেবে ভদ্রলোক বাঙালিরা হীনভাবে উপস্থাপিত এই চরিত্রটিকেই নিজেদের করে নেয়।

৫৯. এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য দেখুন, রোজেলি, দি সেল্‌ফ ইমেজ অব ইফেক্টনেস।

৬০. দেখুন সুমিত সরকার, *দি স্বদেশী মুভমেন্ট*, পৃ. ৩৫০-৩৫৩।

৬১. *বন্দে মাতরম*, ৬ই মার্চ ১৯০৮।

৬২. রচিত সাহিত্যের সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে পরে যা আলোচনা করা হয়েছে তা প্রায় ক্ষেত্রেই নিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান নয়। এসব রচনা পাঠ থেকে প্রাপ্ত উপলব্ধি কারো কারো কাছে এগুলিকে চাপিয়ে দেয়া মনে হতে পারে। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পাঠ করার পর যে অন্তর্নিহিত কাঠামো দৃশ্যমান হয় তাতে অভ্যন্তরীণ একটা জটিলতার অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। শুধু তাই নয়, এর মধ্য দিয়ে এমন একটা ধারণাগত কাঠামোর চিন্তা স্পষ্ট হয় যা তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রকাশ করে। সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি পল রিকোয়ার (Paul Ricoer) যুক্তি প্রমাণ সহকারে উপস্থাপন করেছেন; পল রিকোয়ার, *হারমেনিউটিকস্ এ্যান্ড দি হিউম্যান সায়েন্সেস*; পিয়েরে বোরডিউ (Pierri Bourdieu), *দি ফিল্ড অব কালচারাল প্রোডাকশন, এসেজ অন আর্ট এ্যান্ড লিটারেচার*, কেম্ব্রিজ, ১৯৯৩।

৬৩. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *পথের দাবী*; হরিপদ ঘোষ (সম্পাদিত), *শরৎ রচনা সমগ্র* ৩, কোলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৯-১৯০।

৬৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬।

৬৫. তনিকা সরকার, বেঙ্গলি মিডল ক্লাস ন্যাশনালিজম এ্যান্ড লিটারেচার, পৃ. ৪৫৩।

৬৬. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *পথের দাবী*, পৃ. ১৬৭; তনিকা সরকার, বেঙ্গলি মিডল ক্লাস ন্যাশনালিজম এ্যান্ড লিটারেচার, পৃ. ৪৫৪।

৬৭. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *পথের দাবী*, পৃ. ১৬৩।

৬৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫-৬৮।

৬৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩।

৭০. দেখুন, পিয়ের বোরদিউ (Pierre Bourdieu), *ডিস্টিংশন। এ সোসাল ক্রিটিক অব দি জাজমেন্ট অব টেস্ট* [Rechard Nice অনূদিত], লন্ডন, ১৯৮৬। আরও দেখুন, 'মার্জিত রুচির মানুষ' ও 'সাংস্কৃতিক যোগ্যতা' সম্পর্কে বোরদিউ-এর আলোচনা – এতে তিনি যথার্থ সংস্কৃতিতে যথার্থ যোগ্যতা (এবং নিশ্চিতভাবে তা প্রভাব বিস্তারকারী) বলে ব্যাখ্যা করেন। পিয়ের বোরদিউ এবং জিন-ক্লডে প্যাসেরন (Jean-Claude Passeron), *রিপ্রোডাকশন ইন এডুকেশন, সোসাইটি এ্যান্ড কালচার* (রিচার্ড নাইস অনূদিত), লন্ডন, ১৯৯০, পৃ. ৩৪-৩৫।

৭১. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *পথের দাবী,* পৃ. ১৬৭-৮।

৭২. ঐ সময়ে বামপন্থী রাজনৈতিক গ্রুপিং-এর উদ্ভবের সাথে সাথে একটি সচেতন প্রগতিশীল আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে, এদের মধ্যে একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সুপরিচিত। কিন্তু এ অধ্যায়ে শুধুমাত্র সেই সব রচনাগুলিকে আলোচনায় আনা হয়েছে, যে সবের বিষয়বস্তুতে যাবতীয় সাম্প্রদায়িক ও রক্ষণশীলতা প্রতিফলিত হয়েছে।

৭৩. সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত তাঁর বই *ভারতের সাম্যবাদ* (কোলকাতা ১৯৩০)-তে 'চিরাচরিত' যে জমিদারের কামনা করেছিল, শরৎচন্দ্রের বিপ্রদাশ চরিত্রে গভীরভাবে ঐ চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে।

৭৪. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বিপ্রদাশ, শরৎ রচনা সমগ্র,* ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫০।

৭৫. ১৯১৮ সালে প্রকাশিত *পল্লী সমাজ*-এ আদর্শবাদী রমেশের কাহিনী ও তার সংস্কারমূলক কাজের কথা বলা হয়েছে – যে সংস্কার না হওয়ায় পল্লি সমাজে অন্ধকূপে জলাবদ্ধতার মতো অবস্থা বিরাজ করছে বলে লেখক উল্লেখ করেন। এই উপন্যাসে উপস্থাপিত জমিদার বেণী ঘোষাল যেমন দুর্নীতিপরায়ণ ও লোভী, তেমনি ভিতু; প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি তার উদাসীনতা প্রজাদের জন্য অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুকুমার সেন (সম্পাদিত), পুনর্মুদ্রণ, *সুলভ শরৎ সমগ্র,* ১ম খণ্ড, কোলকাতা, ১৯৯১।

৭৬. দ্বিজু কোনো চাকুরিতে নিযুক্ত ছিল না, সে তার ভাই বিপ্রদাশের কাছ থেকে মাসোহারা পেত। ঐ অর্থ দিয়ে সে কোলকাতায় সংসার খরচ চালাত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বিপ্রদাশ,* পৃ. ৩৫২-৩৫৩।

৭৭. আর্থিক দায়িত্বহীনতার জন্য দ্বিজুকে তার পিতা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে; সে তার মায়ের সাথে তীর্থ যাত্রায় যেতে এই বলে অস্বীকার করে যে, সে *দেশের কাজে* খুব ব্যস্ত আছে, *বিপ্রদাশ,* ৩৫৩, ৩৬১-৩৬২।

৭৮. বিপ্রদাশের আধ্যাত্মিক প্রয়াসের বিবরণ দেখুন, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৭৭। সরল ও সাদাসিধা ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসের দর্শনের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট: রামকৃষ্ণ তাঁর ভদ্রলোক অনুসারীদের উপদেশ দেন – জগতে বসবাস করো এবং জাগতিক কর্তব্য পালন করো, তবে নিজেদের নির্লিপ্ত রাখবে। দেখুন সুমিত সরকার, 'দি কথামৃত এ্যাজ এ টেক্সট: টুয়ার্ডস এ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অব রামকৃষ্ণ পরমহংস, এন এম এম এল, অকেশনাল পেপার নং ২২, ১৯৮৫ এবং আরও দেখুন, তাঁর 'কলিযুগ', 'চক্রী', এবং 'ভক্তি', 'রামকৃষ্ণ এ্যান্ড হিজ টাইমস্', *ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি,* খণ্ড ২৭, ২৯, ১৮ জুলাই ১৯৯২; আরও দেখুন, পার্থ চ্যাটার্জী, 'এ রিলিজিওন অব আরবান ডোমেসটিসিটি'।

৭৯. বিদেশ-ফেরৎ সুন্দর পোশাক পরিহিত একজন ব্যারিস্টার নারী মুক্তি ও কৃষকদের অধিকার নিয়ে উচ্চকণ্ঠ; কিন্তু সাদা লোকদের আক্রমণের মুখে তাকে দেখা গেল সে একজন ভিতু লোক। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বিপ্রদাশ*, পৃ. ৩৬৭।

৮০. তনিকা সরকার বলেন যে, একই ধরনের মনোভাব দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে। ঐ উপন্যাসে কোনো রাখঢাক না রেখে সন্ত্রাসী আন্দোলনের বিরুদ্ধে কঠোর আক্রমণ করা হয়েছে। তনিকা সরকার, বেঙ্গলি মিডল-ক্লাস ন্যাশনালিজম এ্যান্ড লিটারেচার', পৃ. ৪৫৬-৪৫৯।

৮১. বন্দনার 'আধুনিক' বন্ধু সুধীর ও হেম-এর চরিত্র দেখুন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বিপ্রদাশ*, পৃ. ৪১০-৪১১।

৮২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৭-৩৬০।

৮৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬০। এভাবেই সে 'আর্য' (ব্রাহ্মণ) ও 'ক্ষত্রিয়' মূল্যবোধকে অঙ্গীভূত করে। আধুনিক হিন্দু পুরুষের পরিচিতি গঠনে 'আর্য' ও 'ক্ষত্রিয়' উপাদানের আদি ভিত্তি নিয়ে উমা চক্রবর্তীর আলোচনা দেখুন। উমা চক্রবর্তী, 'হোয়াটএভার হ্যাপেনড টু দি ভেডিক দাসি?, ওরিয়েন্টালিজম, ন্যাশনালিজম এ্যান্ড এ স্ক্রিপ্ট ফর দি পাস্ট', – কুমকুম সঙ্গারী ও সুদেষ ভেদ (সম্পাদিত), *রিকাস্টিং ওমেন – এসেজ ইন কলোনিয়াল হিস্ট্রি*, নিউ দিল্লী, ১৯৮৯, পৃ. ৪৬-৫৪।

৮৪. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বিপ্রদাশ*, পৃ. ৩৬৯-৩৭০।

৮৫. বিবেকানন্দের চিন্তাধারার প্রভাব, বিশেষ করে হিন্দু ধর্ম রক্ষায় তাঁর সাহসী ভূমিকা এবং 'ভারতীয় সব কিছুর জন্য দুঃখ প্রকাশের রীতির বিরুদ্ধে তাঁর গৌরবদীপ্ত ঘৃণা' স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। দেখুন, তপন রায়চৌধুরী, *ইউরোপ রিকনসিডার্ড*, পৃ. ২৪৯, এবং সরকার, 'কলিযুগ', 'চক্রী', এবং 'ভক্তি', পৃ. ১৫৪৫।

৮৬. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বিপ্রদাশ*, ৩৫৮।

৮৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৩।

৮৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮১-৩৮২।

৮৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৮।

৯০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৭-৪০৮।

৯১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭১-৩৮২, ৪০৭-৪০৮। 'আদর্শ' হিন্দু মহিলার কাঠামো নির্মাণের ইতিহাসের জন্য দেখুন, উমা চক্রবর্তী, 'হোয়াটএভার হ্যাপেন্ড টু দি ভেডিক দাসি?'; মালবিকা কারলেকার, *ভয়সেস ফ্রম উইদিন আর্লি পারসোনাল ন্যারেটিভস্ অব বেঙ্গলি উইমেন*, দিল্লী, ১৯৯১; সমিতা সেন, 'ম্যারেজ, মাইগ্রেশন এ্যান্ড মিলিট্যান্সি – উইমেন ওয়ার্কার্স ইন দি জুট ইন্ডাস্ট্রি ইন বেঙ্গল', ইউনিভার্সিটি অব কেম্ব্রিজ, পিএইচ ডি ডিসারটেশন, ১৯৯২।

৯২. এই রূপক নির্বাচন আকস্মিক নয় – জাতিগত (এবং সম্প্রদায়গত) পরিচিতি প্রকাশে প্রায় নিশ্চিতভাবে কাল্পনিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভর করা হয়েছে। দেখুন, জি. কার্টার বেন্টলি, 'এথনিসিটি এ্যান্ড প্রাক্টিস', *কম্পারেটিভ স্টাডিজ ইন সোসাইটি এ্যান্ড হিস্ট্রি*, খণ্ড ২৯, ১, ১৯৮৭, পৃ. ৩৩।

৯৩. দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, 'পল্লী সমাজ'-এ বর্ণ প্রথা ও এর অবিচারের কথা বারবার বলা হয়েছে: এর মধ্যে আছে কুলীন বিধবাদের দুর্দশা, ব্রাহ্মণদের বিকৃতি এবং নিম্ন বর্ণের লোকদের পীড়ন। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এসবকে বিকৃতি বলে গণ্য করা হয়েছে

এবং সামগ্রিকভাবে বর্ণ প্রথাকে সমর্থন করা হয়েছে, এবং তাও আবার পারিবারিক রূপকের মাধ্যমে। বিধবা জেঠিমা রমেশকে বলছে এভাবে: 'পাড়াগাঁয়ে জাত ছোট কি বড়, সেজন্যে কারো এতটুকুও মাথাব্যথা নেই। ছোট ভাই ছোট বলে বড় ভাইকে হিংসা করে না, দু-এক বছর পরে জন্মাবার জন্যে যেমন তার মনে এতটুকু ক্ষোভ নেই, পাড়াগাঁয়েও ঠিক তেমনি। এখানে বামুন হয়নি বলে একটুও দুঃখ করে না, কৈবর্তও কায়েতের সমান হবার জন্য একটুও চেষ্টা করে না। বড় ভাইকে একটা প্রণাম করতে ছোট ভাইয়ের যেমন লজ্জায় মাথা কাটা যায় না, তেমন কায়েতও বামুনের একটুখানি পায়ের ধুলো নিতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না।' পল্লী সমাজ, পৃ. ১৬৪।

৯৪. 'বিপ্রদাশ' উপন্যাসে মাত্র একটা মুসলমান পরিবারের কথা সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, পৃ. ৩৮৪।

৯৫. পুনর্মুদ্রণ, হরিহর ঘোষ (সম্পাদিত), *শরৎ রচনা সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৪১। প্রবন্ধের পুরো অংশ পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে।

৯৬. এসব দাঙ্গার বর্ণনার জন্য দেখুন, পি. কে. দত্ত, 'দি ওয়ার ওভার মিউজিক'; সুরঞ্জন দাশ, *কমিউনাল রায়টস্ ইন বেঙ্গল*, পৃ. ৭৫-৯১; কেনেথ ম্যাকফারসন (Kenneth McPherson), *দি মুসলিম মাইক্রোজম*, পৃ. ৯০-৯৭।

৯৭. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা*, পৃ. ৮৪৩।

৯৮. দৃষ্টান্তস্বরূপ, সব্যসাচী কবি শশীকে বলে যে, সে 'আমাদের জাতীয় কবি হবে। হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, খ্রীষ্টানের নয় – শুধু বাঙালি জাতির কবি।' পথের দাবী, পৃ. ১৬৭।

৯৯. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা*, পৃ. ৮৪৩।

১০০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪২।

১০১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪৩। এখানে পাবনার দাঙ্গার কথা বলা হয়েছে। স্থানীয় এক হিন্দু জমিদারের বাড়িতে প্রতিমার অঙ্গহানির ঘটনায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনায় এক জন মারা যায় এবং বাইশ জন আহত হয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, সুরঞ্জন দাশ, *কমিউনাল রায়টস্ ইন বেঙ্গল*, পৃ. ৮২।

১০২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা*, পৃ. ৮৪৩-৮৪৪। হিন্দুদের স্বেচ্ছায় ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনা হিন্দু সংবাদপত্রে আদৌ আলোচিত হলে তাকে ভ্রষ্ট যৌনাচারের ফল বলে আবশ্যিকভাবেই বাতিল করা হত।

১০৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪৪। এখানে গুরুত্ব যুক্ত করা হয়েছে।

১০৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪৪।

১০৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪২-৮৪৪। সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ ও পবিত্রতার আধার হিসেবে হিন্দু মহিলাকে উল্লেখ করা হয়েছে। এদের বারবার দুশ্চরিত্র মুসলমান আক্রমণকারীরা ধর্ষণ ও অসম্মান করেছে – হিন্দু সাম্প্রদায়িক আলোচনায় এটা একটা অতি পরিচিত বিষয়। দেখুন, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, 'হিন্দুজ এ্যান্ড আদারস্: দি মিলিট্যান্ট হিন্দু কনস্ট্রাকশন', পৃ. ৩০০৩-৩০০৪; তনিকা সরকার, 'ওম্যান এ্যাজ কমিউনাল সাবজেক্ট', পৃ. ২০৫৮।

১০৬. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা*, পৃ. ৮৪৩।

১০৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪৩।

১০৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪৩। এখানে হিন্দু ও মুসলমান কৃষকের যে তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা শরৎচন্দ্রের *পল্লী সমাজ* উপন্যাসে বর্ণিত চিত্র থেকে একেবারে বিপরীত। প্রথম দিককার এই উপন্যাসে মুসলমান কৃষক সমাজকে উপস্থাপন করা হয়েছে এভাবে যে তারা লক্ষ্য অর্জনে নিয়োজিত, শান্তিপূর্ণ, ঐক্যবদ্ধ ও কঠোর পরিশ্রমী। অথচ হিন্দু কৃষক সমাজকে দেখানো হয়েছে ঝগড়াটে, দুর্নীতিগ্রস্ত, কুসংস্কারে বিশ্বাসী এবং অলস বলে। একটা স্কুল নির্মাণের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যের উন্নতির জন্য মুসলমান কৃষকদের প্রয়াস লক্ষ করে নায়ক রমেশ মন্তব্য করে যে, 'এরা (পীরপুরের মুসলমান কৃষকেরা) সব সময় তর্ক করে না, যেমন করে কুঁয়াপুরের হিন্দু বাসিন্দারা। এমনকি তারা কোন বিষয়ে একমত না হলেও অভিযোগ দায়ের করার জন্য সদরে ছুটে যায় না। বরং নবীর শিক্ষার ফলে তারা সন্তুষ্ট হোক বা না হোক, তারা একে অন্যকে গ্রহণ করার চেষ্টা করে। বিশেষ করে দুঃখ-কষ্টের সময় তারা শেষ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ থাকে – ভদ্র বা অভদ্র হোক না কেন রমেশ এ অবস্থা কোন হিন্দু গ্রামে কখনও দেখেনি ... সে এ কথা বলে শেষ করে যে, 'হিন্দুদের মধ্যেকার প্রচণ্ডতা ও শত্রুতা তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক অসমতার কারণ। ধর্মের দৃষ্টিতে সব মুসলমান সমান, সে কারণে তারা যেমন ঐক্যবদ্ধ হিন্দুরা তেমন কখনও হতে পারবে না।' *পল্লী সমাজ*, পৃ. ১৬৩।

১০৯. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *পথের দাবী*, ১৬৩।

১১০. *'ইতরতা'* শব্দের অর্থ ব্যাপক – নীচ, অমার্জিত, হেয় মর্যাদাসম্পন্ন, সাধারণ, অপরিপক্বতা, গুরুত্বহীন ও সংকীর্ণ। এর মূলে আছে 'অন্য'রা সম্পর্কিত ধারণা। অভদ্রতার অর্থ হল অমার্জিত, রুচিহীনতা, অশালীন আচরণ, এমনকি অসভ্যতা ও নীচতাকেও বুঝায়।

১১১. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা*, পৃ. ৮৪৪।

১১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪৪। দশ বছর পর প্রায় একই ধরনের বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন ধীরেশ চক্রবর্তী, 'হিন্দু মুসলিম ইউনিটি: প্ল্যাটিচিউডস্ এ্যান্ড রিয়ালিটিজ', *মডার্ন রিভিউ*, খণ্ড ৫৩, ২০৬ জানুয়ারি-জুন, ১৯৩৬, পৃ. ২৮৪-২৮৯।

১১৩. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা*, পৃ. ৮৪৩।

১১৪. সুনির্দিষ্টভাবে এসব চারিত্রিক গুণাবলী শরৎচন্দ্রের পরবর্তীকালের কাহিনীতে তাঁর নায়ক হিন্দু বীর বিপ্রদাশের ওপর আরোপ করেন।

১১৫. প্রাচ্য/ভারতীয় অস্তিত্ববাদ এবং এরই অন্তর্নিহিত মানবীয় কর্তৃত্ব সম্বন্ধে নির্লিপ্ততা ও ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, রোনাল্ড ইন্ডেন, *ইমাজিনিং ইন্ডিয়া*, পৃ. ১-৪৮, ২৬৩-২৭০।

১১৬. জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, *কনস্ট্রাকশনস্ অব কমিউনালিজম*, পৃ. ২৩৫।

১১৭. পাণ্ডে আধুনিকতাবাদী ও 'উদার-যুক্তিবাদ' জাতীয়তাবাদীর সহজাত চিন্তাধারায় ধর্মীয় ব্যাপারে রাজনৈতিক যৌক্তিকতার অনুগামিতা (statism) যে সমালোচনা করেছেন সেটি সমানভাবে চিরাচরিত সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে অধিকতর সংশ্লিষ্ট ছিল। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৩-২৫৪।

১১৮. জাতীয়তাবাদী আলোচনার অঙ্গনে 'আধুনিকতাবাদী ও উদার যুক্তিবাদী (Statist)-দের আক্রমণের আগ্রহে পাণ্ডের বর্ণনায় এই সুস্পষ্ট এবং মৌলিক প্রশ্নটির প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়নি। উপনিবেশবাদী ও জাতীয়তাবাদী রচনার সাম্প্রদায়িকভাবে নির্মিতির সমালোচকেরা সমালোচনায় নিঃসন্দেহে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। ঐ একইভাবে সাম্প্রদায়িক আলোচনাকে

অনুসন্ধান করতে পাণ্ডের ব্যর্থতা তাঁকে একটি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত করতে সাহায্য করে যে, সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতীয়তাবাদ শুধু একে অন্যের সংশ্লিষ্ট বিষয়ই নয়, বরং সত্য যে, তারা একই জিনিস (জাতীয়তাবাদ হল সম্প্রদায়বাদ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং জাতীয়তাবাদ ধর্মনিরপেক্ষ ধারার দিকে ধাবিত করে)। তাঁর তৃতীয় ধরনের আবিষ্কারটি হল 'গোষ্ঠীবাদ' – অন্যান্য লেখকেরা সাম্প্রদায়িকতাকে যেভাবে ব্যবহার করেছেন, তিনি এটাকে সেভাবেই ব্যবহার করেছেন। এর ফলে তাঁর যুক্তির স্পষ্টতা ও ধার আরও কমে যায়। 'সাম্প্রদায়িক' সংগঠনের পরিবর্তে 'সম্প্রদায়ের সংগঠন' হিসেবে হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘকে বর্ণনা করে আসলে কিছুই লাভই হয়নি। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৪।

১১৯. নবীনচন্দ্র সেন, *পলাশীর যুদ্ধ*, পৃ. ১, ১৪, ৬৩, ৯৪-৯৫।

১২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩-৫৯।

১২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪-২৫।

১২২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩-৯৯।

১২৩. অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, *সিরাজদ্দৌলা*, কোলকাতা, ১৮৯১। বিশেষভাবে 'পলাশীর যুদ্ধ' শিরোনামে ২৭ অংশ দেখুন।

১২৪. *প্রাগুক্ত*। আরও দেখুন, নবীনচন্দ্র সেনের *পলাশীর যুদ্ধ* (১৯৮৪ সালের সংস্করণের)-এর শ্রী সজনীকান্ত দাশের ভূমিকা, পৃ. ১৬।

১২৫. রবীন্দ্রনাথ রায় এবং দেবীপদ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), *সিরাজদ্দৌলা, গিরীশ রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, কোলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ৫৫১-৬০০।

১২৬. জওহরলাল নেহেরু, *দি ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া* (১৯৪৬), নিউ দিল্লী, ১৯৮৬, পৃ. ২৯৭, পৃ. ২৯৭। ১৯৪৩-৪৬ সালের বাঙলায় দুঃখজনক চরম দুর্ভিক্ষের বিষয়ে লিখতে গিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে বলেন যে, বাঙলার দুর্দশার সরাসরি কারণ হল দুই শতাব্দীর ব্রিটিশ শাসন: 'ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পূর্ণ অভিজ্ঞতা হয় বাঙলার। এই শাসনের শুরু হয় সরাসরি লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে, এবং তারা একটি ভূমি রাজস্ব পদ্ধতির মাধ্যমে কানাকড়িটুকুও কৃষকদের কাছ থেকে এমনকি মৃত কৃষকদের কাছ থেকেও, আদায় করে ... এটা এক ধরনের ডাহা লুণ্ঠন। সবচেয়ে ভীতিকর দুর্ভিক্ষ বাঙলাকে ক্ষত-বিক্ষত না করা পর্যন্ত 'প্যাগোদা-গাছ'কে (Pagoda Tree) বারবার ঝাঁকানো হয়। এই প্রক্রিয়াকে পরবর্তীকালে বলা হয় ব্যবসা, কিন্তু অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি ... সরাসরি লুণ্ঠন আস্তে আস্তে বৈধ শোষণের রূপ লাভ করে; এটা স্পষ্টভাবে দেখা না গেলেও বাস্তবে সেটা ছিল আরো খারাপ। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিককার লোকগুলোর দুর্নীতি, ন্যায়-অন্যায় নির্বিশেষে অর্থ আদায়, স্বজনপ্রীতি, হিংস্রতা, অর্থের প্রতি লালসা ছিল যা বর্ণনারও অতীত।' *ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া*, পৃ. ২৯৭।

১২৭. সুভাষচন্দ্র বসু, *এ্যান ইন্ডিয়ান পিলগ্রিম* – শিশির কে. বসু (সম্পাদিত), *নেতাজি কালেকটেড ওয়ার্কস*, খণ্ড ১, পৃ. ১৫।

১২৮. এ বিষয়ে গভর্নর হার্বার্ট তাঁর রিপোর্টে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, এই বিক্ষোভ 'মুসলমান অনুভূতিতে তীব্র আবেদন সৃষ্টি করে ... কোনো উপায় উদ্ভাবনে সুভাষ বসু ও ফরোয়ার্ড ব্লকের অব্যাহত প্রয়াসের এটা ছিল একটা দিক, যার ওপর ভর করে মুসলমানদের সহায়তায় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা যায়'। হার্বার্ট থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ৪ঠা

জুলাই ১৯৪০, এফ আর, লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর, এমএস এস ইইউ আরএফ/১২৫/৪০।

১২৯. হার্বার্টের কাছ থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, টেলিগ্রাম আর, ৪ঠা জুলাই ১৯৪০, লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর, এমএস এসইইউ আরএফ/১২৫/৪০।

১৩০. বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, *সুভাষচন্দ্র বোস এ্যান্ড মিডল-ক্লাস র‍্যাডিক্যালিজম*, পৃ. ৬৩-৬৫।

১৩১. বি. সি. *চ্যাটার্জী, দি বিট্রায়াল অব ব্রিটেন এ্যান্ড বেঙ্গল*।

১৩২. যদুনাথ সরকার, *দি হিস্ট্রি অব বেঙ্গল মুসলিম পিরিয়ড*, ১২০০-১৭৫৭, পাটনা, ১৯৭৩, পৃ. ৪৯৭-৪৯৮।

১৩৩. অন্য এক অধ্যায়ে সরকার নবাবের স্মৃতিকে 'দায়মুক্ত' করার জন্য 'কবি'কে সমালোচনা করেন: 'সিরাজের জীবন ছিল অমর্যাদাকর' আর তার সমাপ্তিও ঘটেছিল দুঃখজনকভাবে – এটাই দেশবাসী জানত। কবির মেধা দিয়ে এই স্মৃতিকে দায়মুক্ত করা হয় ... বাঙালি কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য 'পলাশীর যুদ্ধ'-এ সিরাজের বোকামি ও অপরাধকে ধুয়ে-মুছে সাফ করেছেন এবং কারুকার্যের সাথে তার পতিত মহত্ত্ব ও বিক্ষত তারুণ্যের জন্য পাঠকের অশ্রু ঝরিয়েছেন।' প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৭।

১৩৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৯। সরকারের মতে, মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাও সমানভাবে মন্দ। সে-কারণে সিরাজের খালাতো ভাই ও শত্রুর মধ্যেও 'প্রতিদ্বন্দ্বীর সকল বদগুণ বর্তমান ছিল – মিথ্যা অহংকার, কাণ্ডজ্ঞানহীন আকাঙ্ক্ষা, নিয়ন্ত্রণহীন আবেগ, বাচালতা এবং পানাসক্তি'। *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৪৭৮।

১৩৫. *নেহেরু*, *ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া*, পৃ. ২৯৭।

১৩৬. নেহেরু এভাবে যুক্তি দেখান যে, বাঙলা থেকে লুণ্ঠন করা সম্পদ ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের হাতিয়ার হয়। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৭-২৯৮। ঔপনিবেশিক শাসনের সাথে অর্থনৈতিক শোষণের বিষয়টি জড়িত – চল্লিশ বছরের পুরনো এই জাতীয়তাবাদী ধারণায় তাঁর ব্যাখ্যা অবদান রাখে। ঐ ধারণার শুরু হয় ১৯০১ সালে দাদাভাই নওরোজীর *পোভার্টি এ্যান্ড আন-ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া* পুস্তক প্রকাশের পর। রজনীপাম দত্তের ১৯৪০ সালে লেখা *ইন্ডিয়া টুডে* প্রকাশিত হওয়ার পর এই ধারণাটি নতুনভাবে বেগবান ও মাত্রা পায়। এই ঐতিহ্যিক ইতিহাসের জন্য দেখুন, বিপানচন্দ্র, *দি রাইজ এ্যান্ড গ্রোথ অব ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়া*, নিউ দিল্লী, ১৯৬৬।

১৩৭. রচনার এই অংশে এই ইঙ্গিত করছে যে, এটা যেমনটি জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে তাঁর *কনস্ট্রাকশনস অব কমিউনালিজম* গ্রন্থে বলতে চেয়েছেন, শুধু উদারপন্থীরাই নয় ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদীরাও (যথা, নেহেরু) আধুনিকতাবাদ ও যুক্তিবাদ সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা ছাড়াই উৎসাহ দেখিয়েছেন, এতে আরো স্পষ্ট হয় যে, সাম্প্রদায়িক আলোচনায় 'ঐতিহ্যগত' এমনকি 'ধর্মীয়' বৈশিষ্ট্য ব্যবহার একান্তই আবশ্যক নয়।

১৩৮. যদুনাথ সরকার, *দি হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, পৃ. ৪৯৭-৪৯৮।

১৩৯. একারণে ডেভিড কফ (Devid Kopf) তাঁর প্রবন্ধে রামমোহন রায়ের চিন্তাধারাকে এভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন। ডেভিড কফ 'ইউনিভার্সাল ম্যান এ্যান্ড দি ইয়োলো ডগ: দি ওরিয়েন্টালিস্ট লিগেসি এ্যান্ড দি প্রব্লেম অব ব্রাহ্ম আইডেন্টিটি', রাসেল ভ্যান এম. বমার

(Rachel Van M. Baumer) (সম্পাদিত), *আসপেক্ট অব বেঙ্গলি হিস্ট্রি এ্যান্ড সোসাইটি*, হাওয়াই, ১৯৭৫।

১৪০. আর. সি. দত্তের *কালচারাল হেরিটেজ অব বেঙ্গল* (১৮৯৬) গ্রন্থে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; নীরদ চৌধুরী 'রামমোহন রায় থেকে ঠাকুর পর্যন্ত মহান বাঙালি সংস্কারকদের' কথা বলেছেন। *অটোবায়োগ্রাফি*, পৃ. ১৭৯।

১৪১. *অমৃত বাজার পত্রিকা*-র প্রধান সম্পাদকীয়, ৫ই এপ্রিল ১৯৩৯। লেখক এখানে বাঙালি হিন্দুদের 'জেগে ওঠা'র আহ্বান জানান এবং 'নিজের বিবেচনায় কিছু চিন্তা-ভাবনা করার (লেখক) ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচির জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের' কথা বলেন।

১৪২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা*, পৃ. ৮৪১। এই বক্তব্যটি প্রবন্ধে বারবার এসেছে। পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

১৪৩. '*বেঙ্গল* হিন্দু মেনিফেস্টো', ২৩শে এপ্রিল ১৯৩২। পুনঃপ্রকাশিত এন. এন. মিত্র (সম্পাদিত), *ইন্ডিয়ান এ্যানুয়াল রেজিস্ট্রার*, ১ম খণ্ড, জানুয়ারি-জুন ১৯৩২, পৃ. ৩২৩। এতে স্বাক্ষর করেন বাঙলার অনেক বড় বড় জমিদার – এর মধ্যে ছিলেন কাশিম বাজারের মহারাজা শিরিশচন্দ্র নন্দী (তিনি পরে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেন), বেঙ্গল মহাজন সভার সভাপতি এবং অনেক উকিল ও পেশাজীবী। রিপোর্ট ইন জিবি এসবি 'পিত্রম' সিরিজ, ফাইল নং ৬২১৮/৩১।

১৪৪. উত্তর ভারতের মুসলমানদের অধিকতর বেশি প্রতিনিধিত্বের দাবি এতে প্রতিধ্বনিত হয় – ঐ দাবিরও ভিত্তি ছিল সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব।

১৪৫. রমেশচন্দ্র ব্যানার্জী, 'হিন্দু এ্যান্ড মুসলিম পাবলিক স্পিরিট ইন বেঙ্গল', *মডার্ন রিভিউ*, খণ্ড ৫৫, ১-৬ জানুয়ারি-জুন, ১৯৩৪, পৃ. ৩১৫।

১৪৬. যতীন্দ্র মোহন দত্ত, 'দি রিয়েল নেচার অব দি মুহাম্মাডানস্ মেজরিটি ইন বেঙ্গল', *মডার্ন রিভিউ*, খণ্ড ৪৯, ২, ১৯৩১।

১৪৭. যতীন্দ্র মোহন দত্ত, 'রিলেটিভ পাবলিক স্পিরিট এ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ অব হিন্দুজ এ্যান্ড মুহাম্মাডানস্ ইন বেঙ্গল', *মডার্ন রিভিউ*, খণ্ড ৫৫, ১-৬ জানুয়ারি-জুন, ১৯৩৪, পৃ. ৬৮৫-৬৮৯।

১৪৮. যতীন্দ্র মোহন দত্ত, 'কমিউনালিজম ইন দি বেঙ্গল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন', *মডার্ন রিভিউ*, খণ্ড ৪৯, ১, ১৯৩১। এই সোৎসাহী লেখক তুলনা করেন (কাঙ্ক্ষিত ফল উল্লেখ করে), 'দি রিলেটিভ হিরোইজম অব দি হিন্দুজ এ্যান্ড মোহাম্মাডানস্ অব ইন্ডিয়া', *মডার্ন রিভিউ*, খণ্ড ৭৯, ১–৬ জানুয়ারি-জুন, ১৯৪৬।

১৪৯. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নোট, তারিখবিহীন, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পেপার্স, ২-৪ দফা, ফাইল নং ৭৫/১৯৪৫-৪৬।

১৫০. যতীন্দ্র মোহন দত্ত, 'হু দি বেঙ্গলি মোহাম্মাডানস্ আর?', *মডার্ন রিভিউ*, খণ্ড ৪৯, ৩, ১৯৯১।

পঞ্চম অধ্যায়

হিন্দু ঐক্য এবং মুসলমান স্বেচ্ছাচার: হিন্দু ভদ্রলোক রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় ১৯৩৬-৪৭

আদর্শিক পরিবর্তনের সাথে সাথে ১৯৩০ দশকের শেষের দিকে এবং ১৯৪০-এর দশকে যেসব অভিনব পন্থায় ভদ্রলোক রাজনীতির পরিবর্তন ঘটে তা শেষ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, উচ্চতর জাতীয়তাবাদী প্রয়াস পরিহার করার আগ্রহ এবং এর পরিবর্তে ক্ষুদ্রতর ও অতি তাৎক্ষণিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া। এ বছরগুলোতে ভদ্রলোকদের সম্ভবত সবচেয়ে বেশি উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা ছিল হিন্দু রাজনৈতিক সম্প্রদায় গড়ে তোলার প্রয়াস – এ পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল কল্পিত 'হিন্দু পরিবারে'র সব অসম শ্রেণী ও গোত্রকে একটা একক সুসমঞ্জস সামগ্রিকতায় ঐক্যবদ্ধ করা। কিন্তু সাধারণভাবে ভদ্রলোক রাজনীতি ক্রমেই অভ্যন্তরীণ ও সংকীর্ণ বিষয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং ক্রমবর্ধমানভাবে স্থানীয় ও জেলা বোর্ডের নগণ্য বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই ধারা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় পশ্চিম বাঙলার ঐতিহ্যগতভাবে ভদ্রলোক প্রভাবিত প্রধান গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় – এখানে ক্রমবর্ধমানভাবে মুসলমান প্রভাবের ফলে কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির ভাঙন শুরু হয়। এ অধ্যায়ে ভদ্রলোক রাজনীতির ঐ নতুন লক্ষ্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এবং বাঙলায় সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ওপর তার প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্রেণী ও সম্প্রদায়গত সমাবেশ

শতাব্দীর শুরু থেকেই হিন্দু রাজনৈতিক ঐক্যের মতাদর্শীরা অস্পৃশ্যদের উন্নয়ন এবং শ্রেণী বিভেদের বাধা দূর করার কর্মসূচি সমর্থন করে। স্বামী বিবেকানন্দ 'সত্য যুগে'র আগমন প্রত্যাশা করেন যখন 'একটা শ্রেণী (ব্রাহ্মণ) থাকবে, একটা বেদ থাকবে, আর থাকবে শান্তি ও সংহতি'।[১] কিন্তু ঐক্যের বিষয়টি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে একটা সুদূর পরাহত স্বপ্ন হিসেবেই থাকে। ১৯২৬ সালে তাঁর লেখা প্রবন্ধ *বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যায়* তিনি বলেন, হিন্দুদের সামনে সবচেয়ে বড় কঠিন কাজ হল 'নিজেদের সম্প্রদায়ের

মধ্যে ঐক্য অর্জন করা' এবং এ ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটানো 'যা দীর্ঘ দিন ধরে হিন্দু ধর্মকে বিকৃত করেছে – ছোট জাতি বলে কিছু লোককে অপমান করেছে'।[২] ভারতের অন্যান্য কিছু অংশের মতো বর্ণের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ বাঙলায় ততটা কঠোর না হলেও[৩] উচ্চ শ্রেণীর বাঙালি হিন্দুরা তাদের মতোই সংস্কার মেনে চলত। বর্ণ প্রথার বিরুদ্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারকদের আন্দোলনের সাফল্য ছিল ক্ষণস্থায়ী। ১৯৩৩ সালের আনটাচেবিলিটি বিল নিয়ে এবং ১৯৩৪ সালের 'ডিপ্রেসড্ ক্লাসেস স্ট্যাটাস বিলের' বিরুদ্ধে বাঙলা যে বড় ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখায়[৪] সেই প্রেক্ষাপটে বলা যেতে পারে যে, মোটামুটিভাবে ভদ্রলোক-বাঙলা বর্ণভেদের ব্যাপারে যথেষ্ট গোঁড়া ছিল।

বাংলার হিন্দু সমাজে বর্ণ বা জাতিগত দ্বন্দ্ব (mobility) সব সময় একটা উপাদান হিসেবে ছিল। এমনকি প্রথম দশসালা আদমশুমারি শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা উচ্চতর শাস্ত্রীয় (ritual) মর্যাদা দাবি করেছে, এমন দৃষ্টান্ত একাধিক আছে।[৫] বাকেরগঞ্জ ও ফরিদপুরের চণ্ডালেরা ১৮৭০-এর দশকে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে সব রকম সম্পর্ক বর্জন করে, কারণ উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা একজন চণ্ডাল মাতব্বরের বাড়িতে খাওয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে এই কারণে যে, আমন্ত্রণকারী ঐ ব্যক্তি তার নীচু মর্যাদার কারণে শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে এটা আশা করতে পারে না। এ ঘটনার পর থেকে চণ্ডালেরা তাদের শাস্ত্রীয় মর্যাদা উন্নয়নে ক্রমাগতভাবে সংগ্রাম চালায়। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে তারা অধিক সম্মানিত 'নমঃশূদ্র' পদবি এবং ব্রাহ্মণের মর্যাদার দাবি জানায়। পশ্চিম বাঙলার সমৃদ্ধ কৃষক সম্প্রদায় চাষি কৈবর্তরা একইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মাহিষ্য মর্যাদা দাবি করে। মোটামুটিভাবে একই সময়ে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর জমির মালিক রাজবংশী পরিবারগুলো ব্রাত্য কায়স্থ (Bratya Kayastha) মর্যাদা দাবি করতে শুরু করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে তারা তাদের শ্রেণীর লোকদের 'পৈতা' পরিধানে উৎসাহিত করতে আন্দোলন শুরু করে।[৬] ১৮৯১ সালের প্রথম আদমশুমারির পর এ ধরনের দাবি নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়; ১৯১১ সালে বিভিন্ন শ্রেণী সংগঠনের কাছ থেকে সেন্সাস কমিশনার যত দরখাস্ত পায় তার ওজন ছিল এক মণেরও বেশি। আদমশুমারির কার্যধারা প্রায় ক্ষেত্রেই শ্রেণী সংঘর্ষে পরিণত হয়; সামাজিকভাবে নীচু শ্রেণীর লোকদের শাস্ত্রীয়ভাবে অবস্থান সম্পর্কে মিথ্যা দাবির কারণে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা ক্রুদ্ধ হয়। এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। পূর্ব বাঙলার কায়স্থরা নমঃশূদ্রদের কায়স্থ মর্যাদার দাবি দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করলে নমঃশূদ্ররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কায়স্থদের বয়কট করে। অন্য ঘটনায় দেখা যায়, গোয়ালাদের পরিবর্তে সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা মুসলমানদের কাছ থেকে দুধ কিনতে পছন্দ করত, কেননা গোয়ালাদের বৈশ্য মর্যাদার দাবি হজম করা তাদের জন্য কষ্টকর ছিল।[৭] বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বাঙলার উচ্চ বংশীয় হিন্দুরা প্রতিষ্ঠিত বর্ণ প্রথার বিরুদ্ধে পরিচালিত সব আন্দোলনকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে।

যাহোক, ১৯২০ দশকের শেষ দিকে একটা ঐক্যবদ্ধ হিন্দু রাজনৈতিক সম্প্রদায় সৃষ্টির লক্ষ্যে কয়েকজন হিন্দু নেতা নিম্ন বর্ণের 'দাবি'র গুরুত্ব অনুধাবন করতে শুরু করে।

'হিন্দু সভা আন্দোলন' বিভিন্ন হিন্দু বর্ণের মধ্যে সংহতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে। খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরকে প্রতিহত করার প্রয়োজন থেকে আন্দোলন শুরু হয়। ১৯২৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে হিন্দু সভা ঘোষণা করে যে, এর প্রধান উদ্দেশ্য হল অস্পৃশ্যতা দূর করা ও 'অপবিত্র' লোকদের শুদ্ধ করা। ১৯৩১ সালে অনুষ্ঠিত এক হিন্দু সভা মিটিং-এ একজন বক্তা বলেন যে, 'হিন্দুদের ওপর দ্রুত বিপদ ঘনিয়ে আসছে।' তিনি মন্তব্য করেন যে, 'এই বিপদের কারণ হল, নিজেদের ভাইদের প্রতি হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি – ঐ দৃষ্টিভঙ্গি হল উদাসীনতায় পরিপূর্ণ।' তিনি বলেন যে, 'অত্যাচারিত মুসলমানদের প্রতি মুসলমানেরা সক্রিয়ভাবে সমবেদনা জানায় এবং সে-কারণে মুসলমানদের অত্যাচার করতে প্রায় কেউ সাহস পায় না।'[৮] মালদার এক কংগ্রেস নেতা কাশীশ্বর চক্রবর্তী ১৯২৫ সালে 'সত্যম-শিবম দল' গঠন করেন – এ দলের উদ্দেশ্য ছিল সাঁওতালদের 'হিন্দু সম্প্রদায়'-এ অন্তর্ভুক্ত করা।[৯] স্থানীয় স্বরাজী নেতাদের সহায়তায় তিনি 'শাস্ত্রীয়ভাবে শুদ্ধি ও সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে' উপজাতীয় ও অস্পৃশ্যদের হিন্দু পতাকাতলে 'ফিরিয়ে আনার' কর্মসূচি ঘোষণা করেন।[১০] মুন্সীগঞ্জে একটা কালী মন্দিরে নমঃশূদ্রদের প্রবেশের অধিকার আদায়ের জন্য ১৯২৯ সালে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবীরা সত্যাগ্রহ করে।[১১] হরিজনদের অবস্থার উন্নতির জন্য এ ধরনের কাজ গান্ধীবাদী আন্দোলনের অংশ হতে পারে, কিন্তু 'সত্যম শিবম'-এর কাজ ছিল আরও স্পষ্টভাবে হিন্দু রাজনৈতিক সম্প্রদায়কে পুনঃসংজ্ঞায়িত করার একটা রাজনৈতিক 'সংগঠন' আন্দোলনের অংশবিশেষ। দুটো স্পষ্ট চ্যালেঞ্জের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই সংগঠন সৃষ্টি হয়; 'অনুন্নত সম্প্রদায়ে'র জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক নির্বাচনী এলাকা গঠনের ব্রিটিশ সরকারের নীতি, এবং বর্ণ প্রথা সমাজের প্রতি নামেমাত্র আনুগত্যকে ত্যাগ করার জন্য নিম্ন শ্রেণীর লোকদের উৎসাহিত করতে মুসলমান রাজনীতিক ও ধর্ম প্রচারকদের প্রয়াস।[১২] কিন্তু সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ ঘোষণা ও পুনা চুক্তির পর সংগঠন নতুন দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। বাঙলার জনসংখ্যার মধ্যে মোটামুটিভাবে শতকরা ১১ শতাংশ ছিল তফশিলি সম্প্রদায়ের লোক।[১৩] তাদেরকে ফলপ্রসূভাবে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করা গেলে এবং হিন্দু হিসেবে আদমশুমারিতে অন্তর্ভুক্ত করতে উৎসাহিত করা গেলে প্রাদেশিক ক্ষমতায় উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পেয়ে তাদের অবস্থান যথেষ্ট দৃঢ় হবে। ভদ্রলোকেরা ক্রমান্বয়ে বেশি করে 'হিন্দু' স্বার্থ রক্ষায় রাজনৈতিকভাবে ঝুঁকে পড়ায় ব্যাপক হিন্দু রাজনৈতিক ভিত্তি গঠনের প্রয়োজনে নিম্ন শ্রেণীর উন্নত সামাজিক মর্যাদার আকাঙ্ক্ষার প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল হতে উৎসাহিত হয়।

সামগ্রিকভাবে ভদ্রলোক সমাজের কাছে 'সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের' বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে একটা মহান প্রতীক হিসেবে আকর্ষণ সৃষ্টি করে; শহরের পেশাগত শ্রেণী বা গ্রামীণ জমিদার ও তালুকদার, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী বা ঐতিহ্যগত সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় (gentry),[১৪] সম্পদশালী খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ বা অতি সাধারণ ভদ্রলোক পুরোহিত – সবার কাছে তা আবেদন সৃষ্টি করে।[১৫] বস্তুত মধ্যম সারির ভদ্রলোক, যারা কোলকাতা ও মফস্বল শহরে বিভিন্ন সার্ভিসের নিচের দিকের স্তরে কাজ করত – দৈহিক শ্রম দেয় না এমন

কর্মচারী ও ছোট শহরের উকিল, যারা শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল জীবিকায় নিয়োজিত ছিল – এ ধরনের লোকজনেরা তাদের উর্ধ্বতন লোকদের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে ভদ্রলোক সমাজের সব অংশকে একত্রিত করা এখন আর যথেষ্ট ছিল না। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে এটা প্রমাণিত হয় যে, কেবলমাত্র ব্যাপক হিন্দু সমর্থন পেলেই প্রদেশের রাজনীতিতে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। তফশিলি সম্প্রদায়ের আসনের মধ্যে শতকরা বিশ ভাগের বেশি আসন লাভে কংগ্রেসের ব্যর্থতায় ঐ দলের সামাজিক ভিত্তির সীমাবদ্ধতা এবং ভদ্রলোক জগতের ক্ষুদ্র গণ্ডির বাইরে বন্ধু লাভের ব্যর্থতা প্রকাশ পায়। এই শক্তিশালী রাজনৈতিক বিবেচনা হিন্দু স্বার্থের মুখপাত্রদের হিন্দু জনগণের ঐ অংশকে, যারা ঐতিহাসিকভাবে ঐ স্বার্থের অংশীদার নয়, যাদের ভদ্রলোক সংস্কৃতি থেকে বাইরে রাখা হয়েছিল, তাদের মন জয় করার চেষ্টা করতে বাধ্য করায়। নিষ্ফল গণসংযোগ উদ্যোগের ইতিহাস অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, অনুন্নত শ্রেণীর সমর্থন প্রাপ্তির উদ্যোগে ভূ-সম্পত্তি বিষয়ক চরম মতবাদকে ভিত্তি করা যাবে না; ভদ্রলোকদের অর্থনৈতিক স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে হিন্দু ঐক্য গঠন করা যাবে না। তাই বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুদের পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হিন্দু রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের পরিধির বিস্তার একটি উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়।

মধ্য ত্রিশ দশকে বাঙলায় বিভিন্ন শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করার কর্মসূচির বিস্তৃতি লক্ষ করা যায় – এ উদ্যোগ নেয় প্রধানত হিন্দু সভা ও মহাসভা। ১৯৩১ সালে মহাসভা উপজাতীয়দের উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু নাম গ্রহণের এবং পরবর্তী আদমশুমারিতে 'ক্ষত্রিয়' হিসেবে নাম তালিকাভুক্তির আহ্বান জানায়:

> বাংলা, আসাম ও বিহার অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ সাঁওতাল, গারো, ডালু, বানাই, খাসিয়া, ওড়াং, মুণ্ডা, মিকির, মিরি, মিস্‌নি, লুসাই, কুকী, লালুং, কাছাড়ী, রাভ, মেচ প্রভৃতি নরনারী রামায়ণ-মহাভারতের যুগ হইতে বসবাস করিতেছে। হিন্দুস্থানের উপরোক্ত অধিবাসীগণ সকলেই মূলতঃ হিন্দু। গত ১৯২১ সালের লোক গণনার সময় ইহাদিগের অধিকাংশকেই "হিন্দু" না লিখিয়া জড়োপাসক (Animist) লেখা হইয়াছে। ইহাদ্বারা এই সকল সরল ও ধার্ম্মিক ভ্রাতা-ভগ্নিদের প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে। আমরা আশা করি আগামী ১৯৩১ ইং জানুয়ারী মাসে লোক গণনার সময় উপরোক্ত হিন্দু নরনারীগণ গত লোক গণনার ঐ ভুল সংশোধন করিয়া লইবেন। তাহারা ধর্ম্মে "হিন্দু", জাতিতে "ক্ষত্রিয়" এবং তাহাদের বংশোপাধি "সিংহ" অথবা "রায়" লেখাইবেন।[১৬]

১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে সাভারকার নিজে বাঙলায় আনুষ্ঠানিকভাবে পুনরায় মহাসভার কর্মসূচি চালু করেন। এ কর্মসূচিতে বর্ণগত ঐক্যের ওপর দল যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে তার উল্লেখ করা হয়। মুঙ্গেরে এক জনসভায় সাভারকার পাঁচটি সাঁওতাল ছেলেকে হিন্দু সম্প্রদায়ে গ্রহণ করে নেন। *অমৃত বাজার পত্রিকা* গভীর উৎসাহের সাথে ঐ ঘটনার একটা রিপোর্ট প্রকাশ করে:

> সাভারকারকে যখন পাঁচটি সাঁওতাল ছেলের মাথায় হাত রাখতে দেখা যায় তখন শ্রোতাদের মধ্যে আবেগের শিহরন ছড়িয়ে পড়ে। ঐ ছেলেগুলো সাঁওতালি ভাষায় দাবি

করে যে তারা হিন্দু ধর্মের লোক। তারা তাদের নিয়তিকে পরিচালনার জন্য সাভারকারের নেতৃত্ব কামনা করেন। একটা ছেলে তাঁর গলায় বন্য ফুলের মালা পরিয়ে দিলে সাভারকার আনন্দের সাথে তাদের সবাইকে আলিঙ্গন করেন।[১৭]

ঐ বছরের শেষের দিকে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী টিপেরা জেলার চাঁদপুরে যান। সাহা সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত স্থানীয় গৌর-নিতাই মন্দির সকল বর্ণের হিন্দুদের উপাসনার জন্য তিনি উন্মুক্ত করতে চান। তিনি 'মন্দিরের মালিকদের সাথে আলোচনা করেন এবং সকল বর্ণের হিন্দুদের উপাসনার জন্য মন্দির খুলে দিতে তিনি তাদের রাজি করাতে সক্ষম হন'।[১৮]

কিছু কিছু এলাকায় এ ধরনের কার্যকলাপে রাজনীতিতে ভিন্ন ধরনের প্রভাব দেখা দেয়। উত্তরবঙ্গের মালদা জেলায় মুসলমান জোতদারেরা ছিল বিশেষভাবে ক্ষমতাশালী। মুসলমানদের জমিতে কাজ না করার জন্য মহাসভা কর্মীরা আদিবাসী শ্রমিক ও ভাগচাষিদের প্ররোচিত করার চেষ্টা করে। তাদের প্রচেষ্টায় 'সাঁওতাল, রাজবংশী, তুরী ও একই শ্রেণীর অন্যান্য লোক 'মুসলমানদের' অধীনে কাজ করা থেকে বিরত থাকে'।[১৯] ভাগচাষিদের জন্য সংঘবদ্ধ প্রচারণার দুটো লাভ; এর ফলে আদিবাসীরা স্থানীয় হিন্দু রাজনীতিকদের সাধারণ দাবিদাওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে এবং মুসলমান মালিকদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে উৎসাহিত হবে। এটি উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর ভাগচাষিদের দলে টেনে আনতে বামপন্থীদের প্রয়াস ব্যর্থ করতেও সহায়ক হতে পারে।[২০]

এ সময় অনেক হিন্দু সংগঠনের উন্মেষ ঘটে – এদের সবার উদ্দেশ্য হল হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গীয় হিন্দু সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়, এর উদ্দেশ্য ছিল 'বাঙলার হিন্দুদের অধিকার, আইনগত স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা রক্ষা করা এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের সব শ্রেণীর মধ্যে সংহতি বৃদ্ধি করা'।[২১] ঐ বছরের মার্চ মাসে এ সংগঠনের লোকেরা কোলকাতায় বলেন যে, 'আদিবাসী গোষ্ঠীর লোকদের হিন্দু হিসেবে পরিচিতির প্রয়োজন আছে' এবং তারা এই সংগঠনের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য প্রদেশের হিন্দু জমিদারদের কাছে আহ্বান জানায়। একটা 'কনট্যাক্ট বোর্ড' (Contact Board) বা যোগাযোগ করার জন্য বোর্ড নিয়োগ করা হয় – এ বোর্ডের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করা।[২২]

এ ধরনের প্রস্তাবে নিম্ন বর্ণের অনেক সংগঠন আগ্রহের সাথে সাড়া দেয়। তাদের শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে গ্রহণের এবং তাদের সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বীকৃতি লাভের জন্য তারা খুবই আগ্রহী ছিল। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে মেদিনীপুরের জলামুখায় আয়োজিত মাহিষ্য সম্মেলনে সভাপতি তাঁর ভাষণে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের গৌরবময় অতীতের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন:

> অন্যান্য অনেক শ্রেণীর মতো মাহিষ্য শ্রেণীও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বড় শ্রেণী এবং বৃহত্তর হিন্দু সমাজের পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণে মাহিষ্য সম্প্রদায় অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

বাঙলা হিন্দু সম্মেলনের আহ্বান অনুযায়ী কাজ করার জন্য তিনি মাহিষ্যদের প্রতি অনুরোধ জানান – ঐ আহবান ছিল 'প্রতিটি গ্রামে হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠা, কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীর কথা উল্লেখ না করে নিজেদের হিন্দু পরিচয়ে সার্বজনীন পূজা পালন অনুষ্ঠান প্রবর্তন (সব শ্রেণীর সম্মিলিত উপাসনা), বিভিন্ন গোত্র ও উপগোত্রের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্তন ... এবং সাধারণভাবে হিন্দুদের স্বার্থকে রক্ষার প্রয়াস চালানো।'[২৩] মাহিষ্যরা ছিল মধ্যবর্তী 'জলাচল' শ্রেণীর লোক, ধর্মীয় মর্যাদায় নীচু হলেও তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল বেশি।[২৪] নমঃশূদ্রদের মতো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে, বিশেষ করে বিশ দশকে মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট করার ক্ষেত্রে তারা একটা ভূমিকা পালন করে। মাহিষ্যদের যেসব সদস্য ঐ সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করে তারা 'সাধারণভাবে হিন্দুদের স্বার্থে' নিজেদের সংশ্লিষ্ট করতে ইচ্ছুক বলে প্রতীয়মান হয়, তবে বিনিময়ে তারা এই দাবি করে যে 'মাহিষ্য সম্প্রদায়ের গৌরবময় অতীত'কে উচ্চ বংশজাত হিন্দুদের গ্রহণ করতে হবে।

ত্রিশ দশকের শেষ দিকের বিভিন্ন শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করার কর্মসূচি ছিল বাঙলায় ঐক্যবদ্ধ ও আত্ম-সচেতন হিন্দু রাজনৈতিক সম্প্রদায় সৃষ্টির বৃহত্তর আন্দোলনের অংশবিশেষ। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এসব আন্দোলন মুসলমানদের কাছে যথেষ্ট বিরক্তির কারণ হয়। ১৯৪১ সালের আদমশুমারি ও বর্ণ হিন্দুদের উদ্দীপনার সাথে নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণ একই সময় ঘটে। এ সময় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে এবং তা 'রাজনৈতিক মঞ্চ'কে প্রভাবিত করে ...। মন্ত্রীদের মধ্যে ঘন ঘন 'আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়; মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে থাকেন; হিন্দু সংবাদপত্রে পাল্টা বিবৃতি প্রকাশিত হতে থাকে; এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হয়'।[২৫] আদমশুমারির কাজ চলার সময় – সারা প্রদেশ থেকে খবর পাওয়া যায় যে, 'তফশিলি সম্প্রদায়ের লোকদের শুধু হিন্দু হিসেবে তালিকাভুক্তির চেষ্টা করা হচ্ছে',[২৬] এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ চেষ্টার সময় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়েছে। রাজশাহীতে 'বিক্ষোভের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে সাঁওতালদের নিয়ে':

> সাঁওতালদের হিন্দু হিসেবে তালিকাভুক্তির উদ্যোগ প্রায় সব স্থানেই নেওয়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছে ... যেসব জেলায় সাঁওতালদের সংখ্যা অধিক সেসব জেলায় সাঁওতালদের হিন্দু হিসেবে ঘোষণা দিয়ে হিন্দুদের সংখ্যা কত বেশি বাড়ানো সম্ভব হয়েছে সেটাই এখন দেখার বিষয়। এসব জেলায় সাঁওতালদের কিছুটা খেপিয়ে তোলা হয়েছে।[২৭]

বাঁকুড়া জেলায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লক্ষ করেন যে, সাঁওতালদের হিন্দু হিসেবে গণনা করার জন্য মহাসভার লোকেরা অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। এর পাল্টা পরিশ্রম হিসেবে স্থানীয় মুসলিম লীগের লোকেরা সাঁওতালদের মধ্যে কাজ করে এবং তাদের আদিবাসী হিসেবে নিজেদের রেকর্ড করাতে উৎসাহিত করার জন্য 'চেষ্টার ত্রুটি করেনি'। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এই আন্দোলনে ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 'এ বিষয়ে জেলায় কয়েকটা বক্তৃতা দেওয়ার জন্য' তিনি কোলকাতা থেকে বাঁকুড়ায় আসেন। স্থানীয় মহাসভা নেতারা 'সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকায় বক্তা ও এজেন্ট প্রেরণ করে'। মুসলিম লীগের পক্ষ থেকেও

তাদের প্রয়াস জোরদার করা হয়। পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট জানান যে, 'হিন্দু-বিরোধী প্রচার করার জন্য মুসলিম লীগ কিছু সাঁওতালকে অর্থের বিনিময়ে কাজে লাগায়।'[২৮] সমসাময়িক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এটা বলা যায় না যে, 'হিন্দু সম্প্রদায়ে' অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রমে তফশিলি সম্প্রদায় বাধা দিয়েছিল। যশোরের নগেন দাস নামে তফশিলি সম্প্রদায়ের একজন উকিল 'রানাঘাট পৌরসভার কাছে অশ্লীল ভাষায় একটা দরখাস্ত পেশ করেন: ঐ দরখাস্তে তিনি গরুর মাংসের দোকান খোলার অনুমতি চান'। তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হলে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে আর একটা দরখাস্ত করেন; ঐ দরখাস্তে তিনি 'যুক্তিসহকারে তথাকথিত ঐতিহাসিক কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে প্রমাণ করেন যে হিন্দু মহিলারা গরুর মাংস পছন্দ করে'।[২৯] এটা ছিল একটা ব্যতিক্রম; সাধারণভাবে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা, বিশেষ করে বিশুদ্ধতর শাস্ত্রীয় মর্যাদার স্বীকৃতির জন্য যারা আগে থেকেই দাবি জানিয়ে আসছিল তারা, কৃতজ্ঞচিত্তে প্রস্তাবিত 'হিন্দু' পরিচিতি গ্রহণ করে।

ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের শ্রেণী সংগঠিত করার আন্দোলনে দ্বিতীয় বার জন্মলাভ করা বর্ণের বিষয়টি মানুষের হৃদয় পরিবর্তনে সমর্থ হয়নি। ওপর ওপর মনে হবে এই আন্দোলনের দর্শন ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার ঠিক বিপরীত, যে চিন্তাধারায় জাতিভেদ প্রথাকে সমর্থন করা হয় এবং শ্রেণীভিত্তিক বিধানের প্রতি দৃঢ় আনুগত্য প্রচার করা হয়। কিন্তু আসলে জাতিভেদ প্রথা আমূল পরিবর্তনের জন্য সমালোচনা করা হিন্দু সভার কর্মসূচি ও আদর্শের কোনো অংশ ছিল না। এর পরিবর্তে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের 'হিন্দু সম্প্রদায়ের' মধ্যে আকৃষ্ট করার আন্দোলনগুলির লক্ষ্য ছিল একটি স্বীকৃত কাঠামোর মধ্যে কাজ করা। সাধারণভাবে যাকে বলা যায় 'সংস্কৃতায়ন' (sanskriti-sation)।[৩০] নিম্ন বর্ণের লোকেদের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের অপেক্ষাকৃত উঁচু স্তরে উঠে আসতে কিছু পরিচিত আচার-আচরণ পালন করতে উৎসাহিত করা হয়। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর নাম গ্রহণ করে বর্ণভেদ প্রথায় দ্বিতীয়বার জাতিগত হওয়ার জন্য তারা কিছুটা ধর্মীয় আচার পালনের অনুমতি পায় এবং যেসব 'অপবিত্র' ধর্মীয় প্রথা পালনের জন্য তাদেরকে অপমানিত করা হত সেই সব প্রথার কিছু কিছু আচার তাদের ত্যাগ করতে বলা হয়। নতুন হিন্দু নাম গ্রহণের মাধ্যমে ধর্মান্তরিতকরণের আন্দোলনকে বলা হয় 'শুদ্ধি' আন্দোলন – আন্দোলনের এই নাম থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, বিংশ শতাব্দীর হিন্দু সম্প্রদায়গত সংগঠনগুলো পবিত্রতা ও অশুদ্ধতার বিষয় নিয়ে তাদের আচ্ছন্নতা বজায় রেখেছে। আর ঐ বিষয়গুলোই হল জাতিভেদ প্রথার মূল এবং কেন্দ্রীয় বিষয়।[৩১] এ কারণে সত্যম শিবম সম্প্রদায়ের (sect) স্বরাজবাদী 'সন্ন্যাসী বাবা'র উৎসাহে জিতু সাঁওতাল আনুষ্ঠানিকভাবে অপবিত্র শূকর ও মুরগির মাংস[৩২] ত্যাগ করে 'হিন্দুদের মধ্যে সাঁওতালদের অন্তর্ভুক্ত হতে' উদ্বুদ্ধ হয়। ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে 'সারা বাঙলায় সপ্তাহব্যাপী হিন্দু মেলা অনুষ্ঠিত হয়' – ঐসব মেলায় নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা 'শুদ্ধি' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'পুনরায় ধর্মান্তরিত' হয়।[৩৩] এই কর্ম কৌশল বাঙলার জন্য উপযোগী ছিল – এখানে আগে থেকেই অনেক নিম্ন শ্রেণীর লোক নিজেদেরকে পবিত্র করার বা নিজেদের ধর্মীয় আচারকে ব্রাহ্মণদের মতো

করার চেষ্টা করে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজবংশী নেতা পঞ্চানন বর্মণ তাঁর শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদী মূল্যবোধ ও আচার প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে 'ক্ষত্রিয় সভা' প্রতিষ্ঠিত করেন। কুড়ি বছর পর সেটেলমেন্ট অফিসার এফ. ও. বেল এই আন্দোলনের সাফল্য দেখতে পান। ১৯৩৯ সালে তিনি লক্ষ করেন যে, সবচেয়ে গরিব রাজবংশী কৃষকও দ্বিতীয় বারের জাত শ্রেণীর পৈতা ব্যবহার করে। 'তার ঐ পৈতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে' একজন কৃষক মি. বেলকে বলে –

> কয়েক বছর আগে বাঙলা ১৩২৯ সালে (১৯২২ খ্রিঃ) তার শ্রেণীর অনেক লোক ক্ষত্রিয় সভায় যোগদান করে। আশেপাশের অনেক গ্রামের হাজার হাজার লোক দীক্ষা গ্রহণ করে। অনুষ্ঠান শুরুর আগে তারা মাথার চুল কামানোর জন্য একজন নাপিত ও মন্ত্র পড়ানোর জন্য একজন ব্রাহ্মণকে দু' টাকা আট আনা ফি দেয় ... পৈতা গ্রহণ করার পর সে ও তার শ্রেণীর লোকেরা শূকর ও মুরগির মাংস খায় না বা পালকি টানে না। এসব কাজ করে 'পালি'রা।[৩৪]

নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে পরিচালিত এসব আন্দোলনে জাতিভেদ প্রথার ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রায়ই ভালো-মন্দের প্রতিক্রিয়া দেখা দিত গভীরভাবে। তারা বর্ণের ব্যাপারে ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করেনি, বরং তারা ঐ প্রথার মধ্যে নিজেদের শ্রেণীর মর্যাদা উন্নত করতে চায়। এ কারণে ক্ষত্রিয় সভার কৃষক অনুসারীরা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে 'শুদ্ধিকৃত' শ্রেণী ও পালিদের মধ্যকার বিভেদ তুলে ধরে, কারণ পালিরা তখনও হীন ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করত। জিতু সান্যাল তার সাঁওতাল অনুসারীদের সতর্ক করে দেয়; জিতু বলে – 'তোমাদের মুরগি ও শূকর মেরে ফেল। অন্যথায় তোমরা ডোমে পরিণত হবে, তোমাদের দায়িত্ব হবে মড়াটানা।' অতঃপর 'সে নিম্ন শ্রেণীর লোক ও অস্পৃশ্যদের সম্পর্কে মারাত্মক অবজ্ঞাসূচক' কথা বলে।[৩৫] পঞ্চানন বর্মণ নিজেই ১৯৩৩ সালে কাউন্সিলে আনটাচেবিলিটি এবোলিশন বিলের (Untouchability Abolition Bill) বিরোধিতা করেন। তিনি যুক্তি উত্থাপন করে বলেন যে, বিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর 'যথেষ্ট সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও' তিনি মনে করেন যে, 'কোনো ব্যক্তি বা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অধিকার নিয়ে বিরোধ বন্ধ করতে হবে ... এ ধরনের ব্যবস্থা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্তি ও অসন্তোষের সৃষ্টি করবে – সম্প্রদায়ের অখণ্ডতা নিশ্চিত করার জন্য তা পরিহার করা উচিত।'[৩৬] ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের 'হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আনার এসব আন্দোলন তাদেরকে বাহ্যিকভাবে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক লড়াইয়ের প্রতি আরো বেশি করে আকৃষ্ট করে। জিতু সান্যালের সর্বশেষ প্রতিরোধটি হয় ঐতিহাসিক আদিনা মসজিদকে নিয়ে, ১৯৩২ সালে। জিতু ও তার অনুসারী একদল সাঁওতাল লোক এই পরিত্যক্ত মসজিদে আক্রমণ চালায় এবং ধ্বংসাবশেষের ওপর 'অশাস্ত্রসম্মতভাবে' কালী উপাসনার ব্যবস্থা করে। এ সময় পুলিশের গুলিতে জিতু নিহত হয়।[৩৭] চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের হিন্দু রাজনীতিতে আনার প্রয়াস যখন চরম আকার ধারণ করে, তখন নিম্ন শ্রেণীর লোক ও মুসলমানদের মধ্যে

অনেক আক্রমণ পাল্টা আক্রমণের ঘটনা ঘটে। ১৯৪১ সালের প্রথম দিকে 'রাজশাহীতে একটা মসজিদের সামনে গানবাদ্যসহ একটা সরস্বতী পূজা মিছিল অতিক্রম করার সময় স্থানীয়ভাবে উত্তেজনা দেখা দেয়'। সরস্বতী পূজা হল বিদ্যা দেবীর উপাসনা, প্রত্যেক বসন্তকালে অধিকাংশ ভদ্রলোক বাঙালি গৃহে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এবার 'প্রায় দু'হাজার সাঁওতাল তীর-ধনুক বা লাঠি নিয়ে মিছিলে যোগ দেওয়ায় বাড়তি উত্তেজনা দেখা দেয়'। পূজায় সাঁওতালদের এভাবে অংশগ্রহণে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, হিন্দু ধর্মের প্রতি ভঙ্গুরভাবে আনুগত্যশীল এই লোকদের ওপর ভদ্রলোক হিন্দুরা তাদের ইচ্ছানুযায়ী 'সংস্কৃতি' চাপিয়ে দেওয়ার একটি প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছে এবং পূজায় সাঁওতালদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ ধরনের অশুভ একটি প্রবণতা সম্পর্কে একজন স্থানীয় কর্মকর্তা বলেন যে, 'হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক বিবাদে সাঁওতালদের ব্যবহার করছে।'[৩৮]

দুই মাস পর বার্নপুরের কাছে নরসিংহবাদে একটা বড় ধরনের সংঘর্ষ অতি অল্পের জন্য এড়ানো যায়। গোয়ালা শ্রেণীর সদস্যরা আসানসোল থেকে বার্নপুর গো-মাংসের বাজারে গো-মাংস বহন করে নিয়ে যাওয়ায় মুসলমানদের বাধা দিতে শুরু করে, অথচ তারা 'কোনরকম আপত্তি ছাড়াই এটি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছিল'।[৩৯] একই পক্ষকালের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার সুমি থানা এলাকায় অহিরন নামক স্থানে গোয়ালারা অন্য একটা ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে। 'বিভিন্ন ঘটনার কারণে ঐ এলাকায় হিন্দু গোয়ালা ও মুসলমান প্রজাদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়।'[৪০] উত্তর বাঙলায় 'অচ্ছুৎ' লোকদের 'শুদ্ধি' করার কাজ অব্যাহত থাকে – এখানে 'চা বাগানের কুলিদের কড়া মদ পান ও গো-মাংস খাওয়া থেকে বিরত রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়'।[৪১] পূর্ব বাঙলার টিপেরা জেলার তফশিলি সম্প্রদায়ের কয়েকটি গ্রুপের লোক বিদ্যমান পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাদের পূর্ব-প্রদত্ত মর্যাদার চেয়ে একটু উচ্চতর ধর্মীয় মর্যাদা দাবি করে। স্থানীয় পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট লক্ষ করেন যে, 'ভোলাহাট, নাসিরগড় ও সরাইলের তফশিলি সম্প্রদায়ের হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার আবরণে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদেরকে তাদের কাছ থেকে খাদ্য গ্রহণের এবং তাদেরকে অস্পৃশ্য হিসেবে গণ্য না করার অনুরোধ করছে।'[৪২]

আদমশুমারিকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতামূলক ধর্মান্তরকরণ শেষ হওয়ার পরও চল্লিশ দশকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত এ অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি মাসে 'দিনাজপুর জেলার লালবাগ এলাকায় নামাজের সময় স্থানীয় মসজিদের পাশ দিয়ে সাঁওতালদের নেতৃত্বে কালী পূজা উপলক্ষে মিছিল অতিক্রম করাকে কেন্দ্র করে' মুসলমান ও সাঁওতালদের মধ্যে একটা গোলমালের আশংকা দেখা দেয়;[৪৩] ঐ একই বছর যশোরের লোহাগড়া থানা এলাকায় মিঠাপুর বাজারে নমঃশূদ্র ও মুসলমানেরা পরস্পরের বিরুদ্ধে মারাত্মক সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়:

> হাটবারের দিন নামাজ পড়ার সময় মসজিদের সামনে দিয়ে একটা মূর্তি নিয়ে যাওয়ার সময় বেশ কিছু নমঃশূদ্র গান গাচ্ছিল এবং নাচছিল। মসজিদে অবস্থানরত মুসলমানেরা

তাদেরকে চলে যেতে বলে এবং তারা চলে যায়। পরদিন প্রায় চার হাজার নমঃশূদ্র ঢাল-সড়কি নিয়ে আসে এবং মসজিদের সামনে পুনরায় নাচতে ও গাইতে থাকে। কোনরকম বাধা ছাড়াই তারা চলে যায়, কারণ 'মুসলমানেরা প্রস্তুত ছিল না'। এ ঘটনার পর মুসলমানেরা আশপাশের গ্রামের মুসলমানদের সংগঠিত করে এবং নমঃশূদ্রেরা আবার আসলে দলবদ্ধভাবে তাদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে।[৪৪]

যশোরের মুসলমান ও নমঃশূদ্ররা অতীতেও একে অপরের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক লড়াইতে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু ঐসব লড়াই ছিল পাশের গ্রামের জমি বা গরু চরানোর অধিকারের মতো সাধারণ বিরোধ নিয়ে। ১৯১১ সালে একটা বড় ধরনের দাঙ্গা হয়, ঐ দাঙ্গায় দু'জন লোক নিহত হয়। খাজনা না দেওয়ার জন্য একজন নমঃশূদ্রকে তার জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং ঐ জমি একই গ্রামের অন্য একজন মুসলমানকে দেওয়া হয় – দাঙ্গা শুরু হয় সে-কারণেই।[৪৫] অন্য এক ঘটনায় ১৯৩৬ সালে যশোর-খুলনা সীমান্তে আনন্দপুরে 'সামান্য একটা বিষয় নিয়ে লড়াই বেধে যায় – বিষয়টা ছিল মাঠে রাখাল ছেলেদের মধ্যে ঝগড়া'।[৪৬] দু'বছর পর কয়েক গ্রামের নমঃশূদ্ররা পার্শ্ববর্তী কয়েকটি মুসলমান গ্রামে আক্রমণ করে – এতে কমপক্ষে একজন মুসলমান নিহত ও বেশ কয়েক জন আহত হয়। পুলিশি তদন্তে দেখা যায় যে, ঐ দাঙ্গার কারণ হল একটা আইলকে নিয়ে কিছুদিন আগে মুসলমান ও নমঃশূদ্রদের মধ্যকার একটি ঝগড়া'।[৪৭]

কিন্তু ১৯৪৫ সালের দাঙ্গা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। কালী পূজার মিছিলে বহু সংখ্যক নমঃশূদ্রের অংশগ্রহণটাই ছিল একটি উল্লেযোগ্য বিষয়। অন্যান্য অনেক নিম্ন শ্রেণীর বাঙালিদের মতো নমঃশূদ্ররা বৈষ্ণব ধর্মমত দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে একজন নমঃশূদ্র ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব কর্তৃক 'মাতুয়া ধারা' (Matua cult) প্রতিষ্ঠার পর এ ব্যাপারটি ব্যাপকভাবে ঘটে।[৪৮] অপর দিকে, বাঙলার 'শৈব্য' ধর্মমতের মহান ঐতিহ্যের অংশ হল কালী পূজা এবং 'শৈব্য' (saivism) ও 'শাক্ত'রা কালী পূজা করত এবং এটি ছিল বাঙালি হিন্দুর উচ্চ সংস্কৃতির অংশবিশেষ।[৪৯] কালী ও দুর্গা পূজার অনুষ্ঠানের সাথে ক্রমবর্ধমানভাবে জড়িত থেকে নিম্ন শ্রেণীর লোক ও উপজাতীয়রা দেখাতে চায় যে, ধর্ম, সংস্কৃতি ও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু স্বার্থের প্রতি তারা কতটা একাত্ম; নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত হিন্দু সম্প্রদায়ের আওতায় নিম্ন শ্রেণীর লোকদের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের সদিচ্ছার একটা মানদণ্ড হিসেবেও এটি বিবেচিত হয়।

চল্লিশ দশকের শেষ দিকে নমঃশূদ্র এবং অন্যান্য নিম্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন উপজাতীয় গ্রুপ 'হিন্দু' হিসেবে 'ধর্মীয়' অধিকার প্রশ্নে মাঝে মাঝে সম্প্রদায়গত বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। মিঠাপুর বাজারের ঘটনা এ ধরনের একটা দৃষ্টান্ত। সেখানে যে নমঃশূদ্ররা মিছিল করে মসজিদ অতিক্রম করেছিল, তারাই বেশ জোরেসোরে নিজেদের নতুন 'হিন্দু' পরিচিতির কথা তুলে ধরে। যশোর জেলার নড়াইল মহকুমার জালশিতে একই ধরনের অন্য একটি ঘটনা ঘটে – 'কিছু অজ্ঞাত লোক কর্তৃক 'কালী' দেবীর মূর্তি সরিয়ে ফেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নমঃশূদ্র ও মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়'।[৫০] একই সময় নিম্ন শ্রেণীর

লোকেরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভূমিকা নিতে থাকে। বর্ধমান বিভাগের কুলটিতে মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়া একটি হিন্দু মহাবীর ঝাণ্ডা মিছিলকে মুসলমান জনতা প্রতিহত করলে দাঙ্গা বাধে। দাঙ্গা থামাতে পুলিশ গুলি চালালে চার জন নিহত হয়।[৫১] নিহত এই চার জন ছিল তফশিলি সম্প্রদায়ের।[৫২] ১৯৪১ সালে ঢাকায় সংঘটিত দাঙ্গার জের ধরে খুলনায় নমঃশূদ্র ও মুসলমানদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ বাধে। এ ঘটনায় 'অনেক লোক হতাহত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয় – একটা নমঃশূদ্র হিন্দু গ্রাম ও একটা মুসলমান গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়'।[৫৩] ঢাকা শহরের হিন্দু দাঙ্গাকারীদের মধ্যে গোয়ালারা ছিল খুব সংঘবদ্ধ।[৫৪] পাঁচ বছর পর নোয়াখালীতে বাঙলার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তাক্ত ইতিহাসের জঘন্য হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয় – হতভাগ্যদের মধ্যে অনেকেই ছিল নমঃশূদ্র; নিহতদের মধ্যে রামগঞ্জ থানার চণ্ডীপুরের একশ' একটি 'দরিদ্র নমঃশূদ্র পরিবারও ছিল'।[৫৫] দেশ-বিভাগের সময়কার দাঙ্গায় মেদিনীপুরের সাঁওতালদের ব্যাপকভাবে জড়িত থাকতে দেখা যায়। ১৯৪৭ সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী এস. রহমতুল্লাহ এ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা এভাবে বর্ণনা করেন:

> স্থানীয় হিন্দুদের উত্তেজিত করার জন্য কোলকাতা থেকে গোলযোগকারীরা আসে ... তারা ছিল ধনাঢ্য লোক এবং তারা ছিল বড় বড় ট্রাক-মালিক। তারা যুদ্ধংদেহী সাঁওতালদের ভাড়া করে, তারা (সাঁওতালরা) তীরের অগ্রভাগে আগুনের সলতে জ্বালিয়ে মুসলমানদের কুঁড়েঘরে নিক্ষেপ করে এবং মানুষজনকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে ... আমি এক উন্মত্ত সাঁওতাল জনতার মুখোমুখি হই, তাদের কাছে ছিল বড় ধনুক, তীর ও বর্শা – তারা ঢাক পিটাচ্ছিল, রণনৃত্য করছিল ও রণহুংকার দিচ্ছিল ... জীপ বা গাড়িতে করে যাওয়ার সময় কয়েক বার আমরা লক্ষ করি যে, খড়গপুর যাওয়ার রাস্তার ধারের মুসলমান গ্রামগুলোর বাড়ি বাড়ি আগুন লাগাবার জন্য সাঁওতালরা প্রজ্বলিত তীর ছুঁড়ছে। সাঁওতালদের নিবৃত্ত করার জন্য আমার ব্যক্তিগত ৩১৫ মাউসের ম্যাগনাম (315 Mauser magnum) ব্যবহার করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।[৫৬]

চল্লিশ দশকের মধ্য ভাগ থেকে হিন্দু ধর্মযোদ্ধাদের অগ্রবর্তী দল হিসেবে নিম্ন শ্রেণীর লোক এবং উপজাতীয়দের মোতায়েন করা হয়।[৫৭] শুদ্ধি অভিযান ও সংগঠন নিম্ন শ্রেণীর লোক ও উপজাতীয়দের ওপর বিশেষ কার্যকর প্রভাব বিস্তার করে বলে প্রতীয়মান হয়। পূর্বাঞ্চলের নমঃশূদ্র ও উত্তরাঞ্চলের রাজবংশী ও সাঁওতালেরা নিজ উদ্যোগেই গত কয়েক দশক ধরে উচ্চতর ধর্মীয় মর্যাদার দাবি জানিয়ে আসছিল। ভোটার হওয়া প্রধানত সমৃদ্ধ নমঃশূদ্র ও রাজবংশীরা বৃহত্তর 'হিন্দু সম্প্রদায়ে'র সাথে নিজেদের পরিচিত করার আগ্রহ আবার নতুনভাবে প্রকাশ করে। ১৯৪৬ সালের আইন সভার নির্বাচনে ভদ্রলোক রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতিও তারা তাদের একাত্মতার কথা ব্যক্ত করে। এ নির্বাচনে তফশিলি সম্প্রদায়ের ত্রিশটি আসনের মধ্যে তিনটি ছাড়া সব ক'টি আসনেই কংগ্রেস জয়লাভ করে – ১৯৩৬ সালের নির্বাচনের তুলনায় এটা একটা বিরাট সাফল্য।[৫৮] জিতু সান্যালের মতো দরিদ্র লোকেরা ক্রমেই বেশি বেশি করে 'হিন্দু সম্প্রদায়ের' হয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়, যাদেরকে তারা সদস্য করে নিয়েছিল। মূলত জিতু সান্যালের মতো লোকেরাই নিহতদের

তালিকার শিরোনামে ছিল। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের চারিত্রিক এই পরিবর্তনটিকে বাঙলা সম্পর্কে বিদ্যমান গবেষণায় উপেক্ষা করা হয়েছে এবং গবেষকেরা তাঁদের গবেষণায় মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা নিয়েই বিশেষভাবে মনোযোগী রয়েছেন।[৫৯]

ক্ষমতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ

বাঙলায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ নিয়ে আলোচনায় পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জেলার প্রধানত পল্লি এলাকার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকালয়ে সংঘটিত দাঙ্গার ওপর জোর দিতে দেখা যায়।[৬০] তবে এই সময়ের একটা কৌতূহলজনক বৈশিষ্ট্য হল – পশ্চিম বাঙলা এবং উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের নগর ও শহরের হিন্দু ভদ্রলোক প্রভাবিত এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনা বৃদ্ধি; এসব এলাকায় হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হলেও তারাই কর্তৃত্ব করত। এরকম অনেক এলাকা ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ এই প্রথম প্রত্যক্ষ করে। রাজনৈতিক পদ্ধতির পরিবর্তন নিয়ে গবেষণায় দেখা যায় যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তনের সাথে এসব এলাকায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ বৃদ্ধির একটা সম্পর্ক রয়েছে।

সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ ঘোষণার পর স্থানীয় বিষয়ে ভদ্রলোক স্বার্থের গুরুত্ব নতুনভাবে দেখা দেয় এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা শুরু হয় বেশি করে। ১৯৩৫ সালের আইনের সম্প্রদ্রায়গত বিধানগুলো জেলা ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর প্রযোজ্য ছিল না। স্থানীয় ও জেলা বোর্ড, স্কুল বোর্ড ও কমিটির মতো স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন কোনো আসন সংরক্ষণ ছাড়াই যৌথ নির্বাচনের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে সরকার মনোনীত ব্যক্তিদের জন্য গুটিকয়েক আসন পৃথক করে রাখা হয়। স্থানীয় রাজনীতিতে মাঠ পর্যায়ে সামাজিক সম্পর্কের নির্ভুল প্রতিফলন ঘটে এবং এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংঘটিত বিভিন্ন পরিবর্তনে সেটি বেশি বেশি স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। স্থানীয় নির্বাচনের ভোটাররা ছিল প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার সম্ভবত শতকরা ১৫ ভাগ। এদের সম্প্রদায়গত ভোটার হিসেবে পরিচিতি ছিল না, তাদের পরিচিতি ছিল সম্পদ ও শিক্ষার মাপকাঠিতে। যারা কমপক্ষে এক টাকা সেস বা চৌকিদারি ট্যাক্স দিত এবং যাদের গ্রাজুয়েট বা সমমানের ডিগ্রি ছিল তাদের ভোটাধিকার ছিল। তারা ছিল জেলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও উচ্চ শিক্ষিত লোকদের প্রতিনিধি।[৬১] সম্প্রদায়গত রোয়েদাদের বিধানে প্রাদেশিক রাজনীতিতে ভদ্রলোক হিন্দুদের কার্যকর ভূমিকা পালনের সুযোগ চলে গেলেও স্থানীয় ও জেলা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের প্রভাব বজায় রাখতে অসুবিধা ছিল না।

কিন্তু এখানেও উদীয়মান মুসলিম গ্রুপগুলো ভদ্রলোক কর্তৃত্বকে ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ করতে থাকে। গালাঘের পূর্ব বাঙলার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোর স্থানীয় ও জেলা বোর্ডে মুসলমান প্রতিনিধিত্বের ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধির কথা তুলে ধরেছেন।[৬২] কিন্তু তিনি একটা বিষয় লক্ষ করেননি যে, পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে হিন্দুরা সংখ্যায় বেশি থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারি প্রতিষ্ঠানে মুসলিম প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মফস্বলের সামাজিক কাঠামোয় পরিবর্তন হওয়ায় স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে

মুসলমানদের এই প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এই প্রভাব বৃদ্ধির কারণ হল এক শ্রেণীর মুসলমান কৃষকের সম্পদ বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র হলেও সরব মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্মেষ। ভালো অবস্থায় থাকা মুসলমান প্রজারা ভূমির ওপর তাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করে, আর খাজনা আদায়কারী হিন্দুদের অবস্থান শিথিল হয়ে পড়ে – প্রদেশের সর্বত্র স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলমান সদস্যদের সংখ্যা ও অনুপাত বৃদ্ধি পায়। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোতে সংখ্যানুপাতে যে পরিমাণ প্রতিনিধিত্ব তাদের পাওয়ার কথা, প্রায় ক্ষেত্রেই তারা তার চেয়ে বেশি প্রতিনিধিত্ব অর্জন করে।[৬৩] আর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু ভদ্রলোকদের পরাজিত করেই তারা ঐ অতিরিক্ত ক্ষমতা লাভ করে।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কার্যকর হবার পর এই প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায়। এ সময় ফজলুল হক সরকার স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে বেশি ক্ষমতা দেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৩৫ সালের বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ডেটরস্ এ্যাক্ট চালু করে সরকার বিভিন্ন স্থানে তিন হাজারের বেশি ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করে[৬৪] – বিদ্যমান স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এসব বোর্ড নিয়ন্ত্রণ করে। ঋণ কম হলে এবং ঋণ পরিশোধে অস্বীকৃতি জানানো হলে ঋণদাতাদের হয়ে এসব বোর্ডের ব্যবস্থা নেবার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল – ঋণদাতারা ইউনিয়ন ও স্থানীয় বোর্ডের মাধ্যমে একত্রিত হয়ে ঋণগ্রহীতাদের পাকড়াও করে তাদের অনুকূলে সমস্যার নিষ্পত্তি করতে পারত। ১৯৩৯ সালে দিনাজপুর সফরকালে মি. বেল লক্ষ করেন যে:

> ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচন এখন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ... কোথাও কোথাও সম্প্রতি পুলিশও মোতায়েন করা হয়। কারণ হল, সরকার ইউনিয়ন বোর্ডকে আগের তুলনায় অনেক বেশি কাজের দায়িত্ব দিচ্ছে বা এসব বোর্ডকে আগের তুলনায় অধিকতর সরকারি নীতি বাস্তবায়নের এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করছে ... প্রায় ক্ষেত্রেই ইউনিয়ন বোর্ড সদস্যদের মধ্য থেকেই ঋণ সালিশি বোর্ডের সদস্যদের নেওয়া হচ্ছে এবং ঋণ সালিশি বোর্ডের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। তাই জনগণ উপলব্ধি করছে যে, নিজেদের জন্য কিছু করতে হলে তাদের অবশ্যই ইউনিয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ পেতে হবে। ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচনের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাটি আসলে ঋণ সালিশি বোর্ড দখল করার প্রতিযোগিতা।[৬৫]

ইউনিয়ন ও ঋণ সালিশি বোর্ডগুলি জমিদার ও সুদ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাদের খাতকদের বিশেষ করে জোতদারদের সাথে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। বোর্ড জোতদারদের হাতে পড়লে জমিদার ও সুদ ব্যবসায়ীরা জানত যে, সালিশিতে বিলম্ব হবে এবং নানা ধরনের বাধা-বিপত্তি আসবে। এর ফলে 'ঋণ পরিশোধ না করার' মনোভাব বৃদ্ধি পাবে। উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে, বিশেষ করে রাজশাহীতে এটা খুব স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। এসব এলাকায় জোতদারেরা ছিল খুবই শক্তিশালী, 'আর ইউনিয়ন বোর্ড ও ঋণ সালিশি বোর্ডের অধিকাংশ সদস্যই ছিল জোতদার শ্রেণীর'। এসব জেলায় বেল লক্ষ করেন যে, 'বোর্ডগুলোর সদস্যদের পক্ষপাতিত্ব ছিল জমিদারদের বিরুদ্ধে ... নিষ্পত্তিতে তাদেরকে বিলম্বের শিকারে পরিণত করে, ঋণ পরিশোধের অসমর্থতাকে বড় করে দেখিয়ে এবং যারা

ঋণ পরিশোধে সমর্থ তাদেরকে বোর্ডের আশ্রয় নিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে ... এসবের ফলে ঋণ আদায়ের পরিমাণ মারাত্মকভাবে কম হচ্ছে।'[৬৬]

বোর্ডের সিদ্ধান্ত বিপক্ষে গেলে এমনকি সম্পদশালী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরও বোর্ডের কাছে প্রতিকার পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। বালুরঘাট কমিশনারের সাথে সাক্ষাৎ করে 'একজন বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা দুঃখের সাথে মন্তব্য করেন যে, কমিউনিস্ট প্রচারণা নিয়ে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ সরকার তাদের বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ডেটরস্ এ্যাক্টের প্রশাসন নিয়ে নিজেই কমিউনিজম নিয়ে এসেছে'। ঐ নেতা 'তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয় বালুরঘাট ব্যাংকে জমা রাখেন এবং সম্ভবত তা লোকসান হয়'।[৬৭] যেখানে বড় অঙ্কের টাকার বিষয় ছিল সেখানে খাতক ও ঋণদাতার এবং তাদের প্রতিনিধিত্বকারী দলের প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায় স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে দখল করা। এখন এমনকি ছোটখাট স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কাদের নিয়ে গঠিত হবে তা নিয়েও প্রাদেশিক নেতা ও দল সক্রিয়ভাবে আগ্রহ দেখাতে শুরু করে। চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার কিছুটা বিরক্তির সাথে মন্তব্য করেন যে, 'ফেনীতে স্থানীয় সদস্যগণ (আইন সভার) দাবি করেন যে, ইউনিয়ন বোর্ডের সব মনোনয়ন তাদের নিজের অনুসারীদের পেতে হবে ... তাঁরা বোর্ডের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছেন, অথচ সে-ব্যাপারে তাদের স্থানীয় বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই।'[৬৮] প্রভাবশালী অনেক ভদ্রলোক হিন্দু ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রচারণাকে সমর্থন করে এবং পূর্বে এরাই জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ইউনিয়ন বোর্ড রাজনীতি থেকে দূরে অবস্থান করছিল। তারা এখন স্থানীয় নির্বাচনে গভীর আগ্রহ দেখাতে শুরু করে। কোনরকম উচ্চবাচ্য না করে বেঙ্গল কংগ্রেস ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী বিক্ষোভ বন্ধ করে দেয়। জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলো স্থানীয় ও পৌরসভার বিষয়-আশয় নিয়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করে। ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ কংগ্রেস স্থানীয় নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। হুগলীতে দেখা যায় 'কংগ্রেস পার্টি খুবই সক্রিয় ... বিশেষ করে জেলার শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে,'[৬৯] আর ঢাকায় ঐ মাসে অনুষ্ঠেয় মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনে আসন দখলে স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরা জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।[৭০] এমনকি সামান্য ইউনিয়ন বোর্ডের মতো নির্বাচনকেও দল খুবই গুরুত্ব দিচ্ছে: 'হাওড়ায় কংগ্রেস ... প্রার্থীদের হয়ে নির্বাচন পরিচালনার জন্য দুটো নির্বাচনী কমিটি গঠন করেছে ... একটি উলুবেড়িয়া ও অপরটি সদর মহকুমার ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচনের জন্য।'[৭১] রাজশাহীতে দল একাধিক স্থানীয় ও ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছে।[৭২] ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত মেদিনীপুরেও কংগ্রেস এখন উৎসাহের সাথে নির্বাচনী প্রচারণায় যোগ দিয়েছে। ১৯৩৭ সালের মে মাসে নারাজোলের রাজা 'মেদিনীপুর স্থানীয় প্রতিষ্ঠান নির্বাচনী সাব-কমিটি' গঠনের জন্য জেলা কংগ্রেস কমিটির নেতৃত্ব দেন – এই সব কমিটির উদ্দেশ্য হচ্ছে 'নতুন গঠিত ইউনিয়ন বোর্ডের প্রার্থীদের হয়ে নির্বাচন পরিচালনা করা এবং ইতিমধ্যে গঠিত ইউনিয়ন বোর্ডকে নিয়ন্ত্রণ করা'। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মতে, 'এর কারণ সম্ভবত এই

যে, কংগ্রেস এখন উপলব্ধি করেছে যে ইউনিয়ন বোর্ড দখল করা হচ্ছে গ্রামীণ রাজনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার দখল করা।'[৭৩]

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণের প্রতিযোগিতা তীব্র হওয়ায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে চাপা উত্তেজনাও তীব্র আকার ধারণ করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মুসলমান প্রভাবিত এলাকায় পুরানো ক্ষমতাধরেরা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে হিন্দুদের এই নতুন আগ্রহে খুবই ক্ষুব্ধ হয়। ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে টিপেরায় 'ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচনে ভোট প্রদান' 'সাম্প্রদায়িক বিচার-বিবেচনায় পরিচালিত হয়। নোয়াখালী থেকে আগত মৌলভীরা চাঁদপুরে বিভিন্ন মসজিদ ও অন্যান্য স্থানে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার কথা প্রচার করে'।[৭৪] ১৯৩৭ সালের জুন মাসে ময়মনসিংহের বেতাগিরিতে স্থানীয় হিন্দুরা ইউনিয়ন বোর্ডে প্রবেশ করার উদ্যোগ নিলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মতে:

> অতীতে এ গ্রামের হিন্দুরা কংগ্রেসী বন্ধুদের পরামর্শে ইউনিয়ন বোর্ডের ব্যাপারে প্রায় কোনো আগ্রহ দেখাত না। কিন্তু এর গুরুত্ব উপলব্ধি করার পর তারা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নির্বাচিত হওয়ার উদ্যোগ নেয় এবং দুটো আসনে জয়ী হয় ... হিন্দুরা যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় সে-ব্যাপারে মুসলমানেরা অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। কোনো হিন্দুকে কোনো মুসলমান সমর্থন দিলে তার সাথে সম্পর্ক না রাখার হুমকি দেওয়া হয়। মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে একটা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে – কারণ তাদের মধ্যে একজন এক হিন্দুকে সমর্থন করে।[৭৫]

হিন্দু ভদ্রলোক প্রভাবিত এলাকায় প্রায় সময় গোলমাল দেখা দিত। এসব এলাকায় ক্রমবর্ধমান মুসলমান প্রভাব প্রতিহত করতে হিন্দু দলগুলো ব্যর্থ হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে হাওড়ার কথা বলা যায়। এখানে দুটো নির্বাচনী কমিটি গঠন করা সত্ত্বেও ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের স্থানীয় প্রতিষ্ঠান দখলের প্রয়াস 'ব্যর্থ হয়'।[৭৬] অপর পক্ষে উলুবেড়িয়ায় মুসলমানদের আসনের অংশ এক বছরের মধ্যে শতকরা ১৬.৬ ভাগ থেকে ২৫ ভাগে বৃদ্ধি পায়।[৭৭] মেদিনীপুর ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচনে ৯৮টি ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যে মাত্র ৩৭টিতে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।[৭৮] এ ধারা আরও জোরদার হয় ৩০ দশকের শেষ ও চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে – এ সময় হক সরকার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মনোনীত আসনের ওপর (মোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ) নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। এ ব্যবস্থায় সরকারের সমর্থনে মুসলমানদের আসন সংখ্যা নিশ্চিতভাবে বেড়ে যায়। বিষয়টি স্থানীয় হিন্দু ভদ্রলোকদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী জেলার কথা উল্লেখ করা যায়। এ জেলায় মুসলমানদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার চার ভাগের মধ্যে তিন ভাগের বেশি। কিন্তু প্রদেশের অন্যান্য অনেক এলাকার মতো এখানে হিন্দু প্রভাব ছিল অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বেশি। বলা হয় যে:

> হিন্দুরা আসলে একটা কষ্টকর অবস্থার মধ্যে আছে ... কারণ নির্বাচনের ফলে এবং বিলম্বিত রাজশাহী ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে মনোনয়নে দীর্ঘদিন যাবত হিন্দু জমিদার কর্তৃক দখল

করা চেয়ারম্যানের পদ প্রায় অখ্যাত এমন এক মুসলমান উকিলের কাছে চলে যাবে যিনি আইন সভায় সরকারকে সমর্থন করেন। রাজশাহী জেলায় মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, আর হিন্দু জমিদার ও ক্ষুদ্র তালুকদারেরা প্রায় সব সম্পত্তির মালিক এবং তারা সংস্কৃতি ও প্রভাব প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে, এ কথা মনে করলে এটা অস্বাভাবিক নয় যে, তাদের সংরক্ষিত এলাকায় কেউ দখলের হুমকি দিলে তা গভীর ... অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করবে।[৭৯]

চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে কংগ্রেস ও মহাসভার সম্মিলিত প্রয়াসও স্থানীয় সংস্থাগুলোকে হিন্দু নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল না, কারণ এ সময়ে সরকার মুসলমান সদস্যদের মনোনয়ন দিয়ে এসব সংস্থায় হস্তক্ষেপ করছিল। সরকারি মনোনয়নে মুসলমানদের অনুকূলে ক্ষমতার পাল্লা ভারি করা সম্ভব এবং বাস্তবে প্রায়শই তা-ই ঘটছিল। নবাবগঞ্জ থানার বুরা (Burrah) ইউনিয়ন বোর্ডের জন্য 'একজন অত্যন্ত যোগ্য হিন্দু ব্যক্তির পক্ষে' সদস্য পদের দাবি উত্থাপন করা হয় 'যিনি স্থানীয় এলাকায় হিন্দু স্বার্থের একজন দৃঢ় সমর্থক'। এ ব্যাপারে স্থানীয় এক মহাসভা কর্মী সতর্ক করে দেন যে, 'কোনভাবে সরকার যদি এই মনোনয়নের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে তাহলে একজন মুসলমান নিশ্চিতভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে যাবে। নবাবগঞ্জ থানার অধীন অধিকাংশ ইউনিয়ন বোর্ডে প্রেসিডেন্ট হল মুসলমান।'[৮০] এটা এমন এক জেলার ঘটনা যেখানে হিন্দুরা হল সংখ্যাগরিষ্ঠ। মহাসভা হতাশা প্রকাশ করে যখন তারা দেখে –

লীগ সরকারের কাছ থেকে ন্যায়বিচারের আশা কমই করে। এই সরকার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাতেও মিউনিসিপ্যালিটির আসন দখল করতে ইচ্ছুক বলে মনে হয়, এবং ডিস্ট্রিক্ট ও ইউনিয়ন বোর্ডে এই কাজ তারা আগেই করেছে। মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচিত মুসলমান কমিশনারদের চেয়ে নির্বাচিত হিন্দু কমিশনারদের সংখ্যা বেশি হলেও লীগ সরকার সম্প্রদায়গত ভিত্তিতে মনোনয়ন দিয়ে যে কোনো সময় মুসলমানদের অনুকূলে পাল্লা ভারি করতে পারে।[৮১]

বেশ কিছু মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় হিন্দুদের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে, বলতে গেলে, এক প্রকার বিতাড়িত করা হয়। ভদ্রলোক প্রভাবিত এলাকা বাকেরগঞ্জ জেলার একজন মহাসভা সদস্য অভিযোগ করেন যে, 'মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে প্রায় কোনো হিন্দু নির্বাচিত হতে পারে না। কারণ, মুসলমানেরা ভোট দেয় সম্প্রদায় ভিত্তিতে', আর লীগ সরকারের মনোনয়ন পদ্ধতি হল 'দুর্নীতি ও অসৎ স্বার্থসিদ্ধির জন্য উর্বর জায়গা'।[৮২] এক মাস পর ঐ একই ব্যক্তি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে অবহিত করে যে, 'বরিশালে শহর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে চেয়ারম্যানের পদটি হিন্দুদের দখলে ছিল, এবার তা হিন্দুদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে।'[৮৩]

স্থানীয় প্রতিষ্ঠান তথা ইউনিয়ন, স্থানীয় ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড এবং পৌরসভার পরিবর্তনশীল গঠন কাঠামোতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। আগে যেসব গ্রুপ ক্ষমতায় ছিল তারা এসব প্রতিষ্ঠানের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ

হারিয়ে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয় এবং সাধারণত ভদ্রলোকেরাই ক্ষমতা হারায়। প্রায় ক্ষেত্রেই এর ফল দাঁড়ায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ, এবং অনেক সময় তা সংঘর্ষে পরিণত হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে মালদার কথা বলা যায়। এখানে ১৯৪১ সালে অনুষ্ঠিত জেলা বোর্ডের নির্বাচন ঘুষাঘুষির কারণে স্থগিত হয়ে যায় – একটা গ্রুপ প্রিজাইডিং অফিসারের বিরুদ্ধে 'সম্প্রদায় প্রীতি'র অভিযোগ উত্থাপন করে এবং 'পোলিং সেন্টারে আক্রমণ চালিয়ে ভোটের বাক্স ভেঙে ফেলে'।[৮৪] ঐ একই নির্বাচনে সমগ্র রাজশাহী ডিভিশনের বিভিন্ন পোলিং সেন্টারে 'গুণ্ডামি' করা হয়। ঐ মাসে রংপুর জেলায় অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচনে এলাকায় 'সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে'।[৮৫] রংপুর হল একটা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা এবং এখানে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলমান আসনের সংখ্যা এ সময়ে ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।[৮৬] এটা হল এক বিশেষ ধরনের প্রবণতা যা বাঙলার বিভিন্ন এলাকার সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বৃদ্ধিতে ইন্ধন যোগায়।

স্কুল বোর্ডগুলোতেও একই ধারা পরিলক্ষিত হয় – অতীতে এসব বোর্ডে ভদ্রলোকদের প্রভাব ছিল সংরক্ষিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানো ভদ্রলোক হিন্দুদের জন্য সত্যি অসহনীয় ছিল, কারণ তারা নিজেদেরকে বাঙলার বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অভিভাবক হিসেবে গণ্য করত।

চট্টগ্রামের কমিশনার ১৯৪৩ সালের প্রথম দিকে রিপোর্ট করেন:

> চৌমুহনীতে স্থানীয়ভাবে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে – স্থানীয় হিন্দু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও মূলত তাদের দ্বারা অর্থায়িত বেগমগঞ্জ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। এর ফলে হিন্দুরা হিন্দুদের জন্য একটা প্রতিদ্বন্দ্বী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেছে ... একমাত্র বিপজ্জনক বিষয় হল; যে কোনো সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের স্কুলকে পুড়িয়ে দিতে পারে।[৮৭]

ঐ বছরের শেষ দিকে চট্টগ্রামের হিন্দুরা বারবার অভিযোগ করে যে, 'জেলা স্কুল বোর্ডের কর্মকর্তাদের শাস্তিমূলকভাবে বদলি করা হচ্ছে।'[৮৮] এমনকি ভদ্রলোকদের চিরাচরিত ঘাঁটি ঢাকাতেও হিন্দুরা তাদের হাত থেকে পৌরসভা ও স্কুলের নিয়ন্ত্রণ চলে যাওয়া রোধ করতে খুব কমই সফল হয়। তারা বড়জোর নিষ্ফল বিরোধিতা করার মাধ্যমে তাদের হতাশা ব্যক্ত করে। একজন হিন্দু সওদাগর তার 'এলাকার প্রায় সব সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে একটা মামলা দায়ের করে, ধারণা করা হয় যে তারা সব মুসলমান'; অন্য এক ঘটনায় দেখা যায় যে 'একটা স্থানীয় উচ্চ ইংরেজি স্কুলের কমিটি নির্বাচনে হিন্দুরা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং তারা প্রতিবাদ করে বেরিয়ে গেলে সব আসনই তাদের বিরুদ্ধ দলের পক্ষে চলে যায়।'[৮৯]

সরস্বতী পূজার সময় স্কুল কমিটির নিয়ন্ত্রণ হিন্দুদের জন্য থাকা বিশেষভাবে আবেগের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় – এটা ছিল বিদ্যার দেবীর বার্ষিক উৎসব এবং বিশেষভাবে ভদ্রলোকদের ঐতিহ্য। স্কুল কমিটিগুলো আর হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। প্রথা হিসেবে চালু থাকা সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠান স্কুল প্রাঙ্গণে পালন করাকে মুসলমান শিক্ষক ও ছাত্ররা চ্যালেঞ্জ

করলে স্কুল কমিটিগুলো তাদের সমর্থন করে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এটাও বিরোধের কারণ হয়ে ওঠে। রাজশাহী জেলায় এমন এক ঘটনায় দেখা যায় –

> নওগাঁর কে. ডি. এইচ. ই. স্কুলের মুসলমান ছাত্ররা এ বছর সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠানে বাধা দিয়েছে। অথচ গত ষাট বছর ধরে স্কুল প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠান হয়ে আসছিল। স্কুল কমিটি অতঃপর সিদ্ধান্ত নেয় যে, এখন থেকে স্কুল প্রাঙ্গণে আর কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের অনুমতি দেওয়া হবে না ... বিষয়টি এখন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায়ই বিদ্বেষের সৃষ্টি করছে।[৯০]

ঢাকায় একটা স্কুলের মুসলমান ছাত্ররা স্থানীয় অন্য একটা স্কুলে পূজা অনুষ্ঠানের (অতীতে এ স্কুলে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হত) বিরুদ্ধে প্রতিশোধ হিসেবে স্কুল প্রাঙ্গণে গরু কুরবানি করার হুমকি দেয়। টিচার্স ট্রেনিং কলেজের মুসলমান ছাত্ররা –

> সংলগ্ন স্কুলে পূজা উৎসব অনুষ্ঠানে আপত্তি জানায়। তারা একটা অযৌক্তিক ও অসংগত হুমকি প্রদান করে যে ঐ স্থানে যদি পূজা পালন করা হয় (অতীতের মতো) তাহলে তারাও 'কুরবানি' দেবে ... [এই অনুষ্ঠানের সময়] প্রাঙ্গণে একটা পর্দা টাঙানো হয় এবং এর ফলে কোনো গোলমাল হয়নি। তবে একটা সম্ভাবনা থেকে যায় যে, আগামী বকরা ঈদের সময় 'কুরবানি' করার অনুমতি চাওয়া হবে।[৯১]

প্রতিদ্বন্দ্বী দুই সাম্প্রদায়িক গ্রুপের মধ্যে উৎসব পালনের ব্যাপারটি স্থানীয়ভাবে ক্ষমতার পরিবর্তনের মাপকাঠির বিষয় হয়ে ওঠে। মুসলমান নিয়ন্ত্রিত স্কুল কমিটি স্কুল প্রাঙ্গণে সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠান করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করতে পারত এবং একইভাবে পৌরসভাও নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে মিছিল যাওয়ার অনুমতি দিতে অস্বীকার করতে পারত বা যেসব স্থানে ঐতিহ্যগতভাবে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান হত সেই সব সরকারি উন্মুক্ত স্থানের (পৌরসভার ব্যবহারের জন্য) ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারত। মুর্শিদাবাদের কালিন্দিতে দেখা যায় –

> একজন মুসলমান সাব রেজিস্ট্রারের কেনা বাড়ির একটি অংশ জনগণের জন্য রাস্তার প্রয়োজন দেখিয়ে পৌরসভার কমিশনারেরা অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়াতে অস্বস্তিকর অনুভূতি সৃষ্টি করেছে। মিছিলের সময় ... জেমো বাবুদের ঠাকুর রুদ্রদেব ঐ জায়গায় বিশ্রাম নিতেন। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেবতার মূর্তির বিশ্রামের জায়গাটা যাতে মুসলমানদের দখলে না যায় সেটা নিশ্চিত করা। কিছু মুসলমান এর প্রতিবাদ করেছে।[৯২]

এটা একটা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা – এখানে হিন্দু কমিশনারেরা 'পবিত্র স্থান'[৯৩] পুনরুদ্ধার করার জন্য ক্ষমতা ব্যবহার করেছে। অথচ ঐ স্থানটি একজন মুসলমানের কাছে ধর্মনিরপেক্ষ প্রক্রিয়ায় হস্তান্তরিত হয়। মুর্শিদাবাদের অপর এক ঘটনায় একই রকম মনোভাব দেখা যায় –

> পৌরসভার রাস্তার ওপর একটা গাছের ঝুলন্ত ডালের জন্য জঙ্গীপুরে একটা চেহলাম মিছিল বের হতে পারছিল না। ঐ গাছের গোড়ায় হিন্দুদের উপাসনার কিছু বস্তু ছিল ...

সেখানে কিছুটা উত্তেজনা দেখা গেল। কারণ, সাবডিভিশনাল অফিসারের অনুরোধপত্র অনুযায়ী বাধা সৃষ্টিকারী ডালগুলো সরিয়ে ফেলার জন্য জঙ্গীপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।[৯৪]

এই বিশেষ বিরোধের রেশ চলে বেশ কয়েক মাস ধরে। উভয় পক্ষই তাদের নিজের অবস্থান থেকে সরে আসতে অস্বীকৃতি জানায়। হিন্দুরা পৌরসভার চেয়ারম্যানের সমর্থনে এসে দাঁড়ায় – গাছের তলা দিয়ে মুসলমানদের মিছিল অতিক্রম করার সুযোগ দিতে 'পবিত্র অশ্বত্থ' গাছের ডাল কাটতে অস্বীকৃতি জানায়; মুসলমানেরাও অন্য কোনো রাস্তা দিয়ে মিছিল নিতে অস্বীকার করে।[৯৫] এই বিরোধ অন্য সব উৎসব ও মিছিলের ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়ে; কারণ কোনো পক্ষই অন্য পক্ষকে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী উৎসব পরিচালনায় অনুমতি দিতে স্বীকার করেনি। শহরে বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে।

এ ধরনের ঘটনায় দেখা যায় কর্তৃপক্ষ তাদের নিজ 'সম্প্রদায়ে'র কাছে পবিত্র বলে বিবেচিত সরকারি জায়গা ও বস্তু রক্ষা করতে হস্তক্ষেপ করেছে এবং উৎসব পালন করার (বা পালন থেকে বিরত থাকার) মতো ঘটনায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায় স্থানীয়ভাবে কে কতটা ক্ষমতায় আছে সেটা এমনভাবে প্রদর্শন করতে থাকে, যাতে লোকে তা প্রত্যক্ষ করে। আর যেসব জায়গায় স্থানীয় রাজনীতিকে সরাসরি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহার করার সুযোগ ছিল না সেখানে উৎসব পালন করাকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিবর্তিত ক্ষমতার ভারসাম্যে কে কোথায় অবস্থান করছে সেটা মাপার একটা উপায় বলে বিবেচনা করা হয়। শুধু নিজেদের সংহতি ও ক্ষমতা প্রদর্শনই নয়, তারা কতটা সম্পদশালী সেটা দেখানোর উপলক্ষ হয়ে ওঠে এই সব উৎসব পালন।[৯৬] যেমন ধরা যাক, স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় কতটা ধনশালী সেটা বোঝা যাবে কোনো বিশেষ উৎসবে তারা কত প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে তার ওপর। উৎসব পালনের বিষয়টি বেশ ব্যয়সাপেক্ষ; বেশিরভাগ সময়ে জায়গা ভাড়া করতে হয়, প্যান্ডেল তৈরি ও সাজাতে হয়, মূর্তি ও বেদির জন্য কারিগরদের ফরমায়েশ দিতে হয়, পূজা-অর্চনার জন্য পুরোহিতদের মোটা বকশিশ দিতে হয় এবং পূজায় অংশগ্রহণকারী সম্প্রদায়ের জন্য গণভোজের ব্যবস্থা করতে হয়। তাই বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠানের জন্য পুরো সম্প্রদায়ের যার কাছে যা আছে সবটাই এক জায়গায় জড়ো করতে হয়। পল্লি এলাকায় কোনো বড় জমিদার তার এস্টেটে উৎসব পালনের পুরো খরচ অন্যের সাহায্য ছাড়াই নিজের কাঁধে তুলে নিতে পারত, শহর এলাকায় এই খরচ সাধারণত সম্প্রদায়ের সব লোকই যৌথভাবে বহন করত। শহরের ধনী লোকেরা নিজেদের স্বার্থেই বিপুল পরিমাণ অর্থ চাঁদা দিত – এই পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তারা ধার্মিক হিসেবে প্রশংসিত ও সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করত। কম বিত্তবান লোকেরাও এ জন্য সাধ্যমতো চাঁদা দিত। উৎসব কমিটিগুলোর অর্থ সংগ্রহ শুধু সম্প্রদায়ের মধ্যে দাতাদের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগকেই প্রকাশ করত না, তাদের সম্পদ (ও উদ্দীপনা)-এর প্রকাশ ঘটাতো, যারা কিনা জনগণকে সংগঠিত করার কাজে সক্রিয় ছিল।

কিছুটা জটিল হলেও ব্রিটিশ শাসন আমলে উৎসবের মাধ্যমে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ হয়। এ ব্যাপারে ব্রিটিশদের নীতি প্রতিষ্ঠিত প্রথার ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত হত। ধর্মীয় বিষয়ে ব্রিটিশ নীতি পরিচালিত হত প্রশাসকদের 'ঐতিহ্যগত' ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ না করার মনোভাবের ওপর। ফলে কর্মকর্তারা তাদের নিজের এলাকায় স্থানীয়ভাবে যা 'প্রচলিত' ছিল সেটাকেই প্রতিষ্ঠা দিতে চেষ্টা করত। তারা সাধারণভাবে মনে করত যে, ঐ প্রথা স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসছে এবং তা ঐতিহ্যগত প্রথায় পরিণত হয়েছে। ভবিষ্যতে উৎসব পালনের সময় প্রতিষ্ঠিত প্রথা বলে কর্মকর্তাদের কাছে যা প্রতীয়মান হয়, সেটাকেই অনুসরণ করতে হয়। তবু এটা অনুসরণ করতে গিয়ে 'প্রাচীন' প্রথা বলে যাকে বিশ্বাস করা হয়েছে আসলে তা হয়ত ছিল সাম্প্রতিক উদ্ভাবনা – স্থানীয় সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের মধ্যে বিশেষ সময়ে গড়ে ওঠা কিছু সমঝোতার প্রতিফলন। দৃষ্টান্ত হিসেবে নামাজের সময় মসজিদের পাশ দিয়ে হিন্দুদের মিছিল অতিক্রম সংক্রান্ত বিধানের কথা উল্লেখ করা যায়। যখন এ বিধান করা হয় তখন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য ছিল বলে সাধারণভাবে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু স্থানীয় ক্ষমতার কাঠামো তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হওয়ায় ঐ ব্যাপারে পুনরায় আপস-মীমাংসার প্রয়োজন দেখা দেয়।

তবু এসব ছোটখাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার উদ্দেশ্য ঔপনিবেশিক প্রশাসনের ছিল না। শর্ত সাপেক্ষ ঐসব বিষয়কে প্রশাসন প্রথাগত বিষয় হিসেবে বিধিবদ্ধ করে এবং সাময়িক ব্যবস্থাকে স্থায়ী ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করে, অস্থায়ী ব্যবস্থার ওপর স্থিতাবস্থা বজায় রাখে। কিন্তু যখন স্থিতাবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত, মুসলমানেরা একটা নতুন মসজিদ নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিলে বা হিন্দুরা নতুন করে কোনো মিছিল করতে চাইলে বা আগে থেকে চালু মিছিলের পথ পরিবর্তন করতে চাইলে পদ্ধতিটা একেবারে ভেঙে পড়ত।[৯৭] এ সময় অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেয়া হত – যারা পরিবর্তনের কারণ হিসেবে ব্যবস্থাটি সত্যি সত্যি আগে থেকেই রীতি হিসেবে প্রচলিত আছে বলে দাবি করত বা কর্তৃপক্ষকে এটা বোঝাতে চাইত যে তাদের দাবিই যুক্তিযুক্ত, তাদেরকেই তা প্রমাণ করতে বলা হত। এ বিষয়ে অনুমতি পেতে সম্প্রদায়ের নেতাদের স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট বা অফিসারের ওপর প্রভাব খাটানোর প্রয়োজন হয়। স্থানীয় ও ইউনিয়ন বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকদের জন্য ব্যাপারটা সহজ হয়। এর অর্থ হল এই যে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অতি সামান্য পরিবর্তনের সাথেও গভীরভাবে এই প্রশ্ন জড়িয়ে পড়ে – স্থানীয় ক্ষমতার কাঠামো কারা নিয়ন্ত্রণ করে এবং কারা জনমতের কোলাহলপূর্ণ প্রকাশ ঘটায় এবং কারা এই বিতর্কের জোরালো প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম। কোন্ পথ দিয়ে মিছিল যাবে – আপাত দৃষ্টিতে এমন সামান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও এটা বাস্তবতা হয়ে দেখা দেয়, কারণ ঐ বিষয়টাই আস্তে আস্তে বিরোধের মূল বিষয়ে পরিণত হয়ে পড়ে। কোনো সম্প্রদায়ের নতুন মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত, একটা নতুন মন্দির বা মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত বা কুরবানি করার জন্য গরুর সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত, তাদের কর্তৃত্ব ও মর্যাদার প্রতীকে পরিগণিত হয়। এই সময়ে

প্রায় ক্ষেত্রেই উৎসব পালনের নতুন নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপনের চেষ্টা স্থানীয় পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক বিরোধের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

হিন্দুপ্রধান যেসব এলাকায় হিন্দুদের কর্তৃত্ব ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল, সেসব এলাকায় এ ধরনের বিরোধ বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পশ্চিম বাঙলার প্রাণকেন্দ্র বর্ধমান এমন একটা এলাকা। অতীতে 'হিন্দু ধর্মের শক্ত ঘাঁটি' হিসেবে পরিচিত বর্ধমান হল প্রদেশে হিন্দু ভদ্রলোকদের সর্বশেষ দুর্গের একটি। এ জেলার অধিকাংশ এলাকা ছিল বর্ধমানের মহারাজাদের জমিদারির অংশ; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে যে ভদ্রলোক সমাজের সূত্রপাত, এই জেলায় সেটি পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে।[৯৮] বিশ শতকের শেষ দিকে বর্ধমান শহরের ভদ্রলোক সমাজ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে অশোক মিত্র উল্লেখ করেন যে,

> এখনকার মতো বর্ধমানের বাসিন্দারা আগে চিন্তা করত না যে, বর্ধমানে অর্জিত অর্থ তারা কোলকাতায় নিয়ে গিয়ে সেখানে বাড়ি নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। তারা বর্ধমানে বাড়ি নির্মাণ করে সেখানে অর্থ উপার্জন ও বিনিয়োগে বিশ্বাসী ছিল। কোলকাতার মতো তারা বর্ধমানেও একই রকম সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শহরকেন্দ্রিক পরিবেশের সন্তুষ্টি পাওয়ার আশা করত। শহরটি তার সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংস্কৃতির জন্য যথেষ্ট গর্ব বোধ করত।[৯৯]

পরবর্তী দশকে বর্ধমানের জনজীবনে মধ্যবিত্ত মুসলমানেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে এখানকার ভদ্রলোকদের নিরাপত্তা ও আত্মতুষ্টির অনুভূতিতে ধস নামে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলমান সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯৩০-৩১ এবং ১৯৩৬-৩৭ সালের মধ্যে কাটোয়া মহকুমায় এই হার বৃদ্ধি পায় শতকরা প্রায় ২৮ ভাগ থেকে প্রায় ৪০ ভাগে।[১০০] হক সরকারের নীতি ছিল স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মনোনীত আসন নিজের সমর্থকদের দিয়ে পূরণ করার। এর ফলে পৌরসভার রাজনীতিতে মুসলমানেরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং বর্ধমানের হিন্দুরা যে 'পুর-পরিবেশে'র জন্য গর্ব করত তা ভেঙে পড়ে।[১০১] অর্থনৈতিক মন্দার দশকের প্রভাবও বর্ধমানের পল্লি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি মহারাজাকেও তাঁর জমিদারি থেকে আদায় আকস্মিকভাবে হ্রাস পাওয়ার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। এক বছরে তাঁর একটা বড় এস্টেটের খাজনা আদায়ের পরিমাণ শতকরা ৪২ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২৪ ভাগে এসে দাঁড়ায়।[১০২] বর্ধমানের সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা দীর্ঘ দিন ধরে যে ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি ভোগ করে আসছিল, এ বছরগুলোতে তাতে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

সাম্প্রদায়িক বিরোধ থেকে পুরোপুরি মুক্ত বর্ধমান জেলায় ত্রিশের দশক থেকে উত্তেজনার লক্ষণগুলো ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। বর্ধমানে সাম্প্রদায়িক বিরোধের কারণ অবশ্যই কোনো না কোনো সম্প্রদায়ের উৎসব পালনে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রয়াস। এ ধরনের প্রথম ঘটনাটি ঘটে ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে – এ সময় কালনা মহকুমার দেয়ারা শহরের মুসলমানেরা একটা গরু কুরবানি করে বকরা ঈদ উৎসব পালন করে। দেয়ারা শহরে আগে কখনো কুরবানি করা হয়নি। এ ঘটনায় কালনার হিন্দুরা উত্তেজিত হয়

এবং এটাকে তারা মুসলমান সম্প্রদায়ের উসকানিমূলক কাজ বলে মনে করে।[১০৩] সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কুরবানি করার মধ্য দিয়ে শুধু সমৃদ্ধিই নয়, তাদের মধ্যে সৃষ্ট নতুন আস্থার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।[১০৪] নিঃসন্দেহে আগ বাড়িয়ে ক্ষমতা দেখানোর জন্যই এটা করা হয়েছে। হতে পারে, আইন-আল-ইসলামের 'গরু ও হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক পুস্তিকার মতো পুস্তিকা পড়ে তারা গরু কুরবানিতে উৎসাহিত হয়। ঐ পুস্তিকায় গরু কুরবানিকে ধর্মীয় কর্তব্যের একটা প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে যুক্তি উপস্থাপন করে বলা হয় যে, হিন্দুরা মূর্তি পূজা বন্ধ না করা পর্যন্ত মুসলমানেরা যেন গরু কুরবানি করা থেকে বিরত না থাকে।[১০৫] এ ঘটনায় সারা জেলায় বেশ উত্তেজনা দেখা দেয়। বর্ধমান শহরের হিন্দুরা এর প্রতিশোধ গ্রহণ করে – তারা জোরপূর্বক মুসলমানদের গরু কুরবানি থেকে বিরত রাখে। এটা ছিল স্থানীয় 'প্রথার' সুস্পষ্ট লংঘন। কারণ, বর্ধমানের মুসলমানেরা বকরা ঈদের সময় ঐতিহ্যগতভাবে প্রতি বছর গরু কুরবানি দিয়ে আসছিল। এই ঘটনার পর একটা হিংসাত্মক সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হলেও[১০৬] দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে চাপা ক্ষোভ কিন্তু বিরাজ করতেই থাকে। পরের বছরে কালনা পৌরসভা দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের এই পৌরসভা বোর্ডে মুসলমান কমিশনারেরা আসন গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।[১০৭] ১৯৩৭ সালে লীগ-কৃষক প্রজা সরকার গঠন হওয়ার পর উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে। 'মুসলমান রাজা'র অধীন হওয়ার বিরুদ্ধে বর্ধমানের হিন্দুরা তুলনামূলকভাবে জোর প্রতিবাদ জানায়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আশংকা প্রকাশ করেন –

> বিশেষ করে কালনা শহরে একদল লোক যেভাবে বাঙলার বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ জানাচ্ছে ... তা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়িয়ে দেবে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সরকারের ওপর মুসলমানদের পূর্ণ আস্থা আছে এবং বিদ্বেষপরায়ণতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মন্ত্রীদের প্রত্যাখ্যান করার এক শ্রেণীর হিন্দুর প্রয়াসকে তারা ঘৃণা করবে।[১০৮]

তাঁর আশংকা সঠিক প্রমাণিত হয়। পরবর্তী বছরে দুর্গা পূজার প্রতিমা বিসর্জন অনুষ্ঠানের সময় মসজিদের সামনে বাজনা বাজানোকে কেন্দ্র করে বর্ধমান শহরে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এই মিছিলের আয়োজন করে কয়েকটি 'সার্বজনীন' (সকল বর্ণের হিন্দু) গ্রুপ। এখানেও একটা নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয় এবং এর ফলেই হাঙ্গামা শুরু হয়: 'কোলকাতার রীতি অনুসরণ করে এই প্রথমবার বর্ধমানে সার্বজনীন দুর্গা পূজার প্রচলন করা হয় ... মতামতের দিক থেকে যাদের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য এমন প্রায় সকল নেতৃস্থানীয় হিন্দু এই পূজার আয়োজন করে।'[১০৯] আগে যেমনটি দেখা গেছে, তেমনি জাতিকে সংঘবদ্ধকরণ আন্দোলনের (caste consolidation campaign) আড়ালে সাম্প্রদায়িকতার আলামত ছিল। প্রকৃতপক্ষে সার্বজনীন পূজা দল কর্তৃক আয়োজিত নতুন এই পূজার অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে বর্ধমানের মুসলমানদের বিরুদ্ধে দ্বিগুণভাবে উত্তেজনাকর বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ঐ সন্ধ্যায় ৮টা ৪০ মিনিটের সময় বড় বাজার এলাকার মসজিদের

সামনে মিছিল উপস্থিত হয়। এই মিছিলে বাঁশি ও ঢোল বাজানো হচ্ছিল। এ সময় মসজিদের মধ্যে মুসলমানেরা নামাজ পড়ছিল। তারা এটা দেখে রাগান্বিত হয় এবং উভয় পক্ষই সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ সংবাদ খুব দ্রুত বেড়িখানা মসজিদে গিয়ে পৌঁছায়। সেখান থেকে একদল মুসলমান লাঠি নিয়ে ছুটে আসে এবং ঐ পথ দিয়ে প্রতিমা নিয়ে যেতে দিতে বাধা দেয়। উভয় পক্ষে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় – মুসলমানেরা দৃঢ়তার সাথে জানায় যে, মসজিদের সামনে কোনো সময় বাজনা বাজানো যাবে না। হিন্দু মিছিলকারীরা রাস্তার পাশে মূর্তি ফেলে রেখে অত্যন্ত রেগেমেগে ঐ স্থান ত্যাগ করে। স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট এই ঘটনায় হস্তক্ষেপ করেন। মুসলমানেরা শেষ পর্যন্ত রাত দশটার পর মসজিদের সামনে বাজনা বাজানোর অনুমতি দিতে সম্মত হয়। অতঃপর অতি দেরিতে গভীর রাতে মিছিলকারীরা ঐ পথ দিয়ে মিছিল করে চলে যায়।[১১০]

সাম্প্রদায়িকভাবে বিভক্ত উভয় পক্ষের কাছে সার্বজনীন পূজার বিষয়টি বিরোধের ক্ষেত্রে একটি নতুন উল্লেখযোগ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে সর্বসাধারণের উপাসনার ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপনের লক্ষ্যে দুর্গা পূজার উৎসবকে কাজে লাগায়। ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টে দেখা যায়, ঐ বছরের আগে পর্যন্ত বড় মসজিদের পাশ দিয়ে রাত সাড়ে আটটা বা ন'টার পর বাজনাসহ মিছিল অতিক্রম করতে দেওয়া হত, কিন্তু এখন এই ঘটনাকে মুসলমানেরা গণ্য করল একটা প্ররোচনা হিসেবে। তারা ভাবল যে, হিন্দুরা হয়ত বা তাদের 'পবিত্র সময়'-এর মেয়াদ বাড়াতে এটা করছে। প্রথমে তারা কোনো সময়েই বাজনা বাজাতে দিতে অস্বীকার করে এবং পরে রাত দশটার পর বাজনা বাজানোর অনুমতি দেয়। পুরো ঘটনাটিতে বর্ধমানের সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের নতুন আত্মবিশ্বাসের এবং যে কোনো হিন্দু প্ররোচনাকে চ্যালেঞ্জ করার অভূতপূর্ব মানসিকতার প্রকাশ ঘটে। হিন্দুদের উদ্দেশ্য ছিল মিছিলের মধ্য দিয়ে 'হিন্দু সম্প্রদায়ের' সব শ্রেণীর মধ্যে নব আবিষ্কৃত ঐক্যের শক্তি প্রদর্শন করা। মসজিদের সামনে উচ্চস্বরে বাজনা বাজিয়ে হিন্দুরা, যারা দেখছে ও শুনছে, নিঃসন্দেহে তাদের সবার কাছে এটা প্রমাণ করতে চায় যে তারা এখনো তাদের নিজের এলাকায় প্রভুত্ব করে। কিন্তু লাঠি ব্যবহারকারী উন্মত্ত মুসলমান জনতার মুখে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়, অথচ এক সময় এ শহরকে তারা তাদের নিজেদের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করত। এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মুসলমানদের অনুকূলে ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তিত হচ্ছে। মুসলমানেরা মসজিদের সামনে বাজনা বাজাবার আগের নির্ধারিত সময়কে আরও সীমিত করে তারা যে নতুন ও বৃহত্তর প্রতীকী এলাকা অতন্দ্র তত্ত্বাবধান করার ক্ষমতা অর্জন করেছে সেটা দেখানোর চেষ্টা করে এবং এলাকাটিকে তাদের নিজস্ব এলাকা বলে দাবি করে।

পরবর্তী বছরে কালী পূজার সময় যখন একই রকম বিরোধ ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেটি আর বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল না। এ সময়টা ছিল মুসলমানদের রমজান মাস। এ মাসে 'হিন্দুদের মিছিল বের করা নিয়ে আগে থেকেই হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট বিরোধ ছিল'। একটা ভয়াবহ সংঘর্ষ বাধার আশংকায় মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক খুব তাড়াতাড়ি

মহারাজার সাথে একটা সমঝোতা করার জন্য বর্ধমান ছুটে যান। তাঁদের মধ্যে সমঝোতা হয় যে, সন্ধ্যা সাতটার আগে দেবীর বিসর্জনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে – এর ফলে রমজানের নামাজ বিঘ্নিত হবে না।[১১১] হিন্দু উৎসব পালনের জন্য অনুমোদিত নির্ধারিত সময় সংক্ষিপ্ত করার ক্ষেত্রে বর্ধমানের মুসলমানেরা আর একবার সফল হল। পরদিন হিন্দু পত্রিকা *দৈনিক বসুমতী* এক সম্পাদকীয়তে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকার প্রতিবাদ করে:

> রমজানের নামাজের পবিত্রতার জন্য হক সরকার অতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করল, কিন্তু হিন্দুদের ধর্মের ব্যাপারে তারা তেমন ব্যবস্থা গ্রহণ করল না ... হক সরকার গঠিত হওয়ার পর ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে যেসব অহিন্দু উৎফুল্লভাবে চিৎকার করে, হক সাহেবও কি তেমনি মনে করেন যে, ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে?[১১২]

'ইসলামি শাসনে'র জুজুর ভয় ভদ্রলোকদের কাছ থেকে ঘৃণা মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার একটা সুপরিকল্পিত প্রয়াস। কারণ, সেটি ছিল ভদ্রলোকদের সাম্প্রদায়িক আদর্শের মূল বিষয়গুলির মধ্যে একটি। বর্ধমানের হিন্দুরা এ বিষয়ে সচেতন ছিল যে, হক ও নাজিমুদ্দিন সরকারের মন্ত্রীদের আশ্রয়ে মুসলমানেরা ক্রমাগতভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠছে, আর 'মুসলিম স্বেচ্ছাচার' শব্দটি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সেই অশুভ বার্তা যুতসইভাবে প্রকাশ করা যায়।

একই ধরনের ঘটনা অন্যান্য হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোতেও ঘটে। ১৯৩৪ সালে ২৪ পরগণা জেলার কাকদ্বীপ থানায় মোল্লারচকে একটা বড় ধরনের বিরোধ বাধে। কোলকাতা মহানগরীর একেবারে কাছাকাছি অবস্থিত ২৪ পরগণা জেলা রাজধানী শহরের ভদ্রলোক পরিবেশের (milieu) কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লালন করে। বর্ধমান জেলার মতো ২৪ পরগণা জেলাও ছিল অন্যদের জেলার চেয়ে অধিক নগরকেন্দ্রিক এবং এখানে প্রচুর শিক্ষিত হিন্দুর বাস ছিল।[১১৩] কিন্তু স্থানীয় রাজনীতির ওপর শিক্ষিত হিন্দুদের প্রভাব প্রতি বছরই শিথিল হয়ে আসছিল। এমনকি বর্ধমান জেলার চেয়ে ২৪ পরগণা জেলায় স্থানীয় বোর্ডগুলোতে মুসলমান সদস্য সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায় (সারণি ৫)। বশিরহাট ও বারাসাত মহকুমায় জনসংখ্যার আনুপাতিক হারের থেকে মুসলমান সদস্য ছিল অনেক বেশি।[১১৪] ১৯৩২ সাল নাগাদ মুসলমানেরা বারাসাত বোর্ডে হিন্দু সদস্যদের সাথে সমতা অর্জন করে, যদিও এটা ছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা।

১৯৩৩ সালে উত্তর কোলকাতার বেহালায় একটা বড় ধরনের কলহ সৃষ্টি হয়। বকরা ঈদের সময় 'কুরবানি করার জন্য একদল মুসলমান শাপোরের দিকে কিছু পশু নিয়ে যাচ্ছিল। বেশ কিছু হিন্দু ও শিখ এ সময় তাদের ওপর পূর্ব পরিকল্পিত আক্রমণ চালায়'।[১১৫] এতে দু'পক্ষের মধ্যে যে মারামারি হয় তাতে বহু লোক মারাত্মক আহত হয়। ১৯৩৪ সালে ডায়মন্ড হারবার মহকুমার কাকদ্বীপ থানার কাছে মোল্লারচরে এক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এখানে 'মুসলমানেরা গরু কুরবানি করার ইচ্ছার কথা ঘোষণা করে ... আর হিন্দুরা (সংখ্যাগরিষ্ঠ) তা বন্ধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে'।[১১৬] এখানে আবারও দেখা গেল

দৃষ্টান্ত স্থাপন করার সেই প্রয়াস এবং তার পরিণতি হল দাঙ্গা। কমিশনারের মতে, 'সম্পূর্ণ ধর্মীয় অনুভূতি থেকেই এই বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। এর আগে এখানে কোনো সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা যায়নি। গরু কুরবানি করার ইচ্ছায় হিন্দুরা ক্রুদ্ধ হয়। গরু কুরবানিকে তারা হিন্দুপ্রধান এলাকাকে অপবিত্র করার নজিরবিহীন কাজ হিসেবে গণ্য করে এবং তাদের অতি উৎসাহের কাছে তাদের বিচারবুদ্ধি পরাজিত হয়েছে।'[১১৭] পার্শ্ববর্তী মেদিনীপুর জেলাতেও ১৯৩৫ সালে একই ধরনের ঘটনা ঘটে। খড়গপুরের বারহোলা থানায় সামান্য একটা ঘটনা থেকে বিরোধ ছড়িয়ে পড়ে। কারণ, মুসলমানেরা গরু কুরবানি করার জন্য নতুন উদ্যোগ নিলে 'হিন্দুদের অনুভূতিতে মারাত্মকভাবে আঘাত লাগে'।[১১৮] বর্ধমান ও ২৪ পরগণা জেলার মতো মেদিনীপুরও ছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা এবং ভদ্রলোক রাজনীতির প্রধান ঘাঁটি।

সারণি ৫ : ২৪ পরগণা জেলার স্থানীয় বোর্ডসমূহে মুসলমান সদস্য : ১৯৩০-৩১ থেকে ১৯৩৬-৩৭ পর্যন্ত

স্থানীয় বোর্ড	মুসলমান সদস্যদের শতকরা ভাগ				
	১৯৩০-৩১	১৯৩১-৩২	১৯৩২-৩৩	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৬-৩৭
সদর	২৫	২৫	৩০	৩০	৩০
ডায়মন্ডহারবার	১৯	১৯	৩১.২	৩১.২	৩১.২
বারাসাত	৪০	৪০	৫০	৫০	৫০
বশিরহাট	৩৩.৩	৩৩.৩	৪১.৬	৪১.৬	৪৬.৬
ব্যারাকপুর	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০

[illegible] বোর্ডস্ ইন বেঙ্গল, আলীপুর, ১৯৩১ টু ১৯৩৭।

এ তিনটি জেলায় একই ধরনের ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, স্থানীয় রাজনীতিতে ভদ্রলোক হিন্দুদের অংশগ্রহণ যখন ক্রমাগত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করতে থাকে তখন স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতার ভারসাম্যের সামান্য পরিবর্তন যতটা গুরুত্বপূর্ণ হবার কথা তার থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোর হিন্দু ভদ্রলোকেরা আশা করেছিল যে, প্রাদেশিক পর্যায়ে তারা যে ক্ষমতা হারিয়েছে সেটা তারা স্থানীয় পর্যায়ে অধিকতর ভূমিকা রেখে পুষিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু তা অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয়। এর পরিবর্তে তারা দেখতে পায়, সব ক্ষেত্রেই তারা মুসলমানদের কাছে হেরে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে, উৎসব পালনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের নতুন দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ছিল বিশেষভাবে প্ররোচনামূলক। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, কুরবানি প্রতিরোধ করতে ভদ্রলোকদের প্রবল প্রতিরোধকে ধর্মের প্রতি সাংঘাতিক অবমাননা রোধের প্রচেষ্টা হিসেবে

বিবেচনা করা উচিত হবে না, কারণ বর্ধমান শহরে কুরবানি ছিল একটি প্রচলিত রীতি। গো-রক্ষা আন্দোলনে আর্য সমাজবাদীরা বাঙলায় কখনও জনগণকে তেমনভাবে সংগঠিত করতে পারেনি। বলা যায়, ভদ্রলোকদের ঐ প্রতিরোধ বরং তাদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অক্ষমতাকেই তুলে ধরে। সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় যখন প্রথমবারের মতো কুরবানি দিতে শুরু করে তখন এটা তাদের ক্রমবর্ধমান মর্যাদা ও ব্যাপক রাজনৈতিক প্রভাবের প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়। হিন্দুদের দৃষ্টিতে, ঐতিহ্যগতভাবে হিন্দু প্রভাবিত এলাকায় গরু কুরবানি, প্রতীকী হলেও, একটা শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। তাই তারা এটার প্রতিরোধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। ফজলুল হক ও নাজিমুদ্দিন সরকারের আমলে কোলকাতার 'মুসলিম' সরকারের হস্তক্ষেপ থেকে ভদ্রলোকদের স্থানীয় দুর্গকে রক্ষা করা ক্রমাগতভাবে কষ্টকর হয়ে পড়ে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে প্রদেশে 'মুসলিম স্বেচ্ছাচার'কে গ্রহণের অস্বীকৃতির সংকল্প আরও দৃঢ় হয়। সুতরাং এটা বিস্ময়কর নয় যে, ১৯৪৭ সালে এই তিন জেলা থেকেই প্রবলভাবে একটা পৃথক 'হিন্দু আবাসভূমি' সৃষ্টির আন্দোলন শুরু হয়।

টীকা

১. *দি কমপ্লিট ওয়ার্কস্ অব স্বামী বিবেকানন্দ*, খণ্ড ৫, কোলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১৬৭। উদ্ধৃত, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *কাস্ট, পলিটিক্স এ্যান্ড দি রাজ*, পৃ. ১২৩।

২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা*, পৃ. ৮৪৪।

৩. বাঙলার জাতিগত কাঠামোর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রথম অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪. অস্পৃশ্যতা সংশোধনী বিল (আনটাচেবিলিটি এমেন্ডমেন্ট বিল) সম্পর্কে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের বিতর্ক, জিওআই, হোম পলিটিক্যাল ফাইল নং ৫০/৭/৩৩।

৫. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *কাস্ট, পলিটিক্স এ্যান্ড দি রাজ*, পৃ. ৯৮-৯৯।

৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮-৯৯।

৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১।

৮. ১৯৩১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর আলবার্ট হলে নগেন্দ্রনাথ দাশের বক্তৃতার রিপোর্ট, জিবিএসবি 'পিএম' সিরিজ, ফাইল নং ৬২১৮/৩১।

৯. তনিকা সরকার, 'জিতু সাঁওতাল'স মুভমেন্ট ইন মালদা, ১৯২৪-৩২: এ স্টাডি ইন ট্রাইবাল প্রোটেস্ট', *সাবলটার্ন স্টাডিজ ৪*, নিউ দিল্লী, ১৯৮৫, পৃ. ১৫২।

১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৩৬।

১১. তনিকা সরকার, *বেঙ্গল ১৯২৮-১৯৩৪*, পৃ. ৩১; আরও দেখুন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, *সত্যাগ্রহ'স ইন বেঙ্গল*, পৃ. ১৫৯-১৬৪।

১২. বিশেষ করে নমঃশূদ্র শ্রেণীর সমিতিগুলো বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তির বিনিময়ে ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। অধ্যায় ১ দেখুন। হিন্দু সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যে, মুসলমান মৌলভীরা নিম্ন শ্রেণীর লোকের গ্রামগুলোতে সবাইকে ধর্মান্তরিত

করেছে। এসব রিপোর্ট কোলকাতার ভদ্রলোকদের মধ্যে উদ্বেগের কারণ হয়। দেখুন, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, *লাইফ এ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্সেস অব এ বেঙ্গলি কেমিস্ট*, পৃ. ৫২৯-৫৩০।

১৩. সেন্সাস কমিশনার ১৯৩১ সালে তফশিলি সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার প্রকৃত তথ্য দিতে ব্যর্থ হন। কিন্তু সাইমন কমিশন তাদের সংখ্যা ১১.৫ মিলিয়ন বলে উল্লেখ করে। বাঙলা সরকার ১৯৩২ সালে এই সংখ্যা ১১.২ মিলিয়ন বলে রিপোর্ট প্রদান করে। দেখুন, এস. কে. গুপ্ত, *দি সিডিউলড় কাস্টস্ ইন মডার্ন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স*, নিউ দিল্লী, ১৯৮৫. পৃ. ৬৮।

১৪. সাহেবি/বনেদি পার্থক্য সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন রবীন্দ্র রায়, *দি নক্সলাইটস্ এ্যান্ড দেয়ার আইডিওলজি*, পৃ. ৭০।

১৫. রজত রায় যুক্তি দেখান যে, অভ্যন্তরীণভাবে ভদ্রলোক সমাজ অভিজাত ও গৃহস্থ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। দেখুন রজত রায়, *সোসাল কনফ্লিক্ট এ্যান্ড পলিটিক্যাল আনরেস্ট ইন বেঙ্গল ১৮৭৫-১৯২৭*, পৃ. ৩০-৩২।

১৬. *লোক গণনা ও বাঙলার হিন্দু-সমাজ*, ৫ই আশ্বিন, ১৯৩১, *সেন্সাস অব ইন্ডিয়া*, খণ্ড ৫, ১৯৩১, পৃ. ৩৯৫।

১৭. *অমৃত বাজার পত্রিকা*, ২১শে মার্চ, ১৯৩৯।

১৮. জিবি এসবি 'পিএইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫০১/৩৯।

১৯. পত্র নং ১৩৬০/৫৪-৪০, এসপি মালদা থেকে গোয়েন্দা শাখার স্পেশাল এ্যাসিস্ট্যান্টের কাছে, ২১শে আগস্ট ১৯৪০, জিবি এসপি 'পিএইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫২২/৩৮।

২০. এটা বিস্ময়কর যে, কমিউনিস্ট প্রভাবিত দিনাজপুর ও রংপুর জেলার বর্গাদারদের তেভাগা আন্দোলন পার্শ্ববর্তী মালদা জেলায় কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি।

২১. জিবি এসপি 'পিএইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫০৫/৩৯। আরও দেখুন, *অমৃত বাজার পত্রিকা*, ৭ই জানুয়ারি ১৯৩৯।

২২. দেখুন, *অমৃত বাজার পত্রিকা*, ২৭শে মার্চ, ১৯৩৯। সমিতির সেক্রেটারি ১৯৩৯ সালের ১৬ই মে, ১৯৩৯ *আনন্দ বাজার পত্রিকা*-র কাছে আবেদনপত্র পাঠায়, ঐ আবেদনে হিন্দু নেতাদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়: 'হিন্দু ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন ভারতীয় ধর্মে দীক্ষিত উপজাতীয়দের পরবর্তী আদমশুমারিতে যেন হিন্দু হিসেবে তালিকাভুক্ত করার চেষ্টা হয়।' মেমো তাং ২০.৫.৩৯, জিবি এসপি 'পিএইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫০৫/৩৯।

২৩. *অমৃত বাজার পত্রিকা*, ৩রা এপ্রিল ১৯৩৯।

২৪. *জলাচল* শ্রেণী হল এমন এক শ্রেণী যাদের স্পর্শে কোনকিছু অপবিত্র হয় না, তবে তাদের কাজ কোনো সম্মানিত ব্রাহ্মণ করে দেবে না।

২৫. হার্বার্ট থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১, এফআর, লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২/১২৫/৪১।

২৬. বর্ধমানের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, মার্চ, ১৯৪১। জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ১৩/৪১।

২৭. রাজশাহী ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, মার্চ ১৯৪১, *প্রাগুক্ত*।

২৮. এক্সপ্রেস পত্র নং ২৪৬ সি থেকে উদ্ধৃত, বাঁকুড়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থেকে বাঙলা সরকারের হোম পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত সচিবের কাছে লিখিত, ৩রা মার্চ ১৯৪১ – বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, মার্চ ১৯৪১, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ১৩/৪১।

২৯. প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, এপ্রিল ১৯৪১, *প্রাগুক্ত*।

৩০. জাতিভেদ প্রথার মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নের বর্ণনা করার জন্য 'স্যাঙ্গকৃটাইজেশন' কথাটা প্রথম ব্যবহার করেন এম. এন. শ্রীনিবাস। দেখুন, এম. এন. শ্রীনিবাস, *'রিলিজিয়ন এ্যান্ড সোসাইটি এমোঙ্গ দি কুর্গস অব সাউথ ইন্ডিয়া*, অক্সফোর্ড, ১৯৫২; এবং 'এ নোট অন স্যাঙ্গকৃটাইজেশন এ্যান্ড ওয়েস্টার্নাইজেশন', *কাস্ট ইন মডার্ন ইন্ডিয়া এ্যান্ড আদার এসেজ*, বোম্বে, ১৯৬২। এই সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেন ডেভিড হার্ডিম্যান, *দি কামিং অব দি দেবী: আদিবাসী এসারসান ইন ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া*, দিল্লী, ১৯৮৭, পৃ. ১৫৭-১৬৩। 'হিন্দু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক স্বার্থে' চালিত করার উদ্দেশ্যে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের উচ্চ শ্রেণীর ধর্মীয় আচার-প্রথা অনুসরণ করার জন্য উচ্চ শ্রেণীর লোক কর্তৃক উৎসাহ প্রদান করাকে বোঝাতে এই পরিভাষাটিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

৩১. লুইস ডিউমাউন্ট (Louis Dumount), *হোমো হায়ারার্কিকাস (Homo Hierarchicus)*, পৃ. ১৪৩।

৩২. তনিকা সরকার, 'জিতু সান্যাল'স্ মুভমেন্ট ইন মালদা', পৃ. ১৩৭।

৩৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩।

৩৪. এফ. ও. বেল, 'নোটস্ অন রুরাল ট্রাভেলস্ ইন দিনাজপুর, ১৯৩৯', পৃ. ১০-১১; এফ. ও. বেলস্ পেপার্স, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর ডি/৭৩৩/২।

৩৫. তনিকা সরকার, 'জিতু সান্যাল'স্ মুভমেন্ট ইন মালদা' পৃ. ১৫২; 'ডোম'রা অস্পৃশ্য, তারা ঝাড়ু দেওয়া, ময়লা পরিষ্কার করার কাজ করে।

৩৬. আনটাচেবিলিটি এ্যাবোলিশন বিলকে নিয়ে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের বিতর্ক, জিওআই, হোম পলিটিক্যাল ফাইল নং ৫০/৭/৩৩।

৩৭. তনিকা সরকার, 'জিতু সান্যাল'স্ মুভমেন্ট ইন মালদা' পৃ. ১৫৬।

৩৮. রাজশাহী ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, ফেব্রুয়ারি ১৯৪১, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ১৩/৪১।

৩৯. বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, এপ্রিল ১৯৪১, *প্রাগুক্ত*।

৪০. প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, *প্রাগুক্ত*।

৪১. রাজশাহী ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, *প্রাগুক্ত*।

৪২. টিপেরায় পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্টের সাপ্তাহিক গোপন রিপোর্ট, চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের রিপোর্টের সাথে সংযুক্ত, *প্রাগুক্ত*।

৪৩. রাজশাহী বিভাগের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, জানুয়ারি ১৯৪৫, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৩৭/৪৫।

৪৪. প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, এপ্রিল ১৯৪৫, *প্রাগুক্ত*।

৪৫. এ দাঙ্গার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কমিউনিটি ফরমেশন এ্যান্ড কমিউনাল কনফ্লিক্ট – নমঃশূদ্র-মুসলিম রায়ট ইন যশোর, খুলনা', *ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, খণ্ড ২৫, ৪৬, ১৭ই নভেম্বর ১৯৯০।

৪৬. প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, এপ্রিল ১৯৩৬, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৫৬/৩৬।

৪৭. জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ২৪৮/৩৮।

৪৮. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কমিউনিটি ফরমেশন এ্যান্ড কমিউনাল কনফ্লিক্ট', পৃ. ২৫৬৩।

৪৯. বাঙলায় বৈষ্ণববাদ ও শৈব্যবাদ (Saivism)-এর সামাজিক সমর্থক সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন বারবারা সাউদার্ড, 'দি পলিটিক্যাল স্ট্রাটেজি অব অরবিন্দ ঘোষ', পৃ. ৩৫৩-৩৭৬।

৫০. প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, মে ১৯৪৫। জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৩৭/৪৫।

৫১. হার্বার্ট থেকে লিনলিথগো-র কাছে প্রেরিত, ৮ই অক্টোবর ১৯৪০; এফআর, লিনলিথগো কালেকশন, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২৫/৪০।

৫২. তালিকাভুক্ত মৃত ব্যক্তিদের নাম হল সমর মাহাতো, আনমল তেওয়ারী, মোহন চামার এবং খেয়ালী কৌরী, জিবি এসবি 'পিএইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫৪৩/৪৪।

৫৩. হার্বার্ট থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, টেলিগ্রাম, ২০শে মার্চ ১৯৪১। জিওআই হোম পলিটিক্যাল ফাইল নং ৫/২৫/৪১।

৫৪. সুরঞ্জন দাশ, 'কমিউনাল রায়টস্ ইন বেঙ্গল' পৃ. ২৮৬-২৮৮।

৫৫. ড. এস. পি. মুখার্জীর কাছে সারভ্যানটস্ অব বেঙ্গল সোসাইটির পেশকৃত স্মারকপত্র। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পেপার্স, ২-৪ দফা, ফাইল নং ৮২/১৯৪৭, এনএমএমএল।

৫৬. এস. রহমতুল্লাহ মেমোয়ার্স, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর এফ/১২৮/১৪(ক)।

৫৭. নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও উপজাতীয়রা তাদের এই 'হিন্দু হওয়া'র প্রক্রিয়াকে কিভাবে ব্যাখা করত ও নিজেদের মধ্যে ধারণ করত তার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না (সম্ভবত জিতু সান্যালের বিষয়টি ছাড়া), তবে বিষয়টি নিয়ে আরও ব্যাপক গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

৫৮. উল্লেখ্য যে, নির্বাচনে বাঙলার তফশিলি সম্প্রদায়ের ভোটারদের উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ভোটারদের মতো হিন্দু মহাসভাকে সমর্থন করার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ ছিল না। তারা সবাই কংগ্রেসকে ভোট দেয়। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের সংগঠিত করার কাজে মহাসভার ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে 'শুদ্ধি' আন্দোলনের অনেক নেতার উভয় সংগঠনের সাথে যোগাযোগ ছিল। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, '*কাস্ট, পলিটিক্স এ্যান্ড দি রাজ*', পৃ. ১৫৮-১৫৯। তবু কংগ্রেসের আসন নয়, এমন তিনটি আসন লাভ করে স্থানীয় তিন জন জনপ্রিয় নেতা, তাদের সাথে মহাসভার যোগাযোগ ছিল বলে জানা যায় না। 'ফ্রাঞ্চাইজ, ইলেকশানস্ ইন বেঙ্গল, ১৯৪৬', আইওএলআর, এল/পি এ্যান্ড জে/৮/৪৭৫।

৫৯. উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য যে, সুরঞ্জন দাশ ইচ্ছাকৃতভাবে নমঃশূদ্র ও মুসলমানদের মধ্যকার দাঙ্গার বিষয় তথ্য কম থাকার কারণে এড়িয়ে গেছেন, যদিও তাঁর পুস্তকে ঐ সময়ের বড় বড় দাঙ্গার ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা আছে, সুরঞ্জন দাশ, *কমিউনাল রায়টস্ ইন বেঙ্গল*, পৃ. ৩।

৬০. দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখুন সুগত বসু, 'দি কিশোরগঞ্জ রায়টস্'; তাজুল ইসলাম হাশমি, 'দি কমিউনালাইজেশন অব দি ইস্ট বেঙ্গল পিজ্যান্ট্রি, ১৯২৩-২৯', পৃ. ১৭১-২০৪; তনিকা সরকার, 'কমিউনাল রায়টস্ ইন বেঙ্গল'; এবং পার্থ চ্যাটার্জী, 'এ্যাগ্রেরিয়ান রিলেশনস্ এ্যান্ড কমিউনালিজম ইন বেঙ্গল'। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় পূর্ব বাঙলার ময়মনসিংহ, পটুয়াখালী, পোনাবালিয়া, ঢাকা ও নোয়াখালীর সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এবং পশ্চিমের মাত্র একটি জেলা কোলকাতার সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। বইটির প্রথম মানচিত্র যেটিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রধান প্রধান জেলা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি দেখলে গবেষণার ভৌগোলিক ও সাম্প্রদায়িক ঝোঁকটি কোন দিকে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে। সুরঞ্জন দাশ, *কমিউনাল রায়টস্ ইন বেঙ্গল*।

৬১. *ইউনিয়ন বোর্ড ম্যানুয়াল*, খণ্ড ১, আলিপুর ১৯৩৭। বিশেষভাবে দেখুন, অধ্যায় ২, সেকশন ৭।

৬২. জে. এ. গালাঘের, 'কংগ্রেস ইন ডিক্লাইন', পৃ. ৬০১-৬০৭।

৬৩. হাওড়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী ও ২৪ পরগণার স্থানীয় বোর্ডের মুসলমান সদস্যের সংখ্যার জন্য দেখুন, *রেজুলিউশনস্ রিভিউইং দি রিপোর্টস্ অন দি ওয়ার্কিং অব ডিস্ট্রিক্ট, লোকাল এ্যান্ড ইউনিয়ন বোর্ডস ইন বেঙ্গল ডিউরিং দি ইয়ার ১৯৩০-৩১ টু ১৯৩৬-৩৭*, আলীপুর, ১৯৩১-৩৭।

৬৪. আজিজুল হক, *দি ম্যান বিহাইন্ড দি প্লাউ*, পৃ. ১৬৯।

৬৫. এফ. ও. বেল, 'নোটস্ অন রুরাল ট্রাভেলস্ ইন দিনাজপুর, ১৯৩৯', পৃ. ৬৮। এফ. ও. বেল পেপার্স, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর ডি/৭৩৩/২। বেল-এর ট্যুর ডাইরিতে দিনাজপুর জেলার ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

৬৬. 'এগ্রেরিয়ান সিচুয়েশন ইন দি বালুরঘাট সাব-ডিভিশন', রাজশাহীর কমিশনার এ জে ড্যাস (A.J. Dash)-এর একটি নোট, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ১৯১/৩৯।

৬৭. *প্রাগুক্ত*।

৬৮. চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, অক্টোবর ১৯৩৭, *প্রাগুক্ত*।

৬৯. বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, ডিসেম্বর, ১৯৩৭, *প্রাগুক্ত*।

৭০. *ঢাকা বিভাগের কমিশনারের রিপোর্ট, প্রাগুক্ত*।

৭১. *প্রাগুক্ত*।

৭২. রাজশাহী বিভাগের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, ডিসেম্বর ১৯৩৭, *প্রাগুক্ত*।

৭৩. মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, মে ১৯৩৭, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ১০/৩৭।

৭৪. চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, ডিসেম্বর ১৯৩৭, *প্রাগুক্ত*।

৭৫. ময়মনসিংহ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট, ঢাকা বিভাগের কমিশনারের রিপোর্টের সংযুক্তি, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, জুন ১৯৩৭, *প্রাগুক্ত*।

৭৬. বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, ডিসেম্বর ১৯৩৭, *প্রাগুক্ত*।

৭৭. *রেজুলেশনস্ রিভিউইং দি রিপোর্টস্ অন দি ওয়ার্কিং অব ডিস্ট্রিক্ট, লোকাল এ্যান্ড ইউনিয়ন বোর্ডস্ ইন বেঙ্গল, ফর দি ইয়ারস্ ১৯৩৪-৩৫ এ্যান্ড ১৯৩৬-৩৭*-এর এ্যাপেন্ডিক্স 'জি' থেকে মুসলমান প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য থেকে হিসাবকৃত সংখ্যা।

৭৮. বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, জুন ১৯৩৭, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ১০/৩৭।

৭৯. রিড-এর থেকে লিনলিথগোর কাছে প্রেরিত, ২০শে আগস্ট, ১৯৩৯; এফআর রবার্ট রিড পেপার্স, আইওএলআর এমএসএস ইইউআর ই/২৭৮/৫।

৮০. আটককৃত পত্র, এন. সি. সরকারের কাছে নিরঞ্জন সরকারের লেখা, ২০শে এপ্রিল ১৯৪২, জিবি এসবি 'পিএইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫২৩/৪০।

৮১. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর কাছে শরৎচন্দ্র গুহ, ৫ই ডিসেম্বর ১৯৪৪; শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পেপার্স, ২-৪ কিস্তি, ফাইল নং ৯০/১৯৪৪-৪৫।

৮২. *প্রাগুক্ত*।

৮৩. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর কাছে শরৎচন্দ্র গুহ, ১০ই জানুয়ারী ১৯৪৫, *প্রাগুক্ত*।

৮৪. রাজশাহী বিভাগের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, নভেম্বর ১৯৪১, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ১৩/৪১।

৮৫. *প্রাগুক্ত*।

৮৬. ১৯২৬-২৭ এবং ১৯৩৬-৩৭ সনের মধ্যে দশ বছরে রংপুর জেলার স্থানীয় বোর্ডগুলোতে মুসলমানদের আসন বৃদ্ধি পায় শতকরা ৫১.৮ ভাগ থেকে শতকরা ৬৪.৮ ভাগে। কুড়িগ্রাম মহকুমায় ১৯৩৭ সালে মুসলমানেরা ৭৫ শতাংশ আসন দখল করে। *রেজুলেশনস্ রিভিউইং দি রিপোর্টস্ অন দি ওয়ার্কিং অব ডিস্ট্রিক্ট, লোকাল ও ইউনিয়ন বোর্ডস্ ইন বেঙ্গল ডিউরিং দি ইয়ার ১৯২৬-২৭ এ্যান্ড ১৯৩৬-৩৭*, আলিপুর, ১৯২৭ এবং ১৯৩৭-এর এপেনডিকস্ জি থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে হিসাবকৃত।

৮৭. চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, জানুয়ারি, ১৯৪৩, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৩৯/৪৩।

৮৮. চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, জুন ১৯৪৩, *প্রাগুক্ত*।

৮৯. ঢাকা বিভাগের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, মে ১৯৪৫, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৩৭/৪৫।

৯০. রাজশাহী বিভাগের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, জানুয়ারি ১৯৪৫, *প্রাগুক্ত*।

৯১. ঢাকা বিভাগের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, ফেব্রুয়ারি ১৯৪১, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ১৩/৪১।

৯২. প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, মার্চ ১৯৪২। জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৩১/৪২।

৯৩. সাম্প্রতিক দাঙ্গা নিয়ে আলোচনার সময় আনন্দ ইয়াং (Ananda Yang) ও সান্দ্রিয়া ফ্রাইটাগ (Sandria Frietag) 'পবিত্র স্থান' ও 'পবিত্র সময়' – এ দুটো ধারণা উদ্ভাবন করেন। দেখুন, আনন্দ এ. ইয়াং, 'স্যাকরেড সিম্বল এ্যান্ড স্যাকরেড স্পেস', পৃ. ৫৭৬-৫৯৬ এবং সান্দ্রিয়া বি. ফ্রাইটাগ, *কালেকটিভ এ্যাকশন এ্যান্ড কমিউনিটি, পাবলিক এরেনাজ এ্যান্ড দি ইমারজেন্স অব কমিউনালিজম ইন নর্থ ইন্ডিয়া,* বার্কলি, লস এঞ্জেলস্ এ্যান্ড অক্সফোর্ড, ১৯৮৯, পৃ. ১৩১-১৪৭।

৯৪. প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৩৭/৪৫।

৯৫. প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, এপ্রিল এবং প্রথম পক্ষ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৩৭/৪৫।

৯৬. একটা ধর্মীয় গ্রুপের নানামুখী পরিচিতিকে একত্র করে 'সম্প্রদায়'কে সক্রিয় ও আত্মসচেতন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎসবের ভূমিকা প্রসঙ্গে সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে, উৎসবকে সান্দ্রিয়া ফ্রাইটাগ দেখেন সম্প্রদায়ের 'রূপক' হিসেবে এবং 'একটা নির্দিষ্ট স্থানে অংশগ্রহণকারীদের পাশাপাশি অবস্থান'-এর কারণে উৎসবের মধ্য দিয়ে নানা ধরনের পৃষ্ঠপোষক দলগুলিকে সক্রিয় করে তুলতে এবং ধর্মীয় পবিত্র স্থান নিরূপণে সম্প্রদায়গত অনুভূতি সৃষ্টিতে এই সব রূপক সহায়ক বলে যুক্তি দেখান। সান্দ্রিয়া বি. ফ্রাইটাগ, 'রিলিজিয়ার্স রাইটস্ এ্যান্ড রায়টস্', পৃ. ৮৮-৮৯। একইভাবে ভিক্টর টার্নার 'সম্প্রদায়গত' চেতনা সৃষ্টিতে উৎসবের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন; এবং যারা এই অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয় তারা নিজেদের সমজাতীয়, কাঠামোহীন ও স্বাধীন সম্প্রদায় হিসেবে চিন্তা করে। ভিক্টর টার্নার, *ড্রামাস, ফিল্ডস এ্যান্ড মেটাফোরস্*। এই উভয় আলোচনাতেই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেকার সম্পর্কের চেয়ে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে উৎসবের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; এ আলোচনায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের চেয়ে একই সম্প্রদায়ের মধ্যে একীকরণের dynamics নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আমরা বরং উৎসবকে সম্প্রদায়ের শক্তি ও বিরোধের প্রকাশভঙ্গি হিসেবে লক্ষ করব।

৯৭. ধর্মকে নিয়ে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কিছু প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছেন ক্যাথেরিন এইচ. প্রিয়র (Katherin H Prior), 'দি ব্রিটিশ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব হিন্দুইজম ইন নর্থ ইন্ডিয়া, ১৭৮০-১৯০০', ইউনিভার্সিটি অব ক্যাম্ব্রিজ, পিএইচ ডি ডিসারটেশন, ১৯৯০।

৯৮. ১৯১০ সালে বর্ধমানের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগের বেশি ছিল হিন্দু, এর মধ্যে বর্ধমানের রাঁঢ়ী ব্রাহ্মণেরা ছিল তৃতীয় বৃহৎ হিন্দু শ্রেণী (১৯১০)। ঐ বছর জেলার শতকরা ৫৮ ভাগ লোক তাদের জীবন ধারণের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল। জে. সি. কে. পিটারসন, *বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার,* আলিপুর, ১৯১০।

৯৯. অশোক মিত্র, *'থ্রি স্কোর এ্যান্ড টেন'*, খণ্ড ১, *দি ফার্স্ট স্কোর এ্যান্ড থ্রি*, কোলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৪২।

১০০. *রেজুলেশন রিভিউইং দি রিপোর্টস্ অন দি ওয়ার্কিং অব ডিস্ট্রিক্ট এ্যান্ড লোকাল বোর্ডস ইন বেঙ্গল*, নির্দিষ্ট বছরগুলোর তথ্য থেকে নির্ণীত হিসাব।

১০১. আবুল হাশিম তাঁর স্মৃতিকথায় বর্ধমানে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের কথা এবং ঐ প্রভাবকে হিন্দুদের মর্যাদার সাথে গ্রহণের অস্বীকৃতির কথা উল্লেখ করেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি ১৯৪১ সালের জেলা বোর্ডের নির্বাচনের কথা উল্লেখ করেন। এ সময় 'নির্বাচিত জেলা বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে কংগ্রেস দল ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ ... পাঁচ জন মুসলিম লীগ সদস্য ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত করে'। দীর্ঘ আলোচনার পর উভয় পক্ষই হিন্দু চেয়ারম্যান ও মুসলমান ভাইস চেয়াবম্যান নির্বাচনে সম্মত হয়। কিন্তু ভোট গ্রহণের সময় দেখা যায়, কংগ্রেস নেতা হওয়া সত্ত্বেও 'বোর্ডের হিন্দু সদস্যরা মৌলভী আবুল হায়াতকে ভোট দিতে অস্বীকাব করে'। পরের বছর মুসলিম লীগ তার নিজের প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে সফল হয়। আবুল হাশিম, *ইন রিট্রোসপেকশন*, ঢাকা, ১৯৪৭, পৃ. ২৪-২৬।

১০২. 'খাজনা মওকুফ আন্দোলন' নিয়ে স্থানীয় কর্মকর্তাদের মিটিং-এর রিপোর্ট, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ২৮৩/১৯৩৮।

১০৩. জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ১৪৩/৩৫।

১০৪. কুরআনের বিধান মোতাবেক উট, গরু বা ছাগল ইত্যাদি কুরবানি করা যায় – এটা নির্ভর করে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের আর্থিক সচ্ছলতার উপর। আনুপাতিক হারে ধনী লোকেরাই বকরা ঈদের সময় গরু কুরবানি করে।

১০৫. আইন-আল-ইসলাম খন্দকার, *গরু ও হিন্দু-মুসলমান*, আইওএলআর পিপি বিইএল ডি-৬; পিআইবি ৫৩/১।

১০৬. জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ১৪৩/৩৫।

১০৭. বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, দ্বিতীয় পক্ষ, জুন ১৯৩৬, জিবি এইচসিপিবি ফাইল নং ৫৬/৩৬।

১০৮. বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের রিপোর্ট, এলওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, আগস্ট ১৯৩৭, জিবি এইচসিপিবি, ফাইল নং ১০/৩৭।

১০৯. জিবি এইচসিপিবি, ফাইল নং ১০/৩৯।

১১০. *প্রাগুক্ত*।

১১১. জিবি এইচসিপিবি, ফাইল নং ৩/৩৯।

১১২. *দৈনিক বসুমতী*, ১২ই নভেম্বর ১৯৩৯।

১১৩. *সেন্সাস অব ইন্ডিয়া*, ১৯৩১, খণ্ড ৫, পৃ. ২৮৪-২৮৭।

১১৪. *সেন্সাস অব ইন্ডিয়া*, ১৯৩১, খণ্ড ৫, পৃ. ৩৮৯।

১১৫. জিবি এইচসিপিবি, ফাইল নং ১১৭/৩৪।

১১৬. জিবি এইচসিপিবি, ফাইল নং ১১৭/৩৪।

১১৭. জিবি এইচসিপিবি, ফাইল নং ৩৭০/৩৮।

১১৮. জিবি এইচসিপিবি, ফাইল নং ১৪৩/৩৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দ্বিতীয় বারের বাঙলা বিভাগ ১৯৪৫-৪৭

সর্ব-ভারতীয় প্রয়োজন এবং বিভক্তি

বাঙলার উদ্ভূত ঘটনাবলি এ পুস্তকেব মূল বিবেচ্য হলেও তা সর্ব-ভারতীয় পর্যায়ে ঘটে যাওয়া বিষয়ের বিশাল চিত্রেরই অংশ। এসব ঘটনা বাঙলার ঘটনাবলিকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে এবং একইভাবে বাঙলাব ঘটে যাওয়া বিষয়গুলি সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে। এই পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াব সর্ব-ভারতীয় মাত্রা (dımensıons) সম্পর্কে আলোকপাত করা এ গবেষণার লক্ষ্য নয়। তবু সর্ব-ভারতীয় মঞ্চে ঘটে যাওয়া নাটকীয় পরিবর্তন থেকে আলাদা করে গত দু'বছরের ব্রিটিশ শাসনাধীন বাঙলাকে নিয়ে আলোচনা কবা সম্ভব নয়। এটা সর্বজনবিদিত যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে এটলিব লেবার পার্টি ক্ষমতাসীন হওয়ায় ভারতের ব্যাপারে ব্রিটিশ নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। যুদ্ধের সময় চার্চিলের নেতৃত্বে জাতীয় সরকারের প্রথম অগ্রাধিকার ছিল যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতকে ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগানো এবং ভারতের ভবিষ্যতের বিষয়টি হিমাগারে রেখে দেওয়া। ১৯৪০ সালের ৮ই আগস্ট লিনলিথগোর ঘোষণায় শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির জন্য এই পূর্বশর্ত আরোপ করা হয় – অগ্রগতির পন্থার ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমানদের একমত হতে হবে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একমত হতে ব্যর্থ হওয়ার প্রেক্ষাপটে যুদ্ধ শেষ না হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রশ্ন বিবেচনা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ব্রিটিশরা যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করে। ১৯৪২ সালের ক্রিপস্ মিশনকে লন্ডনের প্রভুদের পরিকল্পিত একটা জনসংযোগ কাজ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না – সফল হওয়া এ মিশনের উদ্দেশ্য ছিল না।[১] শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নটি ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের কাছে বিবেচ্য বিষয় করে তোলার জন্য ওয়াভেলের নাছোড়বান্দা প্রয়াসও ব্যর্থ হয়।[২] কিন্তু এটলি ক্ষমতা গ্রহণের পর অগ্রাধিকারভিত্তিক কাজে পরিবর্তন আসে; সিমলা সম্মেলনের পর দ্রুততার সঙ্গে ১৯৩৬-৩৭ সালের পর ভারতে নির্বাচন হয় এবং কেবিনেট মিশনের আগমন ঘটে। ব্রিটিশ ক্ষমতা হস্তান্তর করবে কি না এটা আর আলোচনার বিষয় ছিল না – বরং কত দ্রুত, কার কাছে এবং কী শর্তে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে, এটাই ছিল আলোচনার বিষয়।

পাকিস্তানের দাবিতে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ব্রিটিশদের দৃষ্টিভঙ্গিতে অত্যন্ত কার্যকর বলে প্রমাণিত হয় – যদিও এ প্রস্তাবের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল অস্পষ্ট। যুদ্ধের পর দ্ব্যর্থক এই দাবির বিপদ ব্রিটিশ নীতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায় এবং তা ক্রমবর্ধমানভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জিন্নাহ ও মুসলিম লীগ সুবিধাজনক মিত্র হলেও ব্রিটিশেরা ভারতের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চাচ্ছিল; ব্রিটিশেরা ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তারা ভীষণ বিব্রত অবস্থার মধ্যে পড়ে যায়। লন্ডনের অগ্রাধিকার ছিল ভারতে এমন এক উত্তরাধিকারীকে খুঁজে বের করা যে সুয়েজের পূর্বাংশে ব্রিটিশের কৌশলগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় সক্ষম। এ জন্য প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ ভারত, শক্তিশালী কেন্দ্র ও অবিভক্ত সৈন্যবাহিনী। ক্ষমতা ধরে রাখার প্রশ্নে পাকিস্তান, রাজন্যবর্গ ও অন্যান্য বিভক্তিমূলক বিষয়গুলো অত্যন্ত সুবিধাজনক বলে প্রমাণিত হয়। ঐসব বিষয় ক্ষমতা হস্তান্তরকালে ধীরে ধীরে বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনের ফলাফল, এবং মুসলমান ভোটাররা লীগের পক্ষে যে রায় দেয় তার প্রেক্ষাপটে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে কেন্দ্রীয় আপস-মীমাংসায় লীগ ও জিন্নাহকে উপেক্ষা করা লন্ডন ও দিল্লীর পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। অনেক কারণে যত শীঘ্র সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে লন্ডন ছিল খুবই আগ্রহী।[৩] সুতরাং আপস-মীমাংসার বিষয়টির জন্য আর অতীতের মতো ঢিলেঢালা সময়সূচি রাখা হল না; যেসব পক্ষ ও বিষয় সমস্যার দ্রুত সমাধানের পথে বাধার কারণ হতে পারে সেসবকে যতদূর সম্ভব বাদ দেওয়া হল। আলোচনার জন্য একটি কার্যকরভাবে ত্রিপাক্ষিক কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করা হল – ব্রিটিশদের পক্ষে কথা বলার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ। বাঙলার জন্য এটা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বেঙ্গল কংগ্রেস ও সর্ব-ভারতীয় হাই কমান্ডের মধ্যে সম্পর্ক কতটা সন্দেহপূর্ণ ছিল তা পূর্বের অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হয়েছে। ত্রিশ দশকের শেষের দিকের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের পর বাঙলায় যে কংগ্রেস টিকে থাকে সেটি কেন্দ্রের শিখণ্ডীতে পরিণত হয়। কেন্দ্রের আলোচনায় বাঙলার মুসলমান নেতাদের কার্যকরভাবে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। চল্লিশের দশকে প্রাদেশিক সরকারের দুর্বল ভূমিকার কারণে তাদের সামান্যই গ্রহণযোগ্যতা ছিল এবং দিল্লীর ওপর তাদের প্রভাব ছিল তাই অল্প।[৪] কেন্দ্রে দর কষাকষির জন্য সমানাধিকারের দাবির প্রতিনিধি হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান প্রদেশগুলো জিন্নাহর কাছে যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, বাঙালি মুসলমান রাজনীতিকদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল সন্দেহপূর্ণ। তিনিও যতদূর সম্ভব তাদের কাছ থেকে নিজের দূরত্ব বজায় রাখতেন। তাই এটা ধারণা করা অসম্ভব নয় যে, নিজের পরিকল্পনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার উর্ধ্বে জিন্নাহ বাঙালি মুসলমানদের স্বার্থ ও দাবিকে কেন্দ্রে তুলে ধরবেন।

তবু সর্ব-ভারতীয় পর্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়ায় প্রাদেশিক রাজনৈতিক চাপ একটা ভূমিকা পালন করে। কংগ্রেস হাই কমান্ড যখন দেশ-বিভাগের ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং খণ্ডিত পাকিস্তানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন তারা বেঙ্গল কংগ্রেসের ইচ্ছাকে পদদলিত করেনি, বরং বেঙ্গল কংগ্রেস তাদের দৃঢ় সমর্থন দিয়েছে। বাঙালি হিন্দুরা সব

সময় তাদের প্রদেশকে (বাঙলা) নিজের প্রদেশ বলে গণ্য করে – এ প্রদেশে স্থায়ীভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের শাসনে থাকার ধারণায় তাদের ক্রমবর্ধমান অনিচ্ছার কথা আগের অধ্যায়গুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে। ১৯৪৬ সালের শেষ দিকে এবং ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে এই অস্বীকৃতি এমন দৃঢ় সংকল্পে পর্যবসিত হয় যে, বাঙলাকে অবশ্যই ভাগ করতে হবে এবং হিন্দুরা অবশ্যই নিজেদের জন্য কেটেছেঁটে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ সৃষ্টি করবে। এর অর্থ হল, পশ্চিম ও উত্তর বাঙলার হিন্দু-প্রধান জেলাগুলো নিয়ে নতুন এক প্রদেশ সৃষ্টি করা যেখানে হিন্দুরা হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাঙালি হিন্দু রাজনীতির অভ্যন্তরীণ গতিপ্রকৃতির থেকে এই দৃঢ় সংকল্পের উৎপত্তি ঘটে; তবু দেখা যায়, এর সফলতা কেন্দ্রের কংগ্রেসের সমর্থনের ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। প্রাদেশিক ভদ্রলোক রাজনীতি ও কংগ্রেস হাই কমান্ডের অগ্রাধিকারের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীল এই প্রতীকী সম্পর্ক ১৯৪৭ সালে বাঙলা ভাগকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দান করে।

১৯৩৭ সালে বিভিন্ন প্রদেশে দায়িত্ব গ্রহণের সময় কংগ্রেস হাই কমান্ড সরকার গঠনে কোয়ালিশন নীতি গ্রহণে অস্বীকার করে। এর পরিবর্তে নেতৃত্ব প্রদানের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে কংগ্রেস চাপ সৃষ্টি করে যে, আইন সভায় নিরঙ্কুশভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া প্রদেশগুলোতে সে এককভাবে সরকার গঠন করবে। যেসব দল নির্বাচনী ঐক্য করেছিল তারা ক্ষমতায় অংশীদার হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে তাদের স্বতন্ত্র দলীয় পরিচিতি বিসর্জন দিয়ে কংগ্রেসের সাথে মিলে যেতে বলা হয়। যুক্ত প্রদেশে জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ১৩৪টি আসনের মধ্যে ২৭টি আসনে জয়লাভ করে, বাকি আসন লাভ করে কংগ্রেস। কিন্তু কংগ্রেস তার নির্বাচনী ঐক্য ভঙ্গ করে বলে যে, প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকারে যোগ দিতে চাইলে তাদের স্বতন্ত্র সংগঠন ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দিতে হবে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, যুক্ত প্রদেশের মুসলিম লীগ ও জিন্নাহর কাছে এই শর্ত গ্রহণযোগ্য হয়নি।[৫] একইভাবে, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোর মধ্যে যেখানে কংগ্রেসের সরকার গঠনের সুযোগ ছিল না সেখানে অন্য কোনো স্থানীয় দলের সাথে মিলে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে প্রাদেশিক কমিটিগুলোকে নিষেধ করা হয়। একই নীতি বাঙলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। এখানে স্থানীয় কংগ্রেস আইন সভায় দল হিসেবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। স্থানীয় নেতৃবর্গ, বিশেষ করে শরৎ বসু, কৃষক প্রজা পার্টির সাথে মিলে কোয়ালিশন সরকার গঠনের অনুমতির জন্য কংগ্রেসের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু কেন্দ্র তাদের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে।[৬] বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস আড়াই বছর সরকার পরিচালনা করে। বিরোধী দলে থাকার সময় যা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল, সেই সব বিষয় নিয়ে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা সমস্যায় পড়ে। কংগ্রেস যেসব গ্রুপের প্রতিনিধি বলে নিজেকে দাবি করে সেই সব ভিন্ন স্বার্থের সব গ্রুপকে সন্তুষ্ট করা যে কতটা কষ্টকর তার তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় ঐসব মন্ত্রিসভার। দলে ভেতর ও বাইরে থেকে কৃষি সংস্কারের দাবি ওঠে। প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠনও গঠিত হয় – সমাজের দুর্বল ও গরিব শ্রেণীর লোকদের জন্য কথা বলার কংগ্রেসের দাবি নিয়েও তারা প্রশ্ন তোলে। জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে কংগ্রেসের বাড়তি দাবিকে চ্যালেঞ্জ

করা শুরু করে আন্দোলনরত কিষান সভা, ক্রমবর্ধমান বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও বামপন্থী দলগুলো। চল্লিশের দশকে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আগের তুলনায় অনেক বেশি স্পষ্টভাবে ডানপন্থী অবস্থান গ্রহণ করে দলীয় নেতৃত্ব বামপন্থীদের চাপের মুখে পড়ে। অপর দিকে, সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মনিরপেক্ষ অভিভাবক হিসেবে দলের দাবি মুসলিম লীগের ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। উভয় ক্ষেত্রে হাই কমান্ড তাদের বিরোধী পক্ষের বৈধতা ও আন্তরিকতা অস্বীকার করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে; এমনকি জাতীয়তাবাদের প্রতি তাদের অঙ্গীকার নিয়েও হাই কমান্ড প্রশ্ন তোলে। এই অহমিকাপূর্ণ আচরণের জন্য কংগ্রেসের সমালোচকেরা আরো কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে। দলের ভেতর ও বাইরের বামপন্থীরা সব শ্রেণীর লোকের পক্ষে নেতৃবৃন্দের কথা বলার দাবির বিরুদ্ধে অবিরামভাবে আক্রমণ চালায়। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলনে জিন্নাহ ও মুসলিম লীগ ক্রমশ আগের চেয়ে অনেক বেশি অনমনীয় হয়ে ওঠে।

যখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ভারত ত্যাগ করতে ব্রিটিশ মনস্থির করে ফেলেছে, তখন কংগ্রেসই যে তার একমাত্র যথার্থ ও একক উত্তরাধিকারী, এই দাবির বিরুদ্ধে সব মহল থেকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস 'সাধারণ' হিন্দু নির্বাচনী এলাকায় খুবই ভালো করে; কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের দাবি প্রমাণে সে ব্যর্থ হয় (সারণি ৬)। কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে মুসলিম লীগ মোট মুসলমান ভোটের মধ্যে শতকরা ৮৬.৭ ভাগ ভোট পায়; অথচ এর বিপরীতে কংগ্রেস পায় শতকরা মাত্র ১.৩ ভাগ। প্রদেশগুলোতে সব মুসলমান ভোটের মধ্যে মুসলিম লীগ ভোট পায় শতকরা ৭৪.৭ ভাগ, আর কংগ্রেস পায় শতকরা মাত্র ৪.৬৭ ভাগ। ব্রিটিশ ভারতে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ে ১৯৩৬ সালের চেয়ে স্পষ্টত ভালো ফল পায়। উভয়ে আলোচনার টেবিলে আসে, কিন্তু যুক্তি থাক আর নাই থাক স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল থেকে তারা তাদের চূড়ান্ত খেলার সমাপ্তি টানতে চায়। ১৯৪৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সিমলা সম্মেলনে জিন্নাহ জোর দিয়ে বলেন যে, তাঁকে মুসলমানদের 'একমাত্র মুখপাত্র' হিসেবে গণ্য করা হোক, এবং প্রস্তাবিত যে কোনো ফেডারেল সরকারে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে মুসলমানদের সমান প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হোক। অন্য দিকে কংগ্রেস তার পুরনো মনোভাব ব্যক্ত করে; এর নেতারা জোর দিয়ে বলে যে, তারা মুসলমানসহ সমগ্র জাতির পক্ষে কথা বলে। স্বাধীন ভারতের সরকার পদ্ধতির প্রশ্নে কংগ্রেস নেতৃত্ব স্পষ্ট করে বলে যে, একটা শক্তিশালী ও কেন্দ্রীয় একক রাষ্ট্র গঠনে কংগ্রেস অঙ্গীকারাবদ্ধ (বস্তুত ১৯২৮ সালের নেহেরু রিপোর্ট থেকেই এটা স্পষ্ট)। বল্লভ ভাই প্যাটেলের মতো নেতৃবৃন্দ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও দলের প্রাদেশিক শাখার ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহী মনোভাবের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করে যে, একটা শক্তিশালী কেন্দ্র অত্যাবশ্যক। জওহরলাল নেহেরুর মতো অতি বামঘেঁষা নেতারা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন; ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে এ কথা তাঁর কাছে অনুভূত হয় যে, সামগ্রিকভাবে সারা দেশের পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির সমন্বয় সাধনের জন্য কেন্দ্রের হাতে

ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। এটলি গভর্নমেন্ট ১৯৪৬ সালে কেবিনেট মিশনকে ভারতে পাঠায় উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে একটা নিষ্পত্তি করার জন্য। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আজাদ মিশনকে অবহিত করে যে –

> ফেডারেল ইউনিয়নকে আবশ্যিকভাবে কতকগুলি জরুরি দায়িত্ব সরাসরি পালন করতে হবে ... একে হতে হবে সুসংবদ্ধ, এর প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকতে হবে, সেই সঙ্গে ঐসব বিষয় দেখাশোনার জন্য এবং স্বীয় ক্ষমতার ঐ উদ্দেশ্যে রাজস্ব আদায়ের অধিকার থাকতে হবে। এসব দায়িত্ব ছাড়া ফেডারেল ইউনিয়ন দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে ... পররাষ্ট্র বিষয়, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগসহ সাধারণ বিষয়ের মধ্যে থাকতে হবে মুদ্রা, শুল্ক, ট্যারিফ এবং অন্য এমন সব বিষয় যার সাথে এসবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।[৭]

সারণি ৬ : ১৯৪৫-৪৬-এর নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সব-ভারতীয় ফলাফল।

প্রদেশ	কংগ্রেস	মুসলিম লীগ	অন্যান্য	মোট আসন
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩০	১৭	৩	৫০
পাঞ্জাব	৫১	৭৩	৫১	১৭৫
সিন্ধু	১৮	২৭	১৫	৬০
যুক্ত প্রদেশ	১৫৪	৫৪	২১	২২৮
বিহার	৯৮	৩৪	২০	১৫২
উড়িষ্যা	৪৭	৪	৯	৬০
বাঙলা	৮৬	১১৩	৫১	২৫০
মাদ্রাজ	১৬৫	২৯	২১	২১৫
মধ্য প্রদেশ	৯২	১৩	৭১	১৭৫
বোম্বাই	১২৫	৬০	২০	১৭৫
আসাম	৫৮	৩১	১৯	১০৮

সূত্র: এন. এন. মিত্র (সম্পাদিত), *ইন্ডিয়ান এ্যানুয়াল রেজিস্টার*, ১৯৪৬, খণ্ড ১, পৃ. ২৩০-২৩১।

১৯৪৬ সালের শেষ দিকে এবং ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে লীগের সাথে কংগ্রেসের সংক্ষিপ্ত অন্তর্বর্তী কোয়ালিশন সরকারের সময় অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই প্রত্যয়টি আরো দৃঢ় হয়। অন্তর্বর্তী সরকারে প্রাধান্য ছিল কংগ্রেস নেতৃবর্গের – জওহরলাল নেহেরু ও সরদার প্যাটেল ছিলেন যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। লীগের লিয়াকত আলী ছিলেন অর্থমন্ত্রী – তিনি অর্থ তহবিল নিয়ন্ত্রণ করে সরকারের কাজকর্ম কার্যকরভাবে আটকে দিতে সক্ষম হন। নেহেরু অভিযোগ করেন যে, 'উত্তম সরকার ও উন্নয়নের স্বার্থে

বিভক্ত কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়েছে – সরকারি কাজ পরিচালনায় ... এবং দেশে এ সরকারের এক গ্রুপ বিরোধী দল হিসেবে কাজ করছে।'[৮] স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্যাটেলের কাছে এটা অসহ্য বলে মনে হয় যে –

> অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সময় থেকে লর্ড ওয়াভেল প্রদেশগুলোর জন্য এমন ক্ষমতার অনুমোদন দেন যে, তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে অগ্রাহ্য করতে পারবে; তাছাড়া কংগ্রেসের পরামর্শের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল করা হয়েছে এবং এর ফলে ভারত একটা অরাজক রাষ্ট্র হিসেবে দ্রুত খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ছে।[৯]

কংগ্রেসের কাছে 'লৌহমানব' হিসেবে পরিচিত প্যাটেলের কাছে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধ ও শ্রমিক বিক্ষোভ দূর করার জন্য আবশ্যিকভাবে একটা জোরালো কেন্দ্রের শক্তিশালী কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছিল। তিনি মনে করতেন, 'যারা অন্যায় কাজ করে তারা মনে করে যে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শক্তি নেই।'[১০] এ মুখ্য উদ্বেগ কংগ্রেস হাই কমান্ডকে জিন্নাহর পাকিস্তান দাবির বিষয়টিকে নতুনভাবে চিন্তা করতে উৎসাহিত করে। এমন একটা সময় ছিল যখন অখণ্ড ভারতীয় জাতির কোনো অংশের বিচ্ছিন্নতার ধারণা সব কংগ্রেস নেতার কাছেই অভিশাপ হিসেবে গণ্য হত। এখন তারা দেশের এমন-সব অংশ ছেড়ে দিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে যেখানে কখনই তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আশা নেই এবং যা কেন্দ্রে তাদের ক্ষমতার প্রতি হুমকি হিসেবে প্রতীয়মান। কিন্তু তারা অকিঞ্চিতকর অংশ ছেড়ে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। অন্য কথায়, সাবেক মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোর হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলো ভারতের সাথে থাকতে হবে। এর অর্থ হল, কংগ্রেস যদি এ পথেই অগ্রসর হয় তাহলে বাঙলা ও পাঞ্জাবকে অবশ্যই ভাগ করতে হবে।

অন্য দিকে জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের কাছে কংগ্রেস দলের নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীভূত ও একক রাষ্ট্রে সামান্য অংশীদার হওয়ার ধারণা ছিল বিস্বাদময়। জালালের মতে, জিন্নাহ চেয়েছিলেন একটা শিথিল ফেডারেশন যেখানে প্রস্তাবিত কেন্দ্রের কাছ থেকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো ব্যাপক মাত্রায় স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ পাবে।[১১] এই দৃষ্টিভঙ্গিতে জিন্নাহকে মনে হয়, তিনি পাকিস্তানের ধারণাকে একটা 'দর কষাকষির প্রতিঘাত' হিসেবে প্রসারিত করেছেন। বলা হয় যে, জিন্নাহ ধারণা করেছিলেন যে, কংগ্রেস দেশ-বিভাগ এড়াতে খুবই উদ্বিগ্ন এবং ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোকে রাখার জন্য সে প্রয়োজনীয় যে কোনো ছাড় দিতে প্রস্তুত। কেবিনেট মিশনের 'প্ল্যান-এ' শিথিল ফেডারেল কাঠামো ও সীমিত কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসম্পন্ন ভারতের কথা ছিল, সে-ব্যাপারে জিন্নাহর আগ্রহ দেখে বোঝা যায় যে, সম্ভবত এ ধরনেরই একটি ফেডারেশন তিনি চাইছিলেন।[১২]

এ কথা সত্য যে জিন্নাহ কখনও এমনকি ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের কাছে তাঁর পাকিস্তান দাবির স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেননি। জনগণের কাছে অতি পরিচিত লাহোর প্রস্তাবেও দেশ-বিভাগের

কথা উল্লেখ করা হয়নি। আসলে 'পাকিস্তান' ধারণার অস্পষ্টতাই এই শ্লোগানকে অত্যধিক শক্তিশালী করে তোলে। বিভিন্ন লোকের কাছে এর অর্থ বিভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয় এবং বলতে গেলে জিন্নাহর যত অনুসারী ছিল 'পাকিস্তান' সম্পর্কে প্রায় ততগুলো ধারণা সৃষ্টি হয়। সাধারণভাবে হিন্দু এবং নির্দিষ্টভাবে কংগ্রেস পার্টির বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমানভাবে দুঃখ-কষ্টের তীব্র অনুভূতি প্রকাশে এই শ্লোগান যেভাবে ব্যাপক মুসলিম জনগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করে তেমনভাবে আর কিছু কখনও তেমনটি করতে পারেনি। জালাল যেমনটি মনে করেন, জিন্নাহর কাছে 'পাকিস্তানে'র অর্থ হল ভারত ফেডারেশনের মধ্যে সব কিছুর উর্ধ্বে মুসলমানদের জন্য ব্যাপক মাত্রায় রাজনৈতিক ক্ষমতা (এবং সম্ভবত তাঁর নিজের জন্যেও), আর তাঁর অনুসারীদের কাছে এর অর্থ আরও অনেক বেশি। জিন্নাহর অনুসারী অধিকাংশ মুসলমানের কাছে পাকিস্তান হল একটা ধর্মীয় আদর্শ – পাকিস্তান হচ্ছে একটি 'দার-উল-ইসলাম'-এর স্বপ্ন, একটি প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ভূমি, যেখানে ইসলাম তার মর্যাদা পুনরুদ্ধার করে বিকশিত হবে। এটা ছিল একটা শক্তিশালী রাজনৈতিক শ্লোগান – এর অঙ্গীকার ছিল ভারতে সংখ্যালঘিষ্ঠতার কারণে অধস্তন অবস্থান থেকে মুসলমানদের মুক্তি। জিন্নাহর উদ্দেশ্য যা-ই থাকুক না কেন, তাঁর রাজনীতি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে একটা শক্তিশালী ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত জাতীয়তাবোধের চেতনা জাগ্রত করে; তারা এমন এক আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয় যা আবশ্যিকভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ, ঘৃণা ও উগ্রতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। যদি জিন্নাহ নিজে সত্যিকারভাবে পাকিস্তান নাও চান, তাঁর অনুসারীরা চেয়েছিল এবং তিনি তাদেরকে শুধু পাকিস্তান দাবি করতেই উদ্বুদ্ধ করেননি, প্রয়োজন হলে তার জন্যে লড়াই করতে বলেছিলেন। জালালের গবেষণায় আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট এসব বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়নি। এই অবহেলা তাঁর শক্তিশালী যুক্তির পরিধি সংকুচিত করেছে। রাজনীতিকদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের প্রতি অতি মাত্রায় মনোযোগ দেওয়ার কারণে তাঁর বিশ্লেষণে সুনির্দিষ্টভাবে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না – কে দেশ-বিভাগ চেয়েছে এবং কেন? এই প্রেক্ষাপটে ঐ গবেষণা হয়ে পড়েছে দেশ-বিভাগের ওপর অধিকাংশ গতানুগতিক গবেষণা কাজের মতো – যাতে আলোকপাত করা হয়েছে উচ্চ পর্যায়ে রাজনীতির বিষয়-আশয় এবং কতিপয় রাজনৈতিক নেতার মধ্যে কে কী জন্য দায়ী, তাদের প্রশংসা অথবা নিন্দা যাঁরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সময় ত্রি-পক্ষীয় আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছেন।[১৩] এ অধ্যায়ে দেশ-বিভাগের কাহিনীতে অন্য এক মাত্রা যোগ করা হয়েছে বাঙলা প্রদেশের জনগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া ও সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে। এখানে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে ১৯৪৭ সালের পরিণতির ব্যাপারে বাঙালি হিন্দুদের ভূমিকা এবং সেই সব বিভিন্ন দল ও স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট গ্রুপকে চিহ্নিত করার চেষ্টা যারা প্রদেশের বিভক্তি চেয়েছিল। এটি করার ফলে হয়ত দেশ-বিভাগ সম্পর্কে গবেষণায় শীর্ষ পর্যায়ের রাজনীতিক ও মুসলিম রাজনীতি সম্পর্কে বিদ্যমান পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গিটিকে শুধরে নিতে সহায়তা পাওয়া যেতে পারে। ঐসব গবেষণা থেকে উপসংহার টানা হয়েছে যে, দেশ-বিভাগ ছিল এককভাবে

মুসলমানদের দাবি. এবং হিন্দুরা 'যে কোনরূপে' এবং 'বিভিন্নভাবে' এর বিরোধিতা করে,[১৪] কিন্তু এখানে সেই বক্তব্যটিকে চ্যালেঞ্জ করা হবে।

বাঙলা ভাগের প্রাদেশিক উৎস, ১৯৪৫-৪৬

সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে বলা যায় যে, বাঙালিরা তাদের প্রদেশ বিভক্তির সময় নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় দর্শক ছিল না; নিজেদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরের ঘটনারও তারা শিকার ছিল না বা অনিচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের মাতৃভূমির বিভক্তিকে গ্রহণ করার জন্য তাদের বাধ্যও করা হয়নি। বরং ব্যাপারটি তার বিপরীত। হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের প্রাদেশিক শাখাগুলোর সহায়তায় বাঙলার অধিক সংখ্যক হিন্দু ১৯৪৭ সালে বাঙলা বিভাগ ও ভারতের অভ্যন্তরে একটা পৃথক হিন্দু প্রদেশ গঠনের জন্য ব্যাপকভাবে প্রচারণা চালায়। এ আন্দোলনে নিশ্চিতভাবে কংগ্রেস হাই কমান্ডের সমর্থন ছিল, তবু এ আন্দোলনের উৎস নিহিত ছিল প্রদেশের অভ্যন্তরীণ ইতিহাসের মধ্যে।

আগের অধ্যায়গুলোতে দেখানো হয়েছে কিভাবে প্রথমে ধারণাগত 'হিন্দু পরিচিতি' তৈরি করা হয়েছে এবং সেটি কিভাবে বাঙলায় রাজনৈতিক অভিব্যক্তি লাভ করেছে; মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার শাসন গ্রহণে এক শ্রেণীর হিন্দুদের অস্বীকৃতিকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণে 'হিন্দু সম্প্রদায়ে'র শ্রেষ্ঠত্বের দাবি কিভাবে ব্যবহার করা হয় তা-ও আলোচিত হয়েছে। এটা ছিল মূলত ভদ্রলোকদের পরিচিতি, যেটি সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দাবির মধ্য দিয়ে বাঙলার শিক্ষিত ও সচ্ছল হিন্দুদের গ্রামের ভূমি-মালিকদের সাথে শহরের পেশাগত বুদ্ধিজীবী, ধনী ও ক্ষমতাবানদের সাথে ভদ্রলোক নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে বিশেষ সহায়ক হয়। চল্লিশের দশকে এই সম্প্রদায় অ-ভদ্রলোক ও নামে মাত্র হিন্দু গ্রুপকে সঙ্গে নিয়ে তার বিস্তার ঘটাতে চায়। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায় বা অস্পৃশ্য জাতিকে হিন্দু রাজনৈতিক দলে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ভদ্রলোক রাজনীতির বলয়ে টেনে আনতে নিম্ন শ্রেণীর গ্রুপের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সংস্কৃতকরণ (sanskritising) উৎসাহিত করা হয়। জনপ্রিয় ধর্মীয় উৎসবগুলো রাজনৈতিক লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ালে বাঙলার ক্ষুদ্র মফস্বল শহরের সাধারণ হিন্দুরা ক্রমবর্ধমানভাবে একটি সুনির্দিষ্ট হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। বেঙ্গল কংগ্রেস সুস্পষ্টভাবে হিন্দু পরিচিতিতে উপস্থাপিত হওয়ায় কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার মধ্যকার রাজনৈতিক পার্থক্য নির্ণয় করা অশিক্ষিত লোকদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ে।

হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রচারণার ফলপ্রসূতা লক্ষ করা যায় ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলে। ১৯৩৬-৩৭ সালে হিন্দু ভোট বিভক্ত হয়ে যায় কংগ্রেস ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে; ১৯৪৫-৪৬ সালে হিন্দুরা সুস্পষ্টভাবে ভোট দেয় কংগ্রেসকে। ১৯৩৬-৩৭ সালে কংগ্রেস ৮০টি সাধারণ আসনের মধ্যে মাত্র ৪৮টি এবং বিশেষ হিন্দু আসনের মধ্যে ৪টি আসন লাভ করে; ১৯৪৫-৪৬ সালে কংগ্রেস লাভ করে ৭১টি সাধারণ আসন এবং ১৫টি বিশেষ হিন্দু আসন (সারণি ৭)।

সারণি ৭ : বাঙলায় কংগ্রেসের নির্বাচনী ফলাফল· ১৯৩৬-৩৭ এবং ১৯৪৫-৪৬।

নির্বাচনী এলাকা	মোট আসন	কংগ্রেসেব প্রাপ্ত আসন	
		১৯৩৫-৩৬	১৯৪৫-৪৬
সাধাবণ আসন			
উচ্চ শ্রেণীব হিন্দু	৪৮	৩৯	৪৭
তফশিলি সম্প্রদায	৩০	৭	২৪
বিশেষ আসন			
ব্যবসা-বাণিজ্য	৪	০	৪
ভূমি-মালিক	৫	০	৪
শ্রমিক	৬	৪	৫
মহিলা	২	২	২
বিশ্ববিদ্যালযসমূহ	১	০	০
মোট	৯০	৫২	৮৬

সূত্র: সবকাবি ও বিচাব বিভাগীয ফাইল থেকে সংকলিত, এল/পি এবং জে/৭/১১৪২ এবং এল/পি এবং জে/৮/৪৭৫· এ থেকে যথাক্রমে ১৯৩৬-৩৭ এবং ১৯৪৫-৪৬ সালেব প্রাদেশিক নির্বাচনেব ফলাফলেব পৃথক পৃথক তথ্য বিস্তাবিতভাবে পাওয়া যায।

'সাধাবণ' বা বর্ণ হিন্দু নির্বাচনী এলাকায কংগ্রেসেব বিজয় ছিল সবাব জন্য সামগ্রিকভাবে অর্থপূর্ণ ও উদ্দেশ্যপূর্ণ। ১৯৪৫-৪৬ সালেব নির্বাচনে কংগ্রেস তিনটি সাধাবণ আসন ছিনিযে আনতে সমর্থ হয় – ১৯৩৭ সালেব নির্বাচনে ঐ তিনটি আসনে জয়লাভ করে প্রকাশ্য হিন্দু সংগঠনগুলো, যেমন হিন্দু সভা ও হিন্দু ন্যাশনালিস্ট। একইভাবে, ১৯৩৭ সালে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের কাছে হারানো ৫টি আসন কংগ্রেস ফিরে পায়। নতুন সাধাবণ নির্বাচনী এলাকার ৮টি আসনের প্রত্যেকটিতে কংগ্রেস ১৬ থেকে ৪৮ হাজাব ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস একটা মাত্র বর্ণ হিন্দু আসনে পরাজিত হয়, আসনটি ছিল দার্জিলিং; এই আসনে জয়ী হন স্থানীয় জনপ্রিয় ব্যক্তি ডি. এস. গুরুঙ্গ (D S Gurung)। ১৯৩৬ সাল থেকেই তিনি ঐ এলাকার প্রতিনিধিত্ব করে আসছিলেন। ১৯৪৬ সালের মধ্যে কংগ্রেস বর্ণ হিন্দুদের সর্বসম্মত পছন্দের দল হিসেবে গণ্য হয় – হিন্দু ন্যাশনালিস্ট ও সভা ভোটারদেরও মন জয় করতে সফল হয়। মহাসভা ২৬টি আসনে কংগ্রেসের বিরোধিতা করলেও সে মোট হিন্দু ভোটের শতকরা ২.৭৩ ভাগ ভোট পায়। তবু সরকারি মহলকে বিস্মিত করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ আসনটি পায় মহাসভা – এ আসনে ড. শ্যামাপ্রসাদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন।[১৫]

এতদ্‌সত্ত্বেও মহাসভার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের বিপুল বিজয় হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের বিজয় ছিল না। বরং এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় কংগ্রেসের ওপর হিন্দু বাঙালি ভোটারদের দৃঢ় আস্থা – তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের 'স্বার্থ' রক্ষায় কংগ্রেস অঙ্গীকারাবদ্ধ, এবং হিন্দু মহাসভার চেয়ে কংগ্রেস তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করবে। উভয় দলই প্রাদেশিক নির্বাচনে পরস্পরের মুখোমুখি হওয়া থেকে বিরত থাকে; বরং দেখা গেছে, সমঝোতার মধ্য দিয়ে তারা পরস্পরকে সহযোগিতা করেছে। ফলে, সাধারণ আসনের নির্বাচনে 'যথেষ্ট উত্তেজনা' না থাকা বিস্ময়কর ছিল না – 'প্রচারমূলক পোস্টার ছিল না, স্লোগান ছিল না, এমনকি স্বেচ্ছাসেবকদের নির্বাচনী প্রচারও ছিল না। প্রত্যেকেই নিশ্চিত ছিল বলে মনে হয় যে, কংগ্রেস পুরোপুরি জয়ী হবে; এমনকি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরাও দৃশ্যত কংগ্রেস প্রার্থীকে চ্যালেঞ্জ করেনি। ভোট প্রদানে তাই কোনো উদ্যোগ ছিল না।'[১৬] কিন্তু অন্য একটা বিষয়ে কংগ্রেসের সাফল্য ছিল আরও বেশি উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৫ সালের নির্বাচনে তফশিলি সম্প্রদায়ের আসনের মধ্যে কংগ্রেস জয়ী হয় শতকরা ৮০ ভাগ আসনে; অথচ ১৯৩৬-৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস এ আসনগুলোর প্রতি চারটি আসনের মধ্যে একটিরও কম আসনে জয়ী হয় (অর্থাৎ ৩০টির মধ্যে ৭টি আসনে জয়লাভ করে)। এ সময়ের মধ্যে পশ্চিম বাঙলার প্রাণকেন্দ্রের তফশিলি সম্প্রদায়ের সব ক'টি আসনে কংগ্রেস জয়লাভ করে – সব আসনে ৭ হাজারের বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়। ১৯৪৫ সালের নির্বাচনে যে ১১ জন তফশিলি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি পুনর্নির্বাচিত হয়, তাদের মধ্যে ৫ জন ছিলেন দীর্ঘ দিনের প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস নেতা, এবং অন্য চার জন ছিলেন স্বতন্ত্র – পরে তাঁরা কংগ্রেসে যোগদান করেন। সামগ্রিকভাবে দেখলে দেখা যায়, বাঙলার হিন্দু ভোটারদের শতকরা ৯০ ভাগকে কংগ্রেস আস্থায় আনতে সফল হয় এবং বোঝাতে সক্ষম হয় যে, এই দল হিন্দু মহাসভাসহ যে কোনো দলের চেয়ে তাদের স্বার্থ রক্ষায় উত্তমভাবে প্রস্তুত। নতুনভাবে পাওয়া এই সমর্থকদের মধ্যে তফশিলি সম্প্রদায় ও গোত্রগুলোর মধ্যে দুর্বল 'বিচ্ছিন্ন' গ্রুপের লোকেরাই ছিল না, ধনী, ক্ষমতাবান, বড় ব্যবসায়ী ও বড় জমিদারও তাদের সমর্থক ছিল, যাদের ওপর মহাসভার প্রভাব ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। এটা ছিল মতের সম্পূর্ণ মিল – এবং এর মধ্য দিয়ে বাঙলার হিন্দু ভোটারদের উপলব্ধ স্বার্থের ঐক্য সৃষ্টিতে হিন্দু 'সম্প্রদায়' সম্পর্কে প্রচারণার অসাধারণ সাফল্যের প্রতিফলনই শুধু স্পষ্ট হয় না বরং এর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয় চল্লিশের দশকে কংগ্রেস বাঙলায় নতুন, সুস্পষ্ট হিন্দু পরিচিতি গ্রহণ করে কতটা পরিবর্তিত হয়েছে।

নির্বাচন মুসলিম লীগকে পুনরায় বাঙলায় ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনে।[১৭] ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে সোহরাওয়ার্দী সরকার গঠন করেন এবং তিনি বাঙলার নতুন প্রধানমন্ত্রী হন।[১৮] এর ফলে হিন্দু বাঙালিদের প্রত্যাশা হতাশায় পরিণত হয়। কারণ দুর্ভিক্ষের সময় সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দী তাঁর কথিত দুর্নীতির জন্য হিন্দু জনমতের দৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর লোক বলে চিহ্নিত হন। বাঙলার দুর্ভিক্ষে অনাহারে যে অসংখ্য লোক মারা যায় তার জন্য সোহরাওয়ার্দী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী ছিলেন বলে হিন্দু সংবাদপত্রের বিভিন্ন

লেখালেখিতে তাঁর নিন্দা করা হয়। কংগ্রেস হাই কমান্ডের কাছে একজন বাঙালি লেখেন: '১৯৪৩ সালে বাঙলার প্রায় ৪০ লক্ষ লোকের মৃত্যুর জন্য দায়ী লোকটিকে পুনরায় বাঙলার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে পাওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক।'[১৯]

মুসলিম শাসন সম্পর্কে অনেক বাঙালি হিন্দু তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে ভীতিতে ছিল তিনি সেই সব ভীতি দূর করতে পরবর্তী কয়েক মাসে প্রায় কোনো উদ্যোগ নেননি। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রথম কাজ ছিল মন্ত্রিসভায় হিন্দু-মুসলমান সমতার যে নীতি দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত ছিল তা বাতিল করা। তিনি মন্ত্রিসভার সদস্য ১৩ থেকে কমিয়ে ১১ করেন, আর হিন্দু মন্ত্রীর সংখ্যা কমিয়ে করেন ৩ এবং কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে তিনি তিন জন হিন্দু মন্ত্রীর দু'জনকে তফশিলি সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে গ্রহণ করেন। মুসলিম লীগের 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে' ১৬ই আগস্টকে তিনি সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করেন। এর ফলে কোলকাতার রাস্তা ও বস্তিতে সংঘটিত গৃহযুদ্ধ থামাতে তাঁর ব্যর্থতায় হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, মুসলমান সরকারের শাসন 'বাঙলাকে পাকিস্তান বানানোর পথে' নিয়ে যাবে। এই সম্ভাবনা অধিকাংশ হিন্দুকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে। বাঙলা যাতে বিভক্ত না হয় সেজন্য ঐক্যের প্রচেষ্টায় একজন মুখ্য ব্যক্তি হিসেবে এক সময়ে খ্যাত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ১৯৪৬ সালে তাঁর মত পাল্টান। হাতে লেখা ব্যক্তিগত এক নোটে তিনি মুসলিম লীগের শাসনে বাঙলার ভবিষ্যৎ নিয়ে মূল্যায়ন করেন:

> বাঙলা যদি পাকিস্তানে রূপান্তরিত হয় ... বাঙলার হিন্দুরা স্থায়ীভাবে মুসলমান শাসনের অধীন হয়ে যাবে। হিন্দু ধর্ম ও সমাজের ওপর যেভাবে আঘাত আসছে তা বিবেচনা করলে বলা যায়, এটা হল বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতির সমাপ্তি। কিছু নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু থেকে ইসলামে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে শান্ত করতে হলে অতি প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতিকেই বিসর্জন দিতে হবে।[২০]

মুসলমান শাসনের থেকে দেশ-বিভাগ অধিকতর পছন্দনীয়, এই ধারণা পশ্চিম বাঙলার অন্তত কিছু হিন্দুর মনে উদিত হয়। ১৯৪৪ সালে যখন রাজাগোপালাচারী বলেন যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোর সমন্বয়ে পাকিস্তানকে গ্রহণ করা কংগ্রেসের উচিত – কোলকাতার কিছু হিন্দু তাঁর এই প্রস্তাবকে সাদরে গ্রহণ করে। রাজাগোপালাচারীর এই ফর্মুলায় পাঞ্জাব ও বাঙলা বিভক্তির কথা পরোক্ষভাবে প্রকাশ পায়। ১৯৪৪ সালে শ্যামাপ্রসাদ 'সি আর ফর্মুলা'-কে বর্জন করার আন্দোলন শুরু করলে হাওড়া থেকে একজন বাঙালি হিন্দু তাঁর কাছে একটা চিঠি লেখেন। ঐ চিঠিতে তিনি ঐ পরিকল্পনার বিচক্ষণতার বিষয়টিকে লক্ষ করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন: 'ভাইসরয় কর্তৃক ভারতের বিরুদ্ধে দেয়া চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করার জন্য আর কী বিকল্প আছে? ... ঐ ফর্মুলায় সারা ভারতের স্বাধীনতাকে ভিত্তি করে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও স্থায়ী সমাধান দেওয়া হয়েছে।'[২১] ১৯৪৬ সালের গ্রীষ্মকালে দিল্লীতে কেবিনেট মিশন ও ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনার সময় জল্পনা-কল্পনা উত্তেজনার তুঙ্গে ওঠে। তখন কোলকাতা ও পশ্চিম বাঙলার প্রাণকেন্দ্রের হিন্দুরা প্রদেশ বিভাগের পরিকল্পনাকে অনুকূল বলে মনে করে এবং

এভাবে পশ্চিম বাঙলাকে একটা নতুন হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার কথা চিন্তা করে। মুসলমানদের 'স্থায়ী শাসনের' অধীন থাকার সম্ভাবনা পরবর্তী মাসগুলোতে ক্রমবর্ধমানভাবে অসহ্য মনে হওয়ায় পশ্চিম বাঙলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোর অধিক সংখ্যক হিন্দুদের কাছে এই সমাধান অনুকূল বলে বিবেচিত হয়। সম্ভবত আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ১৬ই আগস্ট সরকারি ছুটি ঘোষণার (মুসলিম লীগের প্রস্তাবিত 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে') এক সপ্তাহেরও কম সময় আগে সোহরাওয়ার্দীর সরকারি বিবৃতি – ঐ বিবৃতিতে তিনি কেন্দ্রের বাইরে বাঙলার পুরোপুরি স্বাধীনতা ঘোষণার হুমকি দেন। কেন্দ্রে সম্পূর্ণ কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রতিক্রিয়ায় সোহরাওয়ার্দী এই বলে সতর্ক করে দেন:

> লীগকে কৌশলে পাশ কাটিয়ে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় বসানোর সম্ভাব্য পরিণতি হবে বাঙলার পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা ও সমান্তরাল একটা সরকার প্রতিষ্ঠা ... এ রকম কেন্দ্রীয় সরকার বাঙলা থেকে যাতে কোনো রাজস্ব সংগ্রহ করতে না পারে তা আমরা নিশ্চিত করব, আর আমরা নিজেদের পৃথক রাষ্ট্র মনে করব যার সাথে কেন্দ্রের কোনো সম্পর্ক নেই।[২২]

সোহরাওয়ার্দীর এ বিবৃতিতে হিন্দু সংবাদপত্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, তারা এর ব্যাখ্যা করে সমগ্র বাঙলাকে তখনই 'পাকিস্তান বানাবার' হুমকি হিসেবে। হিন্দু বাঙালিদের কাছে 'পাকিস্তান' আসার অর্থ হল চিরকালের জন্য রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব হারানো এবং তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের ইচ্ছার অধীনে থাকা। প্রথম কয়েক মাসে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার অপরিণত ও উদ্ধত কার্যকলাপে এটা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, ভবিষ্যতেও এমন ধারা চলবে – ফলে অনেক হিন্দু এই পরিণতি এড়াবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে'কে তাই কোলকাতার হিন্দুরা শুধু নিছকই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও শাসনতন্ত্র পরিষদের ব্যাপারে লেখা সর্ব-ভারতীয় পর্যায়ে নেয়া সুবিস্তৃত ও ভবিষ্যৎ দেনদরবারের একটি কৌশল হিসেবেই দেখেনি, তারা অস্তিত্বের জন্য আসন্ন হুমকি হিসেবে গণ্য করে, আর সে-জন্য তারা আমরণ লড়াই করতে প্রস্তুত ছিল।

এই প্রেক্ষাপটে কুখ্যাত কোলকাতা হত্যাযজ্ঞ (Great Calcutta Killing) সংঘটিত হয়। এই দাঙ্গায় কমপক্ষে পাঁচ হাজার লোক নিহত হয় – ঐ দাঙ্গা স্বতঃস্ফূর্ত ও অপরিচিত উন্মত্ত জনতার আক্রমণের ব্যাখ্যাতিরিক্ত হঠাৎ বহিঃপ্রকাশ ছিল না। উভয় পক্ষই যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে একে অপরের মুখোমুখি হয়। হত্যাযজ্ঞ শুরু হওয়ার চার দিন পর *স্টেটসম্যান* পত্রিকা তার পাঠকদের অবহিত করে:

> এটা দাঙ্গা নয়। এ জন্য প্রয়োজন মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে একটা শব্দ খুঁজে আনা – ক্রোধোন্মত্ততা (a fury); তবু 'fury' শব্দটির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা আছে – এই ক্রোধোন্মত্ততাকে নিজের পথ ঠিক করে দেওয়ার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন কিছুটা চিন্তা ও সংগঠন। আট ফুট লম্বা লাঠি নিয়ে পঙ্গপালের মতো অসংখ্য লোক (the horde) অন্যকে আঘাত করছিল ও খুন করছিল – ঐসব লাঠি তারা আশপাশের স্থান থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে বা তাদের নিজের পকেট থেকে বের করেছে, এ কথা বিশ্বাস করা কষ্টকর।[২৩]

অন্য একজন প্রত্যক্ষদর্শী কোলকাতা হত্যাযজ্ঞকে 'দাঙ্গা' হিসেবে দেখেননি, দেখেছেন 'গৃহযুদ্ধ' হিসেবে:

> উভয় পক্ষ থেকেই ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করা হয়েছে। উভয় পক্ষ থেকেই এ দাঙ্গা ছিল সু-সংগঠিত। সোহরাওয়ার্দী নির্মমভাবে এ দাঙ্গা সংগঠিত করেন এটা দেখানোর জন্য যে, ... (মুসলমানেরা) কোলকাতা অধিকারে রাখবে। *হিন্দু পক্ষে এটা ছিল বাঙলা ভাগের জন্য লড়াইয়ের একটা অংশ বিশেষ।* এর সংগঠকদের মধ্যে ছিল হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের সদস্য, বিশেষ করে পুরনো সন্ত্রাসী কংগ্রেস নেতা যারা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়নি। মাড়োয়ারিরা প্রচুর সাহায্য করেছিল; তারা অর্থ দেয় ও দেশ-বিভাগের আন্দোলনের জন্য তহবিল সংগ্রহ করে। আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ আন্দোলন তখন শুরু না হলেও প্রত্যেকে জানত যে, এটা এ জন্যেই করা হয়েছে।[২৪]

কোলকাতা 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে' একটা আকস্মিক ঝলকের মতো বিষয় ছিল না, এটা ছিল উদ্ভূত বিভিন্ন ঘটনার ফল যা দীর্ঘদিন থেকে সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছিল। অংশত এটা ছিল মুসলিম লীগের নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকদের ক্রমবর্ধমান ঔদ্ধত্যের পরিণতি, সাম্প্রতিক নির্বাচনে তাদের সাফল্যের উন্মাদনা এবং বাঙলাকে যে কোনো কাঠামোয় পাকিস্তান বানানোর ব্যাপারে তাদের ক্ষমতার ওপর দৃঢ় আস্থা; অংশত এটা ছিল তথাকথিত 'মুসলিম স্বেচ্ছাচার'কে প্রতিরোধ করার হিন্দু সংকল্প। এই রক্তক্ষরণের দায়িত্বের অনেকটাই বহন করেন সোহরাওয়ার্দী নিজে; কারণ তিনি হিন্দুদের প্রতি খোলা চ্যালেঞ্জ দেন এবং দাঙ্গা শুরু হওয়া মাত্রই তা দমনে সন্দেহজনক অবহেলার (ইচ্ছাকৃত বা অন্য কারণে) কারণে ব্যর্থ হন। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার পর দেখা যায়, উভয় পক্ষের হাজার হাজার লোক নৃশংসভাবে নিহত হয়েছে। হত্যা শুরু হওয়ার দশ দিন পর এই ভয়ঙ্কর রাতের শহরের (city of dreadful night) ফুটপাতে তিন হাজারের বেশি মৃতদেহ পড়ে থাকে।[২৫] মৃতদেহ পোড়ানোর জন্য শহরে যে ব্যবস্থা ছিল মৃতদেহের সংখ্যা তার তুলনায় অনেক বেশি ছিল। ফলে মৃতদেহ সংগ্রহ ও তা গণকবরে স্তূপীকৃত করার জন্য সরকারকে নিম্ন শ্রেণীর ডোমদের জড়ো করতে হয়।[২৬]

এটি সোহরাওয়ার্দীর নিন্দনীয় কাজ, এখন পর্যন্ত তা একটা সুপ্রতিষ্ঠিত কাহিনী হিসেবে টিকে আছে।[২৭] কিন্তু হিন্দু নেতারাও যে এই ঘটনায় গভীরভাবে জড়িত ছিল, এ সত্যটা তেমন সুবিদিত নয়। ঐ লড়াইয়ে হিন্দুর চেয়ে অনেক বেশি মুসলমান নিহত হয়। অভ্যাস মতো নিরুদ্বিগ্ন প্যাটেল ঐ বীভৎস বিষয়টিকে এভাবে মূল্যায়ন করেন: 'হিন্দুরা এতে তুলনামূলকভাবে বেশি লাভবান হয়েছে।'[২৮] শক্তির এই বীভৎস প্রতিযোগিতায় ১৯৪৬ সালে হিন্দুদের প্রস্তুতি একেবারে বিস্ময়কর ছিল না। কারণ এ কথা মনে রাখা দরকার যে, ত্রিশ দশকের শেষে এবং চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে কোলকাতা ও মফস্বল শহরগুলোতে হিন্দু স্বেচ্ছাসেবক গ্রুপের সংগঠন প্রতিষ্ঠার আধিক্য দেখা যায় – এসব গ্রুপের বিঘোষিত নীতি ছিল হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করা; কিন্তু তারা ভদ্রলোক যুবকদেরকে দৈহিক যোগ্যতা অর্জন করতে ও আধা-সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে উৎসাহ দিতে

অধিকতর শক্তি ব্যয় করত। সম্ভবত এসব সংগঠনের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে সুসংগঠিত সংগঠন ছিল ভারত সেবাশ্রম সংঘ – এটা ছিল হিন্দু মহাসভার স্বেচ্ছাসেবক শাখা। প্রকাশ্যে সমাজ সেবা সংগঠন হলেও শুরু থেকে এই সংঘ সামরিক কৌশল গ্রহণ করে এবং হিন্দুদের আত্মরক্ষার কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণের আহ্বান জানায়। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সংঘের এক সভায় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সভাপতিত্ব করেন। এ সভায় ২,৬০০ লোক যোগদান করে বলে জানা যায়। সভায় –

> বক্তারা সম্প্রদায়গত রোয়েদাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, এর উদ্দেশ্য বাঙালি হিন্দুদের প্রতিহত করা। তাঁরা বলেন যে, সাবেক দণ্ডিত অপরাধী পুলিন দাস ও সতীন সেনের সাহায্য নিয়ে তাদের আখড়া তৈরি করে দৈহিক গঠনের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত যাতে হিন্দুরা আক্রান্ত হলে যেন এক হাজার লাঠি উত্তোলিত হয় ... বাঙলায় লেখা পোস্টার ছাপানো হয় – এর মধ্যে একটা পোস্টারের শিরোনাম ছিল 'এখনই অহিংসার চেতনা ত্যাগ করো, প্রয়োজন হল পৌরুষ'।[২৯]

দু'মাস পর অনুষ্ঠিত সংঘের অন্য এক সভার প্যান্ডেলে প্রদর্শিত প্লাকার্ডে বাঙলায় লেখা ছিল: 'হিন্দুরা জাগ্রত হও এবং অসুরদের হত্যার শপথ গ্রহণ করো।'[৩০] এর পরের বছর শিবের ধর্মীয় মূর্তিকে ব্যবহার করে একই মূলভাবকে প্রকাশ করা হয়:

> ৭ তারিখে (এপ্রিল, ১৯৪০) সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে মহেশ্বরী ভবনে একটা হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মি. বি. সি. চ্যাটার্জী ঐ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। হিন্দুদের সামরিক মানস গড়ে তোলার জন্য সেখানে বক্তৃতা করা হয়। ত্রিশূলসহ শিবের একটা বড় চিত্র প্রদর্শিত হয় ... স্বামী বিজনানন্দ বলেন যে, অসুরকে ধ্বংস করার জন্য হিন্দু দেব-দেবীরা সব সময় বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকতেন। স্বামী আদিত্যনন্দ ... মন্তব্য করেন যে, তিনি হিন্দুদের সেবা করার জন্য একটা লাঠি নিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন যে, হিন্দুর শত্রুদের মুণ্ডচ্ছেদ করতে হবে। ত্রিশূলসহ শিবের চিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন যে, তাঁর অনুসারীদের অস্ত্র, কমপক্ষে লাঠি হাতে এগিয়ে আসতে হবে ... স্বামী প্রণবানন্দ পাঁচ লাখ লোকের একটা প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তুলতে চান ... তিনি মাড়োয়ারিদের কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানান ... হরনাম দাস প্রত্যেক হিন্দুকে সৈনিক হওয়ার আহ্বান জানান। পাঁচ লাখ হিন্দুর একটা প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলার সংঘের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এতে সন্তুষ্টির সাথে উল্লেখ করা হয় যে, ইতিমধ্যে বারো হাজার লোককে সংগ্রহ করা হয়েছে।[৩১]

শুরু থেকেই ভারত সেবাশ্রম সংঘ মহাসভার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু চল্লিশের দশকে সংঘ এবং এর মতো অন্যান্য সংগঠন ভদ্রলোকদের ব্যাপক সমর্থন পেতে থাকে। *অমৃত বাজার পত্রিকা-র* মৃণাল কান্তি ঘোষ, *দৈনিক বসুমতী* পত্রিকার সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এবং *মডার্ন রিভিউ* পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চ্যাটার্জীসহ কোলকাতার ভদ্রলোক বুদ্ধিজীবী গ্রুপের সদস্যরা সংঘের মিটিং-এ উপস্থিত থাকতেন।[৩২] এমনকি ১৯৪৭ সালের দিকে ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত খ্যাতনামা ব্যক্তিরাও সংঘের সাথে তাঁদের সংশ্লিষ্টতার কথা গোপন রাখেননি। ঘোষণা করা হয় যে, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সাবেক

সদস্য ও মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় সংঘ আয়োজিত হিন্দু সম্মেলনের অধিবেশন উদ্বোধন করবেন। ঐ সম্মেলনে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পি. এন. ব্যানার্জী সভাপতিত্ব করবেন।[৩৩] কংগ্রেস পার্টির নিজস্ব একাধিক স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন ছিল,[৩৪] এসব সংগঠনের লোকেরা প্রায়ই সংঘের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করত। চন্দ্রনাথ মন্দির অপবিত্র করার প্রতিবাদে ১৯৪৬ সালের মে মাসে সংঘ একটা জনসভার আয়োজন করে। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় আইন সভার কংগ্রেস সদস্য শশাংক শেখর সান্যাল।[৩৫] পরের বছর স্বামী প্রণবানন্দের জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে সংঘ একটি মিছিলের আয়োজন করে – ঐ মিছিলে কংগ্রেসের একটা দল সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে: 'তারা ছিল সাদা জামা, হাপ প্যান্ট ও গান্ধী টুপি পরিহিত অবস্থায় ... তারা বহন করছিল কংগ্রেস পতাকা (এবং) ... বিভিন্ন পোস্টার, এতে হিন্দুদের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং শিবাজী ও রানা প্রতাপের আদর্শ অনুসরণ করে শক্তি অর্জনের আহ্বান ছিল।'[৩৬] তদুপরি সংঘের মতো আরো অনেক সংগঠন তাদের সামরিক ও আক্রমণাত্মক হিন্দুবাদী কর্মসূচির মাধ্যমে (কমিউনিস্ট আন্দোলনের বাইরে থাকা) পুরনো সন্ত্রাসী সংগঠনের অবশিষ্ট কর্মীদের আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়। পুলিন দাস ও সতীন সেন ছিলেন সাবেক যুগান্তর সদস্য, অতীতে তাঁরা 'সন্ত্রাসী' অপরাধের জন্য গ্রেফতার হন।[৩৭] এখন তাঁরা সেবাশ্রম সংঘের 'মার্শাল আর্ট'-এর পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োজিত হন। যুগান্তর পার্টির মাদারীপুর স্থানীয় শাখা ১৯৪১ সালে সংঘের স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণের ভার গ্রহণ করে।[৩৮] মাদারীপুর যুগান্তর গ্রুপের অন্য একজন বিশিষ্ট সদস্য কল্যাণ কুমার নাগ ত্রিশের দশকে সংঘ এবং হিন্দু মহাসভার সক্রিয় সদস্য হন।[৩৯] এই কল্যাণ কুমার নাগ পরে 'স্বামী সত্যানন্দ' হিসেবে পরিচিত হন এবং ইনিই ১৯২৬ সালে 'হিন্দু মিশন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে কোলকাতার হিন্দু স্বেচ্ছাসেবক গ্রুপের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পায় (সারণি ৮)। এর মধ্যে মহাসভার অপর এক 'সক্রিয়' শাখা হিন্দু শক্তি সংঘ[৪০] ছিল বেশ বড় ও সুগঠিত। এর পাঁচশ'র বেশি সদস্য শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন শাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং এদের আর্থিক অবস্থা ছিল ভালো।[৪১] অন্যান্য সংগঠনগুলো ছিল 'পাড়াভিত্তিক' সংগঠন। যেমনটি ছিল বেহালার 'যুব সম্প্রদায়'। এর –

> বেহালা থানার কিছু ছেলেমেয়েকে নিয়ে নির্মল কুমার চ্যাটার্জী ১৯৪৩ সালে এর কার্যক্রম শুরু করেন। এর কার্যক্রম হল: ১. তরুণ ছেলে ও মেয়েদের জন্য ব্রতচারী ও ছোরা খেলা, ২. নাট্য শাখা, ৩. ফুটবল শাখা। এর একটা লাইব্রেরিও আছে। সর্বমোট এর সদস্য সংখ্যা ৫০; ৩০ জন হচ্ছে স্কুলের উঠতি বয়েসের ছেলেমেয়ে এবং বাকি ২০ জন যুবক। এরা দুর্গা পূজা এবং সরস্বতী পূজা পালন করে। দুর্গা পূজার সময় তারা নাটক মঞ্চস্থ করে।[৪২]

সারণি ৮: কোলকাতার কয়েকটি হিন্দু স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন: ১৯৪৫-১৯৪৭।

নাম	সদস্য	প্রভাবের এলাকা	আর্থিক অবস্থা	শান্তির প্রতি হুমকি
আর এস এস	১০০	উত্তর কোলকাতা	মধ্যম	নেই
জাতীয় যুব সংঘ	২০০	উত্তর কোলকাতা	মধ্যম	নেই
বাগবাজার তরুণ ব্যায়াম সমিতি	২৫–৩০	বাগবাজার এলাকা	ভালো নয়	সামর্থ্য আছে
দেশবন্ধু ব্যায়াম সমিতি	২৫–৪০	বাগবাজার, শ্যামবাজার এলাকা	ভালো নয়	সামর্থ্য আছে
হিন্দুস্তান স্কাউট এসোসিয়েশন	৩,০০০	সমগ্র কোলকাতা	ভালো	নেই
হিন্দু শক্তি সংঘ	৩০০–৫০০	মুচিপাড়া, বৌবাজার	ভালো	সামর্থ্য আছে
আর্য বীর দল	১৬	পার্ক সার্কাস	ভালো	নেই
বিপিএইএম ভলান্টিয়ার কোর	২৫০	জানা যায়নি	জানা যায়নি	নেই

* [illegible] সংঘ ও হিন্দু মহাসভা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে সেবাশ্রম সংঘের নাম মিশে গেছে।

সূত্র: স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ওপর গোয়েন্দা শাখার স্মারক, জিবি এসবি 'পিএম' সিরিজ, ফাইল নং ৮২৯/৪৫ এবং ৮২২/৪৭১-তে যুক্ত সারণি থেকে সংকলিত।

একইভাবে বাগবাজার তরুণ ব্যায়াম সমিতি এবং পার্ক সার্কাস এলাকার আর্য বীর দলের সদস্য সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৫ এবং ১৬ জন।[৪৩] বৃহৎ কোলকাতায় এ ধরনের সক্রিয় সমিতির মধ্যে ছিল এন্টালি ব্যায়াম সংঘ, হাওড়ায় সালকিয়া তরুণ দল, ২৪ পরগণা জেলার হাজী নগরে হিন্দু সেবা সংঘ এবং শ্রীরামপুরে মিতালী সংসদ।[৪৪]

বড় বড় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে প্রায়শই বিপুল আর্থিক সাহায্য দেওয়া হত। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ভারত সেবাশ্রম সংঘ মাড়োয়ারিদের সাহায্য পেত। ১৯৪১ সালে গোয়েন্দা শাখা একটা পত্র হস্তগত করে – বাঙলা প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সেক্রেটারির লেখা ঐ পত্রের প্রাপক ছিল যুগল কিশোর বিড়লা। 'বর্ধমানের হিন্দুদের প্রশিক্ষণ ও দৈহিক উন্নতির জন্য' আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাবের প্রেক্ষাপটে ঐ পত্রে ধন্যবাদ জানানো হয়।[৪৫] অন্য একটি সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) বাঙলা শাখা বিড়লাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করত। আরএসএস-এর কোলকাতাস্থ প্রধান কেন্দ্র 'হ্যারিসন রোড ও আমহার্স্ট চৌমাথার পাশে মি. বিড়লার শিল্প বিদ্যালয়ে' ছিল বলে উল্লেখ করা হয়।[৪৬] চল্লিশ দশকের মধ্যভাগে আরএসএস কোলকাতা থেকে পল্লি এলাকায় বিস্তৃত হয় – এ কাজে

কমপক্ষে একজন বড় হিন্দু জমিদার সহায়তা করে। গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে –

> রাজশাহী, পাবনা, সালাপ (Salap) (পাবনা জেলা), ময়মনসিংহ, সুসঙ্গ (ময়মনসিংহ জেলা) এবং বাঙলার অন্যান্য অংশে অনেক শাখা আছে। সুসঙ্গ রাজ পরিবারের বাবু পরিমল সিংহ ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের একজন অনুগত সমর্থক। বলা হয় যে, বাঙলায় এ সংঘের সদস্য সংখ্যা প্রায় এক লাখ।[৪৭]

চল্লিশ দশকের সাম্প্রদায়িক আদর্শ এবং হিন্দু মহাসভা ও হিন্দুত্ববাদী কংগ্রেসের রাজনীতিতে কোলকাতার হিন্দু ভদ্রলোক যুবক শ্রেণীর ব্যাপক অংশকে সংগঠিত করতে এ ধরনের সংগঠন খুবই কার্যকর ছিল। এ ধরনের সংগঠনের অধিকাংশকেই নির্দোষ বলে কর্তৃপক্ষ গণ্য করে (সারণি ৮-এর শেষ কলাম)। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও সংগঠনের ব্যাপারে সরকারের সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গির বিস্ময়কর প্রতিফলন ঘটে।[৪৮] রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ তার তালিকাভুক্ত যুবকদের 'শারীরিক প্রশিক্ষণ' দিত, তার মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৩৯ সালে আরএসএস-এর বাঙলা শাখার ভি আর পাঠকী লন্ডনে অবস্থানরত তার এক বন্ধুকে লেখেন:

> আপনার পাঠানো লি এন-ফিল বেয়োনেট ইত্যাদির নকশা-তালিকা পাওয়া গিয়েছে ... লন্ডনে 'পার্কার হেল' নামে একটা সুপ্রসিদ্ধ ফার্ম আছে যেখানে প্রয়োজনীয় আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করা হয়। আপনি কি ঐ ফার্ম থেকে একটা 'এইমিং রেস্ট' (Aiming Rest) যোগাড় করতে পারেন? এ যন্ত্রটির ওপর বন্দুক রেখে নিশানা ঠিক করা হয়। নতুন যারা ভর্তি হয়েছে তারা গুলি করার অনুমতি পাওয়ায় আগে এটা ব্যবহার করতে পারে।[৪৯]

যুদ্ধের পর সামরিক কাজ থেকে অব্যাহতি পাওয়া সৈনিক ও সামরিক কর্মচারীদেরকে হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলোর জন্য আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগহ করতে প্রলুব্ধ করা হয়।[৫০] ১৯৪৬ সালের মে মাসে দেওয়া এক পুলিশ রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে, অনুশীলন ও যুগান্তর গ্রুপ অস্ত্র সংগ্রহের সাথে জড়িত; গুজব রটে যে, হিন্দু মহাসভা তাদের এই কাজে অর্থ যোগান দেয়:

> অনুশীলন দলের সদস্যরা সামরিক কর্মচারীদের মাধ্যমে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করছে বলে জানা গেছে ... ১১ই মে যুগান্তর দলের সদস্য শ্যামসুন্দর পালের কোলকাতার বাড়ি তল্লাশি করা হয় এবং সেখানে ১০৮ রাউন্ড গুলি পাওয়া যায়। অবৈধ অস্ত্র সংগ্রহের কাজেও যুগান্তর দল জড়িত – অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে হিন্দু মহাসভার একজন বিশিষ্ট নেতা তাদের অর্থ প্রদান করে বলে জানা যায়।[৫১]

যুদ্ধের পর থেকে সামরিক বাহিনী থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সৈনিকদের মাঝে মহাসভা খুবই সক্রিয় ছিল; তারা সৈনিকদের এবং 'অব্যাহতিপ্রাপ্ত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির লোকদের মহাসভার পতাকাতলে' সংগঠিত করার চেষ্টা করে এবং 'সৈন্যবাহিনীর সাবেক কর্মচারীদের নিয়ে হিন্দু যুবকদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে'।[৫২] অন্তত বর্ধমানে এই প্রচেষ্টা থেকে ফল পাওয়া যায়। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর কাছে লিখিত

'পানাগড়ের একজন সাবেক হিন্দু সৈন্য অফিসার' আবেগতাড়িত এক পত্রে ঘোষণা করেন:

> হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলায় আমাদের বিপজ্জনক শত্রু মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আমরা বর্ধমান জেলার সৈন্যবাহিনীর সাবেক হিন্দু কর্মকর্তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি ... আমরা প্রস্তুত আছি, আপনার নির্দেশ আমরা অনুসরণ করব ... আমরা শপথ নিয়েছি এবং আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা পূরণে আমরা বিরত হব না। আমরা অস্ত্রসজ্জিত এবং যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ... আমরা মনে করি যে, প্রতিশোধ গ্রহণের এই পদ্ধতিতে প্রদেশের বর্বর মুসলমানদের থামিয়ে দিতে পারব এবং এ থেকে তাদের বর্ণসংকর (halfcast) কুখ্যাত নেতা সোহরাওয়ার্দী ও নাজিমুদ্দিন প্রতিশোধ গ্রহণে হিন্দুদের সাহস সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারবে।[৫৩]

মুসলমানদের এইভাবে প্রাণপণে প্রতিহত করার পটভূমিতে ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পর তাই বিস্ময়ের কিছু নেই যে, কয়েক মাস পর হিন্দু স্বেচ্ছাসেবীরা কোলকাতায় তাদের শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল। বি. আর. মুনজে মহাসভার নির্বাচনী প্রচারণায় সর্ব প্রথম কামান দাগেন এই ঘোষণা করে:

> হিন্দু মহাসভা স্বাধীনতা চায়, কিন্তু তারা বিশ্বাস করে না যে অহিংস পথে তা অর্জন করা যাবে। এ জন্য তা পাশ্চাত্যের অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারায় আক্রমণকে সংঘটিত করতে চায় ... গৃহযুদ্ধের হুমকির (মুসলিম লীগের) মোকাবেলায় কংগ্রেস যদি মহাসভার শ্লোগান 'অস্ত্রচালনা ও রাইফেল শুটিং-এ যুবকদের শিক্ষা দাও' গ্রহণ করে তাহলে তা হবে বুদ্ধিমানের কাজ।[৫৪]

বাঙলায় যখন গৃহযুদ্ধ সত্যি সত্যি আসন্ন হয়ে দাঁড়াল, তখন মহাসভা স্বেচ্ছাসেবীরা প্রস্তুত ছিল বাঁশের লাঠি, ছোরা ও দেশীয় পিস্তল নিয়ে নেতাদের পরামর্শ মতো কাজ করতে, তারা বাহিনীর মতো যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে ব্যগ্র ছিল। মুসলমানদের মতো হিন্দুরাও ১৬ই আগস্ট যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল; উভয় পক্ষই ছিল অস্ত্রসজ্জিত, তবে দলে-বলে হিন্দুদেরই ভারি দেখা যায়।

হিন্দু দাঙ্গাকারীদের সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণে ক্রমবর্ধমান উগ্র সাম্প্রদায়িকতার প্রেক্ষাপটে কোলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দুদের সংগঠিত করতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো কতটা সফল হতে পেরেছিল তা প্রকাশ পায়। এই উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ছিল চল্লিশের দশকে ভদ্রলোক রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। মুসলমান দাঙ্গাকারীদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিল পল্লি এলাকা থেকে শহরে আসা ভাসমান শ্রেণীর লোক। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার যে, বহু সংখ্যক ভদ্রলোক হিন্দুকে দাঙ্গার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। দাঙ্গায় জড়িত হিন্দু জনতার গঠন সম্পর্কে আলোচনাকালে সুরঞ্জন দাশ লক্ষ করেন:

> বাঙালি হিন্দু ছাত্র ও অন্যান্য পেশাজীবী বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ... সক্রিয় ছিল। ধনাঢ্য ব্যবসায়ী, প্রভাবশালী সওদাগর, শিল্পী, দোকানদার ... দাঙ্গার অভিযোগে গ্রেফতার হয়। মধ্য কোলকাতায় মুসলমানদের একটি সভা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য অন্যদের সাথে ভদ্রলোকেরাও অংশগ্রহণ করে – ঐ সভায় মুখ্যমন্ত্রী নিজে ভাষণ দেন। বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক ড. জামাল মোহাম্মদকে হত্যাকারী জনতার মধ্যে একটা বড়

> অংশ ছিল 'শিক্ষিত যুবক' ... এটা বিস্ময়কর ছিল না যে, তাদের মধ্যে অনেকে পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলে।[৫৫]

আরো বিস্ময়ের ব্যাপার যে, হত্যাযজ্ঞের পর অব্যাহতভাবে অসন্তোষের মধ্যে মুসলমান জনতার মাঝে বোমা নিক্ষেপের জন্য হিন্দুদের মধ্য থেকে গ্রেফতারকৃত একজন হিন্দু ছিল বর্ধমানের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. মহেন্দ্রনাথ সরকার। তিনি স্বীকার করেন: 'এখন আমি একজন কংগ্রেস নেতা। আগে আমি ছিলাম হিন্দু মহাসভার সদস্য। বাঙলা বিভাগের পক্ষে আমি এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছি।'[৫৬] হিন্দুদের পক্ষে যোগ দেয় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সৈনিক ও মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা।[৫৭] ছাত্র, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী এবং দোকানদার ও পাড়ার ভাড়াটে গুণ্ডা মার্কা ছেলেদের অভাবিত ঐক্যের ফলে হিন্দু জনতার রক্তক্ষয়ী বিজয় হয় কোলকাতার রাস্তায়, ১৯৪৬ সালে। এটাই বাঙলা বিভাগ এবং একটা পৃথক হিন্দু আবাসভূমি গঠনের জন্য হিন্দু আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করেছে।

কিন্তু হিন্দুদের এই জঘন্য কাজকে কখনও স্বীকার করা হয়নি। হিন্দু সংবাদপত্র এই আক্রমণের জন্য দোষারোপ করে সোহরাওয়ার্দী সরকার ও মুসলিম লীগকে; আর এই হত্যাযজ্ঞকে গণ্য করা হয় ভবিষ্যতে 'মুসলমান শাসনে'র অধীন বাঙালি হিন্দুদের ভাগ্যের ভয়াবহ অশুভ লক্ষণ হিসেবে। পরবর্তী মাসগুলোতে হিন্দু সংবাদপত্রে পাল্টাপাল্টি অভিযোগের আবরণে কোলকাতা হত্যাযজ্ঞ একটা শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে গণ্য হয় এবং তা পশ্চিমে বাঙলায় একটা পৃথক হিন্দু রাজ্য গঠনের দাবির সপক্ষে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। নোয়াখালী ও টিপেরার স্থানীয় মুসলমানেরা কোলকাতা ও বিহারের মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যার গুজবে বিলম্বিত অথচ ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া দেখায়, এবং প্রতিশোধ হিসেবে শত শত হিন্দুকে হত্যা করে। হিন্দুরা নিজেদের নির্লজ্জভাবে যুদ্ধাবস্থায় দাঁড় করাতে এরকম একটি ঘটনাই চাইছিল, তারা এই অজুহাতটি পেয়ে যায়:

> সোহরাওয়ার্দীকে (তার নাম উচ্চারণে আমার ঘৃণা হয়) জানিয়ে দাও যে, হিন্দুরা এখনও মরে যায়নি, এবং সে বা তার দুশ্চরিত্র সাঙ্গোপাঙ্গোরা হিন্দুদের ভয় দেখিয়ে শাসন করতে পারবে না ... সোহরাওয়ার্দীকে তার দুষ্কর্মের জন্য খুব শীঘ্রই চরম শাস্তি ভোগ করতে হবে। সে-ই হিন্দুদের বিদ্রোহী করে তুলেছে। এখন থেকে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হল বিদ্রোহ এবং প্রতিশোধ গ্রহণ। এসো, আমরা মুসলিম লীগের বর্বরদের সাথে যুদ্ধ করি। বাঙলা ভাগ না হওয়া পর্যন্ত এবং হিন্দুদের স্বদেশভূমি থেকে লীগ কর্মীদের বের করে না দেওয়া পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ থেকে বিরত হব না।[৫৮]

এ ধরনের অনুভূতি অনেক হিন্দুর মনে ক্রমবর্ধমান দৃঢ় সংকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করে যে, যে কোনো মূল্যে, যা কিছুই হোক না কেন, বাঙলাকে অবশ্যই ভাগ করতে হবে।

বিভক্তির জন্য প্রচার অভিযান, ১৯৪৬–৪৭

১৯৪৬ সালের শেষ কয়েক মাসে এবং ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে এসব ভীতি প্রদেশ-বিভাগের জন্য হিন্দুদের মধ্যে সংগঠিত এবং সুসমর্থিত প্রচার অভিযানকে জোরদার করে।

আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিভক্তির প্রচার শুরু হয় কেবল ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে *অমৃত বাজার পত্রিকা*-র ঘোষণার মধ্য দিয়ে – ঐ ঘোষণায় বলা হয় যে, এই প্রশ্নে 'জনমতের সঠিক মূল্যায়ন করার জন্য' পত্রিকা জনমত যাচাই করবে।[৫৯] কিন্তু বাস্তবে ১৯৪৬ সাল শেষ হবার আগে থেকেই 'বেঙ্গল পার্টিশন লীগ' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এ ধরনের প্রয়াস ভালোভাবে চলছিল – এই লীগের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল 'পশ্চিম বাঙলার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষার্থে পশ্চিমবঙ্গ জেলায় একটা পৃথক প্রদেশের দাবি করা'।[৬০] পার্টিশন লীগ বছর শেষের আগেই সদস্য তালিকাভুক্তির কাজ শুরু করে। কোলকাতায় গোয়েন্দা শাখা লীগের তিন জন ভাবী সদস্যের পূরণকৃত আবেদন ফরম আটক করে। প্রতিটি ফরমেই ইংরেজিতে টাইপ করা বিস্তারিত বিবরণ টাইপ করা ছিল: 'বেঙ্গল পার্টিশন লীগের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে আমি ঐকমত্য পোষণ করি, দয়া করে আমাকে সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্ত করুন।' এরপর উল্লেখ আছে আবেদনকারীর নাম, বয়স ও পেশা। এ তিন জন আবেদনকারীই হল কোলকাতা ভদ্রলোক সমাজের সদস্য।[৬১] প্রথম জনের নাম এন. এন. ঘোষ, বয়স ৩৭, কোলকাতার সুপরিচিত হেয়ার স্কুলের শিক্ষক; দ্বিতীয় জন হলেন জি. এন. ঘোষ, বয়স ২৫, একজন হিসাবরক্ষক; তৃতীয় জনের নাম পি. ঘোষ, বয়স ২৯, জেহাপুর গান ফ্যাক্টরির অডিটর।[৬২] পরে দেখা যাবে যে, পশ্চিম বাঙলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোর হিন্দু ভদ্রলোকেরাই পুনরায় স্বদেশ ভূমির প্রভুতে পরিণত হবার ইচ্ছা পূরণ করতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হয় – এরাই ছিল বিভক্তির আন্দোলনের মূল অংশ। এই ভদ্রলোকদের লক্ষ্য করেই বিভক্তির প্রচারণায় বলা হয়:

> এখন সময় ঘোষিত হয়েছে। ভগ্নী ও ভায়েরা, আমি আপনাদের নমনীয় মনোভাব ত্যাগ করে স্বপ্নরাজ্যের বিহ্বলতার শিখর থেকে বাস্তবের জগতে ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। পুরানো স্লোগান বারবার আওড়ানো ও প্রচলিত কথার দাস হওয়া স্বদেশ প্রেম নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আরোপিত দেশ-ভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন হল বাঙলার ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়। ঐতিহ্যগতভাবে এবং আবেগের দিক থেকে বাঙলার জনগণ প্রদেশ ভাগের যে কোনো উদ্যোগের বিরুদ্ধে। কিন্তু আমরা যদি অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন না করে শুধু পুরানো স্লোগান উদ্ধৃত করি, তাহলে মাতৃভূমির কাছে আমরা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হব। স্বদেশী দিনগুলোতে বিভাগ-বিরোধী আন্দোলন ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম – ঐ সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য ছিল উভয় প্রদেশে বাঙলার হিন্দুদের সংখ্যালঘিষ্ঠ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত সবচেয়ে বৃহৎ জাতীয়তাবাদীদের শক্তিকে পঙ্গু করে দেওয়া। বিভক্তির জন্য আমাদের আজকের দাবি সেই একই আদর্শ ও লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত – অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী শক্তির বিচ্ছিন্নতা রোধ, বাঙলার সংস্কৃতি রক্ষা করা এবং বাঙলার হিন্দুদের জন্য একটা স্বদেশভূমি অর্জন করা যা ভারতের অংশ হিসেবে জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হবে।[৬৩]

হিন্দু ভদ্রলোকদের সাম্প্রদায়িক পরিচিতির সমসাময়িক অনেক জনপ্রিয় আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটানো হয় এ ধরনের উদাত্ত আহ্বানের মধ্য দিয়ে: বাঙলার গৌরবময় অতীতের ভাবমূর্তি, বিভক্তির মধ্য দিয়ে বাঙলার অনন্য সাধারণ 'সংস্কৃতি' যে সংরক্ষিত হবে সেই

দাবি, হিন্দুদের জন্য নিরাপদ 'স্বদেশভূমি'র নিশ্চয়তা, নিরাপদ নতুন স্বদেশভূমিকে নিয়ে তাদের স্বপ্ন, আশাহীন সংখ্যালঘিষ্ঠ থেকে মুক্ত হয়ে তাদের আস্থাশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া, যথার্থ কর্তৃত্বে তাদের প্রতিষ্ঠা। এ ধরনের বক্তব্যে স্থাপিত ঐ আহ্বান হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে *অমৃত বাজার পত্রিকা* দৃষ্টিকটুভাবে আত্মতৃপ্তির সঙ্গে এক রিপোর্টে উল্লেখ করে যে, বিভক্তি নিয়ে পত্রিকার জনমত যাচাই-এ কার্যত সর্বসম্মত আস্থার রায় পাওয়া গিয়েছে – হ্যাঁ-সূচক ভোট দিয়েছে শতকরা ৯৮.৬ ভাগ লোক। যুক্ত বাঙলার পক্ষে যারা রায় দিয়েছে তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ একটি ক্ষুদ্র অংশ, তাদের অবস্থান দশমিক বিন্দুরও পরে।[৬৪]

জনমত যাচাই অবশ্য ব্যাপক প্রচারণার একটা দিক মাত্র। সারা প্রদেশে ব্যাপক প্রচারণায় কোলকাতা ও মফস্বল হিন্দুদের সংগঠিত করার জন্য আবেদন ও স্বাক্ষর অভিযানের আয়োজন করা হয়। এর নেতারা অনুধাবন করে যে, সুদূর দিল্লীতে আপস-মীমাংসায় বিভক্তির জন্য চাপ সৃষ্টিতে ঐ প্রচারণার পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থনের বিষয়টি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ মনে করে যে, এর পাশাপাশি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে বসবাসরত বহু সংখ্যক বাঙালি হিন্দুর মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে যে, সেখানে তাদের ভাগ্য মৃত্যুর চেয়ে খারাপ। কোলকাতা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পরবর্তী মাসগুলোতে হিন্দুরা ক্রমাগতভাবে উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রচারণার শিকার হয়, এর উদ্দেশ্য ছিল আবেগকে তুঙ্গে রাখা। ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে কোলকাতায় 'সংগ্রাম' নামে একটা লিফলেট প্রচার করা হয় – ঐ লিফলেটে 'একজন হিন্দু মহিলাকে উৎপীড়ন করার প্রতিশোধ হিসেবে একশ জন লীগ গুণ্ডাকে নৃশংসভাবে হত্যা করার জন্য' হিন্দুদের প্ররোচিত করা হয়। ঐ লিফলেটে দাবি করা হয়:

> ভারতের হিন্দুদের ওপর আপতিত দুর্যোগের এই চরম দিনগুলোতে হিন্দুরা কি কাপুরুষের মতো তাদের গৃহের মধ্যে শান্ত হয়ে থাকবে? ... তারা কি শত্রুদের ধ্বংস এবং নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য এখনই সংগঠিত হবে না? বাঙলার হিন্দু যুবকেরা কি তাদের মা-বোনদের উৎপীড়নের প্রতিশোধ নেবে না? ... আজই তোমাদের আত্মোৎসর্গের শপথ নিতে হবে! প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে! ... লীগের গুণ্ডাদের নির্মূল করতে হবে এবং লীগ সরকারকে ধ্বংস করে পাকিস্তানি রাজত্বকে শেষ করতে হবে!

হিন্দুদের সহজাত শান্তিপ্রিয়তাকে বিসর্জন দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে ঐ পুস্তিকায় তাদের আক্রমণ ও আত্মোৎসর্গের মহান বিপ্লবী ঐতিহ্য অনুসরণের কথা বলা হয়:

> বাঙলার যুবক বিপ্লবীরা সিংহের মতো শৌর্য হিংস্রতায় যে পথে শ্রেণীবদ্ধভাবে শৃঙ্খলার সাথে অগ্রসর হয়েছিল, সেটাই একমাত্র পথ – এর আর কোনো বিকল্প নেই। সেই সব বীরোচিত বাঙালিদের আহ্বান শোনো, যারা পথিকৃতের মতো পথ দেখিয়েছে এবং নিজের জীবনের রক্ত দিয়ে ঐ পথকে রঞ্জিত করেছে![৬৫]

বিপ্লবী সন্ত্রাসীদের স্বদেশপ্রেমের সাথে তুলনা করে সাম্প্রদায়িক আক্রমণকে সংগত বলে বৈধতা দেওয়া হয়, আর হিন্দু সাম্প্রদায়িক প্রচারণার হাতিয়ার হিসেবে জাতীয়তাবাদকে এর

সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। প্রচারপত্রের শিরোনাম 'সংগ্রাম' শব্দটি নেওয়া হয় জাতীয়তাবাদী শব্দ-তালিকা থেকে; তবে এখনকার এই 'সংগ্রাম' ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নয়, 'মুসলমান স্বেচ্ছাচারে'র বিরুদ্ধে। ব্রিটিশদের এখন গণ্য করা হয় কেবল মুসলমানদের দুষ্কর্মের সহচর হিসেবে, আর হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের দৃষ্টিতে পিশাচদের নতুন তালিকায় গভর্নর ও ভাইসরয়ের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে দ্বিতীয় ধাপে, সোহরাওয়ার্দীর পরে। দৃষ্টান্ত হিসেবে, ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে রাসবিহারী এভিনিউতে একটা পোস্টার সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করা হয় – এতে বলা হয়:

কুকুর সোহরাওয়ার্দীর মুণ্ডু চাই
সাদা চামড়ার রক্ত চাই।[৬৬]

গণহত্যার জন্য সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, এমন কল্পিত গুজব শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এতে সাম্প্রদায়িক সন্দেহ ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে একটা প্রচারপত্র পাওয়া যায়, তাতে এ ধরনের অদ্ভুত দাবি করা হয়:

কোলকাতার মতো শহরে কার্ফু দিয়ে আইন-শৃঙ্খলার নামে আজকাল কী হচ্ছে তা কি তোমরা জানো? তারা কোলকাতায় গোপন কসাইখানা বানিয়েছে। কার্ফু আইন ভঙ্গ করার জন্য পাঞ্জাবি পুলিশ তাদেরকে পুলিশের ট্রাকে করে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে কসাইখানায় অবস্থানরত বা ঐসব কসাইখানার কোয়ার্টারে বাসরত খুনি দলের হাতে তুলে দেয়। অতঃপর গ্রেফতারকৃত ঐ লোকদের অধিকাংশদের কী হয় তা তোমরা জানো; তাদেরকে হত্যা করা হয়, তাদের দেহ কেটে টুকরো টুকরো করা হয় এবং কাঠের বাক্সে পুরে শহরের বাইরে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। এটাই হল 'কোলকাতায় গ্রেফতারকৃতদের অন্তর্ধান রহস্য'। তোমরা জানো যে, মৃত্যু তোমাদের জন্য নিশ্চিত, সুতরাং তোমাদের সব শক্তি দিয়ে এর প্রতিরোধ করো, যত শক্তিশালীই হোক না কেন পাঞ্জাবি পুলিশকে হত্যা করো এবং সম্ভব হলে তার বন্দুক ছিনিয়ে নাও বা তাকে কামড়িয়ে দাও এবং গ্রেফতার করার স্থানে এমন করে চিৎকার করো যাতে আশপাশের লোকজন তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে। এরফলে বাঙলার গুণ্ডা মুসলমান মন্ত্রীদের সহায়তায় মুসলিম লীগের সুপরিকল্পিত এ ধরনের রহস্যময় অন্তর্ধান থেকে মুক্তির কোনো সুযোগ তুমি পেতে পারো। পাকিস্তান এবং তার অর্জনের পন্থা ধ্বংস হোক![৬৭]

'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে'-এর ঘটনার কথা একজন অন্য জনকে বলল, সে আবার অন্য জনকে বলল, এবং প্রতিবারই কোলকাতার 'শান্তিপ্রিয়' হিন্দু জনগণের ওপর মুসলমানদের 'নৃশংসতা'র বিবরণ প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতরভাবে প্রচারিত হল। লোয়ার সার্কুলার রোডে ট্রাম গাড়িতে একটা প্রচারপত্র পাওয়া যায় ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে। ১৬ই আগস্টের ঘটনা বিস্মৃত না হওয়ার জন্য হিন্দুদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ঐ প্রচারপত্রে বলা হয়:

এ কথা আমাদের সব সময় স্মরণ করা উচিত যে, ঐসব লোকের কথা আমাদের স্মৃতি থেকে মুছতে দেয়া যায় না। ঐ নৃশংসতা ঘটিয়েছে এমন-সব লোক যারা মনে করে হিন্দুদের জমির ওপর মসজিদ তৈরি করা, হিন্দু মহিলার সতীত্ব হরণ করা, হিন্দু

উপাসনালয় ধ্বংস ও অপবিত্র করা এবং হিন্দু রীতি ও ধর্মীয় কাজে হস্তক্ষেপ করা তাদের ধর্মীয় কর্তব্য। ১৬ই আগস্ট 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে' পালনকালে তারা ধর্মীয় উন্মাদনায় মেতে ওঠে ও আমাদের প্রিয় মা ও বোনকে ধর্ষণ করার পর ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাদের যোনিপথ ও পায়ু ফেঁড়ে এক করে দেয় এবং মায়েদের স্তন বিকলাঙ্গ করে দেয়, যে স্তন থেকে দুধ পান করতে আমরা হিন্দুরা গর্ববোধ করি ...।

গোয়েন্দা শাখা এটাকে বর্ণনা করে 'ঘৃণার স্তবগান' (a hymn of hates) হিসেবে। ঐ পুস্তিকার শেষে হিন্দুদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, যারা প্রদেশ বিভক্তির বিরোধিতা করে তাদেরকে 'নিশ্চিহ্ন' করে দিতে।[৬৮]

কোলকাতা হত্যাযজ্ঞের একই ধারার অন্য এক বিবরণ পাওয়া যায় একটা কবিতায়। 'ষোলোই আগস্ট উনিশ শ' ছেচল্লিশ' শিরোনামে ঐ কবিতার[৬৯] রচয়িতা হলেন একজন সুপরিচিত হিন্দু কবি, দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী। ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আবৃতি প্রতিযোগিতার বিষয় হিসেবে মুখস্থ করার জন্য ঐ কবিতাটি স্কুলের হিন্দু ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন পাড়ার স্বেচ্ছাসেবী গ্রুপগুলোর মধ্যে সিঁথি ছাত্র সংঘ ঐ আবৃতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। কবিতা সম্বলিত পুস্তিকাটির একাধিক কপি পাওয়া যায় জেমস্ ফিনলে এ্যান্ড কোম্পানির ডেসপ্যাচ শাখার হেড ক্লার্ক বাবু সৌরেন্দ্র কুমার চ্যাটার্জীর কাছে। 'শরীর চর্চায় উৎসাহ দানের একটি সংগঠন' উত্তরা পল্লী মিলন সংঘের তিনি সহকারী সচিব ছিলেন। চ্যাটার্জী আরও স্বীকার করেন যে, তিনি ছিলেন 'জাতীয় ক্রীড়া সংঘের' সাধারণ সম্পাদক। স্বেচ্ছাসেবী এই সংগঠনটি 'শারীরিক ও জাতীয় খেলাধুলার উন্নতি'র জন্য ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪০ সালে। পুলিশের কাছে তিনি বলেন যে, ঐ পুস্তিকার কপি তিনি গ্রহণ করেন সিঁথি ছাত্র সংঘের একজন সদস্যের কাছ থেকে – ঐ কপিগুলো 'আমাকে দেওয়া হয় আমার পরিচিত বিভিন্ন ক্লাবের মধ্যে বিতরণ করার জন্য, যেন তারা রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে'।[৭০] সৌরেন্দ্র কুমার চ্যাটার্জীর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত কোলকাতায় বিভিন্ন স্বেচ্ছামূলক সংগঠনের এই নেটওয়ার্ক সাম্প্রদায়িক প্রচারণার বিস্তারে একটা প্রধান ভূমিকা পালন করে – এই প্রচারণার উদ্দেশ্য ছিল বিভক্তির দাবির পক্ষে বিভিন্ন হিন্দু সমর্থন সংগঠিত করা। দৃষ্টান্ত হিসেবে এন্টালির কথা বলা যায়। ঐ এলাকায় বিভক্তির অনুকূলে জনমত সংগঠিত করার জন্য পাশাপাশি ৭টি ক্লাব কাজ করে।[৭১] একই সাথে সারা বাঙলায় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিভক্তির অনুকূলে যথেষ্ট সংখ্যক সভা ও আবেদনপত্র সংগ্রহের অনুষ্ঠান সংগঠিত করে।[৭২]

তবে বিভক্তির অনুকূল আন্দোলন শুধু কোলকাতা শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সারা প্রদেশের শহর ও গ্রামে এর সপক্ষে দৃঢ় সমর্থন আদায়ে এর সংগঠকেরা সমর্থ হয়। এটা অপ্রত্যাশিত ছিল না যে, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলো এ আন্দোলনের পুরোভাগে থাকবে। কিন্তু পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতেও হিন্দুরা আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করে – যে আন্দোলনের দাবি মেনে নিলে তারা নিজ ভূমিতে পরবাসী হয়ে পড়বে (সারণি ৯)। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই

আবেদন আসে: স্থানীয় সংগঠনগুলো প্রস্তাব নিয়ে প্রায় ক্ষেত্রেই কয়েক শ' লোকের স্বাক্ষর যুক্ত করে তা প্রেরণ করত – এক বা দুটো ঘটনায় দেখা যায় দাবির সপক্ষে বুড়ো আঙুলের ছাপ দিয়ে আবেদনপত্রের কাগজ পাঠানো হয়েছে। এক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোককে ব্যাপকভাবে সংগঠিত করা হয়েছিল – বাঙলার ইতিহাসে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যা কখনো হয়নি। প্রত্যেকেই বিভক্তির পক্ষে মত দেয়; প্রতিটি ফাইলেই দেখা যায় এককভাবে অনেক ব্যক্তির পত্র, যারা তাদের অসন্তোষ প্রকাশে ভীত হয়নি।[৭৩]

সারণি ৯: বাঙলা বিভাগের দাবি সম্বলিত আবেদনের জেলাভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ ও হিন্দু জনগণের আনুপাতিক হার, ১৯৪৭

জেলা	আবেদনের সংখ্যা	হিন্দু জনসংখ্যা (শতকরা হিসাব)
বর্ধমান	৪৩	৭৮.৬২
বীরভূম	২	৬৭.১৭
বাঁকুড়া	৩৪	৯০.৯৯
মেদিনীপুর	৩৪	৮৯.২৩
হুগলী	১৮	৮২.৯৩
হাওড়া	৩৭	৭৮.৩
কোলকাতা	৯৪	৬৮.৭১
২৪ পরগণা	২৩	৬৪.২
মুর্শিদাবাদ	৫	৪৩.১
নদীয়া	১৮	৩৭.৫৩
যশোর	৩	৩৭.৫৫
খুলনা	১৫	৫০.২২
রাজশাহী	৩	২২.৮১
দিনাজপুর	৬	৪৫.২২
জলপাইগুড়ি	১২	৬৭.৫৩
দার্জিলিং	৬	৭৪.১২
মালদা	১২	৪২.১৭
রংপুর	১	২৮.৭৭
বগুড়া	–	১৬.৩৫

(চলমান)

(সারণি ৯-এর বাকি অংশ)

জেলা	আবেদনের সংখ্যা	হিন্দু জনসংখ্যা (শতকরা হিসাব)
পাবনা	১	২২.৯৯
ঢাকা	৬	২৪.১৪
ময়মনসিংহ	৬	২২.৮৯
ফরিদপুর	৩	৩৫.৮৬
বাকেরগঞ্জ	১৪	২৬.৪২
ত্রিপুরা	১	২৪.১৪
নোয়াখালী	২	২১.৪৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম	১	১৭.২৭

সূত্র: সংকলিত হয়েছে এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং জি-৫৪(১)/১৯৪৭, সিএল-১৪(বি)/১৯৪৬ ও সিএল-১৪(ডি)/১৯৪৬; হিন্দু মহাসভা পেপার্স, ২–৪ কিস্তি, ফাইল নং ৮২/১৯৪৭, পি-১০৭/১৯৪৭ এবং ১৩৮/১৯৪৬-৪৭ থেকে। হিন্দু জনসংখ্যার হিসাব নেওয়া হয়েছে *সেন্সাস অব ইন্ডিয়া,* ১৯৩১, খণ্ড ৫ থেকে।

সবচেয়ে বেশি আবেদন পাওয়া যায় পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন হিন্দু-প্রধান এলাকা থেকে (৩ ও ৪ নং মানচিত্র)। কোলকাতা ও ২৪ পরগণাসহ বর্ধমান বিভাগের ৬টি জেলার প্রাপ্ত আবেদনপত্র ছিল মোট সংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগের বেশি।[৭৪] এর মধ্যে কেবল বর্ধমান, মেদিনীপুর, কোলকাতা ও ২৪ পরগণা জেলাই শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ আবেদনপত্র প্রেরণ করে। বাঙলার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার মধ্য থেকে কেবলমাত্র বাকেরগঞ্জ এলাকা থেকে দশটির বেশি আবেদনপত্র প্রেরণ করা হয়।[৭৫] এই বিন্যাসটি একেবারে বিস্ময়কর কিছু ছিল না। কারণ, প্রস্তাবিত নতুন হিন্দু রাষ্ট্রে কেবলমাত্র হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলো অন্তর্ভুক্ত করার কথা ছিল। ত্রিশ দশকের শেষ দিকে এবং চল্লিশ দশকে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাওয়া জেলায় এ আন্দোলন বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে – উল্লেখযোগ্য এসব জেলা হল বর্ধমান, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, হুগলী এবং অবশ্যই কোলকাতা। এর পেছনে যুক্তি হিসেবে বলা হয় যে, এসব জেলায় স্থানীয় ক্ষমতার ভারসাম্য ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে হিন্দুদের হাত থেকে চলে গিয়েছিল এবং গোলযোগ হয়েছিল, যাকে এ পুস্তকে পূর্ববর্তী দাঙ্গা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলি হল সেইসব এলাকা যেখানে ভদ্রলোক হিন্দুরা মুসলমান শাসনের 'স্বেচ্ছাচারিতা' অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব করে – নিজ এলাকায় সংখ্যাগুরু হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান সরকারকে মেনে নিতে বাধ্য হয়।[৭৬]

বিভক্তির আন্দোলন বিভিন্ন জেলায় হিন্দু গ্রুপের স্থানীয় অভিযোগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ছিল না। বরং এটা ছিল একদল লোকের সুপরিকল্পিত আন্দোলন। অধিকাংশ আবেদনপত্রে
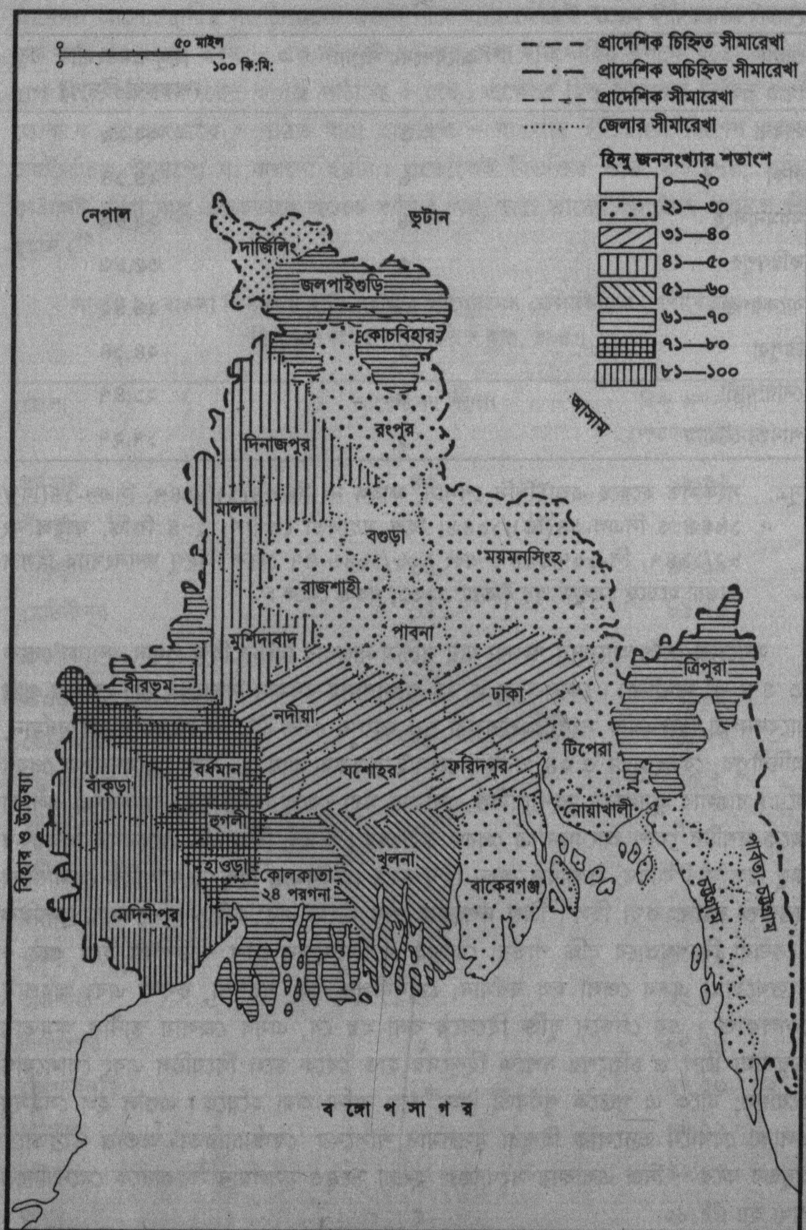
মানচিত্র ৩: জেলাওয়ারি হিন্দু জনসংখ্যার অবস্থান। *সমগ্র জনসংখ্যার প্রতি একশ জনে হিন্দুদের সংখ্যা, ১৯৩১ সালের আদমশুমারি।*
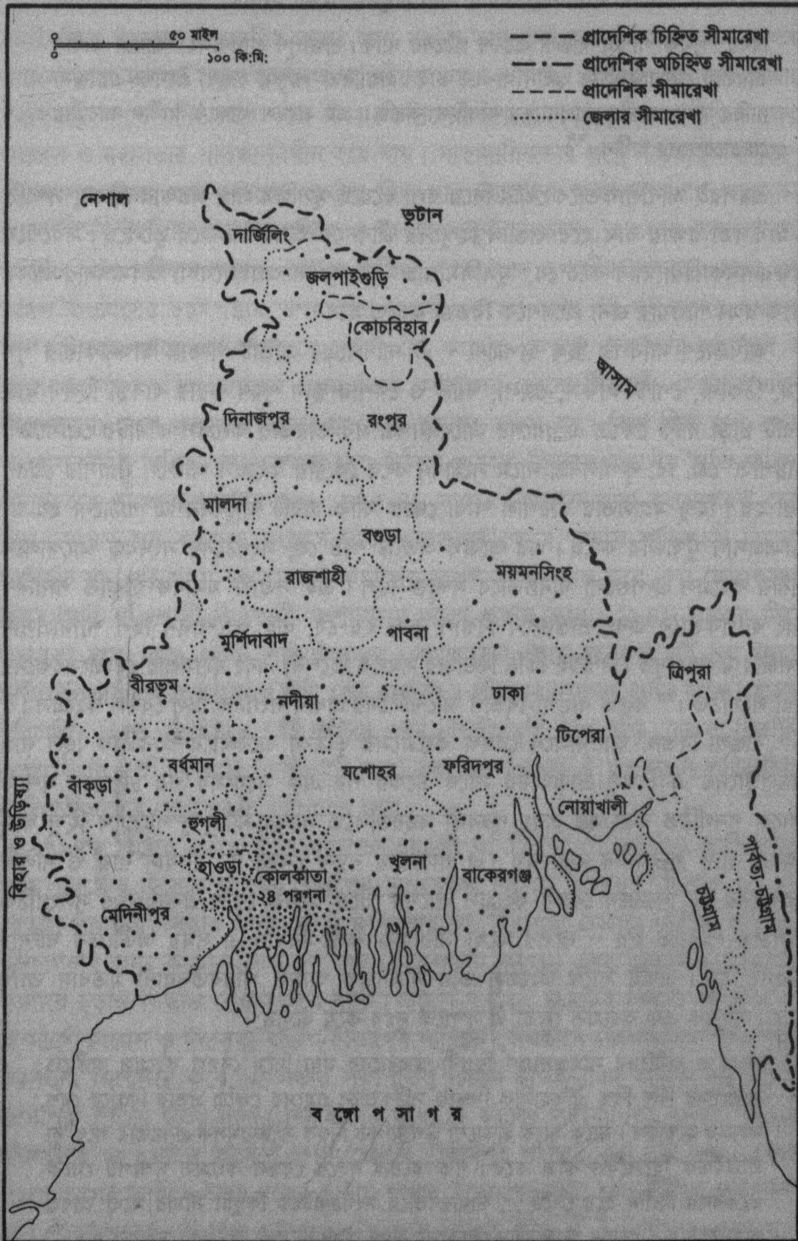
মানচিত্র ৪: বিভাগের জন্য প্রচারণার ভৌগোলিক বিস্তার। *জেলাওয়ারি পিটিশন দাখিলের অবস্থান।*

একই মনোভাব প্রকাশ পায় এবং একই ধারা অনুসরণ করা হয়:

> বিষয়: পৃথক পশ্চিম বাঙলা প্রদেশ গঠনের দাবি। শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রার্থনাসহ: আমরা স্বাধীন ভারতীয় ফেডারেশনের অধীন থাকতে চাই। প্রস্তাবিত 'পশ্চিম বাঙলা প্রদেশ'-এর জন্য দাবির কথা আমরা আপনাদের অবহিত করছি। এই প্রদেশ থাকবে স্বাধীন ভারতীয় ফেডারেশনের অধীন।[৭৭]

এরপরই আবশ্যিকভাবে জোর দিয়ে বলা হয়েছে মুসলিম লীগ সরকার জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতা রক্ষায় ব্যর্থ হয়ে বাঙালি হিন্দুদের জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে। সবশেষে স্বাক্ষরদানকারীরা দাবি করে যে, 'মুসলিম রাজ'-এর অধীন অগ্রহণযোগ্য অবমাননার জীবন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রদেশকে বিভক্ত করতে হবে।

অধিকাংশ দাবিপত্র ছিল ছাপানো – ঐ দাবিপত্রের প্রতিটি পাতায় স্বাক্ষরকারীর পূর্ণ নাম, ঠিকানা, পোস্ট অফিস, জেলা, বয়স ও পেশার স্থান পূরণ করার ব্যবস্থা ছিল। মাত্র চারটি ছাড়া বাকি ক্ষেত্রে এ ধরনের আবেদনপত্র সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট 'রাষ্ট্রপতি' জে. বি. কৃপালনীর নামে সম্বোধন করে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস অফিসে সরাসরি প্রেরণ করা হয়। হিন্দু মহাসভার বরিশাল শাখা থেকে বাকি চারটি আবেদনপত্র পাঠানো হয় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর কাছে। এর ভাবার্থ অত্যন্ত স্পষ্ট যে, সংগঠনের সংঘবদ্ধ আন্দোলনে স্থানীয় কংগ্রেস গ্রুপগুলো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল। এই সত্যটি যথাযথ স্বীকৃতি পায়নি। বরং ব্যাপকভাবে এবং ভ্রান্তভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, এই আন্দোলন ছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মস্তিষ্কপ্রসূত (নিশ্চয়ই তিনি বিভক্তির সমর্থক ছিলেন) এবং মহাসভার স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা সংগঠিত।[৭৮] বস্তুত বাঙলা-বিভাগ আন্দোলনের প্রধান সংগঠক ছিল বেঙ্গল কংগ্রেস।

বাঙলা-বিভাগ আন্দোলনে বেঙ্গল কংগ্রেসের ভূমিকা একেবারে আকস্মিক ছিল না। বামপন্থীদের এবং বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের সাথে একের পর এক সংঘর্ষের পর চল্লিশের দশকে দলকে পুনর্গঠিত করা হয় এবং পরবর্তী বছরগুলিতে দলের নীতি সুস্পষ্টভাবে হিন্দু স্বার্থ রক্ষার পক্ষে পরিবর্তন করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় নতুন নেতা ডা. বিধান রায় ও নলিনী সরকারের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণে বেঙ্গল কংগ্রেস আগের চেয়ে অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত সংগঠনে পরিণত হয় – দলের মধ্যে মারাত্মক কলহ-বিবাদ এ সময় অতীতের ঘটনায় পরিণত হয়। একই সাথে কংগ্রেস তার সামাজিক আমূল পরিবর্তনবাদী মতবাদ ত্যাগ করে। সাবেক এক কংগ্রেস নেতা এ সম্পর্কে দুঃখ করে বলেন:

> নেতা ও কর্মীদের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিপ্লবী আহ্বানের মধ্য দিয়ে বেঙ্গল কংগ্রেস অতীতে কংগ্রেসের কিছু কিছু ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারে বেশ সহায়ক হয়েছিল। মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে উপস্থাপিত নিছক সংস্কারমূলক প্রবণতার পথে তা প্রতিবন্ধক হিসেবেও কাজ করে। গত কয়েক বছরে বেঙ্গল কংগ্রেস দৃশ্যপট থেকে একেবারে বিলীন হয়ে গেছে ... সাধারণভাবে সংগঠনটিকে কিছুটা সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয়েছে ... যাতে ক্ষমতাসীন লোকদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য তা খুবই সহায়ক হয়।[৭৯]

নেতারা এ সময় সিদ্ধান্ত নেন যে, দলের অভ্যন্তরে তাদের ক্ষমতাকে বাইরের রাজনৈতিক ক্ষমতায় রূপান্তরিত করার জন্য বাঙলা ভাগ করা হল একমাত্র পথ। এ লক্ষ্য অর্জনে তারা তাদের নতুন সুশৃঙ্খল বাহিনীকে কাজে লাগায়, যেখানে প্রয়োজন সেখানে মহাসভার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। চল্লিশের দশকে সদস্যভুক্তি ও নীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও মহাসভার পার্থক্য বিলীন হয়ে যায়। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে বাঙলায় মহাসভা ও কংগ্রেসের মধ্যে প্রায় কোনো পার্থক্য ছিল না। ভারতের অন্যান্য অংশে মহাসভার আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল অমার্জিত ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ চালচলন, বাঙলায় সাধারণভাবে মহাসভা এটা পরিহার করে। এর মূল কৃতিত্ব শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বের প্রজ্ঞা এবং বেঙ্গল কংগ্রেসের চরমপন্থার ওপর তাঁর সংযমী কোমল ভাষ্য।[৮০] দুই দলের মধ্যকার সম্পর্ক আস্তে আস্তে এমন পর্যায়ে আসে যে, কংগ্রেস নেতৃত্ব দেয় আর মহাসভা তা অনুসরণ করে। চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে কংগ্রেসের পুরনো নির্বাচনী এলাকার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মহাসভা নিজের আওতায় আনতে সক্ষম হয়। কিন্তু হিন্দু স্বার্থ রক্ষায় কংগ্রেস নীতি অধিক বাস্তবসম্মত হয়ে উঠলে অনেক হিন্দু কংগ্রেসের প্রতি তাদের আনুগত্যের পুনঃপ্রকাশ ঘটায় এবং ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনে তারা কংগ্রেসকেই ভোট দেয়। যুদ্ধের পর বাঙলায় কংগ্রেস দুটো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী হিসেবে আবির্ভূত হয়; এই সময় কংগ্রেস হাই কমান্ডের সুস্পষ্ট সমর্থন লাভ করে এবং কোলকাতার ক্রমবর্ধমান শক্তিশালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জন করে। ১৯৪৬ সালের দিকে মহাসভা হয়ে পড়ে একটা শক্তিহীন দল। কংগ্রেসের কাছে অবনত এই দল উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় একটা আসনেও জয়ী হতে ব্যর্থ হয়। চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে মহাসভা পরিচালিত করত কংগ্রেসকে, এই ভূমিকা এখন বিপরীতমুখী হয়ে পড়ে। বাঙলা বিভক্তির লক্ষ্যে উভয় দল একসাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করলেও কংগ্রেস ঐ আন্দোলন পরিচালনায় সন্দেহাতীতভাবে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করে।

১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে মহাসভা ওয়ার্কিং কমিটি 'বাঙলা বিভক্তির আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে পাঞ্জাবি পুলিশের 'নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে এক দিন হরতাল পালনের' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জানা যায় যে, 'মহাসভা নেতারা একটা যৌথ কার্য পরিচালনার জন্য কংগ্রেস নেতাদের সাথে আলোচনা করছে' এবং 'প্রস্তাবিত হরতালের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বাঙলা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নির্বাহী পরিষদে'।[৮১] মে মাসে কংগ্রেস ও মহাসভা বাঙলা বিভাগের দাবিতে যৌথভাবে কোলকাতায় এক বিরাট জনসভার আয়োজন করে, ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকার।[৮২] প্রাদেশিক পর্যায়ে উভয় দলের নির্বাহীদের মধ্যে এ ধরনের সহযোগিতা স্থানীয় পর্যায়েও পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে হুগলী জেলার শ্রীরামপুর শহরের কথা বলা যায়। এখানে বাঙলা ভাগের দাবিতে উভয় দলের স্থানীয় শাখার উদ্যোগে একটা যৌথ মিছিল পরিচালিত হয়। শ্রীরামপুরের এই তুচ্ছ ঘটনাতেও কংগ্রেস নেতৃত্ব দেয় – ঐ মিছিলের চেয়ারম্যান ছিলেন স্থানীয় কংগ্রেস নেতা বাবু কালিপদ মুখোপাধ্যায়।[৮৩] বাকেরগঞ্জ জেলার ঝালকাঠি

এবং ঢাকা জেলার কালনায় কংগ্রেস ও মহাসভার মহকুমা শাখা বাঙলা বিভাগের দাবিতে যৌথভাবে জনসভা করে। অন্যান্য ঘটনায় দেখা যায়, স্থানীয় বিভিন্ন মহাসভা কমিটি বাঙলা বিভাগের প্রস্তাব পাশ করার পর তা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর কাছে না পাঠিয়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কাছে প্রেরণ করেছে। পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন মহাসভা কমিটির ক্ষেত্রে বিশেষ করে কোলকাতা, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা এবং সর্বোপরি বর্ধমানের ক্ষেত্রে এটা সত্য ছিল।[৮৪] এমনকি মহাসভা কর্মীরা বুঝতে পারে যে, শ্যামাপ্রসাদ নয়, কংগ্রেস নেতারাই নেতৃত্বে আছে। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বাঙলা ভাগ হয়ে যাবে। এ সময় উভয় দলের মধ্যে কাজের সম্পর্ককে স্বাভাবিক করার প্রয়াসে বাঙলার 'খাদি-গ্রুপের নেতারা' শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে কংগ্রেস নেতা হিসেবে পশ্চিম বাঙলার মন্ত্রিসভায় যোগদানের আহ্বান জানায়। সেখানে উপস্থিত হিন্দু মহাসভার নেতারা তাঁকে এই প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করেন। জানা যায়, 'শ্যামাপ্রসাদ নিজে ব্যক্তিগতভাবে পশ্চিম বাঙলায় একটা মন্ত্রীর পদ গ্রহণের পক্ষে ছিলেন; তবে বোঝা যায় যে, শীর্ষ কংগ্রেস নেতাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে কংগ্রেস পার্টিতে যোগদান করতে হবে বলে তিনি ঐ পদ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন।'[৮৫]

বাঙলা ভাগের যৌথ আন্দোলনে কংগ্রেস স্পষ্টতই ছিল অধিকতর অগ্রণী অংশীদার। আর বিভক্তির আন্দোলনে এর ভূমিকা (যাকে বলে নেতৃত্বের মর্যাদায়) হিন্দু মহাসভার সাথে শুধু সহযোগিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সারা বাঙলায় মহাসভা ছাড়াই কংগ্রেস স্বতন্ত্রভাবে বাঙলা ভাগের আহ্বান জানিয়ে জনসভার আয়োজন করে। কোলকাতার বালিগঞ্জে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বাঙলার নেতৃস্থানীয় গান্ধীবাদী ড. প্রফুল্লচন্দ্র রায় – এ ধরনের জনসভার মধ্যে এটাই ছিল বহুল প্রচারিত। বাঙলা ভাগের জন্য ৭৬টি জনসভার আয়োজন করা হয় বলে জানা যায় – এর মধ্যে কংগ্রেস একাই কমপক্ষে ৫৯টি জনসভার আয়োজন করে। বারোটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয় মহাসভার উদ্যোগে, আর মাত্র পাঁচটি জনসভা হয় যৌথ উদ্যোগে। ঘটনাচক্রে এক জায়গায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে অথচ পুরোপুরি এককভাবে হয়নি এমন ঘটনাও স্পষ্ট গোচর হয়। এগুলি হয়েছে সেই সব জেলায়, যেখানে আন্দোলন অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল (অর্থাৎ কোলকাতা, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হাওড়া ও বাঁকুড়া) এবং যেখানে কংগ্রেস অগ্রণী ভূমিকায় ছিল (মানচিত্র ৪ এবং ৫ নং)। যুক্তিগ্রাহ্যভাবে এই আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল বর্ধমান জেলা। কংগ্রেস কমিটিগুলো এ জেলায় বাঙলা বিভাগের পক্ষে শুধু কাটোয়া, কালনা ও আসানসোলের মতো শহরেই জনসভার আয়োজন করেনি, রায়ানের মতো ক্ষুদ্র গ্রামেও জনসভার আয়োজন করে। এ গ্রাম থেকেই স্বাক্ষর ও বুড়ো আঙুলের ছাপ দিয়ে একশ'টি দরখাস্ত প্রেরণ করা হয়।[৮৬] এটা স্পষ্ট যে, বেঙ্গল কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি থেকে এই আন্দোলন যে শক্তি লাভ করে তা মোটেও কম নয়।

ভদ্রলোকেরা ছিল এ আন্দোলনের মূল শক্তি, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বস্তুত ভদ্রলোক রাজনীতির মূল স্রোত যে দিকে প্রবাহিত হয় তাতে বাঙলা ভাগ ছিল তার

যৌক্তিক পরিসমাপ্তি। প্রাদেশিক রাজনীতিতে ক্ষমতা হারিয়ে ও জমিদারি পদ্ধতির দ্রুত অবক্ষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে হতাশ ভদ্রলোক গ্রুপ তাদের ঐতিহ্যগত সুযোগ-সুবিধা রক্ষায় স্বীয় শক্তি নিয়োগে তৎপর হতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়ায় তারা মূল জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ধারা থেকে সরে যায়। কিছুটা হলেও প্রস্তাবিত বাঙলা-বিভাগ তাদেরকে আশ্বস্ত করে যে, প্রদেশের হিন্দুপ্রধান এলাকায় তারা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। এসব এলাকায় মুসলিম শাসনের সম্ভাবনা ও অভিজ্ঞতা তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং এসব এলাকাতেই বিভক্তির আন্দোলন সবচেয়ে বেশি জোরালো সমর্থন পায়। একদা জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত ভদ্রলোক বাঙালিরা ১৯৪৭ সালে তাদের প্রদেশকে ভাগ করার দাবিতে প্রাপ্ত প্রতিটি কৌশল ও পদ্ধতিকে কাজে লাগায়। একটা পৃথক হিন্দু প্রদেশের দাবি উত্থাপনের জন্য তাদের শুধু কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভাই একমাত্র মাধ্যম ছিল না; মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের এসোসিয়েশন, ইউনিয়ন বোর্ড, জমিদার এসোসিয়েশন, রেটপেয়ারস্‌ (Ratepayers) এসোসিয়েশন, স্থানীয় ক্লাব (যেমন ন্যাশনাল এ্যাথলেটিক ক্লাব, এন্টালি), স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন (যেমন কোলকাতার খেয়ালী সংঘ) এবং এমনকি এন্টালি বয়েজ লাইব্রেরি বহু আবেদনপত্র প্রেরণ করে। ভদ্রলোকদের শক্তিশালী ঘাঁটি বাঁকুড়ার কমপক্ষে ত্রিশটি ইউনিয়ন বোর্ড থেকে আবেদনপত্র পাঠানো হয়[৮৭] (মানচিত্র নং ৫)। যেসব ইউনিয়ন বোর্ডে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ছিল, সেখানকার আবেদনপত্রে 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' দিয়ে বলা হয় যে, এ আবেদনপত্র শুধুমাত্র হিন্দু সদস্যরাই সমর্থন করেছে, যাদের বেশিরভাগেরই ভদ্রলোক হিসেবে সামাজিক পরিচিতি আছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, তিন জন ব্যারিস্টার, এক জন উকিল, দুজন চা বাগানের মালিক, দুজন সওদাগর (এর মধ্যে একজন হলেন মাড়োয়ারি লক্ষ্মী নারায়ণ আগরওয়াল) এবং এক জন জমিদারের আবেদনপত্র জলপাইগুড়ি পৌরসভা অগ্রায়ন করে।[৮৮] যেসব জেলায় হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিল এবং স্থানীয় সংস্থাগুলোতে মুসলমানেরা নেতৃত্ব দিত, সেসব এলাকার ভদ্রলোক নিয়ন্ত্রিত পেশাজীবী সমিতিগুলোকে দিয়ে এ ধরনের কাজ করানো হত। বরিশাল, পিরোজপুর, গোয়ালন্দ, বারুইপুর, মাদারীপুর, খুলনা, সুরি, বহরমপুর, এবং নদীয়া বার এসোসিয়েশনের পাশাপাশি দিনাজপুরের উকিলদের সমিতি, নদীয়ার হিন্দু মেডিকেল প্রাকটিশনার্স এসোসিয়েশন আবেদনপত্র প্রেরণ করে। ব্রিটিশ ও এ্যাঙ্গলো প্রতিষ্ঠানের ক্লারিক্যাল ও ম্যানেজারিয়াল কর্মচারীরা অর্থাৎ কোলকাতার তথাকথিত 'বক্সওয়ালা'রা রীতিমতো ভীত হয়ে পড়ে, তাদের রাজনৈতিক মত প্রকাশ করতে এবং আন্দোলনে যোগ দিতে দেখা যায়। আবেদনপত্রের ফাইলে জমা হয় মেসার্স জেসফ এ্যান্ড কোম্পানি, সাউথ ব্রিটিশ ইনসুরেন্স কোম্পানি, লুইস ড্রিফাস কোম্পানি, এ্যাঙ্গাস এ্যান্ড কোম্পানি, জেমস ফিনলে এ্যান্ড কোম্পানি, বালমার লরি এ্যান্ড কোম্পানি এবং আরও অনেক ব্রিটিশ ও মাড়োয়ারি মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ভারতীয় কর্মচারীদের আবেদনপত্র। বাঙলার সম্ভ্রান্ত এবং খ্যাতিমান ভদ্রলোক যেমন, চক্ষু সার্জন, সার্জারির প্রফেসর, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, জমিদার, বাবু মিল ম্যানেজার, নির্বাহী প্রকৌশলী – সবাই এ কথা সমর্থন করে
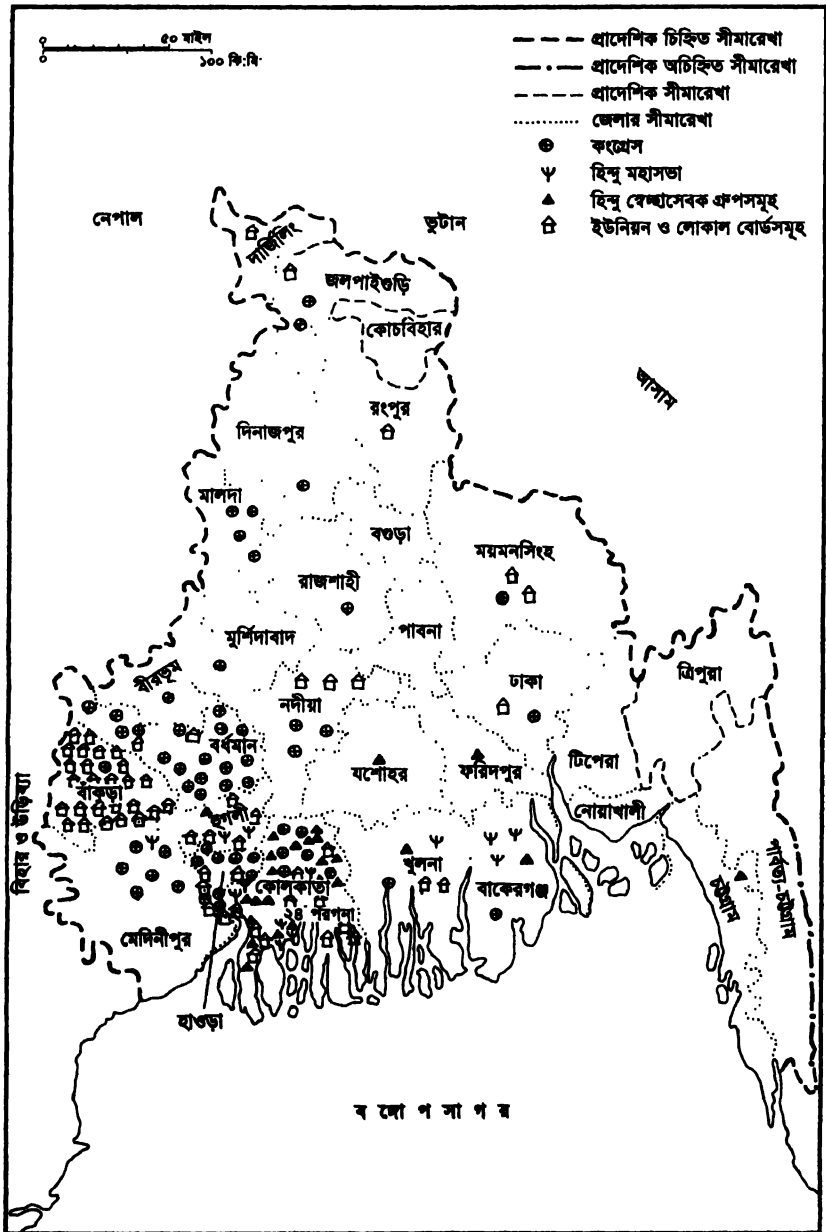
মানচিত্র ৫: বিভাগের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি। *কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সভা অনুষ্ঠান।*

ঘোষণা করে যে, 'মুসলিম লীগ সরকারের অধীনে জীবন, সম্পত্তি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ধ্বংস হয়ে যাবে' এবং সে-কারণে 'অনতিবিলম্বে বাঙলা ভাগের দাবি ছাড়া' তাদের বিকল্প নেই।[৮৯]

আর্থিক স্বার্থের বিষয়টি এই আন্দোলনে বেশ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়; এর পরিচালনা ছিল সুসংগঠিত ও এর জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল ছিল। কোলকাতা ও পল্লি এলাকার বাঙালি বা অবাঙালি ব্যবসায়ীরা এই আন্দোলন পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিড়লা, ঈশ্বর দাস জালান, গোয়েঙ্কা ও নলিনী রঞ্জন সরকার – বাঙলার সব লাখপতি ক্রোড়পতি – উচ্চ পর্যায়ের কমিটিতে উপস্থিত থেকে আন্দোলন পরিচালনার কৌশল নির্ধারণ করতেন।[৯০] প্রদেশের সব এলাকা থেকে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির কাছে দরখাস্ত প্রেরণ করে জানায় যে, মুসলিম লীগ সরকারের অধীন বাঙলায় ব্যবসা 'সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস' হয়ে গিয়েছে এবং তারা বাঙলা বিভাগের প্রচেষ্টায় আন্তরিকভাবে সমর্থন করে। তারা বলে যে, এই পদক্ষেপ 'শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয়'।[৯১] বাঙলার বিভিন্ন এলাকায় অনেক জনসভায় অনতিবিলম্বে একটা পৃথক হিন্দু প্রদেশ গঠনের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব পাশ করা হয় – এসব জনসভায় সভাপতিত্ব করেন (এবং অবশ্যই অর্থ প্রদান করেন) স্থানীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, হাওড়ার ডালিমগুলঘাটের সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় একজন লাখপতি এবং উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে এ ধরনের সভায় সভাপতিত্ব করেন সম্পদশালী বাঙালি চা-বাগান মালিক এস. সি. কর। আর কোলকাতায় আনন্দিলাল পোদ্দার সভাপতিত্ব করেন –

> এক বৈঠক ... যেখানে আর্য সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ, মহাবোধিনী সমাজ, হিন্দু মিশন, সনাতন হিন্দু সভা ইত্যাদি সহ বাঙলার বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিনিধিরা যোগদান করে ... (এ সভায়) বিভিন্ন বক্তৃতায় ভারতীয় ইউনিয়নে থাকতে আগ্রহী বিভিন্ন এলাকা নিয়ে বাঙলায় পৃথক এক হিন্দু প্রদেশ গঠনের দাবি জানানো হয়।[৯২]

বস্তুত বেশ কয়েক বছর ধরে জি. ডি. বিড়লা ছিলেন বাঙলা ভাগের একজন সমর্থক: ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে তিনি মহাদেব দেশাইয়ের কাছে স্বীকার করেন যে, 'আমি (বাঙলা) বিভাগের পক্ষে। আমি মনে করি না যে, এটা অবাস্তব বা হিন্দুদের স্বার্থবিরুদ্ধ।'[৯৩] কোলকাতার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাছে (বাঙলা) বিভাগ স্পষ্টত আর্থিক দিক দিয়ে উত্তম বলে প্রতিভাত হয়। মন্দার আর্থিক ক্ষতি থেকে পাট শিল্প কখনও পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে পারেনি। অধিকাংশ মাড়োয়ারি পারিবার পাটের ফটকা বাজারে লেনদেন করে তাদের ভাগ্য গড়ে তুললেও ত্রিশের দশকে তারা পাট শিল্প থেকে দ্রুত অন্য ব্যবসায়ের দিকে মনোনিবেশ করে। তাদের কেউ কেউ যেমন আনন্দিলাল পোদ্দার এবং ঝুনঝুনওয়ালা, শেঠি ও কারনানিদের মতো অনেকে ঐ সময় কয়লার খনিতে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করে; বিড়লা ভ্রাতৃবর্গসহ অন্যরা 'এ যাবত অজ্ঞাত ও অপরিচিত ভিন্নমুখী শিল্প', যেমন চিনি, কাগজ, বস্ত্র, কেমিক্যাল, ব্যাংকিং ও বিমা শিল্পে বিনিয়োগ করে;[৯৪] এই বিনিয়োগের ফলে

তাদের স্বার্থ প্রায় ক্ষেত্রেই বাঙলার বাইরের এলাকার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে এবং উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের সাথে কোলকাতার বাণিজ্যিক যোগাযোগ দৃঢ়ভাবে গড়ে ওঠে। কোলকাতার ব্যবসায়ীদের কাছে এক সময় পূর্ব বাঙলা এবং পাট উৎপাদন এলাকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু চল্লিশের দশকে ঐ সম্প্রদায়ের কাছে এ এলাকা ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত পূর্ব বাঙলার দুর্বল বাজার দখলের বিষয়টিও কোলকাতার ব্যবসায়ীদের কাছে তখন যথেষ্ট লোভনীয় ছিল না। ফলে ব্রিটিশদের চলে যাওয়ার প্রাক্কালে সর্ব-ভারতীয় বাজারের প্রধান অংশ নিশ্চিতভাবে দখলের লোভনীয় সম্ভাবনার আশা পোষণ করার যথেষ্ট কারণ তাদের ছিল।

কিন্তু স্বাধীনতার দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত সুফল প্রাপ্তির জন্য বাঙলাকে অবশ্যই ভাগ করতে হবে। কোলকাতার মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের এ কথা বিশ্বাস করার কোনো কারণ ছিল না যে, মুসলিম লীগ সরকারের অধীনে তারা ভালো করবে। বস্তুত বাঙলা লীগ, যা ছিল হাসান ইস্পাহানীর আর্থিক সমর্থনের ওপর মারাত্মকভাবে নির্ভরশীল, স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, স্বাধীনতার পর মুসলমান ব্যবসায়ীদের উন্নয়নে তারা উদ্যোগ নেবে।[৯৫] অপর পক্ষে, বাঙলায় কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে ঐ সরকার হবে মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের পকেট সরকার। একমাত্র বাঙলা বিভাগের মাধ্যমে কংগ্রেস বাঙলায় ক্ষমতায় আসতে পারবে। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোকে ভারতে রাখাসহ জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাঙলা ভাগ করা হলে কোলকাতাকে প্রস্তাবিত হিন্দু প্রদেশে রাখা যাবে। এ ধরনের বিভক্তি বড় বড় ব্যবসায়ীদের স্বার্থের অনুকূল বলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়। বাঙলা ভাগের আন্দোলনে বিড়লা ও তাঁর সম্প্রদায়ের সদস্যরা নিখুঁত ব্যবসায়িক স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জমিদার, পেশাজীবী ও বাঙলার অসংখ্য সম্মানিত শ্রেণীর চাকুরিজীবী (স্পষ্ট করে বললে ধুতিপরা) কেরানিরা ব্যবসায়ী গ্রুপের পাশাপাশি স্পষ্টভাবে আন্দোলনে আধিপত্য বিস্তার করে। বাঙালি হিন্দু সমাজের অন্যান্য কম সুবিধাভোগী শ্রেণীকেও সংগঠিত করা হয়। চারটি ভিন্ন পল্লি অঞ্চলের আবেদনে স্বাক্ষরকারীদের পেশাগত শ্রেণী বিভাগে দেখা যায়, কৃষিকাজের পেশায় (চাষ বা চাষাড়ি) যুক্ত জমিতে লাঙল দেয়াসহ কঠিন পরিশ্রমের কাজ সম্পাদনকারী চাষা লোকের সংখ্যা বিস্ময়করভাবে বেশি (সারণি ১০)। অবশ্য এসব আবেদনের সমর্থনকারী কৃষকের সংখ্যা স্থানবিশেষে বেশ কম-বেশি হয়। সারণি ১০-এ উল্লিখিত কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাদের সংখ্যা কাশিয়ারায় শতকরা ৮০ ভাগ এবং তিরোল-এ শতকরা ৪৪ ভাগ। যাদের আবেদনপত্রে স্বাক্ষর (বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ দেওয়ার পরিবর্তে) ছিল, মনে করা যেতে পারে যে, এরা মোটামুটিভাবে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন এবং মর্যাদার দিক থেকে তাদের স্থান সাধারণ কৃষকদের থেকে কিছুটা উচ্চ স্তরে। তবু এসব আবেদনপত্র থেকে দেখা যায়, আন্দোলনের সংগঠকেরা (বাঙলা) বিভাগের দাবিতে অ-ভদ্রলোক হিন্দু জনমতকে সংগঠিত করতে এবং আন্দোলনকে উৎসাহিত ও জনপ্রিয় করতে সমর্থ হয়। বিশেষভাবে বর্ধমান জেলায় দেখা যায়, এই সাফল্যের মূলে রয়েছে কংগ্রেসের স্থানীয় শাখার কর্মকাণ্ড। দৃষ্টান্ত হিসেবে রায়ান গ্রামের কথা বলা যায়; 'কংগ্রেস সেবক সংঘের' স্থানীয় শাখার কর্মকাণ্ডের

ফলেই ঐ গ্রামে স্বাক্ষর অভিযান বেগবান হয়েছে। বিভক্তিকে সমর্থন করে এই সংঘ স্বীয় প্রস্তাব প্রেরণ করে। কিন্তু ভদ্রলোক নয় এমন অনেক লোক আন্দোলনে যোগদান করে। এ আন্দোলনে তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণে প্রতিফলিত হয় যে, কম সুবিধাপ্রাপ্ত নিম্ন শ্রেণীর লোক ও উপজাতীয় গ্রুপকে হিন্দু রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চল্লিশের দশকের জাতিগত সংহতি কর্মসূচি (cast-consolidation programmes) সফল হয়েছে। কংগ্রেস ফাইলে যেসব আবেদনপত্র আছে তাতে দেখা যায় যে, এগুলো পাওয়া গেছে ২৪ পরগণা জেলার বারাসাতের 'তফশিলি সম্প্রদায় হিন্দু', বর্ধমানের পরাতল ইউনিয়নের আদিবাসী সমিতি, ময়মনসিংহের ইসলামপুর হরিজন সেবা সংঘ, খুলনা তফশিলি সম্প্রদায় সমিতি, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং-এর উপজাতীয় লোক, বঙ্গীয় সদগোপ সভা, বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি, খুলনার বঙ্গীয় যাদব মহাসভা এবং ২৪ পরগণা জেলার জয়নগরের 'তফসিলী সম্প্রদায় হিন্দু'দের কাছ থেকে। এসব এলাকার জনমত সংগঠিত করার এই প্রক্রিয়ায় মহাসভার 'শুদ্ধি' অভিযান অগ্রণী ভূমিকা পালন করে; জাতিগত সংহতির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচিও বেশ কার্যকর হয়।

পূর্ব বাঙলায়, বিশেষ করে বাকেরগঞ্জে, বিভাগের সমর্থনে আন্দোলনকে জোরদার করতে মহাসভা সাহায্য করে, কারণ এখানে তার সাংগঠনিক কাঠামো ছিল খুবই শক্তিশালী। কিন্তু মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার হিন্দুরা বিভাগের আহ্বানকে সমর্থন করে একটা অবাস্তব দাবি করে – তারা বলে যে, যে কোনো ভাবেই হোক তাদের মহকুমাগুলোকে প্রস্তাবিত নতুন হিন্দু রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, (বাঙলা) বিভাগের দাবিকে সমর্থন করে বরিশাল জেলা হিন্দু মহাসভার এক স্মারকলিপিতে বাকেরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ নতুন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার যুক্তি উত্থাপন করা হয়:

> এটা এখন এক সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হয়েছে যে, সাম্প্রদায়িক সংহতি, শান্তি ও সুস্থিরতার স্বার্থে এবং হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য বাঙলায় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ গঠন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। গত দশ বছরে মুসলিম লীগ প্রশাসনের অধীনে বিশেষ করে মুসলিম ঘোষিত ১৬ই আগস্ট 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে' ঘোষণার পর এবং এর ফলে সৃষ্ট নৃশংসতায় হিন্দুদের সংস্কৃতি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা মারাত্মকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

এ স্মারকলিপিতে এই দাবি উপস্থাপন করা হয় যে, যেন একটা নতুন 'বরিশাল জেলা', যেখানে পুরো গৌরনদী, উজিরপুর, ঝালকাঠি, স্বরূপকাঠি থানা ও বরিশালের (কোতোয়ালি) বাবুগঞ্জ, নলছিটি, বাকেরগঞ্জ, কোনাখালি ও পিরোজপুর থানা'র অংশ অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এই জেলাকে নতুন হিন্দু রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।[৯৬] পূর্ব বাঙলার যারা বাঙলা বিভাগের দাবি জানায় তারা কেউ এই নির্মম সত্যের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না যে, বিভাগের পর তার নিজের শহর বা থানা 'পাকিস্তানের' অন্তর্ভুক্ত হবে। ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে এটা যখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাদেরকে নতুন হিন্দু

সারণি ১০: বিভাগের জন্য আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারীদের পেশাগত শ্রেণীবিভাগ (বাঙলার চারটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম থেকে প্রেরিত)।

পেশা	স্বাক্ষরকারীদের সংখ্যা	পেশা	স্বাক্ষরকারীদের সংখ্যা
কাইতি পোস্ট অফিস		**খাশিয়ারা পোস্ট অফিস**	
বর্ধমান জেলা		বর্ধমান জেলা	
ব্যবসা	১৩	ব্যবসা	২
জমিদারি	২	জমিদারি	–
চাকুরি (বৃত্তিভোগী/চাকুরি)	৬	চাকুরি	৬
কৃষিকাজ (চাষ/চাষাদি)	১২৫	কৃষিকাজ	৪৪
ছাত্র	৬	বিবিধ	৩
বিবিধ	২৬	মোট	৫৫
মোট	১৭৮		
রায়ান পোস্ট অফিস		**ভিরোল পোস্ট অফিস**	
বর্ধমান জেলা		হুগলী জেলা	
ব্যবসা	৩	ব্যবসা	১২
জমিদারি	–	জমিদারি	–
চাকুরি	২০	চাকুরি	২৮
কৃষি কাজ	৪০	কৃষি কাজ	৪৪
বিবিধ	২৩	বিবিধ	১৬
মোট	৮৬	মোট	১০০০

প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোনো বিশেষ উদ্ধার-পরিকল্পনা নেই তখন তাদের কোলকাতা ও পশ্চিম বাঙলায় পাড়ি জমানো উদ্বাস্তুদের স্রোতে যোগ দেয়া ছাড়া উপায় থাকল না। পেছনে পূর্ব পাকিস্তানে ফেলে আসল তাদের ভিটেমাটি, কর্মসংস্থান। এটা এখনো নথিপত্র দৃষ্টে ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের বাস্তু ত্যাগের ঘটনা।

যুক্ত বাঙলার পরিকল্পনা

বাঙলা-বিভাগ আন্দোলনে হিন্দু জনমত সংগঠনের সাফল্য মানে এই নয় যে, সবাই এ আন্দোলনে ভেসে গিয়েছিল। শরৎ বসুর নেতৃত্বে মুষ্টিমেয় কিছু লোক এই স্রোতকে
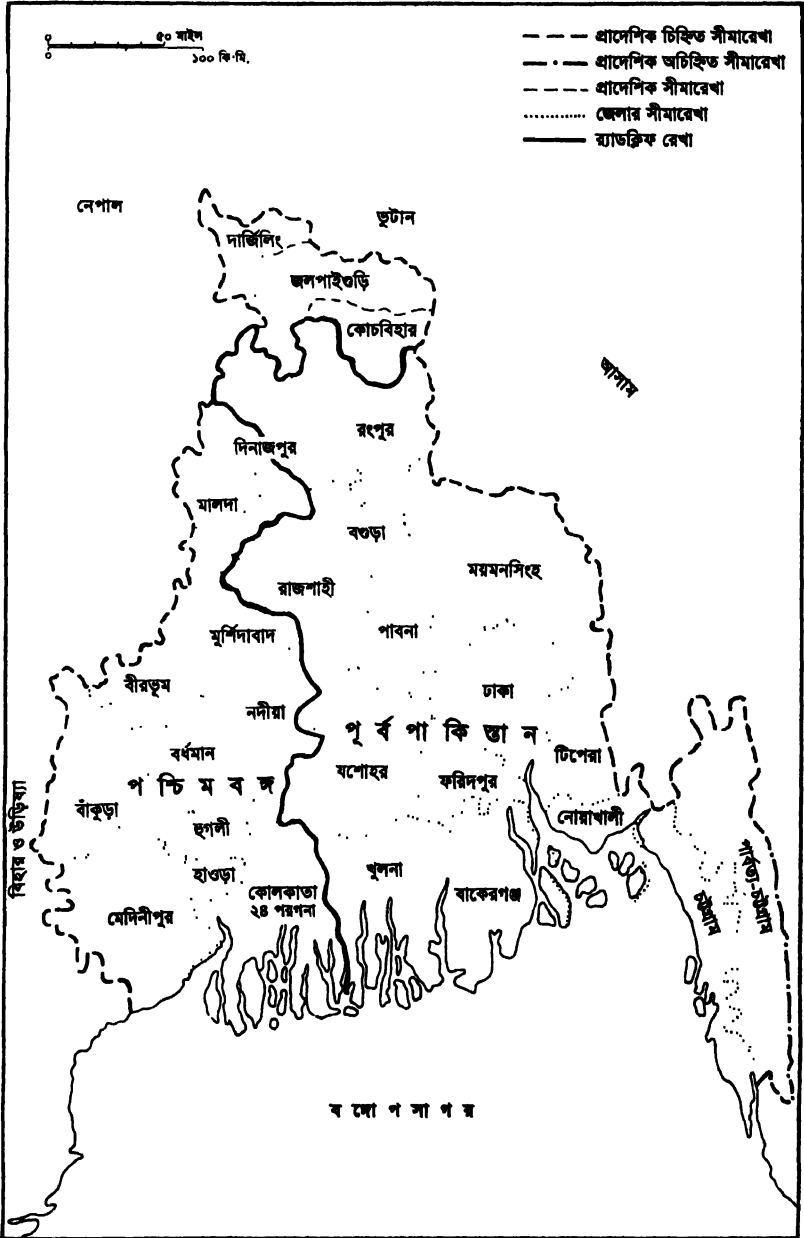
মানচিত্র ৬: পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান। *র‍্যাডক্লিফ রেখা।*

ঠেকানোর প্রচেষ্টা নেন। বেঙ্গল কংগ্রেসের ৬ই ডিসেম্বর পরিকল্পনা 'গ্রহণ' প্রশ্নে ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে বসু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন – এর কিছুদিন আগে তিনি দলে ফিরেছিলেন। বিবৃতিতে বলা হয় যে, এ দল 'জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আরোপিত বা জনগণকে বাধ্য করার কোনো বিষয়ে সম্পৃক্ত থাকবে না'। এই বিবৃতিতে এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে, কংগ্রেস আসলে বিভাগের নীতিকে মেনে নিয়েছে।[৯৭] একইভাবে ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যুক্তি উত্থাপন করে যে, 'পাঞ্জাবকে দুই প্রদেশে ভাগ করার জন্য সামান্য পরিমাণে হলেও বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এর মাধ্যমে প্রধানত অমুসলিম অংশকে মুসলিম প্রধান অংশ থেকে পৃথক করা যাবে।'[৯৮] শরৎ বসু অনতিবিলম্বে বাঙলার ক্ষেত্রে এর ফল লক্ষ করে বলেন: 'আমি মনে করি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ করা উচিত এবং সতর্ক করা উচিত ... আমার মনে হয় ধর্মীয় ভিত্তিতে প্রদেশের বিভাগ সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের ভিত্তি হতে পারে না।'[৯৯] তিনি যুক্তি উত্থাপন করে বলেন যে, 'এই প্রস্তাব হল, কংগ্রেসের ঐতিহ্য ও আদর্শ থেকে মারাত্মক বিচ্যুতি। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এটা হল পরাজিত মানসিকতার ফল।'[১০০]

কিন্তু অনতিবিলম্বে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রাদেশিক কংগ্রেসের কেউ বসুকে সমর্থন করেনি। এক পক্ষকালের মধ্যে বাঙলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে একটা প্রস্তাব পাস করে। বিভাগের দাবিকে সমর্থন করে ঐ প্রস্তাবে বলা হয় যে, বাঙলার যেসব অংশ ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে থাকতে আগ্রহী তাদেরকে সেইভাবে থাকার অনুমতি দেওয়া উচিত।[১০১] কয়েকদিন পর শাসনতন্ত্র (constituant) পরিষদের বাঙলার এগারো জন হিন্দু সদস্য মাউন্টব্যাটেনের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর কাছে 'ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে পশ্চিম ও উত্তর বাঙলায় পৃথক ও স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ গঠনের দাবি জানান'।[১০২] তবু কিরণ শংকর রায়ের সহায়তায় শরৎ বসু শেষ মুহূর্তে একটা 'যুক্ত ও সার্বভৌম বাঙলা' গঠনে মুসলমান নেতাদের সাথে চুক্তি করেন। ১৯৪৭ সালের মে মাসে বসু এই প্রস্তাবের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের একটি রূপরেখা প্রস্তুত করেন এবং সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম তা উৎসাহের সাথে গ্রহণ করেন। আবুল হাশিম ছিলেন প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ক্ষমতাবান জেনারেল সেক্রেটারি। অনিশ্চিত এই মৈত্রীর ভিত্তি ছিল যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার এবং জনসংখ্যা অনুপাতে আসন সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ। বাঙলার 'স্বাধীন রাষ্ট্রে' সমান সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান মন্ত্রী থাকবে, তবে ব্যতিক্রম হল এই যে, মুখ্যমন্ত্রী হবেন মুসলমান এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন হিন্দু। সরকারি চাকুরিতে মুসলমানদের সমান অংশ নিশ্চিত করা হবে। সবশেষে সবাই সম্মত হয় যে, বাঙলার স্বাধীন রাষ্ট্র হবে 'সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী'; এ ধারণা গ্রহণ করা হয় যে, 'সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান আসলে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মধ্যে নিহিত রয়েছে'।[১০৩]

যাহোক, যুক্ত বাঙলা পরিকল্পনা অসম্ভব পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।[১০৪] বাঙলাকে যুক্ত রাখার পরিকল্পনায় গান্ধীও শর্তসাপেক্ষ সমর্থন দেন,[১০৫]তবে তাঁকে সমর্থন প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয়। পরে তিনি স্বীকার করেন যে, ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁর

সহকর্মীরা 'শরৎ বাবুর উদ্যোগে সমর্থন জানানোর জন্য তাঁকে কৈফিয়ত তলব করে'।[১০৬] ইতিমধ্যে কংগ্রেস হাই কমান্ড একটা শক্তিশালী কেন্দ্র ও একক (unitary) ভারতের একটা প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। ভারতের ঐক্য ও সংহতি নিশ্চিত করার জন্য মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল কেটে বাদ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যতের জন্য এই ঐক্য ও সংহতিকে চাবিকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল সেটি তখন রাজনীতিবিদদের ভণ্ডোক্তিতে পরিণত হয়। এমনকি নেহেরু ও প্যাটেলের মধ্যে প্রায় ক্ষেত্রে মতবিরোধ হলেও এ বিষয়ে তাঁরা ছিলেন একমত। নেহেরু ভারতকে 'পারস্পরিক শত্রুভাবাপন্ন এলাকা'য় বিভক্ত করার বিরোধিতা করেন দৃঢ়তার সাথে।[১০৭] এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ছিলেন যে, কোনো একক প্রদেশকে কোনো অবস্থাতেই ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। প্যাটেল কংগ্রেসের নিজে থেকে ছেড়ে দেয়া এলাকা ছাড়া জিন্নাহর জন্য বেশি এক ইঞ্চি জমি না দিতেও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এ কারণে বাঙালি হিন্দুদের (বাঙলা) বিভাগের দাবির প্রতি তিনি জোর সমর্থন জানান। তিনি তাদেরকে আশ্বস্ত করেন যে:

> ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বাঙলা পৃথক হতে পারে না। স্বাধীন বাঙলা সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের ধারণা হল বোকার মতো মুসলিম লীগের খপ্পরে পড়ার জন্য অপ্রত্যাশিত প্ররোচনাপূর্ণ একটা ফাঁদ। বাঙলার এই অবস্থা সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সম্পূর্ণ সচেতন এবং আপনাদের ভয় পাওয়ার আদৌ প্রয়োজন নেই! অ-মুসলিম জনগণের বেঁচে থাকার জন্য বাঙলাকে অবশ্যই বিভক্ত হতে হবে।[১০৮]

শরৎ বসু ও কিরণ শংকর রায় যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন সে-সম্পর্কে তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। অতি সাম্প্রতিককালেও রায় ছিলেন কেন্দ্রের কাছে বাঙলার অনুগত মিত্র। প্যাটেল 'সার্বভৌম বাঙলার দাবি'কে বর্ণনা করেন 'একটা ফাঁদ হিসেবে যেখানে কিরণ শংকরও শরৎ বাবুর সাথে আটকা পড়বেন'।[১০৯] দলের শৃঙ্খলা বিধানকারী প্যাটেলের কাছ থেকে ঐ দুজন ভদ্রলোক স্পষ্ট সাবধানবাণী লাভ করেন। তাঁরা যেন কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক নীতিতে ঐক্যবদ্ধ থাকেন সেজন্য তিনি তাঁদেরকে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে পরামর্শ দেন। অনেক পূর্ব-দৃষ্টান্ত ছিল যে, তাঁর পরামর্শ হালকাভাবে উপেক্ষা করার মতো বিষয় নয়। বাঙলার অবশিষ্ট কয়েকজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান কংগ্রেসের কাছে বাঙলা-বিভাগ রুখতে মিনতিপূর্ণ আহ্বান জানায় – তাদের প্রতিও একইভাবে কঠোর ব্যবহার করা হয়। সাম্প্রদায়িক প্রেরণায় বাঙলা-বিভাগের সম্ভাবনা দেখে আশরাফউদ্দিন চৌধুরী ভেঙে পড়েন। কারণ এই বিভাগের ফলে তাঁকেও কাঁটাতারের অপর পারে থাকতে হবে। তিনিও হাই কমান্ডের কাছ থেকে কোন সান্ত্বনা পাননি। তাঁকে বলা হয় যে,

> এখন কংগ্রেস যা করতে চায় তা হল লীগের হুমকিপূর্ণ কর্তৃত্ব ও পাকিস্তান থেকে যত লোককে সম্ভব উদ্ধার করা। বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বাধীন ভারতীয় ইউনিয়নের জন্য তা যতটা সম্ভব এলাকা রক্ষা করতে চায়। এ কারণে তা পাঞ্জাব ও বাঙলা ভাগ করতে চায় ... এ পরিস্থিতিতে কংগ্রেস আর কী করতে পারে তা আমার জানা নেই।[১১০]

সার্বভৌম বাঙলা পরিকল্পনার প্রতি কংগ্রেস হাই কমান্ডের অনমনীয় শত্রুতার ফলে ঐ পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ শেষ হয়ে যায়। কারণ এই পর্যায়ের আলোচনায় মাউন্টব্যাটেনকে আপাতদৃষ্টিতে হলেও কংগ্রেস ভক্তদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু বাঙলা অবিভক্ত রাখার পরিকল্পনা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হওয়ার আগেই ধ্বংস হয়ে যায়; কারণ তা বাঙলা থেকেই সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়। আবুল হাশিম ও হোসেন সোহরাওয়ার্দীর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই প্রশ্নে মুসলিম লীগ নেতৃত্ব বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রতিটি মুসলমান গ্রুপই বাঙলাকে দু'ভাগে ভাগ করার বিরোধিতা করে, তবে সেই অবিভক্ত বাঙলা মুক্ত ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে থাকবে সবাই এ ধারণা পছন্দ করেনি। বিশেষভাবে জিন্নাহর বিশ্বস্ত অনুসারী আকরম খাঁ ও খাজা নাজিমুদ্দিন নিশ্চিত ছিলেন যে, বাঙলা পাকিস্তানের অংশ হবে অথবা কমপক্ষে পশ্চিমাঞ্চলের নতুন মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে তা একটা ঘনিষ্ঠ শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক বজায় রাখবে।[১১১] অন্য দিকে পাকিস্তান সম্পর্কিত ধারণায় উৎসাহিত মুসলিম লীগের নেতা-কর্মীরা কম ইসলামী 'সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী' বাঙলার বদলে প্রতিশ্রুত দেশকে ত্যাগ করতে ইচ্ছুক ছিল না। এ কারণে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত লীগ সম্মেলনে আবুল হাশিম এই সম্ভাবনার কথা উত্থাপন করলে দলের লোকেরাই চিৎকার করে তাঁকে থামিয়ে দেয়।[১১২] অপর দিকে জিন্নাহর মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যরা কংগ্রেস নেতাদের (এবং একই সাথে তাদের নিজের লোকদের) সতর্ক করে দেয় যে, 'বাঙলা ভাগের পথ থেকে ফিরে এলে এবং পাকিস্তান সৃষ্টির বিরুদ্ধে বাধার সৃষ্টি করলে তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য গুলিভরা পিস্তল প্রস্তুত রাখা আছে।'[১১৩] জিন্নাহ তাঁর নিজের মতামত নিজের মনেই রাখেন। শরৎ বসু বিশ্বাস করতেন যে জিন্নাহ তাঁকে সমর্থন দেবেন[১১৪] এবং এ কারণে তিনি তাঁর সহায়তা কামনা করেন।[১১৫] জিন্নাহ যদিও তাঁর উদ্যোগের বিরোধিতা করেননি কিন্তু তাঁকে প্রকাশ্যে সমর্থনও করেননি।[১১৬] তবু বাঙলায় তাঁর অনেক অনুসারী মনে করে যে, তাদের সাথে কায়েদে আজম যে স্বপ্নের ব্যাপারে একমত পোষণ করেন, ঐ পরিকল্পনা হল সেই স্বপ্নকে অস্বীকার করার শামিল। এ কারণে তারা জিন্নাহর নামেই ঐ পরিকল্পনা বাতিল করে দেয়।

কিন্তু যুক্ত বাঙলা পরিকল্পনার সবচেয়ে মারাত্মক দুর্বলতা বাঙলার হিন্দুদের সত্যিকার সমর্থন লাভে তার ব্যর্থতার মধ্যে নিহিত। শরৎ বাবু তাদেরকে এ কথা অনুধাবন করাতে ব্যর্থ হন বলেই মনে হয় যে, (বাঙলা) বিভাগ ও অবিসংবাদিত ক্ষমতার চেয়ে একটা অবিভক্ত বাঙলার সার্বভৌমত্বের ব্যাপক বিতর্কিত অংশীদারী অনেক ভাল। কিরণ শংকর রায়, অখিলচন্দ্র দত্ত, নিশীথনাথ কুণ্ডু এবং আশরাফউদ্দিন চৌধুরীর মতো কয়েকজন কংগ্রেস নেতা শরৎ বসুর সর্বশেষ প্রচেষ্টায় সমর্থন জানান; বলা যায় যে, ১৯৪৭ সাল নাগাদ বাঙালি রাজনীতি থেকে বসুর বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে এটাই তাঁর শেষ প্রয়াস। এক সময় শরৎ বসু বেঙ্গল কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিতেন, এখন সেই নেতৃত্ব তাঁর প্রতিপক্ষদের হাতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। এ দলটি কেন্দ্র থেকে নির্দেশিত মনিবের কথা শুনত এবং প্রধানত কংগ্রেস হাই কমান্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষমতাবান ডা. বি. সি. রায়ের মতো লোক তা

পরিচালনা করত। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে কংগ্রেস ঘোষণা করে যে বাঙলাকে ভাগ করা হবে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু করার ইচ্ছা থাকলেও প্রদেশ কংগ্রেস পার্টির কোনো ক্ষমতা ছিল না (অবশ্য কিছু করার ইচ্ছাও ছিল না)। শেষ মুহূর্তে সোহরাওয়ার্দী মত পরিবর্তন করলেও কোনো হিন্দু তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি। বরং তিনি ঐ পরিকল্পনাকে সমর্থন দেওয়ার কারণে তা হিন্দুদের দৃষ্টিতে আরও সন্দেহজনক ও অগ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। বাঙলার হিন্দুদের সতর্ক করে দিয়ে একটা পুস্তিকায় বলা হয় –

> সোহরাওয়ার্দীর বিলাপে এখন বিভ্রান্ত হবেন না। বাঙলার হিন্দু বা মুসলমানদের ভবিষ্যতের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে সে বিলাপ করছে না। আসল কথা হল, এ কথা মনে করে সে চিন্তিত হয়ে পড়েছে যে, সে ও তাঁর সহকর্মীরা তাদের ভাগ্য ফেরাতে আর চুরি করতে পারবে না। এ কথা তোমরা ভুলে যেও না যে ঐ সরকারের অধীনে ... (মুসলমানেরা) শুধু হত্যা করেনি, মহিলাদের অপমান করেনি ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করেনি – তারা তোমাদের মায়ের কপালের সিঁদুরের চিহ্ন পা দিয়ে ঘষে মুছে ফেলেছে এবং তোমাদের জুতো দিয়েই তাদের হাতের শাখা ভেঙে ফেলেছে সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়কে অপমানিত করার জন্য ... [১১৭]

পশ্চিম বাঙলার হিন্দুরা একজন কুখ্যাত অবিশ্বস্ত মুসলমান মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে থাকার চেয়ে নিজেদের হিন্দু রাষ্ট্রে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর পূর্ব বাঙলার হিন্দুরা ইতিমধ্যে তিক্ত বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছে যে, তাদের গাঁট্টি-বোঁচকা বেঁধে পশ্চিম বাঙলায় পালাতে হবে।

পূর্ব বাঙলার হিন্দুদের কাছ থেকে তাঁর আহ্বানে সাড়া পাওয়ার জন্য শরৎ বসু বৃথাই অপেক্ষা করলেন। তাদের সাড়া পাওয়ার জন্য তাঁর আহ্বান আসে খুবই দেরিতে। যদিও তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, পশ্চিম বাঙলার 'উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছু লোক' প্রদেশ ভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, কিন্তু তিনি তাঁর দাবির সমর্থনে এই সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করতে ব্যর্থ হন যে, 'পূর্ব বাঙলার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা এই বিভাগের সম্পূর্ণ বিরোধী'।[১১৮] তাঁর ভাই সুভাষ বসুর (বর্তমানে শহীদ) কাছ থেকে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন ফরোয়ার্ড ব্লক দল। এই দলটির নেতৃস্থানীয় সদস্যরাও তাঁকে সমর্থন দিতে অস্বীকার করে। ১৯৪৭ সালের মে মাসে পুলিশ উল্লেখ করে যে,

> গত সপ্তাহে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ফরোয়ার্ড ব্লকের নির্বাহী পরিষদের বত্রিশ জন সদস্য সর্ব-ভারতীয় ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারির কাছে প্রেরিত যৌথ স্মারকলিপিতে প্রস্তাবিত বাঙলা ভাগের বিষয়ে দলের দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্বিবেচনা করার জন্য ফরোয়ার্ড ব্লক হাই কমান্ডের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে। বিভাগের জন্য আন্দোলনে সাধারণ জনগণের ক্রমবর্ধমান সমর্থন সত্ত্বেও ফরোয়ার্ড ব্লক যদি তার বিরোধিতার নীতি অব্যাহত রাখে তাহলে ফরোয়ার্ড ব্লক সংগঠন সম্ভবত পরে বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং শেষে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।[১১৯]

সুভাষ বসুর যেসব গুরুত্বপূর্ণ অনুসারী তখনও বর্তমান ছিল, তাদের উপরও শরৎ বসু আস্থা রাখতে পারলেন না। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর সাজা দেওয়ার প্রতিবাদে কোলকাতার ছাত্র ও বামপন্থী সংগঠনের সদস্যরা ডালহৌসী স্কয়ারের দিকে মিছিল নিয়ে যায়। এর ফলে ভীত হয়ে গভর্নর সেনাবাহিনী তলব করেন। কোলকাতার ইতিহাসে এটা সবচেয়ে বড় একটা গণবিক্ষোভ হতে পারত। এটাকে প্ররোচনাকারীদের এজেন্টের কাজ বলে তিনি এই গণবিক্ষোভ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন।[১২০] ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসের এই ঘটনা প্রবাহ শরৎ বসুর ভাবমূর্তিকে তাঁর ভাইয়ের অনুসারীদের কাছে অপূরণীয়ভাবে নষ্ট করে দেয়। এতে নেতাজীর নতুন ও উদ্যমী সমর্থকদের কাছে 'নেতাজী'র যথাযোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে তিনি তাঁর নিজের মর্যাদাও হারিয়ে ফেলেন। ১৯৪৭ সালে শরৎ বসু যখন যুক্ত বাঙলার প্রশ্নে সুভাষের অনুসারীদের তাঁর পেছনে পেতে আশা করেন, তখন তিনি তাদেরকে অবাধ্য ও শত্রুভাবাপন্ন হিসেবেই দেখতে পান। সুভাষ বসুর অনুসারীরা তাঁর ভাই, যিনি তাদের হতাশ করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে কতটা আগ্রহী ছিল তা একটা পুস্তিকায় স্পষ্টভাবে বলা হয়:

> তোমরা দেখতে পাবে আমরা কিভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করি। বাঙলা ভাগের আন্দোলন থামবে না। আজ শরৎ বসু ও তাঁর কয়েকজন অন্ধ সমর্থক, ঘৃণ্য পুরুষ ও মহিলা সবাই, বাঙলা-বিভাগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, কারণ তারা নিরাপদ এলাকায় বসবাস করে ... আজ যদি তাঁর বীর ভাই আমাদের মাঝে থাকতেন এবং যদি বিবেচনা করতেন যে, বাঙলা ভাগের আন্দোলন বন্ধ করা উচিত তাহলে তিনি ঐসব (বিপজ্জনক) স্থানে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মনে আস্থা জাগিয়ে তুলতেন ... শরৎ বসু যে কাপুরুষতা প্রদর্শন করেছে তার জন্য আমরা তাকে চিরতরে থামিয়ে দিতে পারতাম, যদি সে নেতাজীর ভাই না হত ... আমরা বাঙলা ভাগ বা একটা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার চাই। কিন্তু শরৎ বাবুর মতো লোক দিয়ে এ ধরনের সরকার গঠন করা যাবে না, কারণ তারা হল মুসলমানদের অনুচর। সরকারে শ্যামাপ্রসাদের মতো হিন্দুদের অবশ্যই থাকতে হবে।[১২১]

শ্যামাপ্রসাদ বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হয়ে ওঠেন যখন তিনি ঘোষণা করেন যে, 'হিন্দুদের শরৎ বসুর প্রতি সামান্যতম কোনো সমর্থন নেই এবং একটা সভায় ভাষণ দেওয়ার সাহসও তাঁর নেই।'[১২২] ৩রা জুন পরিকল্পনা ঘোষণা করার পর কংগ্রেস নেতৃত্ব তা গ্রহণ করলে বাঙলার ভবিষ্যৎ চূড়ান্ত হয়ে যায়। শরৎ বসু এবং যারা যুক্ত ও সার্বভৌম বাঙলার স্বপ্ন দেখেন তাঁরা বুঝতে পারেন যে, তাঁরা পরাজিত হয়েছেন। জনগণের সমর্থন ও ইচ্ছা ছাড়া প্রদেশের ওপর (বাঙলা) বিভাগ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁর এই দৃঢ়তাপূর্ণ বক্তব্যটি ছিল নিতান্তই কল্পনাপ্রসূত:

> আমি জানি যে, বাঙলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও বেঙ্গল আইন সভার হিন্দু সদস্যদেরকে পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে বলা হবে না ... সামগ্রিকভাবে নির্বাচনী ওয়াদা ও সামগ্রিকভাবে বাঙলার কথা বিবেচনায় এনে তাদের নিজের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া হলে সেটাই হত গণতান্ত্রিক। কিন্তু তা হওয়ার নয়। বাঙলার কণ্ঠকে রুদ্ধ করা হয়েছে এবং সর্ব-ভারতীয় খেলায় সে দাবার ঘুঁটি হিসেবেই থাকবে।[১২৩]

কিন্তু কোনো অর্থেই বাঙলা দাবার ঘুঁটি ছিল না। বেঙ্গল কংগ্রেস আগেই (বাঙলা) বিভাগ গ্রহণ করে এবং বেঙ্গল আইন সভায় হিন্দু সদস্যদের শতকরা ৯০ জন ছিলেন কংগ্রেস নেতা। শরৎ বসুর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই প্রদেশের অসুখী হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বাঙলা ভাগের সিদ্ধান্তের অনুকূলে ব্যাপক সমর্থন ছিল। কংগ্রেস কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যক্ত, নিজের সমর্থকদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পর্কহীন শরৎ বসু ১৯৪৭ সালে এমন একজন নেতা হিসেবে গণ্য হন, যাঁর কোনো অনুসারী ছিল না। তাঁর 'আন্দোলন' বাস্তবে হয়ে পড়ে এমন একজন মানুষের ব্যক্তিগত উদ্যোগ, যাঁর নিজের লোকদের উপরেও কোনো প্রভাব ছিল না, আর তাই, ব্যর্থতাই হয় সেই আন্দোলনের স্বাভাবিক পরিণতি।[১২৪]

টীকা

১. দেখুন, আর. জে. মুর, *চার্চিল, ক্রিপস্ এ্যান্ড ইন্ডিয়া,* ১৯৩৯-১৯৪৫, অক্সফোর্ড, ১৯৭৯।

২. ওয়াভেলের স্বীয় প্রচেষ্টার বিবরণের জন্য দেখুন, পেনডেরেল মুন (সম্পাদিত), *ওয়াভেল: দি ভাইসরয়'স জার্নাল,* লন্ডন, ১৯৭৩।

৩. এ কারণগুলো আলোচিত হয়েছে – আর. জে. মুর, *এসকেপ ফ্রম এম্পায়ার, দি এটলি গভর্নমেন্ট এ্যান্ড দি ইন্ডিয়ান প্রোব্লেম,* অক্সফোর্ড, ১৯৮২ এবং *ঐ লেখকেরই এন্ড গেমস্ অব এম্পায়ার স্টাডিজ অব ব্রিটেনস্ ইন্ডিয়ান প্রোব্লেম,* নিউ দিল্লী, ১৯৮৮। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে যা স্বাধীনতা ও বিভক্তিকে পরিচালিত করে সাম্প্রতিক ডক্টরেট থিসিসে ইনদিবর কামতেকার (Indivar Kamtekar) সেসব বাধ্যবাধকতার বিশ্লেষণ করেছেন। ইনদিবর কামতেকার, 'দি এন্ড অব দি কলোনিয়াল স্টেট ইন ইন্ডিয়া, কেম্ব্রিজ, ১৯৪২-৪৭, ইউনিভার্সিটি অব কেম্ব্রিজ, পি এইচডি ডিসারটেশান, ১৯৮৮।

৪. এ বছরগুলোতে বাঙালি মুসলমান রাজনীতির পরিবর্তন, মুসলিম লীগের উত্থান ও কৃষক প্রজা পার্টির পতন একটা আকর্ষণীয় বিষয়। এ বিষয়গুলো অনেক সাম্প্রতিক গবেষণায় ব্যাপকভাবে আলোচিত হওয়ায় এ পুস্তকে আলোচনা করা হল না। দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখুন, বজলুর রহমান খান, *পলিটিকস্ ইন বেঙ্গল;* হারুন-অর-রশিদ, *দি ফোরশ্যাডোইং অব বাংলাদেশ।*

৫. আয়েশা জালাল, *সোল স্পোকস্ম্যান,* পৃ. ২৯-৩৩। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মুকুল কেশবন, *নাইনটিন থারটি সেভেন এ্যাজ এ ল্যান্ডমার্ক ইন দি কোর্স অব কমিউনাল পলিটিক্স ইন দি ইউপি।*

৬. যদিও আমরা লক্ষ করি যে, ১৯৩৭ সালে বাঙলা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাথে কৃষক প্রজা পার্টির আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে, তবু অনেক পর্যবেক্ষক বিশ্বাস করেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির কাছে হাত-পা বাঁধা না থাকলে শরৎ বসু শীঘ্র একটা সমঝোতা করতে পারতেন। অমিয় বসুর সাথে লেখকের সাক্ষাৎকার, কোলকাতা ৪ঠা মার্চ ১৯৮৮।

৭. মওলানা আজাদের কাছ থেকে পেথিক লরেন্স, ২৬শে এপ্রিল ১৯৪৬ , 'এন. মানসার্গ, ই. ডাব্লু. আর. লুম্বি এবং পেনডেরেল মুন (সম্পাদিত), *কনস্টিটিউশনাল রিলেশনস্ বিটুইন ব্রিটেন এ্যান্ড ইন্ডিয়া: দি ট্রান্সফার অব পাওয়ার ১৯৪২-১৯৪৭,* খণ্ড ৭, 'দি কেবিনেট মিশন, ২৩শে মার্চ–২৬শে জুন, ১৯৪৬', লন্ডন, ১৯৭৭। ডকুমেন্ট নং ১৫৩ (এরপর থেকে উল্লেখ করা হবে টিপি, খণ্ড ৭, নং ১৫৩–এভাবে)।

৮. নেহেরুর কাছ থেকে ওয়াভেল, ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭, টিপি খণ্ড ৯, নং ৪৫৬।

৯. প্যাটেলের কাছ থেকে মাউন্টব্যাটেন, ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭, টিপি খণ্ড ১০, নং ২৫২।

১০. প্যাটেলের কাছ থেকে ওয়াভেল, ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭। দুর্গা দাস (সম্পাদিত), *সর্দার প্যাটেলস্ করেসপন্ডেন্স*, আহমেদাবাদ, ১৯৭২, খণ্ড ৪, পৃ. ৬।

১১. আয়েশা জালাল, *সোল স্পোকস্‌ম্যান*। তাঁর এ বিষয়টির আরও বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় সম্প্রতি প্রকাশিত *আজাদ, জিন্নাহ এ্যান্ড পার্টিশান*, শীর্ষক আয়ান হেন্ডারসনের *আবুল কালাম আজাদ: এ্যান ইনটেলেকচুয়াল এ্যান্ড রিলিজিয়াস বায়োগ্রাফি*, বোম্বে, ১৯৮৮ সম্পর্কে আলোচনায় এবং আজাদের নিজের নতুন ও বিতর্কিত আত্মজীবনীতে। এখানে জালাল যুক্তি উত্থাপন করেন যে, স্বাধীন ভারতের ফেডারেল কাঠামোর ব্যাপারে জিন্নাহর ইচ্ছার সাথে আজাদের দৃষ্টিভঙ্গির মিল পাওয়া যায়। দেখুন, *ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, খণ্ড ২৪, নং ২১, ২৭ মে ১৯৮৯।

১২. লর্ড ওয়াভেলের সাথে কেবিনেট ডেলিগেশনের বৈঠক, ১০ই এপ্রিল ১৯৪৬, টিপি খণ্ড ৭, নং ১৪৪।

১৩. দেশ-বিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তরকে ব্যক্তিবিশেষের তথা মাউন্টব্যাটেন, নেহেরু ও জিন্নাহর ইচ্ছা ও মেজাজ-মর্জি হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখুন, ফিলিপ জেইগলার, *মাউন্টব্যাটেন: দি অফিসিয়াল বায়োগ্রাফি;* লন্ডন, ১৯৮৫, এবং মাউন্টব্যাটেনের নিজের বক্তব্য সম্পর্কিত পুস্তিকা, *রিফ্লেকশন্স অন দি ট্রান্সফার অব পাওয়ার এ্যান্ড জে নেহেরু*, কেম্ব্রিজ, ১৯৬৮। ১৯৪৭ সালের ঘটনায় এ ধরনের বিবরণ নিয়ে বেশ আলোচনা হয় ল্যারি কলিন্স ও ডমিনিক লাপিয়েরের *ফ্রিডম এ্যাট মিডনাইট* (লন্ডন, ১৯৭৫) প্রকাশিত হওয়ার পর।

১৪. শীলা সেন, *মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল*, পৃ. ২২৭।

১৫. এসব এবং ১৯৩৬-৩৭ ও ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনের ফলাফলের বিবরণ নেওয়া হয়েছে যথাক্রমে আইওএলআর, ফ্রান্সাইজ ফাইলস, এল/পি এবং জে/৭/১১৪২ এবং এল/পি এবং জে/৮/৪৭৫ থেকে।

১৬. *অমৃত বাজার পত্রিকা*, ২১শে মার্চ ১৯৪৬।

১৭. লীগের বিজয় কম দৃষ্টি আকর্ষণীয় ছিল না। ১২১টি মুসলিম আসনের মধ্যে লীগ বিজয়ী হয় ১১৪টি আসনে দুই মিলিয়নের বেশি ভোট পেয়ে। দল ব্যাপকভাবে বিজয়ী হয় নগর নির্বাচনী এলাকার ৬টি আসনেই, পল্লি এলাকার ১১১টি নির্বাচনী এলাকার মধ্যে ১০৪টি আসনে এবং মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ৪টি আসনে জয়ী হয়। দেখুন, ফ্রান্সাইজ, 'ইলেকশনস্ ইন বেঙ্গল, ১৯৪৬', জে/৮/৪৭৫।

১৮. বাঙলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগে সোহরাওয়ার্দীর উত্থান সম্পর্কিত বিবরণের জন্য দেখুন, আবুল হাশিম, ইন রিট্রোসপেকশন, পৃ. ৮৯-১১২।

১৯. কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের কাছে বেনামি চিঠি, এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং জি-৫৩/১৯৪৬।

২০. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর তারিখবিহীন নোট, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পেপার্স, ২-৪ অংশ, ফাইল নং ৭৫/১৯৪৫-৪৬। এই নোটের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারণ 'হিন্দু সংস্কৃতি'র ব্যাপারে এখানে ভদ্রলোকদের চিন্তা-ভাবনার কথা প্রতিফলিত হয়েছে। বলা হয় যে, এ বছরগুলোতে 'হিন্দু সংস্কৃতি' হল ভদ্রলোক পরিচিতির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল। ঐ নোট আরও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ

এখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে 'অপমানজনক মন্তব্য আছে' – বলা হয়েছে মুসলমানেরা হল 'নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু থেকে ইসলামে রূপান্তরিত', এবং তাই এটা মনে করা যেতে পারে যে, জাতিগত সংহতির আন্দোলন পরিচালনা এবং নতুন করে 'হিন্দুদের ঐক্যে'র কথা বলা হলেও অন্তত শ্যামাপ্রসাদের মনে জাতিভিত্তিক এই দৃষ্টিভঙ্গি বদ্ধমূল ছিল।

২১. হাওড়ার এ. পি. সোম-এর কাছ থেকে শ্যামপ্রসাদ মুখার্জী, ১৮ই আগস্ট ১৯৪৪, ফাইল নং ৬১/১৯৪৪, *প্রাগুক্ত*।

২২. *অমৃত বাজার পত্রিকা*-য় প্রকাশিত সোহরাওয়ার্দীর বিবৃতি, ১৩ই আগস্ট, ১৯৪৬।

২৩. *দি স্টেটস্‌ম্যান*, ২০শে আগস্ট, ১৯৪৬।

২৪. লেখকের সাথে নিখিল চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার, নিউ দিল্লী, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯। এখানে গুরুত্বের বিষয়টি আরোপিত।

২৫. পরিচ্ছন্নতা অভিযানে ২৭শে আগস্ট পর্যন্ত সরকারের হিসেবে, ৩,১৭৪টি মৃতদেহ সংগ্রহ করা হয়।

২৬. জিবি এইসিপিবি ফাইল নং ৩৫১/৪৬ (পার্ট-বি)।

২৭. এটা একটা প্রচলিত কথা যা জনপ্রিয় বাঙলা উপন্যাসেও দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা উপন্যাস *আদিম রিপু*-র কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯৪৬ সালের কোলকাতা হত্যাযজ্ঞের প্রেক্ষাপটে ঐ উপন্যাসের কাহিনী রচনা করা হয়। এ সময় শহরে মানুষের জীবনের নিরাপত্তাহীনতার জন্য সোহরাওয়ার্দী ও তাঁর পাঞ্জাবি পুলিশকে দায়ী করা হয়। প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত (সম্পাদিত), *শরদিন্দু অমনিবাস*, খণ্ড ২, কোলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১, ২০।

২৮. প্যাটেলের কাছ থেকে আর. কে. সিধওয়া, ২৭শে আগস্ট ১৯৪৬। দুর্গা দাস (সম্পাদিত), *সর্দার প্যাটেলস্ করেসপন্ডেন্স*, খণ্ড ৩, পৃ. ১৪৮।

২৯. মেমো, তারিখ ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯। জিবি এসবি' 'পিএইচ' সিরিজ ফাইল নং ৫১০/৩৯।

৩০. মেমো, তারিখ ১১ই নভেম্বর ১৯৩৯, *প্রাগুক্ত*।

৩১. মেমো, তারিখ ৯ই এপ্রিল ১৯৪০, *প্রাগুক্ত*।

৩২. মেমো, তারিখ ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, *প্রাগুক্ত*।

৩৩. *অমৃত বাজার পত্রিকা*, ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭।

৩৪. ১৯৪৬ সালে কংগ্রেসের সাথে সংশ্লিষ্ট ১৩টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নাম পুলিশ তালিকাভুক্ত করে। দেখুন, মেমো নং ডিআইআর ১০১, জিবি এসবি 'পিএম' সিরিজ, ফাইল নং ৮৮২/৪৬-২।

৩৫. মেমো, তারিখ ২৫শে জুন ১৯৪৬, জিবি এসবি 'পিএইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫১০/৩৯।

৩৬. মেমো, তারিখ ১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭, *প্রাগুক্ত*।

৩৭. মেমো, তারিখ ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০, জিবি এসবি 'পিএইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫১০/৩৯।

৩৮. ঢাকা ডিভিশনের কমিশনারের রিপোর্ট, এফওএফসিআর, প্রথম পক্ষ, মার্চ ১৯৪১, জিবি এইচসিপিবি ১৩/৪১।

৩৯. হিন্দু মিশন সম্পর্কে রিপোর্ট, জিবি এসবি 'পিইএইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫০২/৪২।

৪০. আটককৃত পত্র, আশুতোষ লাহিড়ী কর্তৃক এস. কে. দেবের কাছে লেখা, ২৩শে আগস্ট ১৯৪৪, জিবি এসবি 'পিএইচ' সিরিজ ফাইল নং ৫৫০/৪৪ বি।

৪১. স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো সম্পর্কে নোট, ৩০শে নভেম্বর ১৯৪৫। জিবি এসবি 'পিএম' সিরিজ, ফাইল নং ৮২৯/৪৫।

৪২. মেমো, তারিখ ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৬, প্রাগুক্ত, ফাইল নং ৮২২/৪৬-২।

৪৩. স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো সম্পর্কে নোট দেখুন, ৩০শে নভেম্বর ১৯৪৫। জিবি এসবি 'পিএম' সিরিজ, ফাইল নং ৮২৯/৪৫।

৪৪. এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং সিএল ১৪(বি)/১৯৪৬, সিএল-১৪(সি)/ ১৯৪৬ এবং সিএল-১৪(ডি)/১৯৪৬।

৪৫. আটককৃত পত্র, যুগল কিশোর বিড়লার কাছে বর্ধমান জেলা হিন্দু মহাসভার সেক্রেটারির লেখা, তারিখ ৯ই ডিসেম্বর ১৯৪১। জিবি এসবি 'পিএইচ' সিরিজ, ৫৪৩/৪১। আনন্দিলাল পোদ্দার ছিলেন বিশেষভাবে সেবাশ্রম সংঘের সাথে ঘনিষ্ঠ এবং ১৯৪৪ সালে ঐ সংঘ কর্তৃক আয়োজিত এক জন্মাষ্টমী সভায় তিনি বক্তৃতা করেন। *প্রাগুক্ত*, ফাইল নং ৫১০/৪৪।

৪৬. মেমো, তারিখ ২২শে আগস্ট ১৯৩৯। জিবি এসবি 'পিএইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫১০/৩৯।

৪৭. সিআইডি রিপোর্ট, তারিখ ১৯শে এপ্রিল ১৯৪৩। জিবি এসবি 'পিএইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫১১/৪২। এটা হয়ত একটা সাধারণ অনুমিত হিসাব হতে পারে। তবে এটা ঠিক যে, সংঘ গঠিত হওয়ার সময় এর সদস্য সংখ্যা ছিল একশ এবং তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

৪৮. এটা কৌতুকপ্রদ যে, সরকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যায়াম সমিতিগুলোকে 'সম্ভাবনাপূর্ণ বিপজ্জনক বলে গণ্য করে – এসব সমিতি সংশ্লিষ্ট ছিল ফরোয়ার্ড ব্লকের সাথে। আরএসএস শান্তি-শৃঙ্খলার বিরূদ্ধে হুমকিস্বরূপ নয় বলে সরকার মনে করে (সারণি ৮), অথচ গোয়েন্দা শাখা অবহিত ছিল যে, আরএসএস অস্ত্র সংগ্রহ করছে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অদ্ভুত অবস্থার এটা একটা দৃষ্টান্ত। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, স্যার নাজিমুদ্দিন ও সোহরাওয়ার্দীর মতো লোককে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকর বক্তব্য দেওয়ার জন্য কখনও গ্রেফতার বা আটক করা হয়নি, অথচ শরৎ বসুর মতো লোককে ব্রিটিশ জেলে কয়েক বছর থাকতে হয়েছে।

৪৯. ভি. আর. পাটকি থেকে আর. ভি. কেলকার কাছে লিখিত, আটককৃত পত্র, তারিখবিহীন, জিবি এসবি 'পিএইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫১০/৩৯।

৫০. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *আদিম রিপু* উপন্যাসে বর্ণনা করেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোলকাতায় অবাধে অস্ত্র পাওয়া যেত। তিনি উল্লেখ করেন যে, অব্যাহতিপ্রাপ্ত সৈনিকেরা অপরাধ জগতের বসদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করত। *শরদিন্দু অমনিবাস*, খণ্ড ২, পৃ. ২।

৫১. যেসব হিন্দু সংগঠনের কাছে অস্ত্র আছে তাদের সম্পর্কে মেমো; জিবি এসবি 'পিএইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫০৭/৪৬।

৫২. মেমো, তারিখ ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। জিবি এসবি 'পিএম' সিরিজ, ফাইল নং ৮২৯/৪৫।

৫৩. আটককৃত পত্র, পানাগড়ের প্রাক্তন হিন্দু সামরিক কর্মকর্তাদের সেক্রেটারির কাছ থেকে এস. পি. মুখার্জীর কাছে লেখা, তারিখ ৭ই নভেম্বর ১৯৪৬। জিবি এসবি 'পিএম' সিরিজ, ফাইল নং ৯৩৭/৪৬।

৫৪. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পেপার্স, ২-৪ অংশ, ফাইল নং ৭৫/১৯৪৫-৪৬।

৫৫. সুরঞ্জন দাশ, *কমিউনাল রায়টস্ ইন বেঙ্গল*, পৃ. ১৮৩। দাশের গবেষণার সম্ভবত উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হল, ১৯৩০ সালে ঢাকার দাঙ্গা থেকে শুরু করে ১৯৪৬ সালের কোলকাতা হত্যাযজ্ঞ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলোতে ভদ্রলোকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ – এসব তথ্য পুস্তকের মূল বক্তব্যকে সমর্থন করে।

৫৬. বর্ধমানের ওভাল থানার ড. মহেন্দ্র নাথ সরকারের বিবৃতি। জিবি এসবি 'পিএম' সিরিজ, ফাইল নং ৬২/৪৭।

৫৭. সুরঞ্জন দাশ, *কমিউনাল রায়টস্ ইন বেঙ্গল*, পৃ. ৩২৭ এবং ৩৩৯।

৫৮. আটককৃত পত্র, *অমৃত বাজার পত্রিকার* সম্পাদকের কাছে প্রেরিত মৃন্ময়ী দত্তের লেখা, তারিখ ১৯শে এপ্রিল ১৯৪৭। জিবি এসবি 'পিএম' সিরিজ, ফাইল নং ৯৩৮/৪৭-৩।

৫৯. *অমৃত বাজার পত্রিকা*, ২৩শে মার্চ ১৯৪৭।

৬০. বেঙ্গল পার্টিশান লীগ সম্পর্কে গোয়েন্দা শাখার রিপোর্ট, মেমো নং ২৮৬/৮৭/ জিবি এসবি 'পিএম' সিরিজ, ফাইল নং ৮২২/৪৬-২।

৬১. আটককৃত পত্র, বেঙ্গল পার্টিশান লীগের কাছে প্রেরিত এন. এন. ঘোষ, জি. এন. ঘোষ এবং পি. ঘোষের লেখা। *প্রাগুক্ত*।

৬২. *প্রাগুক্ত*।

৬৩. তারকেশ্বর অধিবেশনে বাঙলা প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনে এন. সি. চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতির ভাষণ, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৪৭, হিন্দু মহাসভা পেপার্স, ফাইল নং পি ১০৭/৪৭।

৬৪. কেবলমাত্র শতকরা ০.৬ ভাগ লোক যুক্ত বাঙলাকে সমর্থন করে। *অমৃত বাজার পত্রিকা*, ২৩শে এপ্রিল ১৯৪৭।

৬৫. *সংগ্রাম*, তারিখবিহীন, বেনামি। ১৯৪৬ সালের ১২ই নভেম্বরের মেমোর সাথে সংযুক্ত। জিবি এসবি 'পিএম' সিরিজ, ফাইল নং ৫০৬ অংশ ৪/৪৬ এ।

৬৬. এক জন 'ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু' তিন জনকেই শাস্তি দেওয়ার পরামর্শ দেয়: 'ভাইসরয়ের স্ত্রীকে অপহরণ করে একজন মুসলিম লীগ নেতার সাথে বিয়ে দেওয়া হোক। গভর্নরের স্ত্রীকে অপহরণ করে একজন পাঠানের সাথে বিয়ে দেওয়া হোক। বাঙলার মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীকে অপহরণ করে একজন হিন্দু মুচির সাথে বিয়ে দেওয়া হোক। ভাইসরয়ের স্ত্রী ... ও বাঙলার গভর্নরের স্ত্রীকে জোরপূর্বক মুসলমান করা হোক ... তাদের সবার স্ত্রীকে ধর্ষণ করা হোক।' মেমো, তারিখ ২রা নভেম্বর ১৯৪৬, প্রাগুক্ত। ফাইল নং ৯৩৭/৪৬।

৬৭. *হিন্দুরা জাগ্রত হও, তোমরা যে যেখানে আছ এবং আঘাতের পর আঘাত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।* বেনামি, তারিখবিহীন। জিবি এসবি 'পিএম' সিরিজ, ফাইল নং ৯৩৭(৪)/৪৭-২। এ ধরনের প্রচারণার ব্যাপক প্রভাবের বিষয়টি অনুমান করা যায় যখন কয়েক দশক পরে সোহরাওয়ার্দীর পুলিশের নৃশংসতার বিষয়টি জনপ্রিয় বাঙলা উপন্যাসে (যাকে আপাতদৃষ্টিতে অসাম্প্রদায়িক মনে হয়) স্থান পায়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'আদিম রিপু'-র কাহিনী শুরু হয় এভাবে – 'কলিকাতার ... রাস্তায় দুই-চারিটা রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া থাকে। সুরাবর্দি সাহেবের পুলিশ আসিয়া হিন্দুদের শাসন করে, মৃতদেহের সংখ্যা দুই চারিটা বাড়িয়া যায়।

কোথা হইতে মোটরভ্যান আসিয়া মৃতদেহগুলিকে কুড়াইয়া লইয়া অন্তর্ধান করে।' *শরদিন্দু অমনিবাস*, পৃ. ১।

৬৮. *হিন্দু! জাগৃহী*, বেনামি তারিখবিহীন। জিবি এসবি 'পিএম' সিরিজ, ফাইল নং ৯৩৮/৪৭-৩।

৬৯. দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, *ষোলোই আগস্ট উনিশ শ' ছেচল্লিশ*, কোলকাতা, ১৯৪৬। জিবি এসবি 'পিএম' সিরিজ, ফাইল নং ৯৩৭/৪৬।

৭০. সৌরেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিবৃতি। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩।

৭১. এসব হল এন্টালি খেয়ালী সংঘ, ন্যাশনাল এ্যাথলেটিক ক্লাবের এন্টালি শাখা, 'নো ক্লাব', দি এন্টালি ইয়ং এ্যাথলেটিক ক্লাব, এন্টালি বয়েজ লাইব্রেরি এবং এন্টালি অর্কেস্ট্রা। এসব ক্লাবের সবাই পৃথকভাবে বিভাগের দাবি জানিয়ে সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির কাছে আবেদন করে। এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং সিএল–১৪(বি)/১৯৪৬ এবং সিএল–১৪(সি)/১৯৪৬।

৭২. খুলনা, হাওড়া, ২৪ পরগণা, হুগলী, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, বাকেরগঞ্জ ও যশোরে অনুষ্ঠিত এসব মিটিং এবং প্রাপ্ত আবেদনপত্রের বিবরণ কংগ্রেস ফাইলে আছে। প্রাগুক্ত।

৭৩. বাঙলা ভাগের সমর্থনে বিক্ষোভের সবচেয়ে অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ বিষয় হল যে, সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির আর্কাইভস্-এ এসব দলিল সংরক্ষণ করা হয়েছে ঠিক তার বিপরীত অর্থবোধক 'বিভাগ-বিরোধী আবেদনপত্র' শিরোনামে। দেখুন এআইসিসি পেপার্স, ফাইল জি-৫৪(১১)/১৯৪৭, সি এল–১৪(বি)/১৯৪৬, সিএল–৮/১৯৪৬ এবং সিএল–১৪(ডি)/১৯৪৬।

৭৪. চারশ' আবেদনপত্রে যেসব থানা বা জেলা থেকে প্রেরণ করা হয় তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ছিল। এর মধ্যে ২৮৫টি বর্ধমান, কোলকাতা ও ২৪ পরগণা থেকে পাঠানো হয়।

৭৫. বিস্তারিত বিবরণ ও সংখ্যা নেয়া হয়েছে এআইসিসি ফাইলে সংরক্ষিত চারশ'র বেশি আবেদনপত্র বিশ্লেষণ করে। ফাইল জি-৫৪(১)/১৯৪৭, সিএল–১৪(এ)/১৯৪৬, বিএল–১৪(বি)/১৯৪৬-৪৭ এবং সিএল–১৪(ডি)/১৯৪৬-৪৭।

৭৬. অপর পক্ষে বীরভূম ছিল এ ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে মুক্ত। (বাঙলা) বিভাগের আন্দোলনে এর সামান্য ভূমিকা তাই একেবারে ব্যাখ্যাতীত নয়।

৭৭. দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখুন, এআইসিসি ফাইলে সংরক্ষিত আবেদনপত্র, ফাইল নং জি-৫৪(১)/১৯৪৭।

৭৮. দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখুন, হারুন-অর-রশিদ, *দি ফোরশ্যাডোয়িং অব বাংলাদেশ*, পৃ. ২৭৫; লিওনার্ড এ গর্ডন, 'ডিভাইডেড বেঙ্গল: প্রোব্লেমস্ অব ন্যাশনালিজম এ্যান্ড আইডেন্টিটি ইন দি ১৯৪৭ পার্টিশান', *জার্নাল অব কমনওয়েলথ এ্যান্ড কমপ্যারেটিভ পলিটিকস্*, খণ্ড ১৬, ২, জুলাই ১৯৭৮, পৃ. ১৫৬।

৭৯. এন. সি. মিত্রের কাছ থেকে জে. বি. কৃপালনী, ৩০শে এপ্রিল ১৯৪৭, এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং সিএল-৮/১৯৪৬।

৮০. এ সময় শ্যামাপ্রসাদ কংগ্রেসের চেয়ে বেশি মুসলমানদের প্রতি সমঝোতামূলক আহ্বান জানান। ১৯৪১ সালে ফজলুল হকের প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির সাথে কোয়ালিশন করতে সম্মত হয়ে তিনি তাঁর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি কয়েকটা শর্তের কথা ঘোষণা করেন – ঐ শর্তসাপেক্ষে মহাসভা মুসলিম লীগ সরকারে যোগ দিতে প্রস্তুত ছিল।

শ্যামাপ্রসাদের কাছ থেকে বীর সাভারকার, ২২শে জুলাই ১৯৪৩, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পেপার্স, বিষয়ভিত্তিক ফাইল নং ৫৭/১৯৪২-৪৩।

৮১. ১৯৪৭ সালের ১৭ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত বাঙলা প্রদেশ হিন্দু মহাসভা ওয়ার্কিং কমিটির (বিপিএইচএম) মিটিং-এর রিপোর্ট। জিবি এসবি 'পিএম' সিরিজ, ফাইল নং ৯৩৮/৪৭-২।

৮২. এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং সিএল-১৪(সি)/১৯৪৬। বাঙলার ইতিহাসের গভীর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি জনপ্রিয়করণে তাঁর ভূমিকা স্মরণ করা হলে এ আন্দোলনে যদুনাথ সরকারের সংশ্লিষ্টতা বিস্ময়কর বলে গণ্য হবে না। দেখুন অধ্যায় ৪।

৮৩. জিবি এইসিপিবি ২২৪/১৯৪৭।

৮৪. জেলা কংগ্রেস সংগঠনের নয়টি ভিন্ন ভিন্ন শাখা 'রাষ্ট্রপতি'র কাছে আবেদনপত্র প্রেরণ করে – কেতুগ্রাম ও কালনা মহকুমা কংগ্রেস কমিটি, রায়ান ইউনিয়ন কংগ্রেস সেবক সংঘ, বাঁতিগ্রাম ও বড়বানন ইউনিয়ন কংগ্রেস কমিটি, খান্তা ঘোষ থানা কংগ্রেস কর্মী পরিষদ, বাইদপুর ও নবগ্রাম কংগ্রেস কমিটি। এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং সিএল-১৪(বি)/১৯৪৬-৪৭।

৮৫. মেমো, তারিখ ১লা জুলাই ১৯৪৭। জিবি এসবি 'পিএইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫০১/৪৭(৩)।

৮৬. কংগ্রেস কমিটির আন্দোলনের সমর্থনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী বর্ধমানের অন্যান্য গ্রামগুলো হল: ভাতার, কেতুগ্রাম, বানতির, বাহুমেরিয়া, হাজিগ্রাম, পাতুলি এবং সন্তেশ্বর। এআইসিসি পেপার্স ফাইল নং সিএল–১৪(বি)/১৯৪৬-৪৭ এবং সিএল–১৪(সি)/১৯৪৬।

৮৭. এ ইউনিয়ন বোর্ডগুলো হল: চান্দর, চিলতোর, মাজিগ্রাম, লোদগ্রাম, লায়েকান্দ, খাটিয়া, ঢেকো, আরা, ঘোষের গ্রাম, বারজোরা, পানচাল, রাধামোহনপুর, সাশপুর, বীরসিংহ, সালতোরা, নেতুরপুর, গাদারিধিতি, বৃন্দাবন, ইসুলকুসমা, চিঙ্গানি, মণ্ডলগ্রাম, কুস্তর, ছাতনা, নবাসন, নদীয়া, সেঘারি, ছাতুয়া, গন্ধপাহাড়, গোপীনাথপুর এবং ত্রাকশাবিকা। *প্রাগুক্ত*।

৮৮. এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং সিএল-১৪(এ)/১৯৪৬।

৮৯. এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং সিএল-১৪(বি)/১৯৪৬।

৯০. *দি স্টেটস্‌ম্যান,* ১লা মে ১৯৪৭।

৯১. এর মধ্যে অন্যান্যের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত ছিল বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, দি অল-বেঙ্গল ট্রেডার্স এ্যান্ড কনজিউমার্স এসোসিয়েশন, দি মাড়োয়ারি ফেডারেশন, দি ক্যালকাটা আয়রন মার্চেন্টস্ এসোসিয়েশন এবং দি আসাম-বেঙ্গল ইন্ডিয়ান টি প্লান্টার্স এসোসিয়েশন। দেখুন, এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং সিএল-১৪(বি)/১৯৪৬।

৯২. মেমো, তারিখ ২৫শে মে ১৯৪৭। জিবি এসবি 'পিএইচ' সিরিজ, ফাইল নং ৫০৭/৪৬।

৯৩. জি. ডি. বিড়লার কাছ থেকে মহাদেব দেশাই, ১৪ই জুলাই ১৯৪২। জি. ডি. বিড়লা, *বাপু: এ ইউনিক এসোসিয়েশন করেসপন্ডেন্স, ১৯৪০-৪৭*, বোম্বে, ১৯৭৭, পৃ. ৩১৬। উদ্ধৃত সুমিত কুমার, 'পপুলার মুভমেন্ট এ্যান্ড ন্যাশনাল লিডারশিপ, ১৯৪৫-৪৭', *ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, বর্ষ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৮২, পৃ. ৬৭৯।

৯৪. ওমকার গোস্বামী, *সাহিব্‌স, বাবুজ এ্যান্ড বেনিয়াজ*, পৃ. ৩০০-৩০১।

৯৫. এম. এ. এইচ. ইস্পাহানী, *কায়েদে আজম জিন্নাহ এ্যাজ আই নিউ হিম*, অধ্যায় ৭–৯। আরও দেখুন, সুমিত সরকার, 'পপুলার মুভমেন্টস এ্যান্ড ন্যাশনাল লিডারশিপ', ১৯৭৭, পৃ. ৬৭৯।

৯৬. বরিশাল জেলা হিন্দু মহাসভার স্মারকপত্র, ১৭ই মে ১৯৪৭। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পেপার্স, ২-৪ কিস্তি, ফাইল নং ৮২/১৯৪৭।

৯৭. এআইসিসি প্রস্তাবের টেকস্ট, ৬ই জানুয়ারি ১৯৪৭। টিপি , খণ্ড ৯, নং ২৫৩।

৯৮. এ. এম. জায়েদী (সম্পাদিত), দি *ইনসাইক্লোপেডিয়া অব দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস*, খণ্ড ১৩, পৃ. ১২৭।

৯৯. প্রেস স্টেটমেন্ট, *অমৃত বাজার পত্রিকা*, ১৫ই মার্চ ১৯৪৭।

১০০. *প্রাগুক্ত*, ১৯শে মার্চ ১৯৪৭।

১০১. প্রাগুক্ত, ৫ই এপ্রিল ১৯৪৭।

১০২. *প্রাগুক্ত*, ১২ই এপ্রিল ১৯৪৭।

১০৩. এসোসিয়েটেড প্রেসের রিপোর্ট, ২২শে মে ১৯৪৭। উদ্ধৃত, শরৎচন্দ্র বসু, *আই ওয়ার্নড মাই কান্ট্রিমেন: কালেকটেড ওয়ার্কস, ১৯৪৫-৫০ অব শরৎচন্দ্র বোস*, কোলকাতা, ১৯৬৮, পৃ. ১৮৬-৮৭। পরিকল্পনা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, হারুন অর-রশিদ, *দি ফোরশ্যাডোইং অব বাংলাদেশ*, অধ্যায় ৭; শীলা সেন, *মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল*, অধ্যায় ৭; লিওনার্ড এ গর্ডন, 'ডিভাইডেড বেঙ্গল' এবং অমলেন্দু দে, *ইন্ডপেন্ডেন্ট বেঙ্গল: দি ডিজাইন এ্যান্ড ইটস্ ফেট*, কোলকাতা, ১৯৭৫।

১০৪. এটা এমন কিছু যার পরিকল্পনা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা সাধারণভাবে গ্রহণ করেননি। তাঁরা এটাকে বিভক্তির বাস্তব বিকল্প হিসেবে মূল্যায়ন করতে আগ্রহী ছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখুন, *লিওনার্ড গর্ডন, 'ডিভাইডেড বেঙ্গল'*।

১০৫. গান্ধীর কাছ থেকে শরৎ বসু, ২৪শে মে ১৯৪৭; *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০।

১০৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২।

১০৭. নেহেরুর সাথে ভাইসরয়ের বৈঠকের রেকর্ড, ১১ই মে ১৯৪৭। টিপি খণ্ড ৯, নং ৪০৫।

১০৮. প্যাটেল থেকে বিনয় কুমার রায়, ২৩শে মে ১৯৪৭; দুর্গা দাশ (সম্পাদিত), *সর্দার প্যাটেল'স্ করেসপন্ডেন্স*, খণ্ড ৪, পৃ. ৩৭।

১০৯. প্যাটেল থেকে কে. সি. নিয়োগী, ১৩ই মে ১৯৪৭। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭।

১১০. জে. বি. কৃপালনী থেকে আশরাফউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, ১৩ই মে ১৯৪৭। এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং সিএল-৮/১৯৪৬।

১১১. পরিকল্পনা সম্পর্কে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, শীলা সেন, *মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল*, পৃ. ২২৩-২৪৫; হারুন অর-রশিদ, *দি ফোরশ্যাডোইং অব বাংলাদেশ*, অধ্যায় ৭।

১১২. লেখকের সাথে নিখিল চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার, নিউ দিল্লী, ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯।

১১৩. দত্ত মজুমদারের কাছ থেকে প্যাটেল, ৮ই মে ১৯৪৭, দুর্গা দাশ (সম্পাদিত), *সর্দার প্যাটেলস্ করেসপন্ডেন্স*, খণ্ড ৪, পৃ. ৩৬।

১১৪. লেখকের সাথে অমিয় বসুর সাক্ষাৎকার, কোলকাতা, ৪ঠা মার্চ ১৯৮৮।

১১৫. শরৎ বসুর কাছ থেকে জিন্নাহ, ৯ই জুন ১৯৪৭, শরৎচন্দ্র বসু, *আই ওয়ার্নড মাই কান্ট্রিমেন*, পৃ. ১৯৩-১৯৪।

১১৬. শীলা সেন, *মুসলিম পলিটিকস্ ইন বেঙ্গল*, পৃ. ২৪৩।

১১৭. 'বাঙলার হিন্দু সাবধান', বেনামি, তারিখবিহীন, জিবি এসবি 'পিএস' সিরিজ, ৯৩৮/৪৭-৪।

১১৮. শরৎচন্দ্র বসু, *আই ওয়ার্নড মাই কান্ট্রিমেন*, পৃ. ১৯৮।

১১৯. নির্বাহী পরিষদের মধ্যে মাত্র আট জন সদস্য শরৎ বসুর উদ্যোগ সমর্থন করেন। এদের মধ্যে ছিলেন – লীলা রায়, অনিল বরণ রায়, হেম ঘোষ, জ্যোতিষ জোয়ারদার এবং সত্য রঞ্জন বকশি। মেমো, তারিখ ৫ই মে ১৯৪৭; জিবি এসবি 'পিএম' সিরিজ, ফাইল নং ৯৩৮/৪৭-৪।

১২০. জিওআই, হোম পলিটিক্যাল ফাইল নং ৫/৮/১৯৪৮। আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, সুমিত সরকার, 'পপুলার, মুভমেন্টস এ্যান্ড ন্যাশনাল লিডারশিপ', পৃ. ৬৭৯-৬৮০।

১২১. *বাঙলার হিন্দু সাবধান*।

১২২. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী থেকে বল্লবভাই প্যাটেল, ১১ই মে ১৯৪৭। দুর্গা দাশ (সম্পাদিত), *সর্দার প্যাটেলস্ করেসপন্ডেন্স*, পৃ. ৩৯।

১২৩. শরৎচন্দ্র বসু, *আই ওয়ার্নড মাই কান্ট্রিমেন*, পৃ. ১৯৮।

১২৪. কংগ্রেস ফাইলে দেখা যায়, বিভাগের বিরুদ্ধে মাত্র চারটি এবং সমর্থনে চারশ'-এর বেশি আবেদনপত্র আছে। এ চারটির মধ্যে তিনটি আবেদনপত্র হল শরৎ বসু ও তাঁর অতি স্বল্প সমর্থকদের কাজ। চতুর্থ আবেদনপত্রটির লেখক দিনাজপুরের নিম্ন শ্রেণীর একজন কৃষক নেতা নিশীথ নাথ কুণ্ডু। আবেদনপত্রটি এমনভাবে লেখা যার অর্থ বোধগম্য নয়। কুণ্ডু উল্লেখ করেন যে, '(বাঙলা) বিভাগের আন্দোলনের বিরুদ্ধে আমরা কিছু করিনি বা করার ইচ্ছাও নেই। কারণ, আমরা সচেতন আছি যে, আমাদের বিশ্বাসে ভুল হতে পারে।' নিশীথ নাথ কুণ্ডুর কাছ থেকে আচার্য কৃপালনী, ৩রা মে ১৯৪৭। এআইসিসি পেপার্স, ফাইল নং সিএল-১৪(বি)/১৯৪৬।

উপসংহার

লন্ডন ও দিল্লীতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অভিপ্রায় মূল্যায়ন করে দেশ-বিভাগের গূঢ় অর্থ পুরোপুরি অনুধাবন করা যাবে না, কারণ বাঙলার স্বার্থের চেয়েও তাঁদের গুরুত্ব ছিল ভারত ও সাম্রাজ্যের ওপর নিবদ্ধ। এমনকি মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবাদ সম্পর্কে অনুসন্ধান করেও পুরো ঘটনা জানা যাবে না, কেননা অন্তত এই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের হিন্দু জনগণের বৃহত্তর ও ক্ষমতাবান অংশের চিন্তাপ্রসূত পছন্দ ছিল বিভক্তি। যখন আর কোনো উপায় থাকল না ভদ্রলোক হিন্দুরা তখন মুসলমানদের দ্বারা শাসিত হওয়ার অসম্মান মেনে নেওয়ার চেয়ে বাঙলা গঠনের আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নকে গুরুত্ব দেয়।

দেশ-বিভাগ সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন ধারণাকে কতকগুলো কারণে এই গ্রন্থে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে দেশ-বিভাগ হল সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির ফল, কিন্তু বাঙলার ক্ষেত্রে দেখা যায়, হিন্দুরা তাদের একটা স্বতন্ত্র সমান্তরাল বিচ্ছিন্নতাবাদী ধারা সৃষ্টি করেছে। ব্যাপকভাবে (কিন্তু ভুলভাবে) বিশ্বাস করা হয় যে, কংগ্রেস হাই কমান্ড অনিচ্ছাকৃতভাবে নীরবে বিভক্তিকে মেনে নেয়। কিন্তু ঘটনাটি ঠিক উল্টো। এই গবেষণায় দেখা যায় যে, একক ভারতের ওপর কর্তৃত্বকে জোরদার করার লক্ষ্যে কংগ্রেস হাই কমান্ড শুধু দেশ-বিভাগের মূল্য দিতেই প্রস্তুত ছিল না, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নিজের প্রদেশকে বিচ্ছিন্ন করতে বেঙ্গল কংগ্রেস সফলভাবে তাদের আন্দোলনও পরিচালনা করেছে।

অনেক বাঙালি বিশ্বাস করে যে, সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত খেলায় তাদের প্রদেশ ছিল অসহায় একটি দাবার ঘুঁটি; সর্ব-ভারতীয় প্রয়োজনের বেদিতে বাঙলার আশা-আকাঙ্ক্ষা ধ্বংস হয়ে যায় এবং তার সাংস্কৃতিক সংহতিকে বলি দেওয়া হয়। যুক্ত বাঙলা পরিকল্পনাকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করে বলা হয় যে, বাঙালিরা দ্বিতীয়বার বিভাগের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করেছে। কিন্তু এ বক্তব্যের মধ্যে আদৌ সত্যতা নেই। বস্তুত যুক্ত বাঙলার পরিকল্পনার পক্ষে তার নিজের মাটিতেই কোনো সমর্থক ছিল না, আর সংস্কৃতি এ অঞ্চলের ঐতিহ্যগত ঐক্যের প্রমাণ তো নয়ই, বরং এখানে একে ব্যবহার করা হয়েছে বিভেদের চিহ্ন হিসেবে; আর ভদ্রলোক বাঙালিরা বিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করা তো দূরের কথা, সত্যিকার অর্থে (প্রদেশ) বিভাগের জন্য সংগ্রাম করেছে – এই বিভাগের কারণেই

তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত একটা স্বতন্ত্র আবাসভূমি লাভ করে। অনিচ্ছুক প্রদেশের ওপর কেন্দ্র বিভক্তি চাপিয়ে দেয়নি। বরং এতে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটে, যেখানে কেন্দ্রের নীতিনির্ধারকেরা বিনিময়ে বাঙলার কাছ থেকে সক্রিয় শক্তি লাভ করে। এই গবেষণায় কেন্দ্রের পরিবর্তে প্রদেশের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। মুষ্টিমেয় কিছু আলোচনাকারী ও আলোচনার টেবিল, যেখানে ওপর তলার কিছু মানুষ বাঙলার শহর ও পল্লির লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্য নিয়ে খেলা করেছে – সেখান থেকে অনেক দূরত্ব বজায় রেখে প্রদেশের উপর ভিত্তি করে এই ঐতিহাসিক অনুসন্ধানটি সম্পন্ন করা হয়েছে। এখান থেকেই মূলত প্রদেশ-বিভাগের সপক্ষের শক্তি আন্দোলন পরিচালনা করে এবং এর ফলে দুর্দৈবে অভ্যস্ত এই প্রদেশটিতে যে নজিরবিহীন মানবিক বিপর্যয় ঘটে তা এখানকার সবাইকে ভোগ করতে হয়।

এ গ্রন্থে হিন্দুদের নিজেদের প্রদেশ-বিভাগের দাবি এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িকতার প্রসারের বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে। পরিবর্তনশীল ঐ সমাজে প্রদেশের সাবেক উচ্চ শ্রেণীর লোকদের ক্ষমতার ভারসাম্য হ্রাস পায়। সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ ও পুনা চুক্তির ফলে কিভাবে ভদ্রলোকেরা রাজনৈতিক ক্ষমতাবঞ্চিত হয় এবং একই সময় কৃষিপণ্যের মন্দার কারণে তাদের আর্থিক অবস্থা যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কিছু মুসলমান সে-সকল সুযোগ ও ক্ষমতা লাভ করে, তাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। একের পর এক মুসলমান সরকারের গৃহীত আইনগত ব্যবস্থার কারণে বিভিন্ন কাঠামো ক্রমশ ধ্বংস হয়ে যায় – যেসব কাঠামো ভদ্রলোক কর্তৃত্বকে দীর্ঘকাল টিকিয়ে রেখেছিল। এ ধরনের ক্রমাগত চ্যালেঞ্জের প্রতিক্রিয়ায় এবং প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক কৌশলের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হিসেবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ ঘটে। এই প্রেক্ষাপটে একটা উদীয়মান বামপন্থী ধারা এক ধরনের লোকপ্রিয় ধর্মনিরপেক্ষ রণকৌশল গ্রহণ করে, কিন্তু তা অধিকাংশ ভদ্রলোক জনমতের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। ফলে ভদ্রলোক জনমত আরো সংকীর্ণ, নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ সংরক্ষণে আরো মনোযোগী এবং আরো তীব্রভাবে সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে। ভদ্রলোকদের হিন্দু সাম্প্রদায়িক আলোচনায় যুযুধান এলিট শ্রেণীর (elite) গভীর রক্ষণশীল পার্থিব মনোভাবের প্রকাশ পায়, এমনকি যখন ধর্মীয় মূর্তির কাছে প্রার্থনা করা হয়নি, বা পবিত্র প্রতীকসমূহ ব্যবহার করা হয়নি, তখনো তাদের আলোচনার উদ্দেশ্য গভীরভাবে সাম্প্রদায়িক ছিল।

ভদ্রলোকদের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার সাথে আনুগত্য, জনপ্রিয় সংস্কৃতি[১] বা আত্মজ্ঞানের 'প্রাক-বুর্জোয়া'[২] জীবনধারার প্রায় কোনো সম্পর্ক ছিল না। এটি এলিট শ্রেণীর লোকদের নিজ স্বার্থে প্রাচীন সম্পর্কের বন্ধন কপটভাবে ব্যবহারের ঘটনাও ছিল না। উপাদানবাদী (primordialist) এবং করণবাদী (instrumentalist) পদ্ধতি দিয়ে বাঙলার ভদ্রলোক সাম্প্রদায়িকতার বৈশিষ্ট্য যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।[৩] বরং এর পরিবর্তে ইতিহাস ও এর নিজস্ব যৌক্তিকতাকে যথাস্থানে রেখে ভদ্রলোক সাম্প্রদায়িকতা যে সামাজিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ ও আদর্শের কারণে সৃষ্টি হয় এবং সে-সবের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ

করে এ পুস্তকে এই সাম্প্রদায়িকতার 'গোপন রহস্যকে উন্মুক্ত' করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে ইতিহাস ও এর নিজস্ব যৌক্তিকতাকে যথাস্থানে রাখা হয়েছে। এ আলোচনার ফলে সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে অনুধাবন করা এবং তাকে ফলপ্রসূভাবে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব।

বাঙলার ইতিহাসের এ ধারা থেকে নিকট অতীত সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে, যেমন পশ্চিম বাঙলা ও কেন্দ্রের মধ্যকার আজকের সম্পর্ক, স্বাধীনতার পর থেকে বেঙ্গল কংগ্রেসের ইতিহাস, দিল্লীর সাথে ভালো-মন্দ মেশানো উভয়মুখী সম্পর্ক ও এর গভীর অভ্যন্তরীণ দলাদলি; সাম্প্রতিককালে বাঙালি বামপন্থীদের শক্তিশালী আঞ্চলিক ঘাঁটিতে পরিণত হওয়ার ঘটনা; আজকের বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বাভাবিক প্রবণতা এবং সর্ব-ভারতীয় রাজনীতিতে তাদের বৈশিষ্ট্যগত দুর্বলতা; বাম ও ডানের মধ্যে শক্ত মেরুকরণ এবং এখনো অনেক হিন্দু ভদ্রলোক কর্তৃক উৎকট স্বাদেশিক সংস্কৃতির অব্যাহত চর্চা। পরিশেষে, এ পুস্তকে উত্থাপিত কয়েকটি যুক্তি অন্য এক আলোচনার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে – যে আলোচনাটি এখন ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করছে। এ গবেষণার মূল বিষয় হল জাতীয়তাবাদ থেকে সাম্প্রদায়িকতার ধারণায় পরিবর্তন। জাতীয়তাবাদী বাগ্মিতা আর সাম্প্রদায়িক ভাবধারা বিস্তারের মধ্যে বৈশিষ্ট্যে ও প্রকাশভঙ্গিতে যতই ঐক্য থাকুক না কেন, এর মধ্যকার পার্থক্যগুলোও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় এবং ব্রিটিশবিরোধী কর্মকাণ্ডকে এ জন্য যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর ভদ্রলোকদের সাম্প্রদায়িকতা পরিচালিত হয় তাদের সাথি বাঙালিদের বিরুদ্ধে।[৪] এর মধ্যে একটার ইতিহাস হল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আর অপরটি হল মুসলমানদের স্বৈরতন্ত্র থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ব্রিটিশ শাসনের কালকে সোৎসাহ উদ্‌যাপন। ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের সময় ঐ *'স্বৈরতন্ত্র'*-এর প্রত্যাবর্তন প্রতিরোধ করাই ছিল মূল রাজনৈতিক লক্ষ্য। এ লক্ষ্যের মধ্যে আরও ছিল মুসলমানেরা যে বাঙালি সে-কথা অস্বীকার করা এবং ভারতীয়তার সম্প্রসারণ। এ ধরনের স্বার্থান্ধ মতবাদের ক্ষতিকর ফলাফল এখন একটা প্রদেশ ভাগের চেয়ে আরও মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে; এখন তারা আবার একটা জাতির ভবিষ্যৎকেই হুমকি দিচ্ছে। এই বইটি যদি জাতীয়তাবাদী অতীত নিয়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের দাবিকে[৫] চ্যালেঞ্জ করে ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে তাদের বৈধতাকে কিছুটা হলেও অস্বীকার করতে পারে, সেটাই হবে এই বইটি রচনার সার্থকতা।

টীকা

১. দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, সাম্প্রদায়িক উগ্রতা নিয়ে সান্দ্রিয়া ফ্রাইটাগ-এর গবেষণা 'অন্যদের সামগ্রিক গবেষণা কাজের ওপর ভিত্তি করে রচিত' – এ বিষয়টাকে প্রায় ক্ষেত্রেই পণ্ডিত ব্যক্তিরা মন্তব্য করেন 'লোকায়ত সংস্কৃতি' হিসেবে। সান্দ্রিয়া ফ্রাইটাগ, *কালেকটিভ এ্যাকশন এ্যান্ড কমিউনিটি*, পৃ. ১২।

২. দেখুন, দিপেশ চক্রবর্তী, *রিথিংকিং ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রি, বেঙ্গল ১৮৯০-১৯৪০*; প্রিন্সটন এবং নিউ দিল্লী, ১৯৮১।

৩. 'পূর্ব থেকে বিদ্যমানতা'র তত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণার জন্য দেখুন, ফ্রান্সিস রবিনসন, 'নেশন ফরমেশন: দি ব্রাস থিসিস এ্যান্ড মুসলিম সেপারিটিজম', *জার্নাল অব কমপ্যারেটিভ এ্যান্ড কমনওয়েলথ পলিটিক্স*, খণ্ড ১৫, ৩, নভেম্বর ১৯৭৭, পৃ. ২১৫-২৩৪ এবং 'ইসলাম এ্যান্ড মুসলিম সেপারিটিজম', ডেভিড টেলর ও ম্যালকম ইয়াপ (সম্পাদিত), *পলিটিক্যাল আইডেন্টিটি ইন সাউথ এশিয়া*, লন্ডন, ১৯৭৯। 'করণবাদী (instrumentalist)'-এর বিষয়টি ঐ একই সংকলনে আলোচনা করেন পল ব্রাস, 'এলিট গ্রুপস, সিম্বল ম্যানিপুলেশান এ্যান্ড ইথনিক আইডেন্টিটি এ্যামং দি মুসলিমস্ অব সাউথ এশিয়া' নিবন্ধে।

৪. দেখুন, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, *দি কনস্ট্রাকশন অব কমিউনালিজম*, পৃ. ২৩৩-২৬১।

৫. ব্রিটিশ শাসনের শেষ কয়েক দশকে হিন্দুত্ব সম্পর্কিত বক্তব্যের ইতিহাস হল, কংগ্রেস 'জাতি-বিরোধী', কারণ সে বিভাগের পক্ষে সম্মতি দিয়েছে এবং মাতৃভূমির মাটিকে পাকিস্তানের কাছে সমর্পণ করেছে। 'কমিউনিস্ট'রা 'জাতি-বিরোধী', কারণ তারা যুদ্ধ প্রচেষ্টার সময় ব্রিটিশদের সহায়তা করেছে। এই বর্ণনা অনুযায়ী কেবলমাত্র হিন্দু সংগঠনগুলো এক্ষেত্রে জাতির প্রতি বিশ্বস্ত ছিল।

পরিশিষ্ট ১

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১৯২৬ সালে অনুষ্ঠিত বাঙলা প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ। পরে ঐ মূল ভাষণ প্রবন্ধ হিসেবে *হিন্দু সংঘ* পত্রিকায় ছাপা হয়, ১৯শে আশ্বিন ১৩৩৩।]

কোন একটা কথা বহু লোকে মিলিয়া বহু আস্ফালন করিয়া বলিতে থাকিলেই কেবল বলার জোরেই তাহা সত্য হইয়া উঠে না। অথচ এই সম্মিলিত প্রবল কণ্ঠস্বরের একটা শক্তি আছে। এবং মোহও কম নাই। চারিদিক গমগম করিতে থাকে – এবং এই বাষ্পাচ্ছন্ন আকাশের নীচে দুই কানের মধ্যে নিরন্তর যাহা প্রবেশ করে, মানুষ অভিভূতের মতো তাহাকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বসে। Propaganda বস্তুত এই-ই। বিগত মহাযুদ্ধের দিনে পরস্পরের গলা কাটিয়া বেড়ানই যে মানুষের একমাত্র ধর্ম ও কর্তব্য, এই অসত্যকে সত্য বলিয়া যে দুই পক্ষের লোকেই মানিয়া লইয়াছিল, সে ত কেবল অনেক কলম এবং অনেক গলার সমবেত চীৎকারের ফলেই। যে দুই-একজন প্রতিবাদ করিতে গিয়াছিল, আসল কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের অবধি ছিল না।

কিন্তু আজ আর সেদিন নাই। আজ অপরিসীম বেদনা ও দুঃখ ভোগের ভিতর দিয়া মানুষের চৈতন্য হইয়াছে যে, সত্য বস্তু সেদিন অনেকের অনেক বলার মধ্যেই ছিল না। বছর-কয়েক পূর্বে, মহাত্মার অহিংস অসহযোগের যুগে এমনি একটা কথা এদেশে বহু নেতায় মিলিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, হিন্দু-মুসলিম মিলন চাই-ই। চাই শুধু কেবল জিনিসটা ভাল বলিয়া নয়, চাই-ই এইজন্য যে, এ না হইলে স্বরাজ বল, স্বাধীনতা বল, তাহার কল্পনা করাও পাগলামি। কেন পাগলামি এ কথা যদি কেহ তখন জিজ্ঞাসা করিত, নেতৃবৃন্দেরা কি জবাব দিতেন তাঁহারাই জানেন, কিন্তু লেখায়, বক্তৃতায় ও চীৎকারের বিস্তারে কথাটা এমনি বিপুলায়তন ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য হইয়া গেল যে, এক পাগল ছাড়া আর এত বড় পাগলামি করিবার দুঃসাহস কাহারও রহিল না।

তার পরে এই মিলন-ছায়াবাজীর রোশনাই যোগাইতেই হিন্দুর প্রাণান্ত হইল। সময় এবং শক্তি কত যে বিফলে গেল তাহার ত হিসাবও নাই। ইহারই ফলে মহাত্মাজীর খিলাফৎ-আন্দোলন, ইহারই ফলে দেশবন্ধুর প্যাক্ট। অথচ এতবড় দুটো ভুয়া জিনিসও ভারতের রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কম আছে। প্যাক্টের তবু বা কতক অর্থ বুঝা যায়; কারণ, কল্যাণের হউক, অকল্যাণের হউক, সময়-মত একটা ছাড়রফা করিয়া কাউন্সিল-ঘরে বাঙলা সরকারকে পরাজিত করিবার একটা উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু খিলাফৎ-আন্দোলন হিন্দুর পক্ষে শুধু অর্থহীন নয়, অসত্য। কোনো মিথ্যাকে অবলম্বন করিয়া জয়ী হওয়া যায় না। এবং যে মিথ্যার জগদ্দল পাথর গলায় বাঁধিয়া এত বড় অসহযোগ-আন্দোলন শেষ পর্যন্ত রসাতলে গেল, সে এই খিলাফৎ। স্বরাজ চাই, বিদেশীর শাসন-পাশ হইতে মুক্তি চাই, ভারতবাসীর এই দাবীর বিরুদ্ধে ইংরাজ হয়তো একটা যুক্তি খাড়া করিতে পারে, কিন্তু বিশ্বের দরবারে তাহা টিকে না। পাই বা না পাই, এই জন্মগত অধিকারের জন্য লড়াই করায় পুণ্য আছে, প্রাণপাত হইলে অন্তে স্বর্গবাস হয়। এই সত্যকে অস্বীকার করিতে পারে জগতে এমন কেহ নাই। কিন্তু খিলাফৎ চাই – এ কোন্ কথা? যে-দেশের সহিত ভারতের সংস্রব নাই, যে-দেশের মানুষে কি

খায়, কি পরে, কি রকম তাদের চেহারা, কিছুই জানি না, সেই দেশ পূর্বে তুর্কীর শাসনাধীন ছিল, এখন যদিচ, তুর্কী লড়াইয়ে হারিয়াছে তথাপি সুলতানকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হউক, কারণ, পরাধীন ভারতীয় মুসলমান-সমাজ আবদার ধরিয়াছে। এ কোন্ স্বগত প্রার্থনা? আসলে ইহাও একটা প্যাক্ট। ঘুষের ব্যাপার। যেহেতু আমরা স্বরাজ চাই, এবং তোমরা চাও খিলাফৎ – অতএব এস, একত্র হইয়া আমরা খিলাফতের জন্য মাথা খুঁড়ি এবং তোমরা স্বরাজের জন্য তাল ঠুকিয়া অভিনয় শুরু কর। কিন্তু এদিকে বৃটিশ গভর্নমেন্ট কর্ণপাত করিল না, এবং ওদিকে যাহার জন্য খিলাফত সেই খলিফাকেই তুর্কীরা দেশ হইতে বাহির করিয়া দিল। সুতরাং এইরূপ খিলাফৎ-আন্দোলন যখন নিতান্তই অসার ও অর্থহীন হইয়া পড়িল, তখন নিজের শূন্য-গর্ভতায় সে শুধু নিজেই মরিল না ভারতের স্বরাজ-আন্দোলনেরও প্রাণবধ করিয়া গেল। বস্তুতঃ এমন ঘুষ দিয়া, প্রলোভন দেখাইয়া, পিঠ চাপড়াইয়া কি স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে লোক ভরতি করা যায়, না করিলেই বিজয় লাভ হয়? হয় না, এবং কোনদিন হইবে বলিয়াও মনে করি না।

এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী খাটিয়াছিলেন মহাত্মাজী নিজে। এতখানি আশা বোধ করি কেহ করে নাই, এতবড় প্রতারিতও বোধ করি কেহ হয় নাই। সেকালে বড় বড় মুসলিম পাণ্ডাদের কেহ-বা হইয়াছিলেন তাহার দক্ষিণ হস্ত, কেহ-বা বাম হস্ত, কেহ-বা চক্ষু কর্ণ, কেহ-বা আর কিছু – হায়রে! এতবড় তামাশার ব্যাপার কি আর কেথাও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পরিশেষে হিন্দু-মুসলমান-মিলনের শেষ চেষ্টা করিলেন তিনি দিল্লীতে – দীর্ঘ একুশ দিন উপবাস করিয়া। ধর্মপ্রাণ সরলচিত্ত সাধু মানুষ তিনি, বোধ হয় প্রাণটা তাঁহার টিকিয়া গেল। ভ্রাতার অধিক, সর্বক্ষেত্রে প্রিয় মিঃ মহম্মদ আলিই বিচলিত হইলেন সবচেয়ে বেশী। তাঁহার চোখের উপরেই সমস্ত ঘটিয়াছিল,– অশ্রুপাত করিয়া কহিলেন, আহা! বড় ভাল লোক এই মহাত্মাজীটি। ইঁহার সত্যকার উপকার কিছু করাই চাই। অতএব আগে যাই মক্কায়, গিয়া পীরের সিন্নি দিই, পরে ফিরিয়া আসি কলমা পড়াইয়া কাফের-ধর্ম ত্যাগ করাইয়া তবে ছাড়িব।

শুনিয়া মহাত্মা কহিলেন, পৃথিবী দ্বিধা হও।

বস্তুতঃ মুসলমান যদি কখনও বলে – হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।

একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুতঃ অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সঙ্কোচ মানে নাই।

দেশের রাজা হইয়াও তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি নামজাদা সম্রাটের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যে আকবর বাদশাহের উদার বলিয়া এত খ্যাতি ছিল, তিনিও কসুর করেন নাই। আজ মনে হয়, এ সংস্কার উহাদের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে। পাবনার বীভৎস ব্যাপারে অনেককেই বলিতে শুনি, পশ্চিম হইতে মুসলমান মোল্লারা আসিয়া নিরীহ ও অশিক্ষিত মুসলমান প্রজাদের উত্তেজিত করিয়া এই দুষ্কার্য করিয়াছে। কিন্তু এমনিই যদি পশ্চিম হইতে হিন্দু পুরোহিতের দল আসিয়া, কোন হিন্দুপ্রধান স্থানে এমনি নিরীহ ও নিরক্ষর চাষাভুষাদের এই বলিয়া উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করেন যে নিরপরাধ মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘরদোরে আগুন ধরাইয়া সম্পত্তি লুঠ করিয়া মেয়েদের অপমান অমর্যাদা করিতে হইবে, তাহা হইলে সেই সব নিরক্ষর হিন্দু কৃষকের দল উহাদের পাগল বলিয়া গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিতে একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করিবে না।

কিন্তু, কেন এরূপ হয়? ইহা কি কেবল শুধু অশিক্ষারই ফল? শিক্ষা মানে যদি লেখাপড়া জানা হয়, তাহা হইলে চাষী-মজুরের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানে বেশী তারতম্য নাই। কিন্তু শিক্ষার তাৎপর্য যদি অন্তরের প্রসার ও হৃদয়ের কাল্‌চার হয়, তাহা হইলে বলিতেই হইবে উভয় সম্প্রদায়ের তুলনাই হয় না। হিন্দুনারীহরণ ব্যাপারে সংবাদপত্রওয়ালারা প্রায়ই দেখি প্রশ্ন করেন, মুসলমান নেতারা নীরব কেন? তাহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যে পুনঃ পুনঃ এতবড় অপরাধ করিতেছে, তথাপি প্রতিবাদ করিতেছেন না কিসের জন্য? মুখ বুজিয়া নিঃশব্দে থাকার অর্থ কি? কিন্তু আমার তো মনে হয় অর্থ অতিশয় প্রাঞ্জল। তাঁহারা শুধু অতি বিনয়বশতঃই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না, বাপু, আপত্তি করব কি, সময় এবং সুযোগ পেলে ও-কাজে আমরাও লেগে যেতে পারি।

মিলন হয় সমানে সমানে। শিক্ষা সমান করিয়া লইবার আশা আর যেই করুক আমি ত করি না। হাজার বৎসরে কুলায় নাই, আর হাজার বৎসরে কুলাইবে না। এবং ইহাকেই খিলাফৎ করিয়া, প্যাক্ট করিয়া, ডান ও বাঁ – দুই হাতে মুসলমানের পুচ্ছ চুলকাইয়া স্বরাজ যুদ্ধে নামাইতে পারিবে, এ দুরাশা দুই-একজনার হয়ত ছিল. কিন্তু মনে মনে অধিকাংশেরই ছিল না। তাঁহারা ইহাই ভাবিতেন – দুঃখ-দুর্দশার মত শিক্ষক ত আর নাই, বিদেশী বুরোক্রেসীর কাছে নিরন্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া হয়ত তাহাদের চৈতন্য হইবে, হয়ত হিন্দুর সহিত কাঁধ মিলাইয়া স্বরাজরথে ঠেলা দিতে সম্মত হইবে। ভাবা অন্যায় নয়, শুধু ইহাই তাঁহারা ভাবিলেন না যে, লাঞ্ছনাবোধও শিক্ষাসাপেক্ষ। যে লাঞ্ছনার আগুনে স্বর্গীয় দেশবন্ধুর হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইত, আমার গায়ে তাহাতে আঁচটুকুও লাগে না। এবং তাহার চেয়েও বড় কথা এই যে, দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে যাহাদের বাধে না, সবলের পদলেহন করিতেও তাহাদের ঠিক ততখানিই বাধে না। সুতরাং এ আকাশকুসুমের লোভে আত্মবঞ্চনা করি আমরা কিসের জন্য? হিন্দু-মুসলমান-মিলন একটা গালভরা শব্দ, অতিরিক্ত সে আর কোন কাজেই আসে নাই। এ মোহ আমাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে। তোমরা হিন্দু ছিলে; সুতরাং রক্ত-সম্বন্ধে তোমরা আমাদের জ্ঞাতি। জ্ঞাতিবধে মহাপাপ, অতএব কিঞ্চিৎ করুণা কর। এমন করিয়া দয়াভিক্ষা মিলন-প্রয়াসের মত অগৌরবের বস্তু আমি ত আর দেখিতে পাই না। স্বদেশে বিদেশে খ্রীশ্চান বন্ধু আমার অনেক আছেন। কাহারও বা পিতামহ, কেহ-বা স্বয়ং ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু নিজে হইতে তাঁহারা নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসের পরিচয় না দিলে বুঝিবার জো নাই যে, সর্বদিক দিয়া তাঁহারা আজও আমাদের ভাইবোন নয়। একজন মহিলাকে জানি, অল্প বয়সেই তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, এতবড় শ্রদ্ধার পাত্রীও জীবনে আমি কম দেখিয়াছি! আর মুসলমান? আমাদের একজন পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। সে মুসলমানীর প্রেমে মজিয়া ধর্ম ত্যাগ করে। এক বৎসর পরে দেখা। তাহার নাম বদলাইয়াছে, পোশাক বদলাইয়াছে, প্রকৃতি বদলাইয়াছে, ভগবানের দেওয়া যে আকৃতি, সে পর্যন্ত এমনি বদলাইয়া গিয়াছে যে আর চিনিবার জো নাই। এবং এইটিই একমাত্র উদাহরণ নয়। বস্তির সহিত যাহারই অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠতা আছে,– এ কাজ যেখানে প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে – তাঁহারই অপরিজ্ঞাত নয় যে এমনিই বটে! উগ্রতায় পর্যন্ত ইহারা বোধ হয় কোহাটের মুসলমানকেও লজ্জা দিতে পারে।

অতএব হিন্দুর সমস্যা এ নয় যে, কি করিয়া এই অস্বাভাবিক মিলন সংঘটিত হইবে; হিন্দুর সমস্যা এই যে, কি করিয়া তাঁহারা সংঘবদ্ধ হইতে পারিবেন এবং হিন্দুধর্মাবলম্বী যে-কোন ব্যক্তিকেই ছোট জাতি বলিয়া অপমান করিবার দুর্মতি তাঁহাদের কেমন করিয়া এবং কবে যাইবে। আর সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা – হিন্দুর অন্তরের সত্য কেমন করিয়া তাহার প্রতিদিনের প্রকাশ্য আচরণে পুষ্পের মত বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে। যাহা ভাবি তাহা বলি না, যাহা বলি তাহা করি না, যাহা করি তাহার স্বীকার পাই না – আত্মার এত বড় দুর্গতি অব্যাহত থাকিতে সমাজগাত্রের অসংখ্য ছিদ্রপথ ভগবান স্বয়ং আসিয়াও রুদ্ধ করিতে পারিবেন না।

ইহাই সমস্যা এবং ইহাই কর্তব্য। হিন্দু-মুসলমানের মিলন হইল না বলিয়া বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া বেড়ানই কাজ নয়। নিজেরা কান্না বন্ধ করিলে তবে অন্য পক্ষ হইতে কাঁদিবার লোক পাওয়া যাইবে।

হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে, – এদেশে চিত্ত তাহার নাই। যাহা নাই তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়াই বা লাভ কি, এবং তাহাদের বিমুখ কর্ণের পিছু পিছু ভারতের জলবায়ু ও খানিকটা মাটির দোহাই পাড়িয়াই বা কি হইবে! আজ এই কথাটাই একান্ত করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে যে, এ কাজ শুধু হিন্দুর, – আর কাহারও নয়। মুসলমানের সংখ্যা করিয়া চঞ্চল হইবারও আবশ্যকতা নাই। সংখ্যাটাই সংসারে পরম সত্য নয়। ইহার চেয়েও বড় সত্য রহিয়াছে যাহা এক দুই তিন করিয়া মাথা-গণনার হিসাবটাকে হিসেবের মধ্যে গণ্য করে না।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি তাহা অনেকের কানেই হয়ত তিক্ত ঠেকিবে, কিন্তু সেজন্য চমকাইবারও প্রয়োজন নাই, আমাকে দেশদ্রোহী ভাবিবারও হেতু নাই। আমার বক্তব্য এ নয় যে, এই দুই প্রতিবেশী জাতির মধ্যে একটা সদ্ভাব ও প্রীতির বন্ধন ঘটিলে সে বস্তু আমার মনঃপূত হইবে না। আমার বক্তব্য এই যে, এ জিনিস যদি নাই-ই হয় এবং হওয়ার যদি কোন কিনারা আপাতত চোখে না পড়ে ত এ লইয়া অহরহ আর্তনাদ করিয়া কোন সুবিধা হইবে না। আর না হইলেই যে সর্বনাশ হইয়া গেল, এ মনোভাবের কোন সার্থকতা নাই। অথচ, উপরে নীচে, ডাইনে বামে চারিদিক হইতে একই কথা বারংবার শুনিয়া ইহাকে এমনিই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছি যে জগতে ইহা ছাড়া যে আমাদের আর কোন গতি আছে, তাহা যেন আর ভাবিতেই পারি না। তাই করিতেছি কি? না, অত্যাচার ও অনাচারের বিবরণ সকল স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া এই কথাটাই কেবল বলিতেছি – তুমি এই আমাকে মারিলে, এই আমার দেবতার হাত-পা ভাঙ্গিলে, এই আমার মন্দির ধ্বংস করিলে, এই আমার মহিলাকে হরণ করিলে,– এবং এ-সকল তোমার ভারী অন্যায়, ও ইহাতে আমরা যারপরনাই ব্যথিত হইয়া হাহাকার করিতেছি। এ-সকল তুমি না থামাইলে আমরা আর তিষ্ঠিতে পারি না। বাস্তবিক ইহার অধিক আমরা কি কিছু বলি, না করি? আমরা নিঃসংশয়ে স্থির করিয়াছি যে, যেমন করিয়াই হউক মিলন করিবার ভার আমাদের এবং অত্যাচার নিবারণ করিবার ভার তাহাদের। কিন্তু, বস্তুতঃ হওয়া উচিত ঠিক বিপরীত। অত্যাচার থামাইবার ভার গ্রহণ করা উচিত নিজেদের এবং হিন্দু-মুসলমান-মিলন বলিয়া যদি কিছু থাকে ত সে সম্পন্ন করিবার ভার দেওয়া উচিত মুসলমানদের 'পরে।

কিন্তু দেশের মুক্তি হইবে কি করিয়া? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মুক্তি কি হয় গোঁজামিলে? মুক্তি অর্জনের ব্রতে হিন্দু যখন আপনাকে প্রস্তুত করিতে পারিবে, তখন লক্ষ্য করিবারও প্রয়োজন হইবে না, গোটা-কয়েক মুসলমান ইহাতে যোগ দিল কি না। ভারতের মুক্তিতে ভারতীয় মুসলমানের মুক্তি মিলিতে পারে, এ সত্য তাহারা কোনদিনই অকপটে বিশ্বাস করিতে পারিবে না। পারিবে শুধু তখন যখন ধর্মের প্রতি মোহ তাহাদের কমিবে, যখন বুঝিবে যে-কোন ধর্মই হউক তাহার গোঁড়ামি লইয়া গর্ব করার মত এমন লজ্জাকর ব্যাপার, এতবড় বর্বরতা মানুষের আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু সে বুঝার এখনও অনেক বিলম্ব। এবং জগৎসুদ্ধ লোক মিলিয়া মুসলমানদের শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে ইহাদের চোখ খুলিবে কি না সন্দেহ। আর, দেশের মুক্তিসংগ্রামে কি দেশসুদ্ধ লোকেই কোমর বাঁধিয়া লাগে? না ইহা সম্ভব, না তাহার প্রয়োজন হয়? আমেরিকা যখন স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিয়াছিল, তখন দেশের অর্ধেকের বেশি লোকে ত ইংরেজের পক্ষে ছিল। আয়ারল্যান্ডের মুক্তিযজ্ঞে কয়জনে যোগ দিয়াছিল? যে বলশেভিক গভর্নমেন্ট আজ রুশিয়ার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছে

দেশের লোক সংখ্যার অনুপতে সে ত এখনও শতকে একজনও পৌঁছে নাই। মানুষ ত গরু-ঘোড়া নয়, কেবলমাত্র ভীড়ের পরিমাণ দেখিয়াই সত্যাসত্য নির্ধারিত হয় না, হয় শুধু তাহার তপস্যার একাগ্রতার বিচার করিয়া। এই একাগ্র তপস্যার ভার রহিয়াছে দেশের ছেলেদের 'পরে। হিন্দু-মুসলমান-মিলনের ফন্দি উদ্ভাবন করাও তাহার কাজ নহে, এবং যে-সকল প্রধান রাজনীতিবিদের দল এই ফন্দিটাকে ভারতের একমাত্র ও অদ্বিতীয় বলিয়া চিৎকার করিয়া ফিরিতেছেন তাঁহাদের পিছনে জয়ধ্বনি করিয়া সময় নষ্ট করিয়া বেড়ানও তাহার কাজ নহে। জগতে অনেক বস্তু আছে যাহাকে ত্যাগ করিয়াই তবে পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান-মিলনও সেই জাতীয় বস্তু। মনে হয়, এ আশা নির্বিশেষে ত্যাগ করিয়া কাজে নামিতে পারিলেই হয়ত একদিন এই একান্ত দুষ্প্রাপ্য নিধির সাক্ষাৎ মিলিবে। কারণ মিলন তখন শুধু কেবল একার চেষ্টাতেই ঘটিবে না, ঘটিবে উভয়ের আন্তরিক ও সমগ্র বাসনার ফলে।[১]

১. সূত্র: হরিপদ ঘোষ (সম্পাদনা), *শরৎ রচনা সমগ্র*, খণ্ড ৩, কোলকাতা, ১৯৮৯।

Bibliography/তথ্যসূত্র

MANUSCRIPT SOURCES

PRIVATE PAPERS

John Anderson Papers (Indian Office Library and Records) (IOLR)

F O. Bell Papers (IOLR)

Linlithgow Papers (IOLR)

Shyama Prasad Mookerjee Papers (Nehru Memorial Museum and Library) (NMML)

Pinnell Papers (IOLR)

Robert Reid Papers (IOLR)

B. C. Roy Papers (NMML)

Nalini Ranjan Sarkar Papers (NMML)

B. P. Singh Roy Papers (NMML)

Suamarez Smith Papers (IOLR)

Zetland Papers (IOLR)

MANUSCRIPT MEMOIRS

P. D. Martyn Memoirs (IOLR)

S. Rahmatullah Memoirs (IOLR)

ORAL HISTORY TRANSCRIPTS

Interview with Surendra Mohan Ghosh (NMML)

Interview with Nellie Sengupta (NMML)

RECORDS OF POLITICAL ORGANISATIONS

All India Congress Committee Papers (NMML)

Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha Papers (NMML)

OFFICIAl RECORDS

Government of India

Public and Judicial Proccedings L/P and J (IOLR)

Private Office Papers L/PO (IOLR)
Home Political Proceedings (National Archives of India) (NAI)

Government or Bengal

(i) Home Department Records

Home Confidential Political Department, Political Branch (West Bengal State Archives) (WBSA)

Local Officers' Fortnightly Confidential Reports (WBSA)

(ii) Police Records

Special Branch 'PM' Series (Special Branch, Calcutta) (SB)

Special Branch 'PH' Series (SB)

PUBLISHED SOURCES

OFFICIAL PUBLICATIONS

District Gazetteers

Bengal District Gazetteer, Burdwan, by J. C. K Peterson, Calcutta, 1910.

East Bengal District Gazetteer, Dinajpur, by F. W. Strong, Dacca, 1905.

Bengal District Gazetteer, Howrah, by L. S. S. O'Malley and M. Chakravarti, Calcutta, 1909.

Bengal District Gazetteer, Jessore, by L. S. S. O'Malley, Calcutta, 1912.

Bengal District Gazetteer, Mymensingh, F. A. Sachse, calcutta, 1917.

Bengal District Gazetteer, Pabna, by L. S. S. O'Malley, Calcutta, 1923.

Bengal District Gazetteer, Tippera. by J. E. Webster, Calcutta, 1910.

Survey and Settlement Reports

Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Burdwan, 1927–34, by K. A. L. Hill, Alipore, 1940.

Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Mymensingh, 1908–19, by F. A. Sachse, Calcutta, 1920.

Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Noakhali, 1914–19, by W. H. Thompson, Calcutta, 1919.

Final Report on the Survey and Settlement Operations in the Districts of Pabna and Bogra, 1920–29, by D. MacPherson, Calcutta, 1930.

Census of India, 1931 and 1941, report and tables on Bengal and Calcutta.

Report of the Land Revenue Commission, Bengal 1938–40 (Chairman Sir Francis Floud), vols. I–VI, Alipore, 1940.

Resolutions Reviewing the Reports on the Working of District and Local Boards in Bengal, Calcutta, 1931–35.

Resolutions Reviewing the Working of District, Local and Union Boards in Bengal During the Year 1934–35 and 1936–37, Calcutta, 1936 and 1937.

Union Board Manual, vol. 1, Alipore, 1937.

Indian Round Table Conference (Second Session), Procedures of the Federal Structure Committee and the Minorities Committee, Calcutta, 1932.

Report of the Indian Statutory Commission, vol. XVII, Calcutta, 1930.

Proceedings, Bengal Legislative Assembly, 2nd Session, vol. LI, Calcutta, 1937.

OTHER PUBLISHED SOURCES

Bose, Sisir K. (ed), *Netaji Collected Works*, vol. I, Calcutta, 1980.

Collett, S. D., *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, Calcutta, 1962.

Das, Durga (ed.), *Sardar Patel's Correspondence*, 10 vols., Ahmedabad, 1971–1974.

Mansergh N., Lumby, E. W. R., and Moon, Penderel (eds.), *Constitutional Relations Between Britain and India: The Transfer of Power 1942–7*, vol. I–XII, 1970–82.

Pandey, B. N., *The Indian Nationalist Movement, Select Documents*, London, 1979.

Munshi, K. M., *Indian Constitutional Documents*, vol. I, *Pilgrimage to Freedom*, Bombay, 1967.

Zaidi, Z. H., M. A. *Jinnah-Ispahani Correspondence, 1936–48*, Karachi, 1976.

NEWSPAPERS AND JOURNALS

Advance (Calcutta).

Amrita Bazar Patrika (Calcutta).

Bande Mataram (Calcutta).

Bengalee (Calcutta).

Dainik Basumati (Calcutta).

Forward (Calcutta).

Indian Annual Register (Calcutta).
Modern Review (Calcutta).
The Statesman (Calcutta).

INTERVIEWS

Bose, Amiya, Calcutta, 4 March 1988
Bose, Sisir Kumar, Calcutta. 11 March 1988.
Chakravarty, Nikhil, New Delhi, 6 February 1989.
Hussain, Syed Sajjad, Dhaka, 12 February 1990.
Mitra, Ashok, Calcutta, 2 March 1988.
Razzaq, Abdur, Dhaka, 11–13 February 1990.
Sen, Ashit, Calcutta, 5 March 1988.
Sengupta, Rabindra, Calcutta, 14 February 1988.
Umar, Badruddin, Dhaka. 11 February 1990.

SECONDARY WORKS

MEMOIRS, JOURNALS AND BIOGRAPHIES

আহমদ, আবুল মনসুর *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা, ১৯৭০।

Banerjee, Surendra Nath, *A Nation in the Making. Being the Reminiscences of Fifty years of Public Life*, Calcutta, 1963.

Birla, G. D., *In the Shadow of the Mahatma – A Personal Memoir, Calcutta 1953.*

Bapu: A Unique Association Correspondence, 1940–47, Bombay, 1977.

Bose, Sarat Chandra, *I Warned my Countrymen. Being the Collected Works 1945–50 of Sarat Chandra Bose*, Calcatta, 1968.

Sarat Bose Commemoration Volume, Calcutta, 1982.

Bose, Sisir Kumar, *Remembering my Father*, Calcutta, 1988.

Bose, Subhas Chandra, *An Indian Pilgrim,* in Sisir Bose (ed.), *Netaji Collected Works*, vol. I, Calcutta. 1980.

চৌধুরী জামালউদ্দিন আহমেদ, রাজ বিদ্রোহী আশরাফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, ঢাকা ১৯৭৪।

Chaudhuri, Jamaluddin Ahmed, *Rajbirodhi Ashrafuddin Ahmed Chaudhuri*, Dacca,1978.

Chaudhuri, Nirad. C., *Thy Hand Great Anarch! India, 1921–1952*, London, 1987.

The Autobiogrophy of an Unknown Indian, London, 1988.

Chowdhury, Hamidul Huq, *Memoirs*, Dhaka, 1989.

Dutt, Kalpana, *Chittagong Armoury Raiders, Reminiscences*, New Delhi, 1979.

Gordon, Leonard A., *Brothers against the Raj. A Biography of Sarat and Subhas Chandra Bose*, New York, 1990.

Hashim, Abul, *In Retrospection*, Dacca, 1974.

Ikramullah, Begum Shaista, *From Purdah to Parliament*, London, 1963.

Ispahani, M. A. H., *Qaid-i-Azam Jinnah as I knew Him*, Karachi, 1966.

Kamal, Kazi Ahmed, *Politicians and Inside Stories: A Glimpse Mainly into the Lives of Fazlul Huq, Shaheed Suhrawardy and Maulana Bhashani*, Dhaka, 1970.

খালেক, খন্দকার আবদুল, *এক শতাব্দী*, ঢাকা, ১৯৭০।

Khan, Tamizuddin, *The Test of Time. My life and Days*, Dhaka, 1989.

Madhok, Balraj, *Dr. Syama Prasad Mookerjee. A Biography*, New Delhi, 1954.

Mitra, Asok, *Three Score and Ten*, Calcutta, 1987.

Moon, Penderel (ed.), *Wavell: The Viceroy's Journal*, London. 1973.

Purani, A. B., *The Life of Sri Aurobindo. A Source Book*, Pondicherry, 1964.

Rab, A. S. M. Abdur, *A. K. Fazlul Huq*, Lahore, 1966.

Ray Chaudhury, Prithwis Chandra, *Life and Times of C. R. Das. The Story of Bengal's Self-Expression*, London, 1927.

Ray, Prafulla Chandra, *Life and Experiences of a Bengali Chemist*, Calcutta, 1932.

শামসুদ্দিন, এ. কে., *অতীত দিনের স্মৃতি*, ঢাকা, ১৯৬৮।

Talukdar, M. H. R. (ed.), *Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy*, Dacca, 1987.

Ziegler, Philip, *Mountbatten: the official biography*, London, 1985.

CONTEMPORARY LITERATURE, TRACTS, AND PAMPHLETS

(Some of these publications are anonymous and undated, and their place of publication is uncertain. Where possible, the place and year in which the pamphlet was found, if known, is appended in square brackets.)

Ambedkar, B. R., *Gandhi and Gandhism*, Jullunder, 1970.

বন্দোপাধ্যায়, শরোদিন্দু, আদিম রিপু, প্রফুল্ল চন্দ্র গুপ্ত (সম্পা.), *শরোদিন্দু অমনিবাস*, খণ্ড ২, কোলকাতা, ১৯৮০।

ব্যানার্জী, ভবানীচরণ, কলিকাতা কমলালয়, কোলকাতা, ১৮২৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *পথের পাঁচালী*, কোলকাতা, ১৯২৯।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব নতুন আইন ও লীগের বাণী, ঢাকা, ১৯৩৯।

বাংলার হিন্দু সাবধান, (বেনামি), তারিখবিহীন।

বসু, যোগীন্দ্রচন্দ্র, *মডেল ভগিনী*, কোলকাতা, ১৮৮৬-৮৭।

Bengal Anti-Communal Award Movement, A Report, Calcutta, 1936.

ভাদুড়ী, দ্বিজেন্দ্রনাথ, *ষোল আগস্ট উনিশশ ছেচল্লিশ*, কোলকাতা, ১৯৪৬।

Chakravarty, Dhires, Hindu Muslim Unity – Platitudes and Reality', *Modern Review*, vol. 59, 1 6, 1936.

Chatterjee, B. C., *The Betrayal of Britain and Bengal*, undated.

Chattopadhyay, Bankimchandra, *Anandamath* (1st English edn), Calcutta, 1938.

Dharmatattva (1894) ('Essentials of Dharma'), in Bankimchandra Chattopadhyay, *Sociological Essays, Utiliterianism, and Positivism in Bengal* (translated and edited by S. N. Mukherjee and Marian Maddern), Calcutta, 1986.

রাজসিংহ (১৮৯৩), প্রফুল্লকুমার পত্র সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী*, খণ্ড ১, কোলকাতা, ১৯৮৯।

রজনী (১৮৮০), প্রফুল্লকুমার পত্র সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী*, খণ্ড ১, কোলকাতা, ১৯৮৯।

লোকরহস্য, (১৮৭৪), প্রফুল্লকুমার পত্র সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী*, খণ্ড ২, কোলকাতা, ১৯৮৯।

চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, পল্লী সমাজ, সুকুমার সেন, সম্পাদিত, *সুলভ শরৎ সমগ্র*, খণ্ড ২, কোলকাতা, ১৯৮৯।

পথের দাবী, হরিপদ ঘোষ সম্পাদিত, *শরৎ রচনা সমগ্র*, খণ্ড ৩, কোলকাতা, ১৯৮৯।

বিপ্রদাস, *শরৎ রচনা সমগ্র*, খণ্ড ৩, কোলকাতা, ১৯৮৯।

বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, *শরৎ রচনা সমগ্র*, খণ্ড ৩, কোলকাতা, ১৯৮৯।

দাশগুপ্ত, সতীশচন্দ্র, *ভারতের সাম্যবাদ*, কোলকাতা, ১৯৩০।

দত্ত, রমেশচন্দ্র, *মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত*, কোলকাতা, ১৮৭৮।

রাজপুত জীবনসন্ধ্যা, কোলকাতা, ১৮৭৯।

Cultural Heritage of Bengal, Calcutta, 1896.

The Lake of Palms: A Story of Indian Domestic Life, London, 1902.

এফেন্দী, মোহাম্মদ এহসানুল হক, *বর্তমান রাজনৈতিক সংকট ও মুসলমানের কর্তব্য*, রংপুর, ১৯৩৯।

ঘোষ, গিরিশচন্দ্র, *সিরাজদ্দৌল্লা*, রবীন্দ্রনাথ রায় ও দেবীপদ ভট্টাচার্য (সম্পা.), *গিরিশ রচনাবলী*, খণ্ড ১, কোলকাতা, ১৯৬৯।

Haque, Azizul, *The Man Behind the Plough*, Calcutta, 1939.

Hindu! Jagrihee (Hindus! Awake) (Anon.) [Calcutta, 1947].

হিন্দুর সংকটময় পরিস্থিতি: নেতৃবৃন্দের আহ্বান, (বেনামি), কোলকাতা, ১৯৩৯।

খোন্দকার, আইন-আল-ইসলাম, *গরু ও হিন্দু-মুসলমান*।

কীর্তনীয়া, লক্ষ্মীকান্ত ও ভট্টাচার্য, কুমুদ, *গানের বহি লুটের গান*, ময়মনসিংহ, ১৯৩০।

মিত্র, প্যারীচাঁদ, *আলালের ঘরের দুলাল*, কোলকাতা, ১৯৩৭।

মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার, *সিরাজদৌল্লা*, কোলকাতা, ১৮৯১।

Naoroji, Dadabhai, *Poverty and Un-British Rule in India*, London, 1901.

ওদুদ, কাজী আবদুল, *হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ*, কোলকাতা, ১৯৩৫।

Rise Up All Hindus, Wherever You Are and Get Ready to Return Blow for Blow (Anon), [Calcutta 1947].

রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল, *রানাপ্রতাপ সিংহ*, কোলকাতা, ১৯০৫।

মেবার পতন, কোলকাতা, ১৯০৯।

সংগ্রাম (বেনামি), কোলকাতা, ১৯৪৬।

সেন, নবীনচন্দ্র, পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৬), কোলকাতা, ১৯৪৮ সংস্করণ।

Swami Vivekananda, *Uthishtat! Jagrat! Hindu Rashtra ka Amar Sandes* ('Arise! Awaken! The Immortal Message of the Hindu Nation'), Lucknow, 1972.

The Complete Works of Swami Vivekananda, Calcutta, 1989.

Tagore, Rabindranath, *Gora*, London, 1912.

Nationalism, London, 1917.

সহজ পাঠ, বিশ্বভারতী, ১৯৩১।

Why Mr. Nalini Ranjan Sarkar left the Congress (Anon.), Calcutta, 1937.

PUBLISHED BOOKS

Ahmed. Rafiuddin, *The Bengal Muslims 1871-1906. A Quest for Identity*, New Delhi, 1981.

Ali, Hashim Amir. *Then and Now (1933-1958). A Study of Socio-Economic Structure and Change in Some Villages near Viswa Bharati University Bengal*, New Delhi, 1966.

Ambedkar, B. R., *Gandhi and Gandhism*, Jullunder, 1970.

Anderson, Benedict, *Imagined Communities. Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*, London, 1990.

Bagchi, Amiya Kumar, *Private Investment in India 1900–1939*, Madras, 1972.

Bak, J. M. and Benecker, G. (eds.), *Religion and Rural Revolt*, Manchester, 1984.

Bandopadhyay, Gitasree, *Constraints in Bengal Politics 1921-41. Gandhian Leadership*, Calcutta, 1984.

Bandopadhyay, Sekhar, *Caste, Politics and the Raj, Bengal, 1872–1937*, Calcutta, 1990.

Banerjee, Sumanta, *The Parlour and the Streets. Elite and Popular Culture in Nineteenth Century Calcutta*, Calcutta, 1989.

Beteille, Andre, *Studies an Agrarian Social Structure*, New Delhi, 1974.

The idea of Natural Inequality, New Delhi, 1983.

Bhattacharya, Buddhadev, *Satyagrahas in Bengal, 1921-1939*, Calcutta, 1977.

Bhattacharya, J. N., *Hindu Castes and Sects*, Calcutta, 1973.

Bose, Sugata, *Agrarian Bengal: Economy, Social Structure and Politics, 1919–1947*, New Delhi, 1987.

Bourdieu, Pierre, *Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste* (translated by Richard Nice), London, 1986.

Homo Academicus (translated by Peter Collier), Cambridge, 1988.

Language and Symbolic Power (translated by Gino Raymond and Matthew Adamson), Cambridge, 1992.

The Field of Cultural Production, Essays on Art and Literature, Cambridge, 1993.

Bourdieu, Pierre and Passeron, Jean-Claude, *Reproduction in Education, Society and Culture* (translated by Richard Nice), London, 1990.

Breuilly, John, *Nationalism and the State*, Manchester, 1985.

Broomfield, J. H., *Elite Conflict in a Plural Society, Twentieth-Century Bengal*, Berkeley, 1968.

Mostly About Bengal, New Delhi, 1982.

Buchanan-Hamilton, Francis, *A Geographical, Statistical and Historical Description (1908) of the District. A Zillah of Dinajpur in the Province, or Soubah of Bengal*, Calcutta, 1883.

Byres, T. J., *Charan Singh 1902-87. An Assessment*, Patna, 1988.

Cardechi, Guglielmo, *On the Economic Identification of Social Classes*, London, 1977.

Chakrabarty, Bidyut, *Subhas Chandra Bose and Middle-Class Radicalism. A Study in Indian Nationalism*, London, 1990.

Chakrabarty, Dipesh, *Rethinking Working-Class History. Bengal 1890-1940*, Princeton and New Delhi, 1989.

Chakrabarty, Ramakanta, *Vaisnavism in Bengal*, Calcutta, 1985.

Chandra, Bipan, *The Rise and Growth of Economic Nationalism in India*, New Delhi, 1966.

Communalism in Modern India, New Delhi, 1984,

Chatterjee, Bhola, *Aspects of Bengal Politics in the 1930s*, Calcutta, 1969.

Chatterjee, Partha, *Bengal 1920–1947. The Land Question*, Calcutta, 1984.

Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse, New Delhi, 1986.

Chatterjee, Partha and Pandey, Gyandendra (eds.), *Subaltern Studies VII*, Delhi, 1992.

Chattopadhyay, Gautam, *Bengal Electoral Politics and Freedom Struggle, 1862–1947*, New Delhi, 1984.

Clark, Gordon L. and Dear, Michael, *State Apparatus: Structures and Language of Legitimacy,* Winchester, Mass., 1984.

Cohen, Anthony P., *The Symbolic Construction of Community*, London, 1985.

Cohn, B. S. and Singer, M., *Structure and Change in Indian Society*, Chicago, 1968,

Collins, Larry and Lapierre, Dominique, *Freedom at Midnight*, London, 1975.

Das, Suranjan, *Communal Riots in Bengal*, 1905-1947, New Delhi, 1991.

Dasgupta, S., *Obscure Religious Cults*, Calcutta, 1969.

Davis, Marvin, *Rank and Rivalry. The politics of inequality in rural West Bengal*, Cambridge, 1983.

De, Amalendu, *Roots of Separatism in Nineteenth Century Bengal*, Calcutta, 1974.

Independent Bengal: The Design and Its Fate, Calcutta, 1975.

Dixit, Prabha, *Communalism: A Struggle for Power*, New Delhi, 1974.

Duff, James Cunningham Grant, *History of the Marhattas*, 3 vols., London, 1826.

Dumont, Louis, *Homo Hierarchicus. The caste System and Its Implications* (translated by Mark Sainsbury), London, 1970.

Dutt, Rajani Palme, *India Today*, London, 1940.

Ewing, Katherine P., *Shari'at and Ambiguity in South Asian Islam*, New Delhi, 1988.

Foucault, Michel, *The Archaeology of Knowledge* (translated by A. M. Sheridan Smith), New York, 1972.

Fox, Richard, *Lions of the Punjab. Culture in the Making,* London, 1985.

Freitag, Sandria B., *Collective Action and Community. Public Arenas and the Emergence of Communalism in North India*, Berkeley, Los Angeles and Oxford, 1989.

Gandhi, Rajmohan, *Understanding the Muslim Mind*, New Delhi, 1988.

Geertz, Clifford, *The Interpretation of Cultures*, New York, 1973.

Giddens, Anthony, *The Class Structure of Advanced Societies*, London, 1973.

Gilmartin, David, *Empire and Islam. Punjab and the Making of Pakistan*, Berkeley, 1988.

Gramsci, Antonio, *Selections from Prison Notebooks* (translated by Q. Hoare and G. Nowell Smith), London, 1971.

Gopal, Sarvepalli (ed.), *The Anatomy of a Confrontation. The Babri Masjid-Ramjanmabhumi Issue*, New Delhi, 1991.

Gordon, Leonard A., *Bengal. The Nationalist Movement 1876–1940*, New Delhi, 1979.

Greenough, Paul, *Poverty and Misery in Modern Bengal. The Famine of 1943*, Oxford, 1982.

Guha, Ranajit, *A Rule of Property in Bengal: An Essay on the Idea of the Permanent Settlement,* Paris, 1963.

(ed.), *Subaltern Studies. Writings on South Asian History and Society*, 6 vols., New Delhi, 1982–89.

Gupta, S. K., *The Scheduled Castes in Modern Indian Politics: Their Emergence as a Political Power,* New Delhi, 1985.

Habelfass, Wilhelm, *Indian and Europe. An Essay in Understanding*, New York, 1988.

Hasan, Mushirul (ed.), *Communal and Pan-Islamic Trends in Colonial India,* New Delhi, 1985.

Hobsbawm, Eric and Ranger, Terence (eds.), *The Invention of Tradition*, Cambridge, 1984.

Holyoake. G. J., *The Origin and Nature of Secularism*, London, 1896.

Hunt, Alan (ed.), *Class and Class Structure*, London, 1977.

Hunter, W. W., *The Indian Mussalmans,* London, 1876.

Inden, Ronald, *Imagining India*, Cambridge, Mass., 1990.

Inden, Ronald B. and Nicholas, Ralph W., *Kinship in Bengali Culture*, Chicago, 1977.

Ionescu, Ghita and Gellner, Ernest (eds), *Populism. Its Meaning and National Characteristics*, London 1969.

Islam, M. M,. *Bengal Agriculture 1920-1946, A Quantitative Study*, Cambridge, 1979.

Islam, Nurul Mustafa, *Bengali Muslim Public Opinion as Reflected in the Bengali Press, 1901-30*, Dacca, 1973.

Jack, J. C., *The Economic Life of a Bengal District*, Oxford, 1916.

Jalal, Ayesha, *The Sole Spokesman. Jinnah, the Muslim League and the Demand for Pakistan*, Cambridge, 1985.

Joshi, Svati, (ed.), *Rethinking English Essays in Literature, Language, History*, New Delhi, 1991.

Kabir, Humayun, *Muslim Politics 1906–47 and Other Essays*, Calcutta, 1969.

Karlekar, Malavika, *Voices from Within. Early Personal Narratives of Bengali Women*, New Delhi, 1991.

Kawai, Akinobu, *Landlords and Imperial Rule: Change in Bengal Agrarian Society c. 1885-1940*, 2 vols., Tokyo, 1986 and 1987.

Khaliquzzaman, Choudhury, *Pathway to Pakistan*, Lahore, 1961.

Khan, Bazlur Rahman, *Politics in Bengal 1927–1936*, Dhaka, 1987.

Kumar, Nita, *The Artisans of Benares. Popular Culture and Identity, 1880-1986*, Princeton, 1988.

Kumar, Ravinder, *Essays in the Social History of Modern India*, Calcutta, 1986.

Kopf, David (ed.), *Bengal Regional Identity*, East Lansing. Mich., 1969.

Laclau, Ernesto, *Politics and Ideology in Marxist Theory. Capitalism, fascism, populism*, London, 1977.

Laushey, David M., *Bengal Terrorism and the Marxist Left. Aspects of Regional Marxism in India, 1905–1942*, Calcutta, 1973.

Leach, Edmund and Mukherjee, S. N. (eds.), *Elites in South Asia, Cambridge*, 1970.

Low, D. A. (ed.), *The Indian National Congress. Centenary Hindsights*, New Delhi, 1988.

Macaulay, T. B., *Critical and Historical Essays*, 3 vols., London, 1843.

Macpherson, Kenneth, *The Muslim Microcosm, Calcutta, 1918–1985*, Wiesbaden, 1974.

Majumdar, R. C., *Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century*, Calcutta, 1960.

McGuire, John, *The Making of a Colonial Mind. A Quantitative Study of the Bhadralok in Calcutta, 1857-1885*, Canberra, 1983.

McLane, John R., *Indian Nationalism and the Early Congress*, Princeton, 1977.

Mill, James, *History of British India*, 6 vols., London, 1858.

Mitra, Ashok (ed.), *Essays in Tribute to Samar Sen*, Calcutta, 1985.

Momen, Humaira, *Muslim Politics in Bengal: A Study of Krishak Praja Party and the Elections of 1937*, Dacca, 1972.

Moore, R. J., *Churchill, Cripps and India, 1939-1945*, Oxford, 1978.

Escape from Empire. *The Attlee Government and the Indian Problem*, Oxford,1982.

Endgames of Empire. Studies of Britain's Indian Problem, New Delhi, 1988.

Mountbatten, Louis, *Reflections on the Transfer of Power and J. Nehru*, Cambridge, 1968.

Mujeeb, N., *The Indian Muslims*, London, 1969.

Mukherjee, Meenakshi, *Realism and Reality. The Novel and Society in India*, New Delhi, 1985.

Mukherjee, Ramakrishna, *The Dynamics of a Rural Society. A Study of the Economic Structure in Bengal Villages*, Berlin, 1957.

Mukherjee, S. N., *Calcutta: Myth and History*, Calcutta, 1977.

Nanda, B. R. (ed.), *Essays in Modern Indian History*, New Delhi, 1980.

Nehru, Jawaharlal, *The Discovery of India*, New Delhi, 1986.

Omvedt, Gail (ed.), *Land, Caste and Politics in Indian States*, New Delhi, 1982.

Page, David, *Prelude to Partition. The Indian Muslims and the Imperial System of Control 1920–1932*, Delhi, 1982.

Pandey, Gyanendra, *The Ascendancy of the Congress in Uttar Pradesh, 1926–34. A Study in Imperfect Mobilization*, New Delhi. 1978.

The Construction of Communalism in Colonial North India, New Delhi, 1990.

Panigrahi, D. N. (ed.), *Economy, Society and Politics in India*, New Delhi, 1985.

Patnaik, Utsa, *The Agrarian Question and the Development of Capitalism in India*, New Delhi, 1986.

Poulantzas, Nicos, *Political Power and Social Classes*, London, 1975.

Classes in Contemporary Capitalism, London, 1975.

Pyarelal, *The Epic Fast, Ahmedabad,* 1932.

Rahman, Atiur, *Peasants and Classes. A Study in Differentiation in Bangladesh*, London, 1986.

Rashid, Harun-or, *The Foreshadowing of Bangladesh. Bengal Muslim League and Muslim Politics 1936–1947*, Dhaka, 1987.

Ray, Rabindra, *The Naxalites and their Ideology*, Delhi, 1988.

Ray, Rajat Kanta, *Social Conflict and Political Unrest in Bengal 1875–1927,* New Delhi, 1984.

Urban Roots of Indian Nationalism: Pressure Groups and Conflict of Interests in Calcutta City Politics, l875–1939, New Delhi, 1979.

Ray, Ratnalekha, *Change in Bengal Agrarian Society c. 1760–1850*, New Delhi, 1979.

Raychaudhuri, Tapan, *Europe Reconsidered. Perceptions of the West in Nineteenth Century Bengal,* New Delhi, 1988.

Three Views of Europe from Nineteenth Century Bengal, Calcutta, 1987.

Riecoeur, Paul, *Hermeneutics and the Human Sciences, Essays on Language, Action and Interpretation* (translated by John B. Thompson), Cambridge, 1988.

Risley, H. H., *The Tribes and Castes of Bengal. Ethnographical Glossary*, Calcutta, 1891.

Robb, Peter and Taylor, David (eds.), *Rule, Protest, Identity. Aspects of Modern South Asia*, London, 1978.

Robinson, F. C. R., *Separatism among Indian Muslims. The Politics of the United Provinces' Muslims, 1860-1923*, Cambridge, 1974.

Rothermund, Dietmar, *Government, Landlord and Peasant in India. Agrarian Relations under British Rule*, Wiesbaden, 1978.

Sangari, Kumkum and Vaid, Sudesh (ed), *Recasting Women. Essays in Colonial History*, New Delhi, 1989.

Sarkar, Jadunath (ed.), *History of Bengal. Muslim Period, 1200-1757*, Patna, 1973.

Sarkar, Sumit, *The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908,* New Delhi. 1973.

Modern India 1885-1947, New Delhi ,1983.

'Popular' Movements and 'Middle Class' Leadership in Late Colonial India: Perspectives and Problems of a 'History From Below', Calcutta, 1985.

A Critique of Colonial India, Calcutta, 1985.

Sarkar, Tanika, *Bengal 1928-1934. The Politics of Protest*, New Delhi, 1987.

Saville, John and Miliband, Ralph (eds.), *Socialist Register*, London, 1975.

Sen, Asok, *Iswar Chandra Vidyasagar and His Elusive Milestones*, Calcutta, 1977.

Sen, Asok, Chatterjee, Partha and Mukherji, Saugata, *Three Studies on the Agrarian Structure of Bengal, 1850–1947*, Calcutta, 1982.

Sen, Shila, *Muslim Politics in Bengal, 1937-47*, New Delhi, 1976.

Shaikh, Farzana, *Community and Consensus in Islam. Muslim Representation in Colonial India, 1860-1947*, New Delhi, 1976.

Singer, Milton, and Cohn, Bernard (eds.), *Structure and Change in Indian Society*, Chicago, 1968.

Singh, Anita Inder, *The Origins of the Partition of India, 1936–1947*, New Delhi, 1987.

Sisson, Richard and Wolpert, Stanley A. (eds.), *Congress and Indian Nationalism. The Pre-independence Phase*, New Delhi, 1988.

Sperber, Dan, *Rethinking Symbolism*, Cambridge, 1975.

Srinivas, M. N., *Religion and Society among the Coorgs in South India*, Oxford, 1952.

Social Change in Modern India, New Delhi, 1977.

Taylor, David and Yapp, Malcolm (eds.), *Political Identity in South Asia*, London, 1979.

Thapar, Romila, Mukhia, Harbans and Chandra, Bipan, *Communalism and the Writing of Indian History*, New Delhi, 1987.

Thompson, John B., *Studies in the Theory of Ideology*, Cambridge, 1987.

Tod, J., *Annals and Antiquities of Rajasthan or the Central and Western Rajpoot States*, 3 Vols., Calcutta. 1821.

Tomlinson, B. R., *The Indian National Congress and the Raj 1929-1942, The Penultimate Phase*, London, 1976.

Tully, James (ed.), *Meaning and Context. Quentin Skinner and his Critics*, Cambridge, 1988.

Turner, Victor, *Dramas, Fields and Metaphors. Symbolic Action in Human Society*, Ithaca, 1974.

Van der Veer, Peter, *Gods on Earth. The Management of Religious Experience and Identity in a North Indian Pilgrimage Centre*, New Delhi, 1989.

Van M. Baumer, Rachel (ed.), *Aspects of Bengal History and Society*, Hawaii, 1975.

Viswanathan, Gauri, *Masks of Conquest. Literary Study and British Rule in India*, New York, 1989.

Williams, Raymond, *Keywords. A Vocabulary of Culture and Society*, New York, 1976.

Wilson, Bryan, *Religion in a Secular Society. A Sociological Comment*, London, 1966.

Wittgenstein, Ludwig, *Philosophical Investigations* (translated by G. E. N. Anscombe), Oxford, 1958.

Yang, Anand A., *The Limited Raj Agrarian Relations in Colonial India, Saran District, 1793–1920*, Berkeley, 1989.

Zaidi, A. M. (ed.), *Encyclopaedia of the Indian National Congress*, New Delhi, 1981.

ARTICLES

Addy, Premen, and Azad, Ibne, 'Politics and Culture in Bengal', *New Left Review*, vol. 79, 1973.

Ahmed, Rafiuddin, 'Conflict and Contradictions in Bengal Islam: Problems of Change and Adjusment', in Katherine P. Ewing, (ed.), *Shari'at and Ambiguity in South Asian Islam*, New Delhi, 1988.

Alavi, Hamza, 'India: Transition from Feudalism to Capitalism', *Journal of Contemporary Asia*, vol. 10, 1980.

'India and the Colonial Mode of Production', in John Saville and Ralph Miliband (eds.), *Socialist Register*, London, 1975.

Ali, Hashim Amir, 'Rural Research in Tagore's Sriniketan, *Modern Review*, vol. 56 1–16, July-December, 1934.

Asad, Talal, 'Anthropological Conceptions of Religion: Reflections on Geertz', *Man* (NS), vol. 18, 1983.

Bagchi, Jasodhara, 'Shakespeare in Loincloths: English Literature and Early Nationalist Consciousness in Bengal', in Svati Joshi (ed.), *Rethinking English. Essays in Literature, Language. History*, New Delhi, 1991.

Bandopadhay, Sekhar, 'Caste and Society in Colonial Bengal: Change and Continuity', *Journal of Social Studies*, vol. 28, April 1985.

'Community Formation and Communal Conflict. Namasudra-Muslim Riot in Jessore-Khulna', *Economic and Political Weekly*, vol. 25, 46, 1990.

Banerjee, Ramesh Chandra, 'Hindu and Muslim Public Spirit in Bengal', *Modern Review*, vol. 55, 1-6, 1934.

Bannerji, Himani, 'The Mirror of Class. Class Subjectivity and Politics in 19th-Century Bengal', *Economic and Political Weekly*, vol. 24, 19, May 1989.

Baxter, Christine, 'The Genesis of the Babu: Bhabanicharan Bannerji and the *Kalikata Kamalalay*', in Peter Robb and David Taylor (eds.), *Rule, Protest, Identity. Aspects of Modern South Asia*, London, 1978.

Bhadra, Gautam, 'The Mentality of Subalternity: *Kantanama or Rajadharma*', in Ranajit Guha (ed.), *Subaltern Studies VI*, New Delhi. 1989.

Bhaduri, Amit, 'Evolution of Land Relations in Eastern India under British Rule', *Indian Economic and Social History Review*, vol. 13, 1976.

Bhattacharya, Jnanabrata, 'Language, Class and Community in Bengal', *South Asia Bulletin*, vol. 7, 1-2, Fall 1987.

'An Examination of Leadership Entry in Bengal Peasant Revolts', *Journal of Asian Studies*, vol. 37, 4, 1978.

Bhattacharya, Neeladri, 'Myth, History and the Politics of Ramjanmabhoomi', in Sarvepalli Gopal (ed.), *The Anatomy of a Confrontation. The Babri Masjid–Ramjanmabhumi Issue,* New Delhi, 1991.

Borthwick, Meredith, 'The Cuch Behar Marriage and Brahmo Integrity', *Bengal Past and Present*, vol. 95, Part II, 181, July–December 1976.

Bose, Sugata, 'The Roots of Communal Violence in Rural Bengal. A Study of the Kishoreganj Riots, 1930', *Modern Asian Studies*, vol. 16, 3, 1982.

Bourdieu, Pierre, 'The Production of Belief: Contribution to an Economy of Symbolic Goods' in Richard Collins et al, (eds.), *Media, Culture and Society*, London, 1986.

Bruner, Jerome, 'The Narrative Construction of Reality', *Critical Inquiry,* vol. 18, 1, Autumn 1991.

Carter, Bentley, G., 'Ethnicity and Practice', *Comparative Studies in Society and History*, vol., 29, 1, 1987.

Chakrabarty, Bidyut, 'Peasants and the Bengal Congress. 1928–38', *South Asia Research*, vol. 5, 1, May 1985.

'The Communal Award of 1932 and its Implications in Bengal', *Modern Asian Studies*, vol. 23, 3, 1989.

'Political Mobilization in the Localities: The 1942 Quit India Movement in Midnapur', *Modern Asian Studies*, vol. 26, 4, 1992.

Chakravarty, Dipesh. 'Sasipada Banerjee: Bengali Bhadralok and Labour', *Centre for Studies in Social Sciences Series*, Occasional Paper No. 45.

Chakravarty, Uma, 'Whatever Happened to the Vedic Dasi? Orientalism, Nationalism and a Script for the Past', in Kumkum Sangari and Sudesh Vaid (eds.), *Recasting Women. Essays in Colonial History*, New Delhi, 1989.

Chandra, Sudhir, 'The Cultural Component of Economic Nationalism: R. C. Dutt's *The Lake of Palms'*, *Indian Historical Review*, vol. 12, 1–2, 1985–86.

Chatterjee, Partha, 'Caste and Politics in West Bengal', in Gail Omvedt (ed.), *Land, Caste and Politics in Indian States*, New Delhi, 1982.

'The Fruits of Macaulay's Poison Tree', in Ashok Mitra (ed.), *Essays in Tribute to Samar Sen*, Calcutta, 1985.

'The Colonial State and Peasant Resistance in Bengal, 1920-47', *Past and Present*, vol. 110, February 1986.

'Agrarian Relations and Communalism in Bengal 1926–35', in Ranajit Guha (ed.), *Subaltern Studies*, 1, New Delhi, 1986.

'Transferring a Political Theory: Early Nationalist Thought in India', *Economic and Political Weekly*, vol. 21, 3, 18 January 1986.

'Caste and Subaltern Consciousness', in Ranajit Guha (ed.) *Subaltern Studies VI*, New Delhi, 1989.

'A Religion of Urban Domesticity: Sri Ramakrishna and the Calcutta Middle Class', in Partha Chatterjee and Gyanendra Pandey (eds.), *Subaltern Studies VII*, Delhi, 1992.

Chattopadhyay, Ratnabali, 'Nationalism and Form in Indian Painting. A Study of the Bengal School', *Journal of Arts and Ideas*, vol. 14–15, July–December 1987.

Chaudhury, B. B., 'The Process of Depeasantization in Bengal and Bihar, 1885–1947', *Indian Historical Review*, vol. 2, 1975-76.

Cohn, Bernard, 'Notes on the History of the Study of Indian Society and Culture', in M. Singer and B. S. Cohn (eds.), *Structure and Change in Indian Society*, Chicago, 1968.

Das, Suranjan, 'Towards Understanding of Communal Violence in Twentieth Century Bengal', *Economic and Political Weekly*, 27 August 1988.

Das, Ujjwalkanti, 'The Bengal Pact of 1923 and its Reactions', *Bengal Past and Present*, vol. 99, Part 1, 188, January–June 1980.

Dasgupta, Swapan, 'Adivasi Politics in Midnapur, c. 1790–1924', in Ranajit Guha (ed.), *Subaltern Studies IV*, New Delhi, 1985.

Datta, Jatindra Mohan, 'The Real Nature of the Muhammadan Majority in Bengal', *Modern Review*, vol. 49, 2, 1931.

'Relative Public Spirit and Enterprise of Hindus and Muhammadans in Bengal', *Modern Review*, vol. 55, 1–6, 1934.

'Communalism in the Bengal Administration', *Modern Review*, vol. 49, 1, 1931.

'The Relative Heroism of the Hindus and Mohammadans of India', *Modern Review*, vol. 79, 1–6, 1946.

'Who the Bengali Mohammadans Are?', *Modern Review*, vol. 49, 3, 1931.

Datta, Rajat, 'Agricultural Production, Social Participation and Domination in Late Eighteenth 'Century Bengal: Towards an Alternative Explanation', *Journal of Peasant Studies*, vol. 17, 1, 1989.

Dutta, P. K., 'War over Music: The Riots of 1926 in Bengal', *Social Scientist*, vol. 18, 6–7, 1990.

'V. H. P.'s Ram at Ayodhya: Reincarnation through Ideology and Organisation', *Economic and Political Weekly*, vol. 26, 44, 1991.

Eaton, Richard M., 'Islam in Bengal', in George Michel (ed.), *The Islamic Heritage in Bengal*, Paris, 1984.

Freitag, Sandria B., 'Sacred Symbol as Mobilizing Ideology. The North Indian Search for a Hindu Community', *Comparative Studies in Society and History*, vol. 22, 1981.

Gallagher, J. A., 'Congress in Decline: Bengal, 1930 to 1939', *Modern Asian Studies*, vol. 7, 3, 1973.

Gopal, Sarvepalli, 'Nehru and Minorities', *Economic and Political Weekly*, vol. 23, 45-47 (Special Number), 1988.

Gordon, Leonard A., 'Divided Bengal: Problems of Nationalism and Identity in the 1947 Partition', *Journal of Commonwealth and Comparative Politics*, vol. 16, 2, July 1978.

Goswami, Omkar, 'Sahibs, Babus and Banias: Changes in Industrial Control in Eastern India, 1918–50', *Journal of Asian Studies*, vol. 48, 2, May 1989.

Hasan, Mushirul, 'The Muslim Mass Contacts Campaign. Analysis of a Strategy of Political Mobilisation', in R. Sisson and S. Wolpert (eds.), *The Congress and Indian Nationalism. The Pre-Independence Phase*, New Delhi, 1988.

Hashmi, Tajul Islam, 'The Communalization of Class Struggle: East Bengal Peasantry, 1923–29', *Indian Economic and Social History Review*, vol. 25, 2, 1988.

'Towards Understanding Peasants' Politics in Bangladesh: A Historical Perspective since 1920', *Journal of Social Studies*, vol. 42, October 1988.

Honneth, Axel, 'The Fragmented World of Symbolic Forms: Reflections on Pierre Bourdieu's Sociology of Culture'. *Theory, Culture and Society*, vol. 3, 1986.

Inden, Ronald, 'Orientalist Constructions of India', *Modern Asian Studies*, vol. 20, 3, 1986.

Jaiswal, Suvira, 'Semitising Hinduism: Changing Paradigms of Brahmanical Intigration', *Social Scientist*, vol. 19, 12, 1991.

Jalal, Ayesha, 'Azad, Jinnah and Partition', *Economic and Political Weekly*, vol. 24, 21, 27 May 1989.

Johnson, Gordon, 'Partition Agitation and Congress: Bengal 1904 to 1908', *Modern Asian Studies*, vol. 7, 3, 1973.

Kaviraj, Sudipta, 'Imaginary History', Occational Papers in History and Society, 2nd series, No. 7, September 1988, Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi.

Kesavan, Mukul, '1937 as a Landmark in the Course of Communal Politics in U.P.', *Occational Papers in History and Society*, 2nd series, No. 11, November 1988, Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi.

Kopf, David, 'The Universal Man and the Yellow Dog: the Orientalist Legacy and the Problem of Brahmo Identity in the Bengal Renaissance', in R. Van M. Baumer (ed.), *Aspects of Bengal History and Society*, Hawaii, 1975.

Kumar, Ravinder, 'Gandhi, Ambedkar and the Poona Pact', Occational Papers in Histry and Society, No. 20, February 1985, Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi.

'Class, Community or Nation? Gandhi's Quest for a Popular Consensus in India', in Ravinder Kumar, *Essays in the Social History of Modern India*, Calcutta, 1986.

Mandal, Archana, 'The Ideology and Interests of the Bengali Intelligentsia: Sir George Campbell's Educational Policy (1871–1874), *Indian Economic and Social History Review*, vol. 12, 1, 1975.

McLane, John R., 'The Early Congress, Hindu Populism and Wider Society', in R. Sisson and S. Wolpert (eds.), *The Congress and Indian Nationalism. The Pre-Independence Phase*, New Delhi, 1988.

Mukherjee, Nilmani, 'A Charitable Effort in Bengal in the Nineteenth Century. The Uttarpara Hitkari Sabha', *Bengal Past and Present,* vol. 89, 1970.

Mukherjee, S. N., 'Bhadralok in Bengali Language and Literature: An Essay on the Language of Class and Status', *Bengal Past and Present*, vol. 95, Part II, July–December 1976.

'Caste, Class and Politics in Calcutta', in S. N. Mukherjee, *Calcutta: Myth and History*, Calcutta, 1977.

Mukherji, Sugata, 'Agrarian Class Formation in Modern Bengal, 1931–51', *Economic and Political Weekly*, vol. 21, 4, January 1986.

Niranjana, Tejaswini, 'Translation, Colonialism and the Rise of English' in Svati Joshi (ed.), *Rethinking English. Essays in Literature, Language, History,* New Delhi, 1991.

Nugent, Helen M., 'The Communal Award: The Process of Decision-Making', *South Asia* (N S), vols. 2.1 and 2.2, 1989.

Pandey, Gyanendra, 'Rallying Round the Cow. Sectarian Strife in the Bhojpuri Region, c. 1888–1917', in Ranajit Guha (ed.), *Subaltern Studies II*, New Delhi, 1983.

'The Colonial Construction of "Communalism": British Writings on Banaras in the Nineteenth Century', in Ranajit Guha (ed.), *Subaltern Studies VI*, New Delhi, 1989.

'In Defence of the Fragment: Writing about Hindu–Muslim riots in India today', *Economic and Political Weekly*, vol. 26, No. 11–12, Annual Number, 1992.

'Hindus and Others: the Militant Hindu Construction', *Economic and Political Weekly*, vol. 26, 52, 1991.

Pant, Rashmi, 'The cognitive status of caste in colonial ethnography: A review of some literature on the North West Provinces and Oudh', *Indian Economic and Social History Review*, vol. 2, 2, 1987.

Patnaik, Utsa, 'Class Differentiation within the Peasantry', *Economic and Political Weekly,* vol. 11, 1976.

Prindle, Carol. 'Occupation and Orthopraxy in Bengali Muslim Rank', in K. P. Ewing (ed.), *Shari'at and Ambiguity in South Asian Islam*, New Delhi, 1988.

Ranger, Terence, 'Power, Religion and Community: The Matabo Case', in Partha Chatterjee and Gyanendra Pandey (eds.), *Subaltern Studies VII,* New Delhi, 1992.

Ray, Asim, 'The Social Factors in the Making of Bengali Islam', *South Asia*, vol. 3, 1973.

'Bengali Muslims and the Problem of Identity', *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, vol. 22, 3, 1977.

'Bengali Muslim Cultural Mediators and Bengali Muslim Identity in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries', *South Asia*, vol. 10. 1, 1987.

Ray, Rajat and Ratna, 'Zamindars and Jotedars: A Study of Rural Politics in Bengal, *Modern Asian Studies*, vol. 9, 1, 1975.

'The Dynamics of Continuity in Rural Bengal under the British Imperium', *Indian Economic and Social History Review*, vol. 10,2, 1973.

Ray, Rajat Kanta, 'The Crisis of Bengal Agriculture, 1820–1927: The Dynamics of Immobility', *Indian Economic and Social History Review*, vol. 10, 3, 1973.

'Political Change in British India', *Indian Economic and Social History Review*, vol. 14, 4, 1977.

'Three Interpretations of Indian Nationalism', in B. R. Nanda (ed.). *Essays in Modern Indian History*, New Delhi, 1980.

'The Retreat of the Jotedars?', *Indian Economic and Social History Review*, vol. 25, 2, 1988.

Ray, Ratnalekha, 'The Changing Fortunes of the Bengal Gentry under Colonial Rule. The Pal Chaudhuris of Mahesganj'. *Modern Asian Studies*, vol. 21, 3, 1987.

Raychaudhuri, Tapan, 'Permanent Settlement in Operation: Bakarganj District, East Bengal', in R. E. Frykenburg, (ed.), *Land Control and Social Structure in Indian History*, Madison, Wis., 1969.

Robb, Peter, 'The Challenge of Gau Mata. British Policy and Religious Changes in India, 1880–1916', *Modern Asian Studies*, vol. 20, 2, 1986.

Robinson, Francis, 'Nation Formation: the Brass Thesis and Muslim Separatism', *Journal of Commonwealth and Comparative Politics*, vol. 15, 3, 1977.

Rosselli, John, 'The Self-Image of Effeteness: Physical Education and Nationalism in Nineteenth-Century Bengal', *Past and Present*, vol. 86, February 1980.

Samuel, Raphael, 'Reading the Signs', *History Workshop Journal*, vol. 32, Autumn 1991.

Sanyal, Hitesranjan, 'Nationalist Movements in Arambag', *Annya Artha*, September 1974.

Sarkar, Sumit, 'The Kalki Avatar of Bikrampur: A Village Scandal in Early Twentieth Century Bengal', in Ranajit Guha (ed.), *Subaltern Studies VI*, New Delhi, 1989.

'Popular Movements and National Leadership, 1945–47', *Economic and Political Weekly*, Annual Number, April 1982.

'Rammohun Roy and the Break with the Past', in Sumit Sarkar, *A Critique of Colonial India*, Calcutta, 1985.

'The Kathamrita as a Text: Towards an Understanding of Ramakrishan Paramhansa', *Occasional Papers in History and Society*, No. 22, 1985, Nehru, Memorial Museum and Library, New Delhi.

"'Kaliyuga", "Chakri" and "Bhakti": Ramakrishna and His Times', *Economic and Political Weekly*, vol. 26, 29, 1992.

Sarkar,Tanika 'Communal Riots in Bengal', in Mushirul Hasan (ed.), *Communal and Pan-Islamic Trends in Colonial India*, New Delhi, 1985.

'Jitu Santal's Movement in Malda, 1924-1932: A Study in Tribal Protest', in Ranajit Guha (ed), *Subaltern Studies IV*, New Delhi, 1985.

'Bengali Middle-Class Nationalism and Literature: A Study of Saratchandra's "Pather Dabi" and Rabindranath's "Char Adhyay", in D. N. Panigrahi (ed.), *Economy, Society and Politics in India*, New Delhi, 1985.

'Woman as Communal Subject: Rashtrasevika Samiti and Ram Janmabhoomi Movement', *Economic and Political Weekly*, vol. 26, 25, 1991.

Skinner, Quentin, 'Motives, Intentions and the Interpretation of Texts', in James Tully (ed.), *Meaning and Context. Quentin Skinner and his Critics*, Cambridge, 1988.

Smalley, Alan, 'The Colonial State and the Agrarian Structure in Bengal', *Journal of Contemporary Asia*, vol. 13, 1983.

Southard, Barbara, 'The Political Strategy of Aurobindo Ghosh. The Utilization of Political Symbols and the Problem of Political Mobilization in Bengal', *Modern Asian Studies*, vol. 14, 1980.

Torri, Michelguglielmo. "'Westernised Middle-Class" Intellectuals and Society in Late Colonial India', *Economic and Political Weekly*, vol. 25, 4, January 1990.

Upadhyaya, Prakash Chandra,'The Politics of Indian Secularism', *Modern Asian Studies*, vol. 26, 4, 1992.

Van der Veer, Peter, '"God Must be Liberated!" A Hindu Liberation Movement in Ayodhya', *Modern Asian Studies*, vol. 21, 2, 1987.

Van Meter, Rachel, 'Bankimcandra's View of the Role of Bengal in Indian Civilization', in David Kopf (ed.), *Bengal Regional Identity*, East Lansing, Mich., 1969.

Washbrook, D. A., 'Gandhian Politics', a review of Judith M. Brown's *Gandhi's Rise to Power*, Cambridge, 1972, *Modern Asian Studies*, vol. 7, 1, 1973.

'Law, State and Agrarian Society in Colonial India', *Modern Asian Studies*, vol. 15,1981.

Wills, Clair, 'Language, Politics, Narrative, Political Violence', *Oxford Literary Review*, vol. 13, 1991.

Yang, Anand A., 'Sacred Symbol and Sacred Space in Rural India. Community Mobilization in the "Anti-cow Killing" Riot of 1893', *Comparative Studies in Society and History*, vol. 22, 1981.

UNPUBLISHED SECONDARY WORKS

DOCTORAL DISSERTATIONS

Das, Suranjan, 'Communal Riots in Bengal, 1905-1947 University of Oxford, D. Phil thesis, 1987.

Freitag, Sandria B., 'Religious Rites and Riots: From Community Identity to Communalism in North India, 1870–1940', University of California, Berkeley. Ph.D. dissertation, 1980.

Goswami, Omkar, 'Jute Economy of Bengal 1920-1947: A Study of Interaction between Agricultural, Trading and Industrial Sectors', Univerity of Oxford, D.Phil thesis, 1982.

Kamtekar, Indivar, 'The End of the Colonilal State in India; 1942–47', University of Cambridge, Ph.D. dissertation, 1988.

Murshid, Tazeen M., 'The Bengal Muslim Intelligentsia, 1937–77. The Tension between the Religious and the Secular'. University of Oxford, D. Phil thesis, 1985.

Prior, Katherine H., 'The British Administration of Hinduism in North India, 1780–1900, University of Cambridge, Ph.D. dissertation. 1990.

Sen, Samita, 'Women Workers in the Bengal Jute Industry, 1890–1940. Marriage, Migration and Militancy', University of Cambridge, Ph.D. dissertation, 1992.

PAPERS

Guha Thakurta, Tapati. 'Orientalist Constructions of Indian Art at the Turn of the Century: the Polemics of Tradition and "Indianness"', presented at the seminar 'Orientalism and the History and Anthropology of South Asia', London, 1988.

নির্ঘণ্ট

২৪ পরগণা জেলা, ৬৮, ৬৯, ৭৯, ১১৪, ২৪৮, ২৪৯, ২৭৪, ২৮৩, ২৯৩

অগ্রক্রয়, ৮৬, ১২৪

অগ্রিম ঋণ, ৭৪

অধীনস্ত প্রজা, ৭০, ৮৫, ১৩৭

অধ্যাত্মবাদ, ১৮৪, ১৯২

অনুন্নত শ্রেণী, ২৩, ২৫, ৩৯, ৪৪, ৫৯, ৬০, ২২৮; সম্প্রদায়, ২৪, ৩৮, ২২৭, ২৬৬

'অনুপস্থিত' জমিদার, ৭০, ৯৭

অনুশীলন, ১৩৯, ১৪১, ১৮৩, ১৮৭, ১৮৯, ২৭৫

অন্তর্বর্তী কোয়ালিশন, ২৬৩

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, ২৬৪, ২৭০

'অপবিত্র' ধর্মীয় প্রথা, ২৩১

'অপবিত্র' লোক, ২২৭

অব্যাহতিপ্রাপ্ত সৈনিক, ২৭৫, ২৭৭, ৩০৪

অভয় আশ্রম, ১৩৪

অর্থনৈতিক মন্দা, ৬, ১০, ৭৩, ৭৪, ৭৭, ৭৮, ৮৩, ৮৬, ৯৮, ৯৯, ১০১, ১১১, ১৩৮, ১৯২, ২৪৫

অর্থনৈতিক সংকট, ১০৪, ২৬২

অল-বেঙ্গল ট্রেডার্স এ্যান্ড কনজিউমার্স এসোসিয়েশন, ৩০৭

অল-বেঙ্গল নমঃশূদ্র সম্মেলন (১৯২৮), ৪০

অল বেঙ্গল মুসলিম ছাত্র লীগ, ১৩০

অল বেঙ্গল স্টুডেন্ট ফেডারেশন, ১৬৫

অসহযোগ আন্দোলন, ৩২, ৪১, ৪৮, ৭৬, ৭৮, ৮০, ৯৭, ১০১, ১০৪, ১৪২, ১৯৫, ৩১৫

অহিংস আইন অমান্য, ১৫৪

অহিংসবাদী, ২০৬

অহিংসার চেতনা, ২৭২

অস্পৃশ্য, ৩৭, ৩৮, ৪২, ৪৩, ৫৯, ১৯৪, ২২৫, ২২৭, ২৫২. ২৬৬; গ্রুপ, ৩৯, ৪১, ২২৭; আনুষ্ঠানিক পবিত্রকরণ, ৪১; উন্নয়ন, ২২৫

অস্পৃশ্যতা, ৪১, ৪২, ১৯১, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৮, ২২৭; গান্ধীর ধারণা, ৩৬, ৩৭, ৫৯; বাঙলা প্রদেশে, ৩৮, ৪৩,

অস্পৃশ্যতা বিলোপ বিল (Untouchability Abolition Bill), ৪১, ২৩২

আইন অমান্য আন্দোলন, ২৭, ৪৫, ৪৭, ৫৩, ৭৮, ১০৩, ১০৮, ১৯১, ২২২,

আইন-আল-ইসলাম, ২৪৬, ২৫৭, ৩২৬

আক্রমণাত্মক হিন্দুবাদী কর্মসূচি, ২৭৩

আখড়া, ১৮৬, ২৭২

আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগহ, ২৭৫

আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ, ২৭৫

আচার্য চৌধুরী, মহারাজা শশীকান্ত, ১৫১

আজাদ, মওলানা, ১৫৮

আদমশুমারি, ২৪, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২৩০, ২৩৩, ২৫১

আদর্শ হিন্দু ব্যক্তিত্ব, ১৯২

'আদি মুসলমান', ১৯৫

আদিত্যানন্দ, স্বামী, ২৭২

আদিনা মসজিদ, ২৩২

আদিবাসী গোষ্ঠী, ৩৯, ২২৯; শ্রমিক, ২২৯
আদিম আদিবাসী, ৩৮; উপজাতি, ৩৯, ৪১; গোত্র, ৪১
আধা-সামরিক প্রশিক্ষণ, ২৭১
আধিয়ার, ৭৩
আনোয়ারুল্লাহ, ১০৫
আন্দামান বন্দি শিবির, ১০২, ১৪৯
আবওয়াব, ৬৮, ৮৬
আবাদি জমি, ৬৮
আর্য বীর দল, ২৭৪
আর্য সমাজ, ২৫০, ২৯১
আলবার্ট হল, ৩০, ৫৭, ২৫০
আলী, ইয়াকুব, ৯৬, ১০৫
আলী, হাশিম আমীর, ৩৯, ৬০, ৬১, ৬৯, ১১০
আলী, হাসান, ৮৪
আলী, সৈয়দ নওশের, ৮৩, ৮৪, ৯২, ১৩১, ১৪৮, ১৬৬
আলোকিত শ্রেণী, ৮, ১৮৭
আল্ট্রা-লেফটিজম, ৮৬
আসন বণ্টন (বেঙ্গল আইন সভা), ২৪, ২৬, ৫৬
আসানসোল, ২৩৩, ২৮৮
আসাম-বেঙ্গল ইন্ডিয়ান টি প্লান্টার্স এসোসিয়েশন, ৩০৭
আহতাব, এনামুল উলেমা কুতুবুল, ১২৯
আহমদ, অছিমুদ্দিন/ওয়াসিমুদ্দিন, ৯৬, ১০৫
আহমদ, কাজী ময়জুদ্দীন, ১৩০, ১৬৫
আহমদ, নাজিমুদ্দিন, ৮৭, ৮৯, ৯৩-৯৫, ১২৫, ১৪৮, ১৬৩, ১৬৫, ২০৩, ২৪৮, ২৫০, ২৭৬, ২৯৮, ৩০৪
আহমদ, শামসুদ্দিন, ৮৩, ৮৪, ১৬৮

ইউনিয়ন বোর্ড, ২৪০
ইনডেন, রোনাল্ড, ২৩, ৫৪, ২১৩
ইন্ডিয়া অফিস, ২৬, ৫৫
ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি, ২৭৫, ২৭৭, ২৯৯
'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি', ৮৮-৯১
ইউনাইটেড মুসলিম লীগ, ১৫৮
ইউনিয়ন বোর্ড, ৩৪, ৮৭, ১০১, ১০৬, ১০৮, ১২৬, ২৩০, ২৩৭-৩৯, ২৪১, ২৮৯
ইয়ং বেঙ্গল, ৫, ১৮০
ইসলাম, ৪৩, ৯৩-৯৬, ১২৯, ১৮৪, ১৯৫, ১৯৬, ২১১, ২২০, ২২৭, ২৬৫, ২৬৯, ৩০৩
ইসলামি শাসন, ২৪৮
ইস্পাহানী, হাসান, ৮৮, ৮৯, ২৯২

উইলিংডন, লর্ড, ২৬, ৫৪, ৫৫
উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রচারণা, ২৭৯
উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, ২৭৬
উজিরপুর, ২৯৩
উচ্চ বর্ণের হিন্দু, ৪
উচ্চ শিক্ষার কর্তৃত্ব, ১২৭
উচ্চ শ্রেণীর কৃষক, ১১
উচ্চ শ্রেণীর লোক, ৮, ১০, ১২, ৩৯, ৭৬, ৮৫, ৯০, ২২৬, ৩১২
উচ্চতর জাতীয়তাবাদী প্রয়াস, ২২৫
উচ্চতর শাস্ত্রীয় (ritual) মর্যাদা, ২২৬
উচ্চতর হিন্দু সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, ১৯৩
উৎসব পালন, ২৯, ১৭৮, ২৪২-৪৫, ২৪৮, ২৪৯
উত্তর কোলকাতার বেহালা, ২৪৮
উত্তর পাড়া, ৯৭
উত্তর বাঙলা, ৬৭-৬৯, ৭৪, ৭৬, ৯৫, ১০৯, ১৩৪, ১৫১, ২০৯, ২৩৩, ২৬১, ২৯৬
উত্তর ময়মনসিংহ, ৬৯
উত্তরা পল্লী মিলন সংঘ, ২৮১
উন্মুক্ত নির্বাচন, ৩৫

উপ-পত্তনিদার, ৭১

উপজাতীয়, ১২, ২০৯, ২২৭, ২২৮, ২৩৪, ২৩৫, ২৫১, ২৫৩, ২৯৩; গ্রুপ, ২৩৪, ২৯৩

উপজাতীয় লোক, ২৯৩

উপজাতীয়, হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তি, ২২৭

উপনিবেশবাদ, ১২, ১৩, ১২৯, ১৩১, ২০১, ২০৫

উপস্থিত জমিদার ও তালুকদার, ৭৩, ৯৯

উলুবেড়িয়া, ২৩৮, ২৩৯

উর্ধ্বতন লোকদের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দাবি, ২২৮

ঋণ, ৬৯, ৭৪-৭৬, ৭৮, ৮৪, ১০৭, ১১২, ১২৫, ১৪৮, ১৭২, ২৩৭,

ঋণ-খেলাপি, ৭৫

ঋণদাতা, ৭১, ৭৮, ১২৫, ২৩৭, ২৩৮

ঋণ সালিশি বোর্ড, ৮৬, ১২৫, ১৩২, ২৩৭

একক 'বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়', ৪৪

একেশ্বরবাদী ধর্ম, ১৮২

এটলির লেবার পার্টি, ২৫৯

এন্টালি, ২৮১, ২৮৯

এন্টালি বয়েজ লাইব্রেরি, ২৮৯

এন্টালি ব্যায়াম সংঘ, ২৭৪

এম এম ইস্পাহানী লিমিটেড, ৮৯

এলিট শ্রেণী, ১৮৭, ৩১২

এ্যাঙ্গাস এ্যান্ড কোম্পানি, ২৮৯

এ্যাডভান্স্, ২৭

এ্যান ইন্ডিয়ান পিলগ্রিম, ২১. ২০২, ২২২

এ্যানি, এম. এস., ৪৭

এ্যান্ডারসন, জন, ২৬, ৯৪

ঐক্যবদ্ধ হিন্দু বিধিবদ্ধ সমাজ, ১২

ঐতিহ্যগত
মূল্যবোধ, ১৮১, ১৮২; সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় (gentry), ২২৭; হিন্দু প্রথা, ১৮৮; হিন্দু সংস্কৃতি, ১৮৭; হিন্দুত্ববাদ, ১৮২

ওড়াং, ২২৮

ওয়াভেল, আর্চিবল্ড, ২৫৯, ২৬৪, ৩০২

ওয়ার্ধা, ৫১

ওয়েবারিয়ান গ্রুপ, ৩

কংগ্রেস, ২, ৫, ১৪, ১৭, ২০, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৭, ৪৪-৪৭, ৪৯, ৫০-৫৫, ৫৭, ৭৬, ৮৩, ৯২, ৯৬-৯৮, ১০১-০৮, ১২৩, ১২৭-২৯, ১৩১-৫৩, ১৫৬-৬১, ২২৭, ২৩৫, ২৩৮, ২৩৯, ২৫৩, ২৫৭-৭১, ২৭৫, ২৮৬-৮৯, ২৯২, ২৯৩, ২৯৬-৩০১; 'আনুষ্ঠানিক' বেঙ্গল কমিটি, ১৫৪; ওয়ার্কিং কমিটি, ৪৫, ৪৬, ৪৯, ৫১, ৫৩, ১২৭, ১৪০, ১৪২, ১৬২, ২৯৬, ২৯৭; কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন অংশ, ১৩০, ১৩৫; কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, ১১, ১২, ৬৩, ১০১; কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট বোর্ড, ৫৩; গণসংযোগ আন্দোলন, ১২৯, ১৩৬; চরমপন্থী সোসালিস্ট নীতি, ১৩৫; জমিদার লবি, ১০২, ১৩৬; ত্রাণ তহবিল, ১৫৫; ধর্মনিরপেক্ষ পরিচিতি, ৪৬; নতুন 'র‍্যাডিক্যালপন্থী, ১৩২; নির্বাচনী তহবিল, ১০৭; নেতৃত্ব, ১০৫; পার্লামেন্টারি বোর্ড, ৪৯, ১০৭, ১০৮, ১২৭; পুরনো সন্ত্রাসী, ২৭১; বাম শাখা, ১৩৪; -বিরোধী, ১৫৪; সংগঠন ও আন্দোলন, ৪৪; সর্ব-ভারতীয় মুসলিম লীগের সঙ্গে যৌথ অধিবেশন, ৮০; সেবক সংঘ, ২৯২; সোসালিস্ট পার্টি, ১০৬, ১২৯, ১৫৪; হাই কমান্ড, ৪৪, ৪৫, ৫৩, ১৫৬, ২৬০, ২৬১, ২৬৪, ২৯৭, ৩১১

'কনট্যাক্ট বোর্ড', ২২৯

কমিউনিস্ট, ৯০, ১০২, ১০৫, ১২৭, ১৩৪, ১৩৫, ১৪১, ১৪৪, ২৭৩, ৩১৪; পার্টি, ১৫৪,

১৫৮, ২৭১; পার্টি অব ইন্ডিয়া, ১০৩; প্রচারণা, ২৩৮

কর, এস. সি., ২৯১

কলিযুগ, ১৮১, ১৮২, ২১৮, ২১৯

কসবা, ১০৩, ১০৪

কাউন্সিল প্রজা পার্টি, ৮২

কাঁথি, ১০১, ১৩০, ১৩৫, ১৬৫, ১৭২

কাকদ্বীপ থানা, ২৪৮

কাছাড়ী, ২২৮

কাটোয়া, ২৪৫, ২৮৮

কায়স্থ, ১৭, ৫৭, ৬৯, ২২৬

কারনানি, ২৯১

কারমাইকেল হোস্টেল, ১৩০

কালনা, ২৪৫, ২৪৬, ২৮৮; পুরসভা, ২৪৬; মহকুমা, ২৪৫, ৩০৭

কাশেম, আবুল, ৩৪, ৩৬, ৭৯

কালী
উপাসনা, ২৩২; দেবীর মূর্তি, ২৩৪; পূজা, ৯, ২৩৩, ২৩৪, ২৪৭; মন্দির, ২২৭

কিশোর, গৌরীপুরের জমিদার বাবু ব্রিজেন্দ্র, ৯৭

কিষাণ সভা, ২৬২

কুকী, ২২৮

কুচবিহার, ৮১, ২১৪

কুণ্ডু, নিশীথনাথ, ১০৮, ২৯৮

কুমিল্লা, ৮৭, ১০৩, ১০৪, ১২১, ১২৮, ১৩১, ১৩৬

কুরআন, ১৮২, ২৫৭

কুলটি, ২৩৫

কৃষক আন্দোলন, ৮২, ৮৪, ৮৫, ৯৬, ৯৮, ১০১, ১০৩, ১০৪, ১০৬, ১২৮, ১৩৪, ১৪৭, ১৯০; নেতা, ৮৩-৮৫, ৯৩, ১২৮, ১৩২, ১৩৫, ১৩৮, ৩০৯; বিদ্রোহ, ২০৬; সমিতি, ৮৩, ৯২, ৯৩, ৯৬, ৯৯, ১০৩, ১০৫-১০৮, ১২৪, ১৩০, ১৩২-৩৪, ১৩৮, ১৪৫, ১৬২, ১৬৪, ১৬৭, ১৯০; ও শ্রমিক সমিতি, ৯৬; সম্মেলন, ১০৬, ১৩৪

কৃষক প্রজা পার্টি, ১৪, ৮২-৮৮, ৯০-৯৬, ১১৪, ১১৫, ১২৩, ১২৪, ১২৬, ১২৭, ১৩১, ১৩২, ১৩৭, ১৬২, ১৬৪, ১৬৬, ২৬১, ৩০১

কৃষক প্রজা ও মুসলিম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা, ১২৩

কৃষি উৎপাদন সঙ্কট, ৬৭; পণ্য, ৬, ১০, ৯৯, ১২৫, ৩১২; শ্রমিক, ৬৪, ৮৬; সরঞ্জাম, ৭৪; সংস্কার, ১০৫, ২৬১

কেউরা, ৩৮

কে. ডি. এইচ. ই. স্কুল, নওগাঁর, ২৪২

কেবিনেট মিশন, ২৫৯, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৯, ৩০১

কেন্দ্রীয় আইন সভা, হিন্দু সদস্য, ৪১, ৪২

কেন্দ্রীয় আপস-মীমাংসা, ২৬০

কেরানি শ্রেণী, ১১

কৈবর্ত্য, ৩১, ৪৩

কোতুলপুর, ১০৬

কোনাখালি, ২৯৩

কোর্ফা, ৭০, ৭৩, ৮৫, ১৩৭

কোলকাতা টাউন হল, ২৯

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩১, ৩৫, ৯০, ১২৭, ১৬০, ১৯০, ২৭৩

কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ২৭, ২৮, ৩৪, ৪৮, ৮৯, ৯০, ১৪৩, ১৫০, ১৫৫, ১৫৮

কোলকাতা হত্যাকাণ্ড, ৯০, ১১৫, ১৯৫, ২৭৯

ক্যালকাটা আয়রন মার্চেন্টস্ এসোসিয়েশন, ৩০৭

ক্রিপস্ মিশন, ২৫৯

ক্লাইভ, ২০১, ২০২, ২০৪, ২০৫

ক্ষত্রিয়, পদবী, ৪০, ১১৯, ২২৮, ২৩২

'ক্ষমতাধর পাঁচ', ৪৭, ৪৮, ৫০, ৬৪, ১৫২

ক্ষমতার ভারসাম্য, ১০, ২৩৬, ২৪০, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৭, ২৪৯, ২৫৭, ২৮৩, ৩১২

খড়গপুর, ২৩৫, ২৪৯

খাঁ, আকরম, ৭৯, ৮০, ৮৩, ৯০, ২৯৮

খাজনা, ৩-৬, ৮-১১, ৬৮-৭৮, ৮৪-৮৬, ৮৯, ৯৫, ৯৭-৯৯, ১০১, ১০২, ১০৪, ১০৬, ১০৭, ১০৯, ১২৪, ১২৫, ১৩০, ১৩২, ১৩৫-৩৭, ১৪৬, ১৪৭, ১৭১, ২৩৪, ২৩৭, ১৪৫

খাতক, ৭৩, ১০০, ১২৫, ২৩৭, ২৩৮

খাদি কেন্দ্র, ৪১; -গ্রুপ, ১৪৫; -গ্রুপের নেতা, ২৮৮; প্রতিষ্ঠান, ১৪২

খান, তমিজউদ্দিন, ৩৪, ৭০, ৮১, ৮২, ৮৪, ১০৮, ১১০, ১১১, ১৬৮, ১৬৯

খান, দেবেন্দ্রলাল, ৩০, ৫৬, ১৬৫

খাসিয়া, ২২৮

খাস জমি, ৬৮, ৭৩, ৯৯, ১০৪

খুলনা, ৯৫, ২৩৪, ২৩৫, ২৮২, ২৮৯; তফশিলি সম্প্রদায় সমিতি, ২৯৩; বঙ্গীয় যাদব মহাসভা, ২৯৩

খেয়ালী সংঘ, ২৮৯

খেলাফত আন্দোলন, ২, ২৬, ৩২, ৮০, ৮৯, ৯০, ১০৪, ১৯৫, ১৯৯; কমিটি, ৩৩, ৯০

খৈতান, দেবী প্রসাদ, ১৪৮, ১৫১, ১৬১

গঙ্গাজল ঘাটার ন্যাশনাল স্কুল, ৯৭

গজনবী, এ. কে., ৩৪, ৩৬, ৯৫

গণজাগরণমূলক রচনা, ১৯২

গণপ্রতিবাদ, ২০৬

গণসংযোগ কর্মসূচি, ১৩১, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৯, ১৪৮

গনি, আবদুল, ৮৮

গরু কুরবানি, ২৪২, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৮, ২৪৯

গাঙ্গোলি, হযরত শাহ রশিদ আহমদ, ১২৯

গান্ধী, মোহনদাশ করমচাঁদ, ২, ২৭, ৩৬, ৩৭, ৪১, ৪৪-৪৮, ৫০, ৫১, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৩, ৯৭, ১০৬, ১৪১, ১৪২, ১৫২, ১৫৪, ১৬৮, ১৭০, ১৭২, ২৭৩, ২৯৬; 'আমরণ অনশন', ৩৭

গারো, ২২৮, ২৯৬

গালাঘের, জে. এ., ২৮, ৫৬, ১৪৬, ২৩৬

গুপ্ত, ইন্দুভূষণ, ৯৭

গুপ্ত ভাইয়া, সুরেন্দ্রনাথ, ১৭৫

গুরুঙ্গ, ডি. এস., ২৬৭

গুহচৌধুরী, রামচন্দ্রপুরের জমিদার কালিপ্রসন্ন, ৯৭

গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্ব চর্চা, ৪৪

গোঁড়া মূল্যবোধ, ৪৪, ১০০, ১৮২, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৬, ২২৬

গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ, ১৯১, ১৯২

গো-মাংস, ২৩১, ২৩৩

গো-রক্ষা আন্দোলন, ২৫০

গোমস্তা, ১৬, ৭৩, ১০৬

গোয়ালন্দ, ২৮৯

গোয়ালপাড়া, ৪২

গোয়ালা, ২২৬, ২৩৩, ২৩৫

গোয়েঙ্কা, বদরিদাশ, ১৫১

গোল টেবিল বৈঠক (১৯৩১), ৩৬

গোস্বামী, তুলসী চরণ, ৩০, ৯৭, ১১৯

গোস্বামী, রাজা কিশোরী লাল, ৬৪, ৯৭

গৌর-নিতাই মন্দির, ২২৯

গৌরনদী থানা, ২৯৩

গ্রাম পঞ্চায়েত, ৯৮

'গ্রাম পুনর্গঠন', ৯৭, ৯৮, ১৩৪

গ্রামীণ অর্থনীতি, ৭৪; ঋণ, ১০, ৭৪, ৭৫; নির্বাচকমণ্ডলী, ৬৭, ৭৮; বাঙলা, ১১, ৩৯,

৪১, ৬৮, ৬৯, ৭৮; মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ১১; রাজনীতি, ২৩৯

ঘোষ, অরবিন্দ, ২, ৯, ১৮৬
ঘোষ, গিরিশচন্দ্র, ২০২, ২০৬
ঘোষ, তুষার কান্তি, ৪৬, ১৫০, ১৫৮
ঘোষ, প্রফুল্ল, ১০৬
ঘোষ, সুরেন্দ্র মোহন, ১৭, ৯৭, ১৪৯, ১৫২
ঘোষ, হেমেন্দ্র প্রসাদ, ২৭২

চক্রবর্তী, কাশীশ্বর, ২২৭
চক্রবর্তী, ডি., ১৩৪
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ৫০, ১১৯
চট্টগ্রামের হিন্দু, ২৪১
চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, ১৬, ১৭, ৩১, ১৮৬-৯০, ১৯২-৯৫, ১৯৭-৯৯, ২০৬-০৮, ২২৫
চট্টোপাধ্যায়, এন. সি., ১৫৮, ১৭৬
চট্টোপাধ্যায়, বি. সি., ২, ৩০, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৯, ২০৩, ২০৬, ২৭২
চন্দ্রনাথ মন্দির, ২৭৩
'চরমপন্থী', ১১, ৯৬, ১০৪-০৬, ১৩২, ১৩৬, ১৩৯, ২০৬
চা বাগানের কুলি, ২৩৩
চাঁদপুর, ১৩৩, ২২৯, ২৩৯
চাটখিল, ৯৩
চান্দিনা, ১০৩
চামার, ৩৮
চাষি কৈবর্ত্য, ২২৬
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ৩, ৬৮, ৭৬, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯৬, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩৬, ১৩৮, ২৪৫
চেমস্‌ফোর্ড, ২৩
চেম্বার অব লেবার, ৯০
চৌধুরী, হেমন্ত চন্দ্র, ১৫১
চৌধুরী, আশরাফউদ্দিন আহমদ, ১০৪, ১০৫, ১২৮, ১৩৩, ১৩৬, ১৪৫, ১৬৪, ১৭৫, ২৯৭, ২৯৮
চৌধুরী, এস. কে. আচার্য, ১৬১
চৌধুরী, নীরোদ, ৪, ৫, ১৮, ১২৯
চৌধুরী, ফজলুল করিম, ১৪৫
চৌমুহনী, ২৪১
চ্যাটার্জী, নির্মল কুমার, ২৭৩
চ্যাটার্জী, পার্থ, ১২৮, ২১০, ২১৪
চ্যাটার্জী, বি. সি., ৩০, ২০৩, ২৭২
চ্যাটার্জী, রামানন্দ, ২৭২

জঙ্গল মহাল, ৪১
জঙ্গীপুর, ১৪৬, ২৪২; পৌরসভা চেয়ারম্যান, ২৪৩
জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ৬৭, ৭৪
জমি
হস্তান্তর, ৬৮, ৭৮; বিক্রি ৮৬; বিরোধ, ৮৭; খাজনা, ৬, ৭, ৭২, ৭৪
জমিদারি, ৮, ২৮, ৪১, ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৩, ৭৭, ৮৭, ৯২, ৯৭, ১০১, ১৩৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫১, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৪৫; অধিকার, ৯৮; হাট, ১২৫; ব্যবস্থার অবক্ষয়, ৯৮, ১২৬, ২৮৯; প্রথা বাতিল, ৮৪, ৯২, ৯৪, ১০৩
জলপাইগুড়ি, ৮৮, ২৮২, ২৮৯, ২৯৩
জলপাইগুড়ি পৌরসভা, ২৮৯
জলাচল শ্রেণী, ২৩০, ২৫১
জলিল, আবদুল, ১০৩
'জায়গির', ৮১
জাতপাত সমস্যা, ১৮৮, ১৯৩
জাতি, ২৩, ২৭, ২৯, ৪৬, ৫৬, ৫৯, ৬০, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৬-৮৯, ১৯৪, ১৯৮, ১৯৯,

২০৭, ২১২, ২২৬, ২৪৬, ২৬২. ৩১৩, ৩১৭, ৩১৮
জাতি সংঘবদ্ধকরণ আন্দোলন, ২৪৬
জাতিগত সংহতি কর্মসূচি, ২৯৩
জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব, ১২
জাতিভেদ কাঠামো, ৪৩.
জাতিভেদ প্রথা, ৪৩, ১৯৪, ২৩১, ২৩২, ২৫২
জাতীয় ক্রীড়া সংঘ, ২৮১
জাতীয় গৌরব, ১৮৩; পুনর্জাগরণ, ১৮৩; পুনরুজ্জীবন, ১৮৩; ফ্রন্ট, ১৫৯, ১৬০; মুক্তি, ১৮৮
জাতীয় যুব সংঘ, ২৭৪
জাতীয়তাবাদ, ১, ২, ১২, ২০, ৪৪, ৫২, ৯৫, ১৪০, ১৪৫, ১৪৯, ১৫০, ১৮১, ১৮২, ১৮৫, ১৮৮, ১৮৯, ১৯১, ১৯২, ১৯৪, ১৯৫, ২০০, ২০১, ২০৬, ২২১, ২২২, ২৬২, ২৬৮, ২৬৯, ২৮৯, ৩১৩
জাতীয়তাবাদী
রাজনীতিক, ২৩, ২০৬; আদর্শ, ১, ১১, ২৯, ৩০; ইতিহাস রচনায় পলাশী যুদ্ধ, ৩০; ঐতিহ্য, ২, ২০৮; মুসলমান, ৪৫, ৪৯, ৬৩, ২৯৭; চিন্তাধারা, ১, ২, ১০, ২৯, ৫৬, ২০০, ২০৫, ২৩১; শক্তির বিচ্ছিন্নতা, ২৭৮; সাহিত্য, ১৮৬
জামালপুর, ৭৯
জালান, ঈশ্বর দাস, ২৯১
জালান, শেঠ বংশীধর, ১৫১
জিন্নাহ, মোহাম্মদ আলী, ৫৬, ৯১, ১১৬, ২৬০-৬২, ২৬৪, ২৬৫, ২৯৭, ২৯৮, ৩০২
জেমো বাবু, ২৪২
জেলা কংগ্রেস, ৯৭, ১০৬, ১১৯, ১৪৩, ৩০৭
জেলা কংগ্রেস কমিটি, ১৪৫, ২৩৮
জেমস ফিনলে এ্যান্ড কোম্পানি, ২৮৯
জেলা স্কুল বোর্ড, ২৪১
জোতদার, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭৭, ৭৮, ৮০, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ৯২, ৯৩, ৯৬, ১০৯, ১২৪, ১৩৮, ১৭৮, ২২৯, ২৩৭
জোতদার-জমিদার প্রতিযোগিতা, ৮৭
জোরালো কেন্দ্র, ২৬৪
জ্যাক, জে. সি., ৬৯, ৭০, ৭২, ৮১, ৮৫, ১১০

ঝাড়ুদার, ৩৮
ঝালকাঠি, ২৮৭, ২৯৩
ঝুনঝুনওয়ালা, ২৯১

টাঙ্গাইল, ৩৪
টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ২৪২
টিপেরা, ৭৫, ৭৬, ৮৭, ৯৬, ১০৩-০৭, ১২৮, ১৩০, ১৩২, ১৩২, ১৩৫, ১৪৫, ২২৯, ২৩৩, ২৩৯, ২৭৭; কৃষক সমিতি, ৯৪, ১০৩, ১০৫, ১৪৫
টেগার্ট, চার্লস, ৫০, ৬৫

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ২৯, ৩১, ১৮২, ১৯১, ২০৬, ২১৪
ঠাকুর, রুদ্রদেব, ২৪২

ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে, ২৬৯-৭১, ২৮০-৮১, ২৯৩
ডায়মন্ড হারবার মহকুমা, ২৪৮
ডালু, ২২৮
'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া', ২০২
ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, ৮৪, ২৩৬, ২৩৯, ২৪০, ২৮৯
ডেরোজিও, ২০৬
ডেরোজিয়ান, ২০৬, ২১৪; পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুরাগ, ১৮০
ডোম, ৩৮, ৪০, ৪৩, ২৭১, ২৩২

ঢাকা, ৫৫, ৭২, ৭৬, ৮০,৮৭-৮৯, ৯২, ৯৪, ৯৫, ৯৭, ১০৪. ১০৭, ১২৫, ১২৬,

১৩০, ১৫৫, ১৫৬, ২৩৮, ২৪১, ২৪২, ২৮৩; জরিপ ও সেটেলমেন্ট, ৭২; নির্বাচনে প্রাপ্ত আসন, ৯৫; দাঙ্গা তদন্ত কমিটি, ১৫৬, ১৫৭; শহরের হিন্দু দাঙ্গাকারী, ২৩৫; হিন্দু দাঙ্গাকারী, ২৩৫; কংগ্রেস নেতা, ১৫৫, ১৫৬; তেওতা, ৯৭

তফশিলি সম্প্রদায়, ৩৬, ৩৭, ৫৯, ৯২, ১৬৩, ১৬৪, ২২৭, ২২৮, ২৩০, ২৩১, ২৩৩, ২৩৫, ২৬৭-৬৯, ২৯৩

তমলুক, ১০১

তরুণ সমিতি, ১৮৬

তর্কচূড়ামণি, পণ্ডিত শশধর, ১৮০

তা, দশরথি, ১৩০

তাজিয়া, ১৫৯

তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ, ৯৭

তালুকদার, ৩, ১১, ৬৯, ৭০-৭৪, ৭৮, ৭৯, ৯৯, ১০৮, ১০৯, ১২৪, ১৩৩

তিয়ার, ৩৮

তুলসীঘাটার জমিদার, ৯৭

ত্রাণ কর্মসূচি, ১৫৫

ত্রিপুরা রাজ্য, ১৫৫

ত্রিপুরী অধিবেশন, ১৪০, ১৪১, ১৪৬

ত্রিশূলসহ শিবের মূর্তি, ২৭২

দত্ত, অখিলচন্দ্র, ২৯৮

দত্ত, অমরনাথ, ৪১, ১৮৫,

দত্ত, বাবু কামিনী কুমার, ১০৩, ১০৬, ১৫৫, ১৫৬

দত্ত, মধুসূদন, ২০৬

দত্ত, রমেশচন্দ্র, ১৮৪, ২০৬, ২১৫, ২১৬, ২২০, ২২১

দাদন ব্যবসা, ৬৮, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৪, ৮৫

দামোদর ক্যানাল ট্যাক্স, ১৩৬

'দার-উল-ইসলাম', ২৬৫

দার্জিলিং, ২৬৭, ২৮২, ২৯৩

দাশ, চিত্তরঞ্জন, ৯, ২৬, ৩২, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৫০, ৫৩, ৯৭, ৯৮, ১২৭, ১৪০, ১৪৩

দাশ, শৈলজা মোহন, ১৭০

দাশগুপ্ত, সতীশচন্দ্র, ৪১, ৯৮, ১৪২

দাশ চুক্তি, ৯০, ১৯৫

দাস, নগেন, ২৩১

দাস, পুলিন, ২৭২, ২৭৩

দাস, হরনাম, ২৭২

দাস, হেদারাম, ৪৩

দিনাজপুর, ৪৩, ১০৮, ১৩৫, ২৩৩, ২৩৭, ২৮২, ২৮৯

দুর্গা পূজা, ২৪৬, ২৪৭, ২৭৩

দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩), ২৯২

দৃঢ়তাসূচক হিন্দুবাদ, ১৮০

দেওলি বন্দি শিবির ১০২, ১৩৯

দেবী, সরলা, ৯

দেশবন্ধু ব্যায়াম সমিতি, ২৭৪

দেশাই, মহাদেব, ২৯১

দেশীয় ঐতিহ্যগত শিক্ষা, ৬

দেয়ারা শহর, ২৪৫

দৈনিক অমৃত বাজার পত্রিকা , ২৭, ২৯, ৪০, ৪২, ৪৬, ১৩১, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০, ২০৩, ২২৮, ২৭২, ২৭৮, ২৭৯

দৈনিক আজাদ, ৭৯, ৩০২

দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা , ২৭

দৈনিক বসুমতী, ২৭, ২৪৮, ২৭৬

দৈহিক সংস্কৃতি, ১৮৬

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৪৪, ১৫৯

দ্বি-জাতি তত্ত্ব, ২৯

দ্বৈত শাসন, ২৫

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, ৭৩, ৭৭

ধনবাড়ির নওয়াব, ৮৪

ধনী কৃষক, ৬৮, ৬৯, ৮৫, ১২৫, ১৩৭,

ধর্মঘট, ৪১, ৪৮, ১৩৯, ১৪৪, ১৪৯, ২০৬

ধর্মনিরপেক্ষ, ১, ২, ৯৬, ১২৮, ১৩৯, ১৪৪, ১৪৬, ১৭৯, ২০০, ২২২, ২৪২, ৩১২; অভিভাবক, ২৬২; জাতীয়তাবাদ, ৮০, ২৬৮; জাতীয়তাবাদী আদর্শ, ১; দৃষ্টিভঙ্গি, ১৫৪; নীতি, ১৪৪; পরিচিতি, ৪৬, ১২৭

ধর্মসভা, ৯

ধর্মান্তরকরণ, ২৩০, ২৩৩

ধর্মান্তরিত, খ্রিষ্টান, ১৭৫, ১৯৫; মুসলমান, ৪৩; হিন্দু, ২২৭

ধর্মীয় অধিকার, ৪২, ২৩২, ২৩৪, ২৩৪; মূল্যবোধ, ৪২, ১৯৪

ধীমান, এম. সি., ১৭৬

নগদ অর্থকরী ফসল, ৬৮

নগরভিত্তিক পেশাজীবী, ১১

নজর সালামি, ৮৬

নতুন দৃষ্টান্ত, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৯, ২৪৭

নতুন প্রতীক, ২০১

নতুন বরিশাল জেলা, ২৯৩

নতুন হিন্দু রাষ্ট্র, ২৭০, ২৮৩, ২৯৩

নদীয়া, ৫, ৮৩, ৮৪, ১৩০, ১৩১, ২৮২

নদীয়া বার এসোসিয়েশন, ২৮৯

নন্দী, শ্রীশচন্দ্র, ১৬৯

নবগোপাল ন্যাশনাল মিত্র'স জিমনাস্টিক স্কুল, ১৮৬

নব যুবক সেবা সমিতি, ১৪৪, ১৭১

বুরা ইউনিয়ন বোর্ড, ২৪০

নবজাগরণমূলক লেখা, ১৮৩

নবশক, ৩৯

নবী, টি. এ. এন., ১৪৬

নবীনগর, ৭৫, ১০৩

নমঃশূদ্র, ৩৩, ৪০, ৪২, ১০১, ২২৭, ২৩০, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫; পদবি, ২২৬; ভাগচাষী, ৪১; বর্গাদার, ৪১, ১০১; মুসলমানদের সঙ্গে সংঘর্ষ, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫; রাজবংশী শ্রেণীর সমিতি, ৪০; সম্মেলন (১৯২৭), ৪০

নরসিংহবাদ, ২৩৩

নলছিটি, ২৯৩

নড়াইল, ৮৪, ৯২, ১০১, ২৩৪

নসিপুরের রাজা বাহাদুর, ৩০

নাগ, কল্যাণ কুমার, ২৭৩

নাগরিক আন্দোলন, ২০৬

নাজিমুদ্দিন, খাজা, ৮৭, ৮৯, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ১৪৮, ২০৩, ২৪৮, ২৫০, ২৭৬, ২৯৮

নাজিমুদ্দিন সরকার, ২৪৮, ২৫০

নাটোর, ৮৩

নারাজোলের রাজা, ১০৭, ১৬৫, ২৩৮

'নায়াসা', ৪৩

নাশকতামূলক আন্দোলন, ২৬, ৫৫

নাসিরগড়, ২৩৩

'নিউ মুসলিম মজলিশ', ৮৯

নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি, ৮২, ৮৩, ৯০

নিখিল বঙ্গ হিন্দু সম্মেলন, ৪৬

নিন্দুক পত্র-পত্রিকা, ১৮১

নির্বাচকমণ্ডলী, ৩৬, ৩৭, ৬৭, ৭৮, ৮০, ১০৮, ১৪৭, ১৫৮, ২৯৬

নির্বাচন (১৯৩৬), ১০৩, ২৩৫

নির্বাচন (১৯৪৫-৪৬), ১৪৪, ১৫৭, ১৫৮, ২৬০, ২৬২, ২৬৭, ২৬৮, ২৭৬, ২৮৭, ৩০২

নির্বাচনী কমিটি, ২৩৮, ২৩৯

নির্বাচনী প্রচারণা, ৫১, ৪৭, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ১০৬, ১০৭, ১২৪, ২৩৮, ২৭৬

নেহেরু, জওহরলাল, ৪৯, ৫১, ৫২, ২০২, ২০৫, ২৬২, ২৬৩, ২৯৭

নোয়াখালী, ৬৯, ৯২, ৯৩, ৯৫, ৯৯, ১৩২, ১৩৩, ২৩৯, ২৭৭, ২৮৩; দাঙ্গা, ২৩৫, ২৫৪

ন্যাশনাল এ্যাথলেটিক ক্লাব, ২৮৯, ৩০৫

"ন্যাশনাল থিয়েটার", ১৮৫

ন্যাশনাল ফ্রন্ট গ্রুপ, ১৪৩

ন্যাশনালিস্ট পার্টি, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫১

পটুয়াখালী, ৯৪, ১৫৪; নির্বাচন, ৯৫

পণ্যমূল্যের আকস্মিক পতন, ৭৫

পত্তনিদার, ৭১

পত্রস্বর, ৯৭, ১০৬, ১৩৪

পথের পাঁচালী, ৬

পথের দাবী, ১৮৬

পবিত্র

অশ্বত্থ গাছ, ২৪৩; প্রতীক, ১৭৯, ৩১২; সময়, ১৭৮, ২৪৭

পলাশী-পূর্ব অন্ধকার যুগ, ৩০

'পলাশীর যুদ্ধ', ১৮৪, ২০১, ২০২

পল্লি অঞ্চল, ৬৭, ৭৮, ৮৪, ৯৫, ১০১, ২৯২; সামাজিক মেরুকরণ প্রক্রিয়া, ৭৮; অর্থনৈতিক মন্দা, ৭৮, ১০১

পল্লী সমাজ, ১৯০, ২১৯, ২২১

পশ্চিম বাঙলা, ২৮, ৩৫, ৩৯, ৬৮, ৭৭, ৯৯, ২২৫, ২২৬, ২৩৬, ২৪৫, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৮৩, ২৮৬, ২৮৮, ২৯৪, ২৯৯, ৩১৩; হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলো, ২৭০, ২৭৮

পাইক, ৭৩, ৯৯

'পাকিস্তান আন্দোলন', ৯৫, ১৭৮; দাবি, ২৬০, ২৬৪; ধারণা, ২৬৪, ২৬৫, ২৯৮; রাজত্ব, ২৭৯

পাঞ্জাবি পুলিশ, ২৮০, ২৮৭

পাট, ৪০, ৬৮, ৭৪, ৭৬, ৯০, ৯৯, ২৯১, ২৯২

পাটনি, ৩৮

পাবনা, ৬৯, ৭২, ১৩৪, ১৯৫, ১৯৭, ২৭৫, ২৮৩, ৩১৬

পাল, বিপিনচন্দ্র, ৯

পাল, শ্যামসুন্দর, ২৭৫

পালচৌধুরী (মহেশগঞ্জ), ৫, ৭২

পালি, ২৩২

পালিত, জগদীশচন্দ্র, ১০৬, ১২১

'পাড়াভিত্তিক' সংগঠন, ২৭৩

পাশ্চাত্য শিক্ষা, ৪, ৫, ৬, ৮, ১৯০, ২২৭

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, ১৮০, ১৮৯

'পির', ৪৩,

পিরোজপুর, ২৮৯, ২৯৩

পুঁজিপতি, ৭৫

'পুনরুজ্জীবনবাদী' লেখকগণ, ৩২, ২০৬

পুনা চুক্তি, ১০, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪৪-৪৮, ৫২, ২২৭, ৩১২

পুরনো প্রতীক, ২০১

পুরোহিততন্ত্র, ৪১, ৪২, ১৪৯

পুলিশ নিয়োগের আইন, ১২৬

পূজা, সাঁওতালদের অংশগ্রহণ, ২৩৩

পৃথক নির্বাচন, ২৮, ৩৪, ৩৫, ৯৪

'পৃথক প্রতিনিধিত্বমূলক' নির্বাচন, ২৪

পৃথক হিন্দু প্রদেশ গঠনের দাবি, ২৭৭, ২৯১

পেশাগত শিক্ষা, ৪, ৬

'পৈতা', ২২৬, ২৩২

পেশাজীবী সমিতি, ২৮৯

পোদ্দার, আনন্দিলাল, ২৯১

পোনাবালিয়া, ১৭৪, ২৫৪

পোলিং সেন্টার, ২৪১

পৌরসভা, ৩৪, ২৩১, ২৩৮, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৫, ২৪৬, ২৮৯

পৌরসভা নির্বাচন, ৯৭, ২৩৬, ২৮৯
প্যাটেল, বল্লভ ভাই, ৫৩, ১৪২, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৭১, ২৯৭
প্রগ্রেসিভ বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল মোহামেডান এসোসিয়েশন, ৭৯
প্রণবানন্দ, স্বামী, ২৭২, ২৭৩
প্রতিমা বিসর্জন, ২৪৬
প্রতীক, ৪, ১২, ১০৩, ১২৪, ১২৭, ১৭৮-৮০, ১৮৬, ১৯৭, ২০১, ২০৩, ২০৬, ২০৮, ২১১, ২১২, ২২৭, ২৪৪, ২৫০, ২৭৭, ৩১২
প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, ১০৬
প্রদেশ বিভাগ, হিন্দু ভূমিকা, ১, ১৩, ২৬৯, ২৯৯, ৩১৩, ২৬৫, ২৬৬
প্রসারিত 'হিন্দু সম্প্রদায়', ১৯৮
প্রাদেশিক কংগ্রেস, ৪৮
প্রাদেশিক নির্বাচন, 'ইলেকশন ট্রাইব্যুনাল', ১৪২
প্রাদেশিক মনোভাব, ৫২
প্রাদেশিক রাজনীতি, ৪০, ৪২, ৮৬, ৮৭, ২৩৬
প্রাদেশিক রাজনীতিতে ক্ষমতা, ২৮৯
প্রাদেশিক সরকারের দুর্বল ভূমিকা, ২৬০
প্রিজাইডিং অফিসার, ২৪১
প্রেসিডেন্সি অঞ্চল, ৩
প্রেসিডেন্সী কলেজ, ৫
প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি, ৩০৬
প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, ১০, ২৩, ৪৫, ১০২, ১২৩, ২৩৭, ২৬২
প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার, ২৯৬

ফজলুল হক মন্ত্রিসভা, ১২৬, ১৩২, ১৫২
ফজলুল হক সরকার, ২৩৭, ২৫০
ফরিদপুর, ৬৯, ৭০, ৮১, ৮৪, ১০৪, ২২৬, ২৮৩, ২৯৩
ফরোয়ার্ড ব্লক গ্রুপ, ১৪০
ফারুকী, কে. জি. এম., ৮৭, ৮৮, ১০৫
ফেডারেল সরকার, ২৬২
ফেনী, ৩৪, ২৩৮
ফ্রাইট্যাগ, স্যান্ড্রিয়া, ১৭৮

বকরা ঈদ, ২৪২, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৮
বগুড়া, ৬৯, ২৮২
বঙ্গবাণী, ১৮৬
বঙ্গভঙ্গ, ১
বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১২), ৮৮
বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি, ২৯৩
বঙ্গীয় সদগোপ সভা, ২৯৩
বঙ্গীয় হিন্দু সংহতি, ২২৯
বটতলা সাহিত্য, ১৮১
'বন্দে মাতরম', ১৮৬
বন্দ্যোপাধ্যায়, জে এল, ৩০, ৩৮
বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, ৬
বরিশাল, ৩৩, ৭৯, ১০৬, ১৩১, ২৪০, ২৮৬, ২৮৯
বরিশাল আশ্রম, ৯৭
বরিশাল জেলা হিন্দু মহাসভা, ২৯৩
বর্গাদার, ৬৮, ৭৩, ৮৭, ১৩৭, ১৩৮
বর্ণ বা জাতিগত দ্বন্দ্ব, ২২৬
বর্ণ বৈষম্য, ৪২
'বর্ণ সমস্যা', ৩৮, ১৯৪, ১৯৮
বর্ণ হিন্দু, ২৬৭
বর্ণপ্রথা, ৩৮, ৪১, ৪২, ৪৪, ১৮১, ১৯৪, ১৯৮, ১৯৯, ২২৬, ২২৭; গান্ধীর ধারণা, ৩৭; বাঙলার অবস্থান, ৩৮
বর্ণভিত্তিক সমাজ, ৪১
বর্ণভেদের দার্শনিক বৈধতা, ১৯৮

বর্ণাশ্রম, ৪১

বর্ধমান, ৬৯, ৭১, ১৩০, ১৩১, ১৩৫, ১৩৬, ১৪৭, ২৩৫, ২৪৫, ২৪৬-৪৯, ২৫০, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৮৩, ২৮৮, ২৯২, ২৯৩; সাম্প্রদায়িক বিরোধ, ২৪৫

বর্ধমান শহর, ২৪৫, ২৪৬, ২৫০

বর্মন, পঞ্চানন, ২৩২

বলশেভিকবাদ, ৭৫

বসু গ্রুপ, ২৭, ৪৭, ৫০, ১৩৪, ১৩৯, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৭, ১৬১

বসু পরিবার, ১৫০, ১৫২

বসু ভ্রাতৃদ্বয়, ৪৭, ৪৮, ৫২, ৫৪, ১৩৪, ১৩৯, ১৪১, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৮-৫০, ১৫২, ১৫৩, ২৮৬

বসু, তারাকৃষ্ণ, ৪২

বসু, শরৎচন্দ্র, ৩০, ৩১, ৪৮-৫১, ১০৬, ১২৪, ১২৭-৩০, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৯-৪৩, ১৪৬, ১৪৭-৪৯, ১৫১, ১৬১, ২৯৪, ২৯৬-৩০১

বসু, সুগত, ৬৮, ৬৯, ৭০-৭২

বসু, সুভাষচন্দ্র, ৯, ২৭, ৪৪, ৪৬-৫০, ১২৯, ১৩৩, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৮, ১৪৯, ১৫১-৫৪, ২০২, ২০৫, ২৯৯, ৩০০

বহরমপুর, ২৮৯

বাউরি, ৩১, ৩৯

বাইবেল, ১৮২

বাঁকুড়া, ৯৯, ১০৬, ১২৮, ১৩০, ১৩৪, ২৩০, ২৮২, ২৮৮, ২৮৯

বাকেরগঞ্জ, ৭৯, ৮১, ৯২, ৯৫, ১০৪, ২২৬, ২৪০, ২৮৩, ২৮৭, ২৯৩

বাগদি, ৩১, ৩৯

বাগবাজার তরুণ ব্যায়াম সমিতি, ২৭৪

বাঙলা বিভাগের দাবি, ২৮২, ২৮৭, ২৮৮, ২৯৩

বাঙলা সরকার, ১১, ১২৪, ১২৬, ১২৯ ৩১৫; কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা, ১২৩, ১৬৮

'বাঙলার নবজাগরণ', ৮, ১০, ১৮০, ১৮৩

বাঙলার দুর্ভিক্ষ, ২৬৮;

বাঙালি উচ্চ শ্রেণী, ৭৬

বাঙালি বাবু, ১২, ১৮০

বাঙালি রাজবন্দি, ১৩৯

বাঙালি মুসলমান, ৪, ২৯, ৩২, ৩৩, ৪৩, ৮০, ২০৭, ২০৯; রাজনীতিক, ২৬০; 'বুদ্ধিবৃত্তিক পশ্চাদ্‌পদতা', ৩২; স্বদেশপ্রেম, ৮০; ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ, ৪৩

বানাই, ২২৮

বানিয়াচং, ১০৩

'বাবু', ৪, ১৮০, ১৮৫, ১৮৬-৮৮, ১৯২; 'বাবু' পদবি, ৩; 'বাবু' শ্রেণী, ৩

বাবুগঞ্জ, ২৯৩

বামপন্থী দল, ১৩৯, ২৬২

বামপন্থী মুসলমান, ২০৩

বামপন্থীদের প্রয়াস, ২২৯

বাম শক্তির আক্রমণ, ১০৫

বার্ষিক পূজা, ২৪৩

বালিদ্বীপ, ১৮৩

বারাসাত বোর্ড, ২৪৮

বারাসাতের 'হিন্দু তফশিলি সম্প্রদায়', ২৯৩

বারুইপুর, ২৮৯

বার্নপুর, ২৩৩

বালমার লরি এ্যান্ড কোম্পানি, ২৮৯

বালুরঘাট, ১৩৫, ১৭১, ২৩৮

বিজনানন্দ, স্বামী, ২৭২

বিড়লা, জি. ডি., ২৯১

বিড়লা, যুগল কিশোর, ১৫১, ২৭৪

বিড়লা ভ্রাতৃবর্গ, ২৯১

বিড়লাদের পৃষ্ঠপোষকতা, ২৭৪

বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র, ২০৬, ২১৪

বিবেকানন্দ, স্বামী, ২, ৯, ১৮০, ২০৬, ২২৫

বিক্রমপুরের আউটশাহী গ্রাম, ৯৭

বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতি, ৪১, ৩১১

বিপিএইএম ভলান্টিয়ার কোর, ২৭৪

বিপ্রদাশ, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৯

বিপ্লবী, ২৭, ১৩১, ১৩৫, ১৯০, ২০৩, ২৮৬; আন্দোলন, ১০২; ঐতিহ্য, ২৭৯; জাতীয়তাবাদ, ১৪৯, ২০৬; সন্ত্রাসবাদ, ১৪৯; সন্ত্রাসীদের স্বদেশপ্রেম, ২৭৯

'বিশেষ' নির্বাচনী এলাকা, ২৪

বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব, ৩৫

বিশ্বভারতী, ৪২, ৪৩

বিশ্বাস, নির্মল, ৯৮

বীরভূম, ৩৯, ৪২, ৬৯, ১০১, ১৩০, ১৩৪, ১৩৫, ২৮২

বীরভূম জেলার লবপুর থানা, ৯৯

বুকানন-হ্যামিলটন, ৬৯

বেঙ্গল আইন সভা, ১০, ১১, ২৪, ২৫, ২৮, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৪১, ৪৭, ৪৮, ৫১, ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৫৯, ৬৭, ৭৮, ৮৩, ৮৭, ৯০, ৯৪, ১০১, ১০৪, ১০৬, ১১৫, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০-৫৪, ১৫৮-৬০, ১৬২, ১৬৩, ১৬৮, ১৭১, ২০৭, ২৩৫, ২৩৮, ২৪০, ২৬১, ২৬২, ২৭৩, ৩০০, ৩০১; ইউরোপীয় গ্রুপ, ২৪; হিন্দু আসন, ৭৮, ১০১, ১৫৯, ১৬০; হিন্দু নির্বাচনী এলাকা, ১০১, ১৬১; হিন্দু প্রতিনিধি, ১৪৭, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, ১৭৮

বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ডেটরস্ এ্যাক্ট (১৯৩৫), ১২৫, ২৩৭

'বেঙ্গল এন্টি-কমিউনাল এ্যাওয়ার্ড মুভমেন্ট', ৩০

বেঙ্গল কংগ্রেস, ১১, ২০, ২৭, ২৯, ৩২, ৪৪, ৪৬-৫১, ৫৩, ৭৮, ৯২, ৯৬-৯৮, ১০১-১০৩, ১০৬-০৮, ১২৩, ১২৭-২৯, ১৩৭, ১৪০-৪৬, ১৫১-৫৯, ১৬১, ২৩৮, ২৬০, ২৬৬, ২৮৬, ২৮৮, ২৯৬, ২৯৮, ৩০১, ৩১১, ৩১৩; ডানপন্থী সমর্থক, ১১, ১৪১, ১৪৯, ১৫২, ১৫৩, ২০৬, ২৬২; ডানপন্থী অবস্থান, ২৬২; বামপন্থীগণ, ১১, ১২৮, ১৩০, ১৩১, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৫৩, ২০৩, ২০৬, ২২৯, ২৬২, ২৮৬, ৩০০, ৩১৩; পার্লামেন্টারি বোর্ড, ৪৯, ১০৭, ১০৮, ১২৭; নির্বাহী কমিটি, ৫৪, ১৪৩; প্রাদেশিক কমিটি, ১৩৫, ১৪১, ১৫৭, ২৬১

বেঙ্গল টিন্যান্সি এমেন্ডমেন্ট বিল (১৯২৮),৩২, ৯৮, ১০৫, ১৬৮

বেঙ্গল টিন্যান্সি এ্যাক্ট (১৯২৮), ৬৪, ৮২, ১২৪

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, ৩০৭

বেঙ্গল পাবলিক সিকিউরিটি এ্যাক্ট, ১০২

'বেঙ্গল পার্টিশন লীগ', ২৭৮

বেঙ্গল প্রজাস্বত্ব আইন, ১৩২

বেঙ্গল প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) বিল (১৯৩৭), ৩২, ১২৪, ১৩৬

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ফরোয়ার্ড ব্লক, ২৯৯

বেঙ্গল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, ২৭, ৪৬, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৩, ৯৭, ১০১, ১০৩, ১২৮, ১৩৫, ১৩৬, ১৪১-৪৫, ১৪৯, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৯, ২৮৭, ২৯৪, ৩০০; নির্বাহী পরিষদ, ১৪২, ২৮৭

বেঙ্গল ভিলেজ সেল্ফ-গভর্নমেন্ট এ্যাক্ট, ৩৫

বেঙ্গল মানিলেন্ডার্স এ্যাক্ট (১৯৪০), ১২৫

বেঙ্গল মানিলেন্ডার্স বিল (১৯৩৯), ১৪৭

বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, ২৮, ৪০, ৮০, ৮২, ৯৬

বেঙ্গল হিন্দু মেনিফেস্টো, ২০৭

বেতনভোগী কর্মচারী, ৯৭

বেতিলি, আঁদ্রে, ৬৮, ১১১
বেতুর, ১০৬, ১৩৪
বেদ, ১৮২, ১৮৫, ২২৫
বেনুরিয়া, ৪৩
বেল, এফ. ও., ২৩২, ২৩৭
বেড়িখানা মসজিদ, ২৪৭
বৈদিক দর্শন, ১৮৩
বৈশ্য মর্যাদা, ২২৬
বৈষ্ণব, ৯, ৪৩; ধর্মমত, ২৩৪; ধর্মীয় পদ্ধতি, ৪৩
বৈষ্ণববাদ, ৯, ৪৩
বোলপুর, ১৩৪
বোম্বাই, ৩৭, ৮৯, ১৪২, ১৬৩
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ২৩
ব্যবসাদার, ৭৫
ব্যানার্জী, জিতেন্দ্রলাল, ১০১
ব্যানার্জী, পি. এন., ২৭৩
ব্যানার্জী, সুরেন্দ্রনাথ, ১৮২
ব্যায়াম সমিতি বা শরীর-চর্চা সমিতি, ১৮৬, ২৭৪
ব্রাত্য কায়স্থ, ২২৬
ব্রাহ্ম আন্দোলন, ১৮০
ব্রাহ্ম ধর্ম, ১৯১
ব্রাহ্ম পরিবার, ৯
ব্রাহ্মবাদী, ২০৬
ব্রাহ্ম সমাজ, ৬৭, ১০৫, ২৯১
ব্রাহ্মণ, ৪০, ৪২, ৭০, ১৪৯, ১৮১, ১৮৫, ১৮৭, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২৩২, ৩১৭
ব্রাহ্মণ সভা, ১৪৯
ব্রাহ্মণের মর্যাদা, ৪০, ২২৬
ব্রুমফিল্ড, জন, ৩
'ব্লাক হোল', ২০২
ভট্টাচার্য, এ. কে., ১৪৪
ভদ্র হিন্দু, ১৯৮, ২৭৬, ২৭৮, ২৯২
ভদ্রলোক, ১-১৩, ২৫-৩১, ৩৬, ৪৩, ৭১-৭৩, ৭৭, ৮০, ৮২, ৯৬, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০৮, ১২৪, ১২৭, ১২৮, ১৩০, ১৩২, ১৩৭, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৯, ১৫০, ১৫৮, ১৭৭-৮৩, ১৮৫-৯২, ১৯৪, ১৯৮, ২০৩, ২০৫-০৯, ২২৫-২৫০, ২৬৬, ২৭১, ২৭২, ২৭৬, ২৭৮, ২৮৮, ২৮৯, ২৯৩, ২৯৭, ৩১১, ৩১২, ৩১৩; শ্রেণী, ৩, ৪, ৫, ১১, ১৪৭; জাতীয়তাবাদ, ১৮৫; জাতীয়তাবাদী, ২৯, ৪১; রাজনীতি, ১, ২, ১০, ১১, ২৬, ৩৮, ৪৪, ৫২, ৭৩, ৪৪, ৯৭, ১২৯, ১৪৯, ২৫৫, ২৬১, ২৬৬, ২৭৬, ২৮৮, ৩১২; রাজনীতিক, ৮, ৪০, ৪৪, ২৪৯; অর্থনৈতিক স্বার্থ, ২২৮; জাতীয়তাবাদী ধারা, ৯; দাবি, ৯, ১৩, ৩৮; সাম্প্রদায়িক আদর্শ, ২৪৮; সংস্কারকামী মতবাদ, ১৯৪
ভবানী, রাণী, ২০১, ২০২
ভাগচাষি, ৬৮, ৬৯, ৮৬, ১৩৭, ১৩৮, ২২৯
ভাদুড়ী, দ্বিজেন্দ্রনাথ, ২৮১
ভারত শাসন আইন (১৯৩৫), ৬৭, ৭৮, ৭৯, ৮২, ৮৩, ৮৮, ৯০, ১০৪
ভারত শাসন আইন (১৯৩৫), ৫৪, ১০২
ভারত সেবাশ্রম সংঘ, ২৭২, ২৭৪
ভারতীয় ইউনিয়ন, ২৬৪, ২৯১, ২৯৬, ২৯৭; ইতিহাস, ১৩, ১৮৪, ২০২; সভ্যতা, ২০৬; সমাজ, ১, ২৩, ২৪, ২০০; সংস্কৃতি, ১৮৮; জাতীয়তাবাদ, ১, ২, ১২, ১৩, ৫২
ভারতের মুসলমান, ২৬, ২৯
ভারতের হিন্দু, ২৭৯
ভুঁইমালি, ৩৮
ভূস্বামী, ৮, ১১, ৭৬, ৭৭, ৮৫, ৯৭, ১৪৯

ভোটের বাক্স, ২৪১
ভোলাহাট, ২৩৩

মজিদ, মৌলভী আবদুল, ৮৪
মজুর, ৭৫, ১০৪, ১৯৮, ২০৯
মডার্ন রিভিউ , ২০৮, ২০৯
মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ৩, ৫, ৮, ১১, ৮০, ১২৬, ১২৮, ১৩৫, ২৩৭, ২৬৬, ২৭৬, ২৯৯, ৩১৩
মধ্যবর্তী রায়তি স্বত্ব, ৭২, ৭৭, ৯৮, ১০১
'মধ্যবিত্ত শ্রেণীর' মুসলমান, ৮০, ১২৬
মধ্যস্বত্বভোগী রায়তি, ৭০
মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী, ৬৮
মন্টেগু, ২৩
মন্ত্রিসভায় হিন্দু-মুসলমান সমতার নীতি, ২৬৯
ময়মনসিংহ, ৩৯, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৯, ৮৩, ৮৪, ৯৫, ১০০, ১০৭, ১৩৮, ১৪৯, ১৫১, ১৫৪, ১৫৯, ১৬১, ২৭৫, ২৮৩
ময়মনসিংহ জেলা কংগ্রেস, ৯৭
ময়মনসিংহের ইসলামপুর হরিজন সেবা সংঘ, ২৯৩
ময়মনসিংহের বেতাগিরি ইউনিয়ন, ২৩৯
ময়মনসিংহের মহারাজা, ১৫১, ১৬১
মর্যাদার স্তর, ৪৩
মসজিদ, ৯৯, ১৩৩, ১৫৯, ২৩২, ২৩৩, ২৩৫, ২৩৯, ২৪৪, ২৪৭, ২৮০
মসজিদের সামনে গান-বাজনা, ১৭৮, ২৩৩, ২৩৪, ২৪৬, ২৪৭
মহাজন, ৬৯, ৭৪, ১০৩, ১০৪, ১২৫, ১৩২, ১৩৩, ১৩৫, ১৪৭, ১৪৮
মহাজনি বিল, ১৪৮
মহাবীর ঝাণ্ডা মিছিল, ২৩৫
মহাবোধিনী সমাজ, ২৯১
মহাভারতের যুগ, ২২৮
মহেশগঞ্জ, ৫, ৭২
মহেশ্বরী ভবন, ২৭২
মাউন্টব্যাটেন, লর্ড, ২৯৮
'মাতুয়া ধারা' (Matua cult), ২৩৪
মাদারীপুর, ৯২, ২৭৩, ২৮৯
মাদ্রাসা, ৭৯, ৮২; শিক্ষা, ৮২
মাধ্যমিক শিক্ষা বিল, ১২৭
মানিক কালী ধর্মীয় পদ্ধতি, ৪৩
মার্কসবাদ, ১০২
মার্টিন, পি. ডি., ১৬৩
'মার্শাল আর্ট', ২৭৩
মাল, ঈশ্বরচন্দ্র, ১০৮, ১৩০, ১৩৫
মালদা জেলা, ৮৬, ১৫১, ২২৭, ২২৯, ২৪১, ২৮২
মালব্য, মদন মোহন, ৪৬, ৪৭, ৫৩
মালেক, আবদুল, ১০৩-০৫
মাহিষ্য, ৩১, ২২৬, ২৩০, ২৯৩; কৃষক, ১০১; মর্যাদা, ২২৬; শ্রেণী, ২২৯; সম্মেলন, ২২৯; সম্প্রদায়, ২২৯, ২৩০
মাড়োয়ারি
ফেডারেশন, ৩০৭; ব্যবসায়ী, ১৪৮, ১৫১, ১৬১, ২৭৫, ২৮৯, ২৯১; সম্প্রদায়, ১৫১, ১৫৩, ২৭১, ২৭২, ২৭৪, ২৯২
মিকির, ২২৮
মিঠাপুর, ২৩৩, ২৩৪
মিত্র, বি. এল., ৪২
মিরি, ২২৮
মিল, জেমস্, ২০১
'মিলন প্রেস', ৮৪
মিশনারি, ১৮৩, ২০৪
মিশ্র-জাতীয়তাবাদ, ৯৫
মিস্‌নি, ২২৮
মুখার্জী, তারকনাথ, ৯৭

মুখার্জী, মীনাক্ষী, ১৮৩

মুখার্জী, রাজা পিয়ারী মোহন, ৯৭

মুখার্জী, শ্যামাপ্রসাদ, ৩১, ১৪০, ১৫০, ১৫৯, ১৬০, ২০৯, ২২৯, ২৩০, ২৪০, ২৬৭, ২৬৯, ২৭২, ২৭৫, ২৮৬-৮৮, ৩০০

মুখার্জী, স্যার আশুতোষ, ৮৯, ১৫০

মুখোপাধ্যায়, বাবু কালিপদ, ২৮৭

মুখোপাধ্যায়, ড. রাধাকুমুদ, ৩০

মুখোপাধ্যায়, ভূদেব, ২০৬

মুঙ্গের, ২২৮

মুচি, ৩৮, ৪০

মুণ্ডা, ২২৮

মুনজে, বি. আর., ২৭৬

মুন্সীগঞ্জ, ১৩১, ২২৭

মুর্শিদাবাদ, ৮৬, ১৪৪, ১৪৬, ১৫৯, ২৩৩, ২৪২

মুসলমান,
আতরাফ শ্রেণী, ৯৩, ১১৩, ১৯৬; 'আশরাফ' শ্রেণী, ৭৯, ৮০, ৮৪, ৮৮, ৯০, ৯১, ৯৩, ১১৩; আসন, ২৪-২৬, ৭৬, ৮৮, ৯০, ৯২, ৯৫, ১০৭, ১২৪, ১২৭, ২৩৯; বর্গাদার, ৪১, ১০১; কৃষক, ৬৯, ৭০, ৮২, ৮৫, ৮৭, ৯৫, ৯৬, ১০০, ১২৮, ১৩০-৩৪, ১৩৮, ১৭৭, ১৯৭; খাজনা গ্রহণকারী, ৯৫; ছাত্র, ৮০-৮২, ১৩০, ২৪১, ২৪২; জনপ্রিয়তাবাদ, ৮০; জমিদার, ৮৩, ১০০, ১০৫, ১২৫; জোতদার, ৮৬, ২২৯; ধর্মান্তরিত, ৪৩; নির্বাচনী এলাকা, ৯৪; নিয়ন্ত্রিত স্কুল কমিটি, ২৪২; নেতা, ৩২, ৩৩, ৩৬, ৪১, ৭৯, ৯০, ১৩৩-৩৬, ১৪০, ১৪৪, ১৭৯, ২৬০, ২৯৫, ৩১৭; পরিবার, ৩৪, ৬৯, ৭৯, ৮০, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১; প্রজা, ৯৯, ১০০, ১৩১, ১৩৯, ১৯৭, ২৩৩, ২৩৭, ৩১৬; প্রতিনিধিত্ব, ৩৫, ২৬২; ব্যবসায়ী, ৭০, ৮১, ৮৯, ২৯২; বুদ্ধিজীবী, ১১; মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ২৩৭; মন্ত্রী, ১২৪, ১৩১, ২৮০. ২৯৬, ২৯৯; মোল্লা, ১৯৭; মৌলভী, ৭৯, ২৫০; রাজা, ১৮৪, ২০২, ২১০, ২৪৬; শিক্ষক, ২৪১; সরকার, ১৩৩, ২৬৯, ২৮৩, ৩১২; সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা, ২৮, ৭০, ১৪৫, ২৩৬, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৬০, ২৬১, ২৬৪, ২৬৯, ২৭৯, ২৮৩, ২৯৩; সংস্কারপন্থী, ৩৩; সাম্প্রদায়িকতা, ১৭৮; স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে, ২৬২; স্বেচ্ছাচার, ১২, ২৪৮, ২৫০, ২৭১, ২৮০; স্বেচ্ছাসেবক, ৯৯; রাজনীতিক, ২৯, ৩২-৩৬, ৮২, ৮৩, ১২৭, ১৩১, ২৬০, ২২৭; যুগ, ২০১, ২০২, ২০৬

মুসলমান সম্পর্কে ধারণা, ইউরোপীয় সম্রাট, ১৮৪

মুসলমানদের
'আগ্রাসন প্রবণতা', ১৯৬; উত্থান, মফস্বলে, ১১; 'একমাত্র মুখপাত্র', ২৬২; নির্বিচারে হত্যা, ২৭৬; বাঙালি জাতীয়তা, ২০৬; শক্তি, ১৯৭; স্বার্থ, ৩২, ৩৩, ৯২. ১২৪; 'সম্প্রদায়গত সচেতনতা', ৩৫; সংখ্যাধিক্য, ৩২

'মুসলমানিত্ব', ১৯৪, ১৯৭, ২০০

মুসলিম আসন বণ্টন, ৭৮

মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্স, ৮০

মুসলিম ঐক্য, ৮৮

মুসলিম কোয়ালিশন সরকার, ১২৬

'মুসলিম ক্ষমতা', ১৮৩

মুসলিম নেতৃত্ব, প্রাদেশিক, ১৭৭

মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য, ২৯৮

মুসলিম-বিরোধিতা, ১০

মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, ১৭৭, ১৭৮

মুসলিম যুগ, ২০৪, ২০৫

মুসলিম লীগ, ৮০, ৮৩, ৮৮, ৯১-৯৬, ১২৩-২৭, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৮, ১৪০, ১৪৬, ১৫৮, ১৬৯, ২০৩, ২৩০, ২৩১, ২৫৯-৬৪, ২৬৮-৭১, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৯, ২৮০,

২৮৬, ২৯১-৯৩, ২৯৬-৯৮; প্রাদেশিক , ৮৮, ৯১, ২৬১, ২৯৬; মন্ত্রী, ১২৬; পুনর্জন্ম, ৯১

মুসলিম

শাসন, ১১, ৩০, ৩৩, ৩৬, ১৮৪; শাসনের বৈশিষ্ট্য, ২০১; সরকার, ২৫০; সম্প্রদায়, ৯৩, ২০৮; সাম্প্রদায়িকতা, ১৩, ৯৩, ১৭৭, ১৭৮, ২৩৬

মূর্তি পূজা, ২৪৬

মূল জাতীয়তাবাদী রাজনীতি, ২৮৯

মূল্যবোধের অবক্ষয়, ১৮১

মে দিবসের র‍্যালি (১৯৩১), ১০৩

মেকলে শিক্ষা পদ্ধতি, ১২৯

মেথর, ৩৮

মেচ, ২২৮

মেদিনীপুর, ৪১, ১০৬-০৮, ১২৯, ১৩০, ১৪৯, ২২৯, ২৩০, ২৩৯, ২৪৯, ২৮২, ২৮৩, ২৮৮

মেদিনীপুর জমিদারি কোম্পানি, ৪১, ১০১

মেদিনীপুর জেলা, ২৪৯

মেদিনীপুর স্থানীয় প্রতিষ্ঠান নির্বাচনী সাব-কমিটি, ২৩৮

মেদিনীপুরের সাঁওতাল, ২৩৫

মেসার্স জেসফ এ্যান্ড কোম্পানি, ২৮৯

মৈত্রেয়, অক্ষয় কুমার, ২০২, ২০৫, ২০৬

মোল্লারচর, ২৪৮

মোহাম্মদী, ৭৯

মোহাম্মদ, ড. জামাল, ২৭৬

মোহামেডান এডুকেশনাল কমিটি, ৮০

ম্যাকডোনাল্ড, রামসে, ১০, ৩৩

'ম্লেচ্ছ', ১৯৩

যবদ্বীপ , ১৮৩

যশোর, ৫, ৪১, ৭০, ৮৩, ৯২, ১০১, ১০৩, ১৪৬, ২৩১, ২৩৩, ২৩৪, ২৮২

'যুক্ত ও সার্বভৌম বাঙলা', ২৯৬, ৩০০

যুক্ত বাঙলা, ২৭৯, ২৯৪, ৩০০

যুক্ত বাঙলা পরিকল্পনা, ২৯৬, ২৯৮, ৩১১

যুগান্তর গ্রুপ, ৫০, ৯৭, ১৩৯, ১৪১, ১৪৯, ২৭৩, ২৭৫; পার্টি, ১০৬, ১৫৪, ২৭৩; সদস্য, ২৭৩, ২৭৫

'যুব সম্প্রদায়', ২৭৩

যৌথ নির্বাচন, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৪১, ৮৬, ২৩৬,

যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী, ২৯৬

যৌথ নির্বাচনের ভিত্তি, ২৩৬

রংপুর, ৪০, ৯৫, ১২৯, ২৪১, ২৮২

রক্ষণশীলতা, ৯৭, ১০২, ১৮২, ১৯৪

'রজনী' উপন্যাস, ১৮৫

রমজান মাস, ২৪৭

রশিদ, মৌলভি আবদুর, ১৬৭

রহমতুল্লাহ, এস., ২৩৫

রহমান, মুকুলেশ্বর, ১০৩

রহীম, স্যার আব্দুর, ৯০

রাইটার্স বিল্ডিং, ৯৪

রাজনীতিতে 'নিম্ন শ্রেণী'র লোক, ১৪৯

রাজনৈতিক ক্ষমতা, ২৩৬

রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব, ২৭০

'রাজবন্দি দিবস', ১৩৩

রাজবন্দিদের মুক্তি, ১২৪, ১৪১

রাজবংশী, ৩১, ৪০, ৪১, ৪৩, ২২৬, ২২৯, ২৩২, ২৩৫

রাজশাহী, ৭৬, ৮৩, ২৩৫, ২৩০, ২৩৩, ২৩৭-৪২, ২৮২

রাজশাহী ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, ২৩৯

রাজাগোপালাচারী, ২৬৯

রাজাগোপালাচারীর ফর্মুলা, ২৬৯

রাজা, এম. সি., ৩৭, ৪১, ৪২

রানাঘাট পৌরসভা, ২৩১

রাভ, ২২৮

রামগঞ্জ থানার চণ্ডীপুর, ২৩৫

রামায়ণের যুগ, ২২৮

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বাঙলা শাখা, ২৭৪, ২৭৫

রাড়ুলি, ৭০, ৭২

রায়, এম. এন., ১৩৪, ১৪৩

রায়, কমলকৃষ্ণ, ১২৮

রায়, কিরণ শংকর, ৪৭, ৪৯, ৯৭, ১০৭, ১২৪, ২৯৬-৯৮

রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল, ২০৬

রায়, প্রফুল্লচন্দ্র, ৫, ৭০, ৭১, ২৮৮

রায়, বিধানচন্দ্র, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ১২৪

রায়, ভবেন্দ্র, ৪৯

রায়, ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ, ১৫১

রায়, রজত, ৮৭

রায়, রত্না, ৮৭

রায়, রাজা রামমোহন, ৬, ১৮০, ২০৫, ২০৬

রায়, কিশোরীপতি, ১০৭

রায়, শ্রীযুক্ত কুমার শংকর, ১০৭, ১০৮

রায়ত, ১১, ৬৮-৭০, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৭, ৯৮, ১২৪, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৮

রায়তি স্বত্ব, ৬৮, ৭০, ৭২, ৭৭, ৮৫, ৯৫, ৯৮, ১০১, ১২৮

রায়ান, ২৮৮, ২৯২

রিড, রবার্ট, ১৪৮

রেটপেয়ারস্ (Ratepayers) এসোসিয়েশন, ২৮৯

রোদারমন্ড, ডিয়েটমার, ১৩৭

রোয়েদাদ-বিরোধী বাগ্মিতা, ২৯, ৩০

র‍্যাডিক্যাল, ৮৩, ১০৩, ১০৮, ১২৮, ১৩০, ১৩৬; উইং, ১০৩; কংগ্রেস, ১০৩; কর্মসূচি, ১২৮; গ্রুপ, ১০৬; পন্থা, ১৩২, ১৩৪; বাম-ধারা, ১২৯; বুদ্ধিজীবী, ১২৮; মতবাদ, ১৩৪;

লক্ষ্মীপুর, ৯২, ৯৩, ১৩২

লক্ষ্ণৌ চুক্তি (১৯১৬), ৮০

লাকসাম, ১০৩, ১৩৮

লালদিঘি, ৯৪

লালবাগ, ২৩৩

লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০), ২৬০, ২৬৪

লাহিড়ী, আশুতোষ, ১৭৫

লালুং, ২২৮

লুইস ড্রিফাস কোম্পানি, ২৮৯

লিবার্টি, ২৭

লীগ-কৃষক প্রজা সরকার, ১৩৬, ২৪৬

লীগ সরকার, ১৪০, ২৬১, ২৭৯

লুসাই, ২২৮

লোহাগড়া (যশোর), ৬৯, ২৩৩

'ল্যান্ডহোল্ডার'স সোসাইটি', ৮

শক্তিশালী কেন্দ্র, ২৫৯, ২৬২, ২৬৪, ২৯৭

শাক্ত (Sakta), ২৩৪; দর্শন, ৯; মতবাদ, ৪৩

শান্তিনিকেতন, ২০৬

'শারীরিক প্রশিক্ষণ', ২৭৫

শাসনতন্ত্র (constituant) পরিষদ, ২৭০, ২৯৬

শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন, ২৩, ২৫৯

শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, ২৩

শাসমল, বীরেন্দ্রনাথ, ১০১

শাস্ত্রীয় মর্যাদা, ২২৬, ২৩১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর নিয়ন্ত্রণ, ২৪১

শিখ, ২৪, ৩৭, ২৪৮

শিবপুর, ১০৫

শিবাজী, ১৮৩, ২৭৩

শিবাজী উৎসব, ৯
শিবের ধর্মীয় মূর্তি, ২৭২
শীল, ব্রজেন্দ্রনাথ, ৩১
'শুদ্ধি', ১২, ৪১, ২২৭, ২৩১, ২৩৩, ২৩৫, ২৯৩
শেঠি, ২৯১
'শৈব্য' ধর্মমত, ২৩৪
শ্বেতপত্র, ২৯, ৪৫-৪৭
শ্রদ্ধাহীন আধুনিকতা, ১৯৪
শ্রমিক সংগঠন, ৯০, ২৬২
শ্রমিক বিক্ষোভ, ২৬৪
শ্রীরামপুর, ২৭৪, ২৮৭
শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচন, ২৩৮
শ্রেণী বিভেদ, ২২৫, ২২৬
শ্রেণী সংঘর্ষ, ২২৬
শ্রেণীভেদ প্রথা, ৪৩

সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিত্ব, ৩৪
সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের শাসন, ২৬১
সংস্কার আইন (১৯১৯), ৪০
সংস্কৃতি, ৪, ৮, ১২, ৩০, ৩১, ৪১, ৮২, ১৮০, ১৮৪, ১৮৬, ১৮৮-৯০, ১৯৩, ১৯৫-২০০, ২০৩, ২০৫, ২০৬-০৮, ২২৮, ২৩৩, ২৩৪, ২৪০, ২৪৫, ২৭৬, ২৭৮, ২৯১, ২৯৩, ৩১১, ৩১২, ৩১৩
'সংস্কৃতি'র প্রতীক, ১৯৭
'সংস্কৃতায়ন' (sanskritisation), ২৩১
সংরক্ষিত আসন, ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৪৪, ৮২, ১৬০
সংরক্ষিত বিশেষ নির্বাচনী এলাকা, ১৬০
সংস্কৃতির আভিজাত্য, ৮
সংমিশ্র জাতীয়তাবাদ, ১৯৫
'সত্যম-শিবম দল', ২২৭
সত্যাগ্রহ, ৯৭, ১৪২, ১৪৩, ১৫৪, ২০৪, ২৭৭
'সত্যাগ্রহ আন্দোলন', ১৪২
সনাতন হিন্দু সভা, ২৯১
'সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী', ২৯৬, ২৯৮
সমান্তরাল 'কংগ্রেস', ১৪১, ১৪২
সমৃদ্ধ কৃষক, ৬৮, ৩৯, ২২৬
সন্ত্রাসী, ৫০, ১০২, ১৩৯, ২০৬, ২৭১, ২৭৩, ২৭৯; আন্দোলন, ১০২; গ্রুপ, ১০, ১০২, ১৩৯, ১৪১, ১৮৬, ২৭৩; সমিতি, ১১, ৫০
সন্ন্যাস ব্রত, ১৯১, ১৯২
সম্প্রদায়, ১, ২, ৮, ২৩, ২৪, ২৭, ২৮, ৩৩, ৩৭, ৪০, ৪২, ৭৩, ৮২, ৯২, ৯৩, ১৪৪, ১৪৮, ১৫০, ১৫৫, ১৮২, ১৮৪, ১৯৫-৯৭, ২০০, ২০৮, ২০৯, ২২৫, ২২৭, ২২৯, ২৩০, ২৩২, ২৩৯, ২৪২, ২৪৩, ২৪৫, ২৪৬, ২৬৬, ২৯৩, ৩১৭
'সম্প্রদায় প্রীতি', ২৪১
'সম্প্রদায়গত ঐক্য', ৯৫, ৯৬, ১৯৯
সম্প্রদায়গত পরিচিতি, ১২, ১৭৭, ১৭৯, ২০০
সম্প্রদায়গত বিরোধ, ২৩৪
সম্প্রদায়গত ভোটার, ২৩৬
সম্প্রদায়গত সচেতনতা, ৩৫, ৯৫
সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ, ১০, ২৩, ২৩-২৫, ২৮, ৩০, ৩১, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪৫-৪৭, ৪৯, ৫১, ৫৩, ৮৮, ৯২, ১০১, ১০৪, ১৫০, ২২৭, ২৩৬, ২৭২, ৩১২; হিন্দু আসন বণ্টন, ২৪-২৭; হিন্দু প্রতিক্রিয়া, ২৮, ৩১, ৩৬, ৩৮, ৪৬, ৪৯
সরকার, তনিকা, ৯৭, ১৮৭
সলিমুল্লাহ, নওয়াব, ৮৮, ৮৯
সরকার, নলিনী রঞ্জন, ৪৭, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৬, ১৬১, ২৮৬, ২৯১
সরকার, মহেন্দ্রনাথ, ২৭৬
সরকার, রায় সাহেব রেবতীমোহন, ৪০

সরকার, সুমিত, ৬, ১৮১
সরকার, যদুনাথ, ২০৩, ২০৫, ২০৬, ২৮৭
সরকার গঠনে কোয়ালিশন নীতি, ২৬১
সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব, ১৩৯
সরকারি কর্মচারী, ৮৪, ২৪১
সরস্বতী পূজা, ২৩৩, ২৪১, ২৪২, ২৭৩, ২৮১
সরাইল, ২৩৩
'সর্বপ্রাণবাদী', ১৭৯, ২২৮
সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস, ৪৬, ৫১, ৫৩, ১৩৩
সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি, ১৪০, ১৪২, ১৪৪, ১৫৮, ২৮৬, ২৯১
সর্ব-ভারতীয় ফরোয়ার্ড ব্লক, ২৯৯
সর্ব-ভারতীয় বাজার, ২৯২
সর্ব-ভারতীয় বাধ্যবাধকতা, ১৩
সর্ব-ভারতীয় মুসলিম লীগের পুনর্গঠন, ৯১
সর্ব-ভারতীয় রাজনীতি, ২, ১১, ৫২, ৩১৩
সর্ব-ভারতীয় হাই-কমান্ড, ২৬০
সর্ব-ভারতীয় হিন্দু মহাসভা, ১৫৩
সর্ব-সাধারণের উপাসনা, ২৪৭
সহিংস বিপ্লব, ১৫৪
সাউথ ব্রিটিশ ইনসুরেন্স কোম্পানি, ২৮৯
সাংখ্য (Sankhya) দর্শন, ১৮৪
সাঁওতাল, ৩৩, ৩৯, ৪০, ৪১, ১০১, ২২৭, ২২৮-৩২, ২৩৩, ২৩৫; হিন্দু সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্তি, ২২৭-২৯
সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকা, ২৩০
সাংস্কৃতিক আস্থার চেতনা, ১৮৩
সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ৩১, ৩৪, ১৮০, ১৮৯, ২৪১
সাংস্কৃতিক প্রাধান্য, ১২৭
সাত্তার, আবদুস, ১৩০
সাধারণ নির্বাচনী এলাকা, ১০৭, ১৬০, ২৬৭
সাধারণ বা যৌথ নির্বাচন, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৪১, ৫৩, ৮৬, ৯২, ১২৩, ১৪৫, ২৩৬, ২৬২, ২৬৬, ২৬৭, ২৯৬
সান্যাল, নলিনাক্ষ, ৩০, ১৪৪
সান্যাল, শশাংক শেখর, ১৫৯, ২৭৩
সামরিক কর্মচারী, ২৭৫
সার্বজনীন ভোটাধিকার, ১২, ৩৫
সার্বজনীন দুর্গা পূজা, ২৪৬
'সার্বজনীনবাদ', ২০৬
সার্বভৌম বাঙলা পরিকল্পনা, ২৯৬-৯৮
'সার্বভৌম বাঙলার দাবি', ২৯৭
সালাপ, ২৭৫
সাহা সম্প্রদায়, ২২৯
সদগোপ, ৩১, ৬৯, ১০৮, ২৯৩
সার্টিফিকেট পদ্ধতি, ১২৩
সালিশি আদালত, ১০৪
সাইমন কমিশন, ৩৪
'সাধারণ জনগণ', ৮৫, ২০৪, ২৯৯
সাভারকার, ১৫০, ২২৮, ২২৯
সামাজিক
ক্ষমতা, ২৩৬; ন্যায়বিচার, ২৯৬; শৃঙ্খলা, ১৮১
সামাদ, আবদুস, ৩৪, ৩৫
সাম্যবাদী ধারা, ১০২
সাম্প্রদায়িক
আক্রমণ, ১০০, ২৭৯; চেতনা, ২, ২২৩; উত্তেজনা, ২৬, ১৫৫, ২৩৩, ২৪১, ২৪৬
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১, ১২, ১০০, ১৩৩, ১৭৮, ২০৬, ২৩৪, ২৩৬, ২৪৮, ২৪৯, ২৬৪, ২৭৬, ২৮৩; কোলকাতা, ৮৯, ১৯৫, ২৭০, ২৭১; ঢাকা, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ২৩৫; নোয়াখালী, ১৩৩, ২৩৫; পটুয়াখালী, ৯৩, ৯৪; বর্ধমান, ২৩৫, ২৪৬; ময়মনসিংহ, ২৩৯

সাম্প্রদায়িক
প্রচারণা, ২৭৯, ২৮১; বিরোধ, ৯৫, ১৫৯, ২৩৬; ভূমিকা, ১৩; রাজনীতি, ১৩, ২৬৬, ২৭৫; সংঘর্ষ, ২৩০, ২৩৬; সমস্যা, ২৯৬
সাম্প্রদায়িক বিবাদে সাঁওতালদের ব্যবহার, ২৩৩
'সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ত্রাণ সাহায্য', ১৫৬
সাম্প্রদায়িক মনোভাব, ১৩০, ১৩৩, ১৮৪
সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাদেশিক রাজনীতির মেরুকরণ, ৮৭
সাম্প্রদায়িক চেতনার যুগ, ১২৩
সাম্প্রদায়িক ঘটনা, ১৩৪
সাম্প্রদায়িক সন্দেহ, ২৮০
সাম্প্রদায়িকতা, ১, ১২, ১৩, ৩৬, ৮৭, ৯৫, ১০০, ১৩৯, ১৪৬, ১৭৭-৭৯, ১৯৪, ২০০, ২০১, ২৩৬, ২৪৬, ২৬৮, ২৭৬, ২৮০, ২৮৭, ৩১২, ৩১৩
সাম্প্রদায়িকতার ভাষা বা বাগধারা, ১২
সালতোরা থানা, ৯৯
সায়মন কমিশন, ৪০
'সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব', ১২, ৩২, ২০৯, ২২৭
সার্বজনীন পূজা পালন, ২৩০
সিঁথি ছাত্র সংঘ, ২৮১
সিমলা সম্মেলন, প্রথম, ২৬২
'সি আর ফর্মুলা', ২৬৯
সিরাজউদ্দৌলা (চরিত্র), ১৮৪, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫
সিমলা সম্মেলন, ২৫৯, ২৬২
সিরাজদ্দৌলা, ২০২
সিংহ, বি. পি., ৪২
সিংহ, বাবু পরিমল, ২৭৫
সিংহল, ১৮৩
সিংহবাদ, ১৫১
সিংহ রায়, বিজয় প্রসাদ, ৩০, ৩৪, ৩৫, ৪২, ১৩০, ২৭৩
সুঁড়ি, ৩৮
সুদ প্রাপ্তি, ৭২
সুদ-ব্যবসায়ী, ১১, ৭৪, ৭৮, ৮৫, ৮৭, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০৫, ১২৫, ১২৬, ১৩২, ২৩৭
সুফি পির, ৪৩
সুরি, ২৮৯
সুসঙ্গ, ২৭৫
সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড, ১২৭
সেকেন্ডারি এডুকেশন বিল, ১৫৪, ১৫৫
সেটেলমেন্ট, ৬৯, ৭২, ১০১,
সেন, নবীনচন্দ্র, ১৮৪, ২০১, ২০২, ২০৪
সেন, লালমোহন, ৯২, ১০৬
সেন, সতীন, ১৫৪, ২৭২, ২৭৩
সেন, সত্যেন্দ্রনাথ, ৪১
সেনগুপ্ত, এন. সি., ৩৮
সেনগুপ্ত, যতীন্দ্র মোহন, ২৭, ৪৪, ৪৬-৪৮, ৫০
সেন্সাস কমিশনার, ৩৮, ৩৯, ৪৩, ২২৬
সোনামুখী, ৯৭
সোহরাওয়ার্দী, হাসান, ৯০
সোহরাওয়ার্দী, হোসেন শহীদ, ৩৪, ৭৯, ৮৩, ৮৮, ৯০, ৯৩, ৯৪, ১২৬, ২৬৮, ২৭০, ২৭১, ২৭৬, ২৭৭, ২৮০, ২৯৬, ২৯৮, ২৯৯
সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা, ২৭০
সোহরাওয়ার্দী সরকার, ২৬৮, ২৭৭
স্কটিশ চার্চ কলেজ, ৮১
স্কুল ও কলেজ বয়কট, ৮০
স্কুল বোর্ড, ২৩৬, ২৪১
স্কুল-শিক্ষক, ৯৭

স্কুল কমিটি, ২৪১, ২৪২

স্কুলের নিয়ন্ত্রণ, ২৪১

স্টেটসম্যান, ১০২, ২৭০

স্থানীয়

ক্লাব, ২৮৯; নির্বাচন, ৩৫, ২৩৬, ২৩৮; প্রতিষ্ঠান, ২৩৬-৪১, ২৪৫; বাজার, ৭৫, ১২৫; বিষয়, ১০৪, ২৩৬; বোর্ড, ২৮, ৩৪, ৩৫, ৪০, ৮৬, ২২৫, ২৩১, ২৩৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫৫; ট্যাক্স, ৬৮; সংস্থা, ৩৪, ৩৫, ১২৬, ২৪০, ২৮৯; স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, ২৮

'স্বতন্ত্র প্রজা পার্টি', ১৬৮

স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী, ৩৬, ৩৭

স্বতন্ত্র প্রার্থী, ৯৫, ১২৭, ১৩২, ১৪৫, ২৬৬, ২৬৭

স্বত্বভোগী প্রজা, ১৩৭

স্বদেশী আন্দোলন, ২০২

স্বরাজ্য পার্টি, ৪৫, ৯০

স্বরাজী, ৪১, ৫৩, ১৫০, ২২৭

স্বরূপকাঠি থানা, ২৯৩

স্বাধীন ভারতের সরকার পদ্ধতি, ২৬২

'স্বামী সত্যানন্দ', ২৭৩

স্বেচ্ছাসেবী

গ্রুপ, ২৮১; সংগঠন, ২৭৪, ২৭৬, ২৮৯

স্মারকলিপি, ২৯, ৩১, ৩২, ২৯৩, ২৯৯

হক, ফজলুল, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৭৯-৮৫, ৮৭, ৯০, ৯১, ৯৪, ১২৩, ১২৪, ১২৬, ১৩২, ১৩৯, ১৪০, ১৪৫, ১৫২, ১৩৭, ২৪৭, ২৫০

হক, মৌলভী এমদাদুল, ৯৬

হত্যাযজ্ঞ, ২৭০, ২৭১, ২৭৭, ২৮১

হরিজন, ৩৯, ১৩৪, ২২৭, ২৯৩

হলওয়েল মনুমেন্ট, ২০২, ২০৩, ২০৫

হাওলাদার, ৬৯

হাওড়া, ৩৬, ৭২, ৯৯, ১৪৫, ২৩৮, ২৩৯, ২৮২, ২৮৮

হাওড়া টাউন হল, ৩৬

হাওড়া, ডালিমণ্ডলঘাট, ২৯১

হাওড়া, সালকিয়া তরুণ দল, ২৭৪

হাঁড়ি, ৩৮, ১০০

হাট বয়কট, ১৩২

হাবিবুল্লাহ, নওয়াব, ৮৮

হামিদ, শাহ আবদুল, ৮৪

হাদি, ৩৯, ৪০

হার্বার্ট, জন, ১৪০, ১৪৮, ১৫৭

হাশিম, আবুল, ২৯৫, ২৯৬

হাসান, মওলানা মুহাম্মাদুল, ১২৯

হিংসাত্মক ঘটনা, ১৫৫, ১৭৮, ২৪৩

হিন্দু অনুভূতি, ২৪৯; আবাসভূমি সৃষ্টির আন্দোলন, ২৫০; আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, ৯; ইতিহাস, ২০৬; উৎসব, ২৪৮; 'উদাসীনতা', ১৯৬; উচ্চবর্ণ, ৪, ১০, ২৬, ৩৭, ৩৮, ৪১, ৪৩, ২২৬, ২৩০; উচ্চ শ্রেণী, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪১, ৮৭, ১০২, ১০৪, ১১৫, ১৩৮, ২২৩, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২৩৩, ২৩৪, ২৫৩, ২৬৭; উপজাতি, ১২; ঐক্য, ১২, ১৫৮, ১৫৯, ২৬৬, ২৬৮, ২৭১, ২৭৭; গোঁড়ামি, ১৮৯, ১৯১, ১৯২; চেতনা, ১৯৩; ছোটজাত, ২০৯, ছোটলোক, ২০৯; জমিদার, ৪১, ৯২, ১০০, ১০১, ১০৭, ১২৫, ১২৬, ১৩২, ১৩১, ১৩৩, ১৩৬, ১৬০, ১৬১, ২০৮, ২২৯, ২৩৯, ২৪০, ২৭৫; জাগরণবাদ, ১৮০; জাতি, ৯, ১৫১, ১৮৩, ১৮৪; জাতিভেদ প্রথা, ২৩১; জাতিগত দ্বন্দ্ব ২২৬; তফশিলি শ্রেণী, ৩৭; তালুকদার, ১৩৩; নিম্নবর্ণ, ১২, ১৯৮, ২২৯, ২৩১, ২৩২; নিম্নশ্রেণী, ৪, ৩৭, ৭০, ২৩৫, ২৬৬, ২৬৯, ২৯৩; নিষ্ক্রিয়তা, ১৯৭; ন্যাশনালিস্ট, ২৬৭; ধর্মান্তরকরণ, ২৩০; পরিচিতি, ১৮০, ১৯৭, ২৩১,

২৩৪, ২৬৮, ২৬৬; পরিচিতির প্রতীক, ১৮০, ১৯৭; পুনর্জাগরণ, ৯; পুরোহিত, ৬, ১৯৭; প্রভাবিত এলাকা, ২৩৬; প্রতিভা, ৩০; প্রদেশ, ২৯২; প্রধান জেলা, ২৬১; প্রধান এলাকা, ২৪০, ২৪৫, ২৪৮, ২৮৮, ২৮৯; বাঙলা, ১০, ১৮৩, ২০৬; বিধবাদের সতীদাহ, ৯; বর্বরতা, ১৮৩; ব্যক্তিত্ব, ১৮৮, ১৯২; ভাবমূর্তি, ১৮৪; ভারত, ১৮৯; মিছিল, ২৪৪, ২৪৭; মূল্যবোধ, ১৯৩; রাজনীতি, ২৩২; রাজনৈতিক সম্প্রদায় গঠনের চেষ্টা, ২২৫-২৭, ২৩০; রাজনৈতিক ঐক্য প্রয়াস, ২২৫, ২২৮, ২২৯; রাজনৈতিক দল, ২৬৬; রাজনৈতিক ভিত্তি, ২২৭; রাজনৈতিক পরিচিতি, ১১; সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা, ৫২; সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা, ২৩৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৬৪, ২৭০, ২৭৬, ২৭৮, ২৮১, ২৮৩, ২৯২; সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ, ১২৩, ২৬১; সংগঠন, ২২৯, ২৬৭; সংবাদপত্র, ১৫০, ২০৮, ২৩০, ২৪৮, ২৬৮, ২৭০, ২৭৭; সংস্কৃতি, ৩১, ১৮৭, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ২০০, ২৩৪, ২৬৯, ২৯৩; সংহতি, ২২৭, ২২৮; সমাজ, ১২, ২৬৯; সমাজে শ্রেণীবিভাগ, ৩৯, ৪০, ৪৩, ১৯৮; সম্প্রদায়গত পরিচিতি, ৩২, ১৭৭; সম্প্রদায়গত শ্রেষ্ঠত্বের দাবী, ৩২, ১৭৭, ২৬৬; সাম্প্রদায়িক আদর্শ, ২, ২৯৪; সাম্প্রদায়িক আলোচনা, ১০, ১৭৯, ২০০; সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দ, ৩০, ৩২, ৩৬; সাম্প্রদায়িক প্রচারণা, ২৭৯; সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, ২৬৬; সাম্প্রদায়িকতা, ১৯৪, ২৬৮, ২৮০, ৩১২, ৩১৩; মহাজন, ১৩৩, ২৬৭; 'স্বদেশভূমি', ২৭৯; স্বেচ্ছাসেবক গ্রুপ, ২৭১, ২৭৩, ২৭৬; সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব, ৩২, ২০৭, ২০৯; স্বার্থ, ১১, ২৬, ১৪৫, ১৪৮, ১৫০, ১৫২, ১৫৪, ১৫৭-৫৯, ১৬১, ২২৭, ২২৮, ২৩০, ২৪০, ২৭৮, ২৮৬, ২৮৭; শ্রেণীগত পুনর্বিন্যাস চেষ্টা, ২২৮; শ্রেষ্ঠত্ব, ৩২, ২০৭, ২০৮

হিন্দু, উদ্ধার-পরিকল্পনা, ২৯৪

হিন্দু জাতিগত সংহতি কর্মসূচি, ২৯৩

হিন্দু জাতীয়তাবাদ, ১৮১, ১৮২, ২০০, ২৩১

হিন্দু ধর্ম, ১৮৩, ১৮৪, ১৯১, ১৯২, ১৯৪, ১৯৮, ১৯৯, ২২৬, ২২৯, ২৩৩, ২৪৫, ২৪৮, ২৬৯

হিন্দু ধর্মিতা, ১৯১

হিন্দু মহাসভা, ১২, ৩০, ১৪০, ১৫০, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭-৬১

হিন্দু মিশন, ২৭৩, ২৯১

হিন্দু মেলা, ২৩২

হিন্দু রাজ, ১২৩, ১৩৩

হিন্দু রাষ্ট্র, ২৭০, ২৮২, ২৯৯

হিন্দু শক্তি সংঘ, ২৭৩, ২৭৪

হিন্দু সভা, ৩০, ৯২, ১৫৬, ১৯৫, ২২৭, ২২৮, ২৩১, ২৬৭

হিন্দু সভা আন্দোলন, ২২৭

হিন্দু সম্মেলন, ২০৩, ২৭২, ২৭৩

হিন্দু সেবা সংঘ, ২৭৪

হিন্দু-মুসলমান ক্ষমতার ভারসাম্য, ২৪০, ২৪৪

হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, ৮৭, ২৪৭

হিন্দু-মুসলমান সহযোগিতা, ২০২

হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক পার্থক্য, ২৯

হিন্দুত্ব, ৯, ১৯২, ১৯৪, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৯, ২০৭

হিন্দুত্ব চর্চা, ব্রাহ্মণ্যবাদী, ৪৪

হিন্দুত্ববাদ, ১৪৯, ১৮০, ১৮২

হিন্দুত্ববাদী কংগ্রেস রাজনীতি, ২৭৫

হিন্দুস্তান, ১৯৯, ২০৪, ২২৮

হুগলী, ১০২, ১৩৪, ২৩৮, ২৮২, ২৮৩, ২৮৭, ২৮৮

হুগলী জেলা ভূমি মালিক সমিতি, ১৪৬

হুগলীর জমিদার, ৯৯

হোসেন, গোলাম সরোয়ার, ১৩২, ১৩৩

হোসেন, মোশাররফ, ৩৪, ৮৮